বকুল গন্ধে বন্যা এলো

নীহাররঞ্জন গুপ্ত

প্রাপ্তিস্থান :
সমকাল প্রকাশনী
১এ, গোয়াবাগান স্ট্রীট
কলিকাতা-৭০০০০৬

প্রথম প্রকাশ ঃ
মাঘ ঃ ১৩৬৯

প্রকাশক ঃ
প্রসূনকুমার বসু
সমকাল প্রকাশনী
৮।২এ, গোয়াবাগান লেন
কলিকাতা-৭০০০১৩

প্রচ্ছদ মুদ্রণ ঃ
অলোকশংকর মৈত্র

মুদ্রাকর ঃ
টি. টি. ট্রেডার্স
১৫এ, ইন্ডিয়ান মীরর স্ট্রীট
কলিকাতা-৭০০০১৩

সূচী

বকুল গন্ধে বন্যা এলো	৯
নিশিবধূ	১১৩
ভেনডেটা	২৩৯

বকুল গন্ধে বন্যা এলো

উচ্ছ্বসিত জলতরঙ্গের মতই যেন ঘরময় ছড়িয়ে গেল হাসিটা।

আর ঠিক টানের মুখে স্রোতের বেহালার ছড়িটাও যেন আকস্মিক ভাবে মাঝ পথে থেমে গেল পার্থর।

'কাফে দ্য মণিকো'র ডাইনিং হলে উপস্থিত নর-নারীর দলও সেই উচ্ছ্বসিত হাসির আকর্ষণে সেই দিকে বুঝি ক্ষণেকের জন্য তাকিয়েই আবার, যে যার সম্মুখোস্থিত টেবিলের 'পরে রক্ষিত আহার্য, পানীয় ও গল্প গুঞ্জনে মন দেয়।

থামেনি শুধু ঘরের কোণে ডায়াসের উপরে যন্ত্রসংগীতের ঐক্যতান।

যেমন বাজছিল তেমনি বেজে চলে।

কেবল থেমে গিয়েছিল পার্থর হাতের বেহালার সুর।

পার্থ তখনো নিষ্পলক নেত্রে চেয়ে আছে, ডাইনিং হলের দক্ষিণ কোণের টেবিলের চারপাশে যে দুটি তরুণীকে নিয়ে চার পাঁচটি সুবেশধারী অভিজাত চেহারার যুবক আহার্যে ব্যস্ত সেই দিকেই।

সহসা পিওনোবাদক রবার্টের চাপা সতর্কবাণীতে চমকে ওঠে পার্থ,—হিস্ পার্থ—হোয়াট আর ইউ লুকিং এ্যাট্! হোয়াই স্টাণ্ডিং লাইক এ স্ট্যাচু। ক্যারি অন—ক্যারি অন উইথ্ ইওর ভায়োলিন।

লজ্জিত, সপ্রতিভ পার্থ বন্ধু রবার্টের কথায় তাড়াতাড়ি আবার বেহালাটা কাঁধের 'পরে থুতনী দিয়ে চেপে ধরে, তাদের গায়ে ছড়ির টান দিয়ে, সুরে সুর মিলবার চেষ্টা করে কিন্তু ঠিক যেন সুর মিলাতে পারে না।

নিজের অজ্ঞাতেই আবার পরমুহূর্তেই তৃষিত চোখের দৃষ্টি তার ঘুরে সেই ঘরের কোণে পতিত হয়।

খুব বেশী দূরে নয়। ডায়াস থেকে মাত্র হাত ছয়ের ব্যবধান।

ডাইনিং হলের দুগ্ধধবল টিউব লাইটের প্রাচুর্যে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে, সুর্মা চিহ্নিত আঁখির তারায় কি এক স্বপ্নালসা দৃষ্টি যেন।

স্বপ্নালসা সেই মৃগনয়নে মধ্যে মধ্যে এদিক ওদিক তাকাচ্ছে তরুণী।

শঙ্খধবল হাতের চম্পকসদৃশ শিথিল ভঙ্গির অঙ্গুলির সাহায্যে ধরা রয়েছে ছোট একটি রক্তাভ সুরাভর্তি সুদৃশ্য পেগ্‌গ্লাস। অন্যান্য সঙ্গীরাও সুরাপানে ব্যস্ত।

টেবিলের 'পরে এখনো খানা পড়েনি। কেবল সুরার পাত্র।

পার্থ! হোয়াট দি হেল ইউ আর ডুইং!···ক্যারি অন উইথ ইওর ভায়োলিন।

আবার সচকিতে বেহালার তারে ছড় টানে।

কাফে দ্য মণিকো। কলকাতা শহরের একটি অভিজাত রুচিসম্পন্ন, ধনী ও বিলাসী সম্প্রদায় অধ্যুষিত হোটেল—পান ও ভোজনশালা।

তারই প্রশস্ত ডাইনিং হল।

রাত বোধকরি সোয়াদশটা হবে। অভিজাত সম্প্রদায়ের সুবেশধারী নানা বয়সী নরনারীতে ডাইনিং হলটি গমগম করছে তখন।

টুং টাং ছুরি কাঁটা চামচ-এর মৃদুমন্দ আওয়াজ।

সংগীতের টুকরো টুকরো শব্দ বুঝি। আর সেই সঙ্গে যেন গুণগুনিয়ে চলেছে অনেক চাপা কণ্ঠের হাসি গল্পর গুঞ্জনটা।

একপাশে ডায়াসে বাজছে অর্কেস্ট্রা। হোটলের নিত্য নৈমিত্তিক ব্যাপার।

ওদিকে একটানা কিছুক্ষণ অর্কেস্ট্রা বেজে বিরতি হয়েছে।

পার্থ এবার নিশ্চিন্ত হয়েই যেন ডাইনিং হলের দক্ষিণ দিকে আবার দৃষ্টিপাত করলো।

বাইশ তেইশ বৎসরের বেশী হবে না তরুণীটির বয়েস। পরিধানে দামী ঈষৎ নীলাভ সূক্ষ্ম নাইলনের শাড়ী। গায়ে ঊর্ধহাতা অনুরূপ একটি ব্লাউজ।

ঘরের দুগ্ধধবল অত্যুজ্জ্বল টিউব আলোয় অতীব সেই সূক্ষ্ম ও পাতলা জামা ও শাড়ী ভেদ করে তরুণীর অপূর্ব দেহ সুষমাকে যেন প্রকটিত করে তুলেছে। গাত্রবর্ণ উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ হলেও প্রসাধন সাহায্যে চক্ষুর দৃষ্টিকে যেন ধাঁধিয়ে দেয়। মুখখানির যেন সত্যিই তুলনা হয় না।

সুচারু ছোট অর্ধচন্দ্রের মত কপালের দু'পাশে মাথার স্যাম্পু করা চুলের স্থানচ্যুত কয়েকগাছি এসে পড়েছে।

টানা বঙ্কিম দুটি ভ্রুর মধ্যস্থলে ছোট একটি সিঙ্গারের টিপ।

মদালসা বিহ্বল দুটি গভীর আঁখিপক্ষে অর্ধাবৃত্ত মৃগনয়ন। সুন্দর নাসা। লিপষ্টিক রঞ্জিত রক্তাভ দুটি চিকন ওষ্ঠ সামান্য দ্বিধাবিভক্ত করে প্রকাশ পাচ্ছে সুগঠিত মুক্তা সদৃশ দন্তপংতি।

শ্যাম্পু করা চুল ডোনেট্ করা।

মধ্যে মধ্যে পেগ গ্লাসটি ওষ্ঠপ্রান্তে ধরে চুমুক দিচ্ছে তরুণী।

আবাব অর্কেস্ট্রা শুরু হলো। পার্থ বেহালাটা তুলে নিল কাঁধের 'পরে।

আরো আধঘণ্টা পরে। রাত প্রায় সোয়া এগারটা।

অর্কেস্ট্রা থেমে গিয়েছে। বাজিয়েরা সব ভিতরে কখন চলে গিয়েছে। বাড়ি ফিরবার জন্য সে রাত্রের মত ডাইনিং হলের দরজা পথে এগুতে গিয়েও থমকে দাঁড়ালো পার্থ, মৃদু একটা সংগীতের গুঞ্জন কানে যেতেই।

"বকুল গন্ধে বন্যা এলো।"

যারা আহার্য ও পানীয়ের লোভে এসে ভিড় করেছিল ডাইনিং হলে সে রাত্রে কেউ আর নেই সবাই কখন চলে গিয়েছে। ভৃত্যের দল সব টেবিল পরিষ্কার করছে।

আর—সেই কোণের টেবিলটার সামনে কেবল তখনো দুটি চেয়ারে বসে আছে সেই তরুণী ও দলের একজন মাত্র যুবক।

টেবিলের 'পরে রক্ষিত তখনো তাদের মদের কাঁচ পাত্র।

দুজনাই যে তারা অত্যধিক মাত্রায় মদ্যপান করেছে এবং সেই জন্যই তাদের দুজনার কারোরই যে উঠে চলে যাবার শক্তিটুকু পর্যন্তও নেই, বুঝতে কষ্ট হয় না পার্থর।

হোটেলের গোয়ানিজ ম্যানেজার ডি'সুজা এগিয়ে গিয়ে ওদের টেবিলের সামনে দাঁড়ালো। স্যার! হোটেল উইল বি ক্লোজড্ নাও।

ডি'সুজার কণ্ঠস্বরে তরুণী তার মদির বিহ্বল দৃষ্টি তুলে তাকালো বারেকের জন্য তার দিকে।

ডি'সুজা আবার তার বক্তব্য বলে গেল।

ও সিওর। উই মাষ্ট রিটায়ার নাও মনীষ! গেট আপ্—বলে রীতিমত টলতে টলতে উঠে দাঁড়াল তরুণী এবং এগুতে গিয়েই পড়ে যাচ্ছিল দেখে, তাড়াতাড়ি ডি'সুজা সাহায্যের জন্য হাত বাড়িয়ে বলে, কুড্ আই হেল্প ইউ—

তরুণী আবার বিলোল দৃষ্টিতে তাকালো। হেল্প! নো—নো নিড্।

সঙ্গের যুবক মনীষও ততক্ষণ নেশার ঘুম ভেঙে উঠে দাঁড়িয়েছে টলতে টলতে। সে বলে, হোয়ার অল দি ডেভিলস্ গন মিতা—

টু দি হেভেন অব হেল —মৃদু হেসে মিতা জবাব দেয় মদির কণ্ঠে।

টলতে টলতেই দুজনে দরজার দিকে এগিয়ে আসে।

খুব কাছাকাছি একেবারে হাত দুয়েকের ব্যবধানে।

তরুণীর দিকেই অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে দাঁড়িয়েছিল পার্থ। এতক্ষণে, এতক্ষণে পার্থ চিনতে পারে তরুণীকে। মিতা রায়।

রুপালী পর্দার সর্বাপেক্ষা গ্ল্যামার গার্ল।

জনচিত্তবিমোহিনী অভিনেত্রী—মিতা রায়।

বর্তমানে পঞ্চাশ হাজার টাকা পারিশ্রমিকের কমে যে কোন কনট্রাক্টই সই করছে না কোন ছবিতে।

বাইরে যাবার প্রশস্ত কাচের দরজার বরাবর এসে মিতা রায় আবার টলে পড়ে যাচ্ছিল। এবার নিজের অজ্ঞাতেই পার্থ হাত বাড়িয়ে তাকে ধরে ফেলে।

থ্যাংকস্! তীব্র এ্যালকোহলের কটুগন্ধের সঙ্গে সঙ্গে ছোট্ট কথাটি উচ্চারিত হয় মিতা রায়ের মুখ থেকে।

ও সুড্ আই হেল্প ইউ! বলে পার্থ।

ইফ্ ইউ প্লিজ—

হোটেলের দরজার পেভমেণ্টের সামনেই পার্কিংয়ে একটি ছোট ও একটি

বিরাট ফোর্ড কনসাল ও প্লিমাউথ গাড়ি পার্ক করা ছিল।

সঙ্গের যুবক মনীষ ছোট গাড়িটায় গিয়ে উঠে বসতেই গাড়ির ড্রাইভার গাড়ি ছেড়ে দিল। গাড়ির জানালা পথে শূন্য হাতটা দুলিয়ে মনীষ একবার বললে, টা, টা—

মিতা রায়ের গাড়িতে কোন ড্রাইভার ছিল না। ছিল একটি বাচ্চা নেপালী সোফার। সেই তাড়াতাড়ি নেমে গাড়ির দরজা খুলে দিল।

পার্থের সাহায্যেই মিতা রায় কোনমতে সামনের ড্রাইভিং সীটে গিয়ে উঠে বসে ফিরে তাকালো পার্থর দিকে।

হাউ ফার ইউ উড্ বি গোয়িং ?

মৃদুকণ্ঠে জবাব দেয় পার্থ, কালীঘাট।

কাম্ এলং, আই উইল গিভ্ ইউ এ লিফট্—মিতা বলে।

না, না—তার কোন প্রয়োজন হবে না। আমি ট্রামটা পেলেও বাস পেয়ে যাবো। কিন্তু আপনি কি ড্রাইভ করতে পারবেন ?

ড্যাস্ বোর্ডের সবুজ আলোটা সুইচ্ অন্ করার সঙ্গে সঙ্গেই জ্বলে উঠেছিল। সেই সবুজ আলোর দ্যুতিই মিতা রায়ের চোখে মুখে এসে পড়েছিল। সেই আলোতেই পার্থ দেখলে, মিতা রায়ের ওষ্ঠ প্রান্তে মৃদু হাসির অস্পষ্ট ইংগিত।

ডোণ্ট্ ওরি—কাম্ এলং।

গাড়ির ওপাশের দরজাটা খুলে দিল মিতা রায়।

এবারে নিজের অজ্ঞাতেই যেন পার্থ পায়ে পায়ে এগিয়ে গিয়ে গাড়িতে উঠে বসলো মিতা রায়ের পাশেই ফ্রণ্ট্ সীটে।

গাড়িতে ষ্টার্ট দিয়ে গাড়ি এবারে ছেড়ে দিল মিতা রায়।

প্রায় নির্জন মেটাল বাঁধানো মধ্যরাত্রের রাস্তা।

দামী গাড়ি ত্রিশ মাইল স্পীডে ছুটে চলেছে।

গাড়ির খোলা জানালা পথে হাওয়ার সঙ্গে একটা মিষ্টিগন্ধ মেশামিশি হয়ে পার্থর ঘ্রানেন্দ্রিয়কে যেন মাতাল করে তোলে।

কিন্তু আশ্চর্য সাবধানতার সঙ্গে গাড়ি ড্রাইভ করছে মিতা রায়। ব্যবহারে কোন মাদকতা, কোন শৈথিল্যই নেই যেন!

পথের দুপাশে একচক্ষু বিদ্যুৎবাতিগুলো গাড়ির গতিবেগের মুখে একের পর এক পিছিয়ে পড়ছে।

আপনি কালীঘাটে থাকেন ?

সহসা মিতা রায়ের প্রশ্নে চমকে ওঠে পার্থ। মৃদু কণ্ঠে বলে, হুঁ।

কি নাম আপনার ?

পার্থপ্রতিম চৌধুরী।

রিয়েলি ! এ ড্রিমি সুইট্ নেম নো ডাউট।

তারপর আবার কিছুক্ষণ চুপচাপ।

পাশ দিয়ে পঞ্চাশ মাইল স্পীডে একটা ট্যাক্সী ছুটে বের হয়ে গেল উল্টো মুখে।

আবার প্রশ্ন, আপনিও বুঝি ডিনার খেতে গিয়েছিলেন ?

না, আমি ওখানে অর্কেস্ট্রায় ভায়োলিন বাজাই।

ভায়োলিন! আই সি—

আবার কিছুক্ষণ চুপচাপ।

শুধু ঐ ভায়োলিনই বাজান না আরো কিছু করেন।

না, ভায়োলিনই বাজাই শুধু!

আপনি বিরক্ত হচ্ছেন নাতো?

না, না—

আবার কিছু সময় স্তব্ধতা, শুধু ইঞ্জিনের একটানা চাপা গুঞ্জন শোনা যাচ্ছে। চরকডাঙার মোড় বরাবর এসে আবার মিতা রায় প্রশ্ন করে, বাড়িতে আপনার কে কে আছেন পার্থবাবু ?

আমি আর আমার মা।

বৌ নেই তাহলে ?

না, বিয়েতো করিনি।

লাকি গাই। এণ্ড মোস্ট ইনটেলিজেণ্ট—কোন দিকে যাবো বলুন ?

এখানে নামিয়ে দিলেই আমি চলে যেতে পারবো।

তা পারবেন জানি, কিন্তু আমারও তো কৃতজ্ঞতা বলে একটা বোধ আছে!

কৃতজ্ঞতা!

নিশ্চয়ই। আপনি আজ হোটেল থেকে বেরুবার সময় না সাহায্য করলে বিশ্রী একটা সিন্ ক্রিয়েট হতো না কি! মৃদু হেসে মিতা রায় কথাগুলো বলে তাকালো পার্থের মুখের দিকে।

পার্থ কোন জবাব দেয় না, চুপ করেই থাকে।

মিতা আবার বলে, ছিঃ ছিঃ ভাবতেও আমার লজ্জা করছে—

কিছু মনে করবেন না মিতা দেবী, একটা কথা বলবো—

কি! মদ খাই কেন এইতো! কথাটা আমার জীবনে অত্যন্ত পুরানো হয়ে গিয়েছে মিঃ চৌধুরী। তবে এটা ঠিক, আপনি বিশ্বাস করতে পারেন, আজকের ব্যাপারটার জন্য মনীষ আর রঞ্জনই দায়ী। মনীষের ঘরে হঠাৎ বোতল ফুরিয়ে গেল তখন ওরা বললে ওখানে যাবার জন্য। আমার কিন্তু ইচ্ছা ছিল না।

তবে গেলেন কেন ?

গেলাম কেন ? তাই না ?—বলেই হঠাৎ চমকে ওঠে মিতা, কিন্তু একি এ যে ব্রিজের কাছে চলে এলাম!

এখানেই আমি নামবো।

কিন্তু আপনার বাড়ি—গাড়ি ততক্ষণে থামিয়ে দিয়েছে মিতা।

ঐ যে সামনে ঐ গলিটা দেখা যাচ্ছে ঐ গলির মধ্যে।

কিন্তু পার্থ গাড়ি থেকে নামার সঙ্গে সঙ্গে মিতাও নামে।

চলুন আপনাকে বাড়ি পর্যন্ত পৌঁছে দিয়ে আসি।

না, না—তার আর প্রয়োজন হবে না।

তা ক হয় চলুন।

সত্যি খুব কাছেই পার্থর বাড়ি।

গলিতে ঢুকে দুখানা বাড়ির পরেই তৃতীয় বাড়িখানা।

পার্থই বন্ধ দরজার কড়া ধীরে নাড়া দিল। এবং বার দুই কড়া ধরে নাড়া দিতেই বন্ধ দরজা খুলে গেল ও একটা আলো জ্বলে উঠলো। সামনেই দাঁড়িয়ে খোলা দরজার 'পরে বাইশ তেইশ বৎসরের একটি তরুণী। সাধারণ একটি মিলের শাড়ী পরিধানে। হাতে একগাছি করে সরু সোনার চুড়ি।

ভিতরের আলোর খানিকটা সামনের রাস্তায় এসে পড়েছিল।

সেই আলোতেই পার্থর পাশে দণ্ডায়মান অপরূপ সজ্জায় সজ্জিতা মিতাকে দেখে তরুণী যেন সহসা থমকে দাঁড়ায়।

আচ্ছা তাহলে আসি পার্থবাবু। নমস্কার।

মিতার কথায় চমকে ফিরে তাকায় পার্থ তার দিকে। এবং সে কিছু বলার আগেই মিতা পিছন ফিরে চলতে সুরু করে।

মিতার পায়ের স্ল্যাট হিল সু-চপ্পলটার শব্দ ধীরে ধীরে গলির মোড়ে অন্ধকারে মিলিয়ে গেল।

॥ দুই ॥

তুমি এখনো জেগে ছিলে অনু?

পার্থের প্রশ্নের জবাব না দিয়ে পালটা প্রশ্ন করে অনীতা, এত রাত হলো যে আজ ফিরতে আপনার পার্থবাবু!

রাত! হ্যাঁ, একটু রাত হয়ে গেল।

একই বাড়িতে আজ বছর পাঁচেক হলো আছে ওরা।

পার্থ তার মাকে নিয়ে বাড়ির দোতালার আড়াইখানা ঘর নিয়ে থাকে আর নীচের দুখানা ঘর নিয়ে থাকে অনিতা, তার বৃদ্ধ দাদু অবিনাশ ঘোষাল ও অনীতার আরো ছোট তিনটি বোন।

সংসার অনীতাই চালায় তার আয়ে।

বি. এ পাশ করে কোন স্কুলে টীচারি করে অনীতা। রোগা, কালো, দেখতে অত্যন্ত সাধাসিধে অনীতার চেহারা। ইদানীং চাকরির সুবিধার জন্য অনীতা বি. টি পড়ছে। মাস দুয়েকের মধ্যেই পরীক্ষা। অনেক রাত অবধি জেগে তাই সে পড়াশুনা করে।

আজো একাকী ঘরের এক কোণে টেবিল ল্যাম্পটি জেবলে অনীতা বসে বসে পড়ছিল। কড়া নাড়ার শব্দ শুনেই নিঃশব্দে উঠে গিয়ে দরজাটা খুলে দিয়েছিল পার্থকে।

রাত সাড়ে এগারটার আগে কোনদিনই পার্থ বড় একটা ফেরে না। আজ একটু দেরিই হয়ে গিয়েছিল। রাত বারটা।

নিচে থাকে বলে বরাবরই অনীতাই পার্থকে রাত্রে দরজা খুলে দেয়। আগে আগে অবিশ্যি পার্থর মা-ই এসে রাত্রে দরজা খুলে দিতেন কিন্তু অনীতাই একদিন বলেছিল, আপনি কেন নিচে যান মাসীমা, আমিই তো

রাত জেগে নিচে পড়ি, দরজা আমিই খুলে দেবো এবার থেকে।

পার্থর মা মৃন্ময়ী অনীতার প্রস্তাবটা সানন্দেই মেনে নিয়েছিলেন কারণ একে বাতের রোগী, সিঁড়ি দিয়ে বার বার ওঠা নামা করতে বেশ কষ্টই হয় তাছাড়া প্রথম রাত্রে ঐ সময়টা যা একটু ঘুম হয়। ঘুমটা ভেঙে গেলে ঐ সময় আর রাত্রে যেন কিছুতেই ঘুম আসতে চায় না। বাকী রাতটুকু জেগেই কেটে যায়।

তাই অনীতা যখন নিজে থেকেই বলেছিল, আমিই দরজাটা খুলে দেবো। আপনাকে উঠতে হবে না।

মৃন্ময়ী মৃদুকণ্ঠে জবাব দিয়েছিলেন, তাই দিও মা।

গত কয়েকমাস ধরে সেই ভাবেই চলে আসছিল। পার্থ এসে দরজার কড়া নাড়লে অনীতাই গিয়ে দরজা খুলে দিত।

অনীতা মুখে বলেছিল বটে অনেক রাত জেগে সে পড়া-শুনা করে, রাত্রে পার্থকে দরজা খুলে দিতে কোন অসুবিধাই নেই কিন্তু সেই অনেক রাতের জাগরণটা যেন তার পার্থ ফিরে আসার সঙ্গে সঙ্গে শেষ হয়ে যেতো। পার্থর পদশব্দটা উপরে উঠবার সিঁড়িতে মিলিয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গেই যেন দু' চোখ ভরে তার ঘুম নেমে আসতো। সারাটা দিনের গুরু পরিশ্রমের ক্লান্তিটা যেন তার বিশেষ ঐ মুহূর্তটি পার হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই তাকে একেবারে শয্যার 'পরে এলিয়ে দিতো।

ঘরের আলোটা নিভিয়ে অন্ধকার শয্যার এক কোণে পরিচিত উপাধানটির উপর মাথা রেখে চোখ বুজতো অনীতা।

সে রাত্রেও পার্থর পদশব্দ সিঁড়িতে মিলিয়ে যাবার পর অনীতা ঘরের আলোটা নিভিয়ে দিয়ে শয্যায় এসে গা এলিয়ে দিল। কিন্তু অন্যান্য রাত্রের মতো সঙ্গে সঙ্গেই দু চোখের পাতায় ঘুম ভাসে না।

গলির গ্যাসের আলোয় দরজার অনতিদূরে ক্ষণপূর্বের দেখা সেই অপূর্বসুন্দর নারী মুখখানি থেকে থেকে অনীতার বোজা চোখে সমস্ত অন্ধকার দৃষ্টিটা জুড়ে যেন কেবলই ভেসে উঠতে লাগলো।

ঘুম যেন ক্লান্ত দু'চোখের পাতা থেকে কোথায় পালিয়ে গিয়েছে।

এত রাত্রে কে এসেছিল ঐ নারী, পার্থকে তার বাড়ির দুয়ার পর্যন্ত পৌঁছে দিতে। এর পূর্বে তো কখনো অনীতা ওকে দেখেনি।

গলির গ্যাসের আলোয় ক্ষণেকের জন্য দেখলেও অনীতা বুঝতে পেরেছিল অনিন্দ্যসুন্দর অপূর্ব সেই নারীমূর্তি।

কিন্তু কে! কে সে!

সহসা মধ্যরাত্রির সেই স্তব্ধতা যেন করুণ একটি সুরের মূর্ছনায় সাড়া দিয়ে ওঠে। আশ্চর্য! এত রাত্রে পার্থ বেহালা বাজাচ্ছে!

কখনো ত এমন হয় না। ফিরে আসবার পর রাত্রে কখনো তো আর সাড়া পাওয়া যায় না পার্থর।

অন্ধকারেই ধীরে ধীরে এক সময় অনীতা শয্যার উপর উঠে বসলো। পাশেই ছোট বোন নমিতা অঘোরে ঘুমুচ্ছে। ঘুমন্ত তার শ্বাস প্রশ্বাসের

একটানা শব্দটা মৃদু অথচ স্পষ্ট শোনা যাচ্ছে।

মাথার চুল খুলে গিয়েছিল। আলগোছে শিথিল হাতে চুলটা জড়িয়ে নিল অনীতা। নিঃশব্দেই শয্যা থেকে উঠে দরজা খুলে বাইরে এলো।

এবারে আরো স্পষ্ট শোনা যাচ্ছে বেহালার সুর। ধারণা তার মিথ্যা নয়। পার্থই উপরে বেহালা বাজাচ্ছে।

সিঁড়ির ধাপগুলো একটার পর একটা অতিক্রম করে অনীতা উপরের সরু অপ্রশস্ত বারান্দাটায় এসে দাঁড়ালো।

মধ্যরাত্রের ক্ষীণ চাঁদের আলো বারান্দায় এসে লুটিয়ে পড়েছে।

বাড়ির সবাই ঘুমিয়ে পড়েছে, এসময় এত রাত্রে উপরে আসাটা উচিত কি অনুচিত তাও যেন একটিবার মনে হয় না অনীতার।

পার্থ ও তার মার সঙ্গে অনীতার তো কোন আত্মীয়তাই নেই। সামান্য পরিচয় মাত্র। তাও একই বাড়িতে গত বছর দেড়েক ধরে উপরে ও নিচের তলায় থাকার দরুণ যেটুকু আলাপ পরিচয় বা হৃদ্যতা হয়েছে পরস্পরের মধ্যে।

হঠাৎ যদি পার্থর চোখে পড়ে যায় সে। আর সে যদি জিজ্ঞাসা করে, এত রাত্রে কি জন্য উপরে এলে অনীতা। কি জবাব দেবে সে।

সহসা একটা দুর্নিবার লজ্জা যেন অনীতার পা দুটো টেনে ধরে।

তাড়াতাড়ি ফিরতে গিয়ে চাঁদের আলোয় একটা দৃশ্য তার চোখে পড়ে। বারান্দার একেবারে শেষ প্রান্তে রেলিংয়ের ধার ঘেঁষে এদিকে পিছন ফিরে দাঁড়িয়ে পার্থ বেহালা বাজাচ্ছে।

ফিরে দাঁড়িয়েও যেন পা বাড়াতে পারে না অনীতা।

পার্থর কিন্তু কোন দিকেই খেয়াল নেই। আপন মনে সে বেহালা বাজিয়ে চলেছে। রাত্রে ক্বচিৎ কখনো বেহালা বাজায় পার্থ।

এবং বাজায় সে তার ঘরে বসেই।

কখনো এমনি করে আজকের রাতের মত ঐ বারান্দায় দাঁড়িয়ে তো কই অনীতা তাকে বেহালা বাজাতে শোনেনি।

কতক্ষণ এমনি ক'রে সিঁড়ির মাথায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে অনীতা পার্থর বেহালা বাজানো শুনেছিল মনে নেই। হঠাৎ একসময় খেয়াল হতেই তাড়াতাড়ি যেন পালিয়ে নিচে চলে এসেছিল। এবং এসেই সোজা একেবারে নিজের শয্যার 'পরে শুয়ে অন্ধকারে চোখ বুজেছিল।

আর সেই রাত্রেই প্রথম অনীতা বুঝতে পেরেছিল, গত দেড় বৎসরে কখন এক সময় তিল তিল করে পার্থকে ঘিরে তার বুকের মধ্যে ভালবাসার মধু সঞ্চিত হয়ে উঠেছিল। অন্ধকারেই লজ্জায় যেন অনীতা নিজেকে শয্যার ভিতরে লীন করে দিতে চায়। প্রথমটা এসেছিল লজ্জা তারপরই অন্ধকারে দুটি মুদ্রিত চক্ষুর কোল বেয়ে নেমে আসে নিঃশব্দ অশ্রুর ধারা। কেঁদে কেঁদেই সে রাত্রে এক সময় ঘুমিয়ে পড়েছিল অনীতা।

বালীগঞ্জ সারকুলার রোডে প্রায় চোদ্দ কাঠার উপরে বাংলো প্যাটার্নের বাগান বাড়িটার গেট দিয়ে ভিতরে প্রবেশ করে একেবারে পোর্টিকোর নিচে

এসে গাড়ি থামাল মিতা।

নেপালী আয়া কাঞ্চী ইতিমধ্যে গাড়ির শব্দ পেয়ে নিচে এসে দরজা খুলে দিয়েছিল। আঠারো উনিশ বছরের ভরন্ত যৌবন হাসি খুশি পাহাড়ী মেয়েটি।

এত রাত করলি মেমসাহেব! কাঞ্চী এগিয়ে এসে প্রশ্ন করে।

কেন তোর ঘুম পেয়েছে বুঝি খুব কাঞ্চী।

না। কিন্তু এত রাত হলো কেন তোর আজ?

বাথরুমে স্নানের জল দে কাঞ্চী!

এত রাত্রে স্নান করবি মেম সাহেব!

মিতা কাঞ্চীর শেষের প্রশ্নের কোন জবাব না দিয়ে সিঁড়ি দিয়ে দোতালায় তাঁর নিজের শয়নঘরের দিকে চলে গেল।

ঘরের দরজাটা খোলাই ছিল। রু রংয়ের ভারী দামী পর্দাটা তুলে মিতা রায় তার ঘরে গিয়ে প্রবেশ করলো।

ঘরের চারিদিকে ঐশ্বর্যের প্রাচুর্য যেন ছড়িয়ে রয়েছে।

মেঝেতে পুরু দামী ঈজীপশিয়ান কার্পেট। একধারে ডানলোপিলোর নিভাঁজ শয্যা। তার পাশে বার্মা টিকের কারুকার্য করা প্রমাণ আয়না লাগানো বিরাট আলমারী। ঘরের মধ্যস্থানে সুদৃশ্য সোফাসেট।

একটা সোফার পরে এসে গা এলিয়ে বসে পড়লো মিতা রায়।

আধুনিক চিত্র জগতের সর্বাপেক্ষা গ্ল্যামার গার্ল মিতা রায়।

শুধু যৌবন আর রূপই নয়, অভিনয়কলাতেও অসাধারণ নৈপুণ্য।

প্রথম কনট্রাক্ট্ মাসে পাঁচশত টাকা থেকে আজ তাই মাত্র পাঁচ বৎসরে চিত্র জগতের সর্বশ্রেষ্ঠা অভিনেত্রীর আসনটি সে দখল করে নিয়েছে। চল্লিশ থেকে পঞ্চাশ হাজারের নিচে সে আজ আর কোন ছবিতে কনট্রাকট্ করে না।

চিত্রমোদীরা, জনসাধারণ আজ মিতা রায় বলতে পাগল।

সবার মুখেই কেবল একটি নাম। মিতা, মিতা, মিতা! মিতা রায়।

কাগজে কাগজে তার অসংখ্যভঙ্গীর অসংখ্য ছবি।

কখন সে কোথায় যায় প্রেস ফটোগ্রাফারের দল যেন মুখিয়ে আছে। ক্লিক্ ক্লিক্ ক্লিক্—অমনি ফটো উঠে যাচ্ছে।

নেশাটা ঝিমিয়ে আসছিল।

সহসা পাশেই ত্রিপয়ের 'পরে ফোনটা বেজে উঠলো, ক্রিং ক্রিং।

অলস শিথিল ভঙ্গীতে হাত বাড়িয়ে মিতা রায় ফোনের রিসিভারটা তুলে নিল, হ্যালো।

কে, মিতা!

হুঁ! কে সাণ্টি?

ওপাশ থেকে পুরুষ কণ্ঠে জবাব এলো, হ্যাঁ কিন্তু তোমার ব্যাপার কি বলতো মিতা?

কিন্তু তোমারই বা ব্যাপার কি এত রাত্রে!..

এত রাত্রে মানে !

ঘরে ঘড়ি থাকলে চেয়ে দেখো !

মাত্র তো পৌনে একটা !

পৌনে একটা কি সন্ধ্যা ?

তা নয়, তবে সেই সন্ধ্যা থেকে এতক্ষণ কোথায় ছিলে ?

একটু বেরিয়েছিলুম।

স্যাণ্টি বোস অর্থাৎ সনৎ বোস।

বর্তমান অভিজাত সোসাইটির অন্যতম খেয়ালী ধনীপুত্র।

কিছুকাল আগে বাপের মৃত্যু হয়েছে। এবং বাপের মৃত্যুতে বিরাট সম্পত্তি এসেছে সনতের হাতে। গাড়ি বাড়ি ব্যাংক ব্যালেন্স ও বিজনেস নিয়ে প্রায় কোটি টাকার সম্পত্তি। বাইরের টান সনতের চিরদিনই ছিল, তবে বাপ যতদিন বেঁচেছিল খানিকটা চোখের পর্দা ছিল। তারপর বাপের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে পর্দাটা গিয়েছে উড়ে। তাই সনৎকুমার আজ সিনেমা অভিনেত্রীদের মহলে স্যাণ্টি নামে হয়েছে পরিচিত।

প্রতিমাসে নতুন নতুন গাড়ি।

প্লিমাউথ, ষ্টুডি কমাণ্ডার, প্রেসিডেণ্ট, বুইক, মাষ্টার বুইক।

প্যাণ্টের ব্যাক্ পকেটে সর্বদাই একশত টাকার নোটের তাড়া। হাঁটা চলা কথাবার্তা চাউনী হাসি, সব কিছুতেই একটা প্রিন্সের ষ্টাইল যেন।

কিন্তু এত রাত্রে কোথা থেকে ফোন করছো ? মিতা আবার প্রশ্ন করে।

কেন, বাড়ি থেকে।

নিশ্চয়ই শোবার ঘর থেকে নয়।

হলেই বা ক্ষতি কি ?

ঘরে বৌ নেই বুঝি ?

আছে। তবে আজকাল তো সে নিচের তলাতেই শোয়।

তাই নাকি। আহা বেচারী !

ঠাট্টা করছো !

না, ঠাট্টা নয়। কিন্তু আমার ভীষণ ঘুম আসছে। সো গুড্ নাইট।

দ্বিতীয় আর প্রশ্নের অবকাশ না দিয়েই মিতা রিসিভারটা নামিয়ে রাখলো।

॥ তিন ॥

কিন্তু অত রাত্রে স্নান করেও শয্যায় শুয়ে ঘুম আসে না মিতার চোখে। ঘুরে ফিরে একটি মুখই কেবল মনে পড়ে।

পার্থপ্রতিম চৌধুরী ! চমৎকার কবিত্ব ভরা নামটি।

আচ্ছা হঠাৎ সে পার্থকে তার বাড়ি পর্যন্ত লিফট্-ই বা দিতে গেল কেন ?

কোথায় কোন রেস্তোরা হোটেলে সন্ধ্যেবেলাতে ভায়োলিন বাজায় লোকটা। কি-ই বা পরিচয় তার।

কিন্তু চিনতে পেরেছে কি মিতাকে সে ! নিশ্চয়ই পেরেছে।

আজ মিতাকে চেনে না কে! পাবলিসিটির দৌলতে আজ তাকে চিনতে কারই বা কষ্ট হতে পারে।

গত দু সপ্তাহ ধরে তার আগামী ছবি 'রাত হলো অনেক'এর বিচিত্র রঙিন সব পোষ্টারে পোষ্টারে সারা কলকাতা শহরটাই তো ছেয়ে গিয়েছে।

তবে পার্থই বা তাকে চিনতে পারবে না কেন! নিশ্চয়ই পেরেছে।

এখন কি করছে ভদ্রলোক!

নিশ্চয়ই ঘুম নেই চোখে। মনে মনে তার মুখখানাই ভাবছে।

ভারী হাসি পায় হঠাৎ মিতা রায়ের। বেচারী পার্থপ্রতিম চৌধুরী।

কিন্তু সে নিজেই বা এখনো ভুলতে পারছে না কেন সেই মুখটা। কেনই বা এই বিনিদ্র রজনীর নিঃসঙ্গ স্তব্ধ মুহূর্তে থেকে থেকে সেই মুখখানাই মনে করবার চেষ্টা করছে বার বার।

কেন, কেন—

গাড়ি চালাতে চালাতে নেশা ভরা চোখে প্রথম গাড়ির ডাস বোর্ডের আলোয়, পার্শ্বে উপবিষ্ট পার্থর মুখের দিকে তাকালেও মিতা যেন সহসাই কেমন চমকে উঠেছিল। অনেক, অনেকদিনকার একটা হারানো অস্পষ্ট মুখ যেন আশ্চর্য ভাবেই ঐ পার্শ্বে উপবিষ্ট পার্থর মুখের ভিতর দিয়ে উঁকি দিচ্ছিল। তবু কিন্তু ভাল করে তাকাতে পারেনি মিতা পার্থর মুখের দিকে সে সময়। নেশার টানে চোখের পাতা দুটো যেন ভারী হয়ে নিচের দিকে ঝুলে আসছিল। অন্ধকারে সেই মুখটাই নতুন করে যেন স্পষ্ট হয়ে উঠছে মনের পাতায় এখন।

অস্পষ্ট ঝাপসা। অথচ চেনা চেনা!

আবার আপন মনেই হেসে ফেলে মিতা।

সে পাগল হয়ে গেল নাকি!

একটা আধটা বছর তো নয়। মনে মনে গণনা করে দেখে মিতা, দীর্ঘ নয় বছর ইতিমধ্যে কখন মিতার জীবনে তারপর পার হয়ে গিয়েছে।

নয়টা বছর। তখন সে মিতা রায় নয়, মিনতি—

মার মুখের দিকে চেয়ে মিনতির সেদিন কোনরকম প্রশ্ন করতে সাহসই হয়নি। গভীর রাত্রে মার সঙ্গে বের হয়ে, দীর্ঘ দু'মাইল মেঠোপথ ভেঙে এসে, মধ্যরাত্রির কলকাতাগামী ট্রেন ভেবে উল্টোমুখী ট্রেনটায় তাড়াহুড়াতে তারা উঠে পড়েছিল।

আর একটু হলেই ট্রেনটা তারা ফেল করেছিল আর কি।

স্টেশনে পৌঁছে দেখে ট্রেনটা এসে গিয়েছে। কোনমতে ছুটে গিয়ে ট্রেনে উঠেছিল মিনতি মার হাত ধরে।

সামনেই কি একটা যোগের স্নান। কি প্রচণ্ড ভিড়ই না ছিল সেদিন গাড়িতে।

ঠিক উল্টোমুখী ট্রেনে যে তারা উঠেছে এ ভুলটা ভাঙতে কিন্তু বেশি দেরি হয়নি। যাত্রীদের কথাবার্তা শুনেই তারা বুঝতে পেরেছিল কলকাতা ট্রেনে না উঠে তারা পশ্চিমের ট্রেনে উঠে বসেছে।

গাড়ির মধ্যে গাদাগাদি করে যাত্রীরা চলেছে সব প্রয়াগে কুম্ভ স্নানে।

বছর নয় বয়স তখন মাত্র মিনতির। রোগা ডিগডিগে চেহারা। পরিধানে সাধারণ একটা জামা আর শাড়ী। গায়ে একটা ছেঁড়া আলোয়ান।

শীতের রাত। গাড়ির খোলা জানালা পথে ঠাণ্ডা হিমকণাবাহী মাঘের হাওয়া আসছে। সে কি কাঁপুনী। দুহাতে মাকে জড়িয়ে একপাশে কোনমতে দাঁড়িয়েছিল সেদিনকার সেই গেঁয়ো মেয়ে মিনতি।

শীত করছে মিনু? মা জিজ্ঞাসা করে তাকে।

হ্যাঁ মা!

কিন্তু তাড়াতাড়িতে যে ভুল ট্রেনে উঠে বসলাম, এখন কি করি বলতো?

এতক্ষণে কোনমতে সাহস সঞ্চয় করে ভীরু কণ্ঠে মাকে প্রশ্ন করে মিনতি, কোথায় যাচ্ছি মা আমরা?

ভেবেছিলাম তো হুগলীতে তোর মামার ওখানেই যাবো। কিন্তু এ ট্রেন যে পশ্চিম যাচ্ছে—

তাহলে এখন কি হবে মা!

উঠেই যখন পড়েছি প্রয়াগেই এখন যাবো। প্রয়াগে স্নান করে তারপর হুগলী যাবো।

মা মলিনা তখন প্রায় মনস্থির করে ফেলেছে।

মামার বাড়িতেই কি এবারে আমরা থাকবো মা? ভীরু কণ্ঠে আবার প্রশ্ন করে মিনতি।

হ্যাঁ, আর ওখানে নয়।

মার কথায় বালিকা মিনতি যেন স্বস্তি বোধ করে অনেকখানি।

যে বাড়ি ছেড়ে এই মধ্যরাত্রে তারা একটু আগে চলে এসেছে সেই বাড়িতে আর তারা ফিরবে না শুনে মিনতি সত্যিই যেন স্বস্তি বোধ করে।

বাড়ি তো নয় যেন একটা কয়েদখানা।

দিবারাত্র খালি কথায় কথায় শাসন বকুনী প্রহার আর অনাহার।

সর্বদা সংকোচ আর ভয়ে ভয়ে আত্মগোপন করে থাকা।

মিথ্যে নয়। মিনতির যখন মাত্র তিন বৎসর বয়স সেই সময় মলিনার স্বামী কলকাতায় মোটর চাপা পড়ে এ্যাকসিডেণ্টে মারা যান।

এবং স্বামী সৌরীনের মৃত্যুর পর হতেই শ্বশুর বাড়ির পরের দীর্ঘ ছয়টা বৎসর তার প্রতিটি দিন রাত্রির ইতিহাস শুধু অশেষ লাঞ্ছনা ও গোপন অশ্রুতে ভেজা।

বার বার মলিনার মন বিদ্রোহী হয়ে উঠেছে তবু সে একমাত্র ঐ মেয়েটার মুখের দিকে চেয়ে সব সহ্য করেছে।

ভাই রমেশ বহুবার মলিনাকে লিখেছে, তুই তোর মেয়েকে নিয়ে চলে আয় মলি। তোর গরীব দাদার যদি দু'মুঠো অন্ন জোটে তোদেরও জুটবে!

কিন্তু তবু যায়নি মলিনা। যতই অসম্মান বা লাঞ্ছনা হোক, এ তার শ্বশুরঘর। শ্বশুরের ভিটে। যদি তার কোন দাবী কোথায়ও থাকে এ

সংসারে তবে একমাত্র যে ঐ ভিটেতেই। কিন্তু শেষ পর্যন্ত মনের সে সান্ত্বনাটুকুও আর রাখতে পারলো না মলিনা।

মলিনার স্বামীর সম্পত্তির অংশটা যখন ছোট দেওর লিখে দেবার জন্য বারংবার অনুরোধ জানিয়ে ব্যর্থ হয়ে, ক্রুদ্ধ আক্রোশে মলিনার চুলের মুঠি ধরে কুৎসিত ভাষায় গালাগাল দিল সে রাত্রে, মলিনা আর সহ্য করতে পারলো না।

গভীর রাত্রে সেই দিনই ঘুমন্ত মেয়েকে টেনে তুলে নিয়ে দীর্ঘ এগার বছর পরে যে শ্বশুরের ভিটে সে এত লাঞ্ছনা ও গঞ্জনাতেও ছাড়েনি, সেই শ্বশুরের ভিটেই ছেড়ে অন্ধকারে মাঠের পথ ধরলো।

রাত্রির অন্ধকারে ট্রেনটা ছুটে চলেছে। কামরা ভর্তি নানা বয়েসী যাত্রীর দল গাড়ির দুলুনীতে এ ওর গায়ের উপর পড়ে চোখ বুজেছে।

চারিদিকে মানুষ, বোঁচকা, পোঁটলাপুঁটলী। তিল ধারণের স্থানও নেই!

মলিনার গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই মিনতি ঘুমাচ্ছে।

ঘুম ছিল না কেবল অতগুলো যাত্রীর মধ্যে একমাত্র মলিনার চোখে।

ঘুম তো নেইই। চোখ দু'টো যেন জ্বলছে।

আঁচলে যা সম্বল আছে প্রয়াগ পর্যন্ত গিয়েও আবার ফিরে যেতে পারবে মলিনা হুগলীতে। কেবল প্রয়াগে নেমেই দাদাকে সব জানিয়ে একটা চিঠি দিতে হবে।

কিন্তু প্রয়াগে কোথায় গিয়ে উঠবে মলিনা সেই চিন্তাটাই যেন মনের মধ্যে বড় হয়ে দেখা দেয়। তার বাইশ বছরের জীবনে একা একা এই প্রথম তার বাইরের পৃথিবীতে পদার্পণ। কোন রাস্তা কোন ঠিকানাই তো সে জানে না। চেনেনা বাইরের কাউকে।

কিন্তু পরক্ষণেই আবার মনে হয় এত ভয়ই বা কিসের। যাদের এ দুনিয়ায় কেউ নেই তাদের ভগবানই তো আছেন। সাহস হারালে চলবে না।

পরের দিন সন্ধ্যার দিকে এলাহাবাদ ষ্টেশনে এসে গাড়ি দাঁড়ালো।

যাত্রীদের সঙ্গেই মলিনা মেয়ের হাতটা শক্ত করে চেপে ধরে ট্রেন থেকে প্ল্যাটফরমে নামলো।

ট্রেনের যাত্রীর মধ্যে এক প্রৌঢ়া বিধবা মহিলার সঙ্গে আলাপ হয়েছিল মলিনার, তাঁরই সঙ্গে সঙ্গে সে গেট দিয়ে ষ্টেশন থেকে বের হয়ে রাস্তায় দাঁড়ালো।

সম্পূর্ণ অপরিচিত শহর।

সন্ধ্যা নামার সঙ্গে সঙ্গে চারিদিকে সর্বাঙ্গে বিদ্যুৎবাতি জ্বলে উঠেছে!

ট্রেনের সহযাত্রিণী, নব পরিচিতা সর্দারনী দেবীর পরিচিত এক ধর্মশালায় গিয়ে মলিনা মেয়েকে নিয়ে উঠলো তাঁর অনুরোধে।

হাজার হাজার পুণ্যলোভী নরনারীর ভিড়ে সেবার শহরে যেন তিল ধারণেরও স্থান নেই। পরের দিন স্নানযোগ। মিনতিকে নিয়ে যাবে না মলিনা স্নান করতে। মিনতিও ছাড়বে না। সে যাবেই।

তুই কোথায় যাবি হতভাগী ঐ ভিড়ের মধ্যে? মলিনা বলে।

না আমি যাবো। মিনতি কাঁদতে থাকে।

শেষ পর্যন্ত নেহাত অনিচ্ছা সত্ত্বেই মলিনা মেয়েকে নিয়ে সহ-স্নান যাত্রীদের সঙ্গে গঙ্গার ঘাটে চললো।

মানুষ, মানুষ আর মানুষ। অত মানুষের ভিড় দেখে গাঁয়ের মেয়ে মিনতির বুকটা যেন কেমন একটা ভয়ে কেঁপে ওঠে। কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম জমে ওঠে।

শক্ত করে মার হাতটা চেপে ধরে সে। দম বন্ধ হয়ে আসছে! ক্রমশঃ মাথাটা ঝিম ঝিম করে মিনতির।

ঠিক যেন আগের মতো আর সব ঠাওর করা যাচ্ছে না আশ পাশের কিছুই।

তার পরই, মিনতির স্পষ্ট মনে পড়ে, বহুকণ্ঠে একটা চিৎকার শুনেছিল, নাঙ্গা সাধুর প্রসেশন আসছে। হাতীর প্রসেশন আসছে।

এবং তারপরই চারিদিক থেকে একটা প্রচণ্ড ভীড়ের এলোমেলো চাপ। আর সেই চাপে বিরাট জনস্রোতটা চারপাশ থেকে চাপ খেয়ে খেয়ে কেমন যেন দুমড়ে ভেঙে এদিক ওদিক হেলে ছড়িয়ে পড়ে নদীর ঢেউয়ের মতো।

বহু কণ্ঠের একটা চিৎকার, হাতী, হাতী—

ঢং ঢং ঢং অনেকগুলো ঘণ্টার আওয়াজ।

বিরাট কালো একটা মেঘ যেন, আর সেই মেঘের ভিতর থেকে আসছে একটা বিরাট ঘণ্টার ধ্বনি, ঢং ঢং ঢং···।

তারপর। তারপর সব যেন কেমন অস্পষ্ট ঝাপসা।

বিরাট একটা ঘন কুয়াশা চারিদিকে আর সেই কুয়াশার মধ্যে সে যেন তলিয়ে যাচ্ছে ক্রমশঃ একটু একটু করে।

খুব ছোটবেলাতে একবার একা একা স্নান করতে গিয়ে গাঁয়ের পুকুরে গভীর জলের মধ্যে হঠাৎ পড়ে গিয়েছিল মিনতি

আর সেদিনকার সেই দুঃসহ শ্বাসকষ্টটার মতোই একটা শ্বাসকষ্ট যেন ঐ মুহূর্তে বুকটাকে চেপে ধরে মিনতির।

কেবল কানে আসছিল একটা অস্পষ্ট এলোমেলো ঢং ঢং শব্দ। এবং সেই শব্দটা অনেকক্ষণ ধরে যেন বেজেছিল। তারপর সেটাও মিলিয়ে গিয়েছিল।

॥ চার ॥

মিনতি অনেকদিন ভাববার চেষ্টা করেছে তারপর কি হলো!

জ্ঞান হবার পর একটি সুসজ্জিত কক্ষে চমৎকার একটি বিছানায় শুয়ে শুয়ে ভেবেছে আর আশ্চর্য হয়ে গিয়েছে, ওখানে সে কেমন করে এলো। এমন নরম বিছানায় তো জীবনে কখনো সে ঘুমায় নি।

চারিদিকে ঘরের দেওয়ালগুলো কি সাদা। মাথার উপরে বন্ বন্ করে কি ওটা ঘুরছে।

ভয়ে ভয়ে আবার মিনতি চোখ বুজেছে। মনের ভাবনাগুলো যেন কেমন শিথিল এলোমেলো। অস্পষ্ট ধোঁয়াটে।

কেমন দেখছেন আজ ডাক্তারবাবু! শোনা গেল একটি মিষ্টি নারী কণ্ঠ।

আর ভয় নেই! পুরুষ কণ্ঠে জবাব এলো, এবারে সেরে উঠবে।

সত্যিই তারপর সেরে উঠেছিল মিনতি একটু একটু করে।

কিন্তু এ কোথায় এলো সে।

সর্বদা যিনি তদারক করেন তিনি ভারিক্কী গোছের একটি মহিলা।

গা ভর্তি গহনা। কপালে মস্ত সিন্দুরের টিপ। চওড়া পাড় শাড়ী পরিধানে। এককালে মহিলা হয়ত দেখতে সুন্দরই ছিল কিন্তু এখন মেদ বাহুল্যে সে সৌন্দর্যের কিছুই আর অবশিষ্ট নেই যেন।

আমার মা কোথায়? মিনতি জিজ্ঞাসা করে মহিলাকে।

তোমার মা!

হ্যাঁ।

কেন, চিনতে পারছো না, আমিই তো তোমার মা!

তুমি আমার মা! মিনতি বিস্মিত হয়ে শুধায়।

হ্যাঁ, আমিই তো তোমার মা।

না, তুমিতো আমার মা নও।

ভাল করে চেয়ে দেখো, আমিই তোমার মা।

না, তুমি আমার মা নও—তারপর একটু থেমে মিনতি বলে, বল না আমার মা কোথায়?

পাশের ঘর থেকে ঐ সময় ভারী পুরুষ কণ্ঠের একটি ডাক শোনা গেল, সরোজ এঘরে একবার এসো।

ভদ্রমহিলা পাশের ঘরে চলে গেলেন।

তখনো বুঝতে পারেনি মিনতি এ জীবনে আর সে তার মার দেখা পাবে না। মা তার জীবন থেকে চিরদিনের মতই হারিয়ে গিয়েছে।

তারপরও অনেকবার শুধিয়েছে মিনতি সেই মহিলাকে তার মার সম্পর্কে কিন্তু সেই একই জবাব পেয়েছে তাঁর কাছ থেকে।

তিনিই তার মা।

এবং তারপর যেদিন তারা কলকাতায় চলে আসে, সকলের অজ্ঞাতে সে সেই বাড়ি থেকে পালিয়ে যাবার চেষ্টা করেছিল কিন্তু পারেনি। জানতো না মিনতি যে দরজায় দারোয়ান রয়েছে সতর্ক দৃষ্টি মেলে।

দারোয়ান তাকে দরজা দিয়ে বের হয়ে যাবার চেষ্টা করতেই জিজ্ঞাসা করেছিল পথ আগলে, কাঁহা যাওগে খোকী!

দারোয়ানের সেই বিরাট চেহারা, বিরাট গোঁফ, ইয়া গালপাট্টা, মাথায় পাগড়ি, হাতে লাঠি দেখে ভয়ে পিছিয়ে এসেছিল মিনতি।

ঠিক সেই সময় সেই মহিলা গাড়ি করে এসে নামলেন দরজার সামনে চাকরের মাথায় একগাদা বাক্স নিয়ে।

দারোয়ান মনিবকে দেখে বলে, খোকী বাহার যাতে থে মাঈজী!

সেকিরে বোকা মেয়ে, আয় চল, উপরে চল! দেখবি চল তোর জন্য কত জামা কাপড় খেলনা এনেছি।

রাশীকৃত রংবেরংয়ের জামা কাপড়, কত খেলনা, সব চারপাশে মিনতির ছড়িয়ে দিলেন মহিলা।

নাও সব তোমার—

বিহ্বল হয়ে তাকিয়ে থাকে মিনতি।

জ্ঞান হওয়া অবধি যে জেনেছে শুধু অভাব, দারিদ্র্য, পেয়েছে শুধু লাঞ্ছনা ও অবহেলা, চিরদিন একটা ছেঁড়া শাড়ী পরে যার কেটেছে সে যেন বিহ্বল হয়ে যায় ঐ সব দেখে।

বিশ্বাস হতে চায় না। ভয়ে ভয়ে তাকায় মহিলার মুখের দিকে।

চোখে জল এসে যায়।

ছল ছল চোখে আবার বলে, মার কাছে যাবো আমি।

মার কাছে যাবি. মা কি তোর বেঁচে আছেরে বোকা মেয়ে!

মার কাছে যাবো।

তোর মা তো সেদিন মেলায় হাতীর পায়ের চাপে মরে গেছে। আজ থেকে আমিই তোর মা! তোকে কত জিনিষ দেবো, কত ভালবাসবো।

ঐ দিনই রাত্রে মিনতি ওদের সঙ্গে কলকাতায় চলে এলো।

মস্ত বড় একটা বাড়িতে এসে ওরা উঠলো।

দোতলা বাড়িটা। অনেকগুলো ঘর।

নানা বয়েসী কত যে মেয়ে বাড়িটায় ভর্তি।

উপরের তলায় যে চারখানা ঘর নিয়ে মিনতি ঐ মহিলার সঙ্গে থাকতো সেখানে কিন্তু কেউ কখনো আসতো না। একমাত্র রথীনবাবু ছাড়া।

ঐ বাড়িতেই মিনতির জীবনের আরো চারটে বছর কেটে যায়।

মহিলার নাম ছিল সরোজিনী। কি ভালই তিনি বাসতেন মিনতিকে।

তার জন্য পড়ার মাস্টার, গানের মাস্টার, নাচের মাস্টার সব নিযুক্ত করেছিলেন সরোজিনী।

নিত্য নতুন শাড়ী, নিত্য নতুন প্রসাধন, নিত্য নতুন গহনা।

দেখতে দেখতে মিনতির চেহারাটাও যেন ফিরে গিয়েছিল।

সেই সঙ্গে ক্রমশঃ মিনতি তার মার কথাও বুঝি ভুলে গিয়েছিল।

আর ভুলবেই বা না কেন। মার স্মৃতির সঙ্গে একমাত্র মায়ের স্নেহটুকু বাদ দিলে জড়িয়ে ছিল তো কেবল শুধু দুঃখ, বেদনা, অভাব আর লাঞ্ছনা—ভয় সংকোচ আর আত্মবিলুপ্তি।

বালিকা মনের বিকল্পনা প্রতিপদে কেবল তো ব্যাহতই হয়েছে সেদিন! একমাত্র মায়ের স্নেহ ছাড়া কি-ই বা সে আর পেয়েছে শৈশবের সেই দিন গুলিতে। একটু একটু করে তাই মিনতি সরোজিনীকেই বুঝি ভালবাসতে শুরু করেছিল।

চতুরা সরোজিনীও তাকে ঐশ্বর্য ও প্রাচুর্যের প্রলোভন দিয়ে যেন অক্টোপাশের মতই ক্রমশঃ তার পৃষ্ঠে বেঁধে ফেলেছিলেন।

ফলে নিজেই মিনতি ভুলে গিয়েছিল ইতিমধ্যে কখন একসময় সে সরোজিনীকে মা বলে ডাকতে শুরু করে দিয়েছে।

আশ্চর্য লাগতো সরোজিনীকে মিনতির।

যেমন গম্ভীর প্রকৃতির তেমনি রাসভারী।

সরোজিনীকে মিনতি বড় একটা বাড়ি থেকে বের হতে দেখনি।

মধ্যে মধ্যে বিকালে বা সকালে কেবল সরোজিনী যা নিচে যেতেন।

নিচের তলায় সরোজিনী কখনো মিনতিকে যেতে দেননি। শুধু নিচের তলায় কেন বাড়ির বাইরে বড় একটা কখনো যেতে দেননি সরোজিনী মিনতিকে। কেবল ক্বচিৎ কখনো সঙ্গে করে রাত্রের শো'তে সিনেমায় নিয়ে যেতেন।

সেই সময়ই মিনতি যেন তার ক্ষুধার্ত দৃষ্টি দিয়ে বিচিত্র কলকাতা শহরটাকে গিলে খাবার চেষ্টা করতো।

কত মানুষ জন, গাড়ি, ঘোড়া, ট্রাম বাস মোটর বিরাট বিরাট সব অট্টালিকা দেখে দেখে যেন মিনতির আশ মিটতো না।

কোন প্রশ্ন বা জিজ্ঞাসা নয় কেবল অবাক বিস্ময়ে চারিদিকে চেয়ে চেয়ে দেখতো মিনতি। জীবনের সে যেন কয়েকটি বিচিত্র বিস্ময়কর মুহূর্ত!

এমনি করেই দেখতে দেখতে মিনতির জীবনের দীর্ঘ চারটি বছর সরোজিনীর আশ্রয়ে কেটে গেল। বালিকা মিনতি হলো কিশোরী।

সেই সময়ই একদিন দ্বিপ্রহরে নিজের ঘরে বসে কি একটা বই পড়ছে এমন সময় পাশের ঘর থেকে সরোজিনী ও রথীনবাবুর কয়েকটা কথাবার্তার আওয়াজ তার কানে আসতেই সহসা যেন সে পাথর হয়ে যায়।

রথীনবাবু লোকটিকে মধ্যে মধ্যে ঐ বাড়িতে দেখা যেতো।

মধ্য বয়েসী। দেখতেও বেশ সুশ্রী। মাথার সামনের দিকটায় চকচকে একটি টাক। কোটরাগত ছোট ছোট চক্ষু।

ফরাসডাঙা বা শান্তিপুরের মিহি কোঁচান ধুতি পরিধানে ও গায়ে আদ্দির গিলে করা পাঞ্জাবী, পায়ে চকচকে পাম-সু।

রথীনবাবুর সঙ্গে সরোজিনীর যে ঠিক কি সম্পর্ক সেটা মিনতি কোন দিনই আবিষ্কার করতে পারেনি। তবে সরোজিনী ও রথীনবাবুর মধ্যে যে একটা বেশ হৃদ্যতা আছে সেটা কিন্তু মিনতি বুঝতে পারতো।

রথীনবাবু সরোজিনীকে 'সরোজ' বলে ডাকতো। এবং সে এলে দু'জনে সরোজিনীর ঘরে বসে অনেকক্ষণ কি সব কথাবার্তা হতো।

সরোজিনীর কথাটা হঠাৎ মিনতির কানে এলো।

সরোজিনী—তুমি ক্ষেপেছো রথীন, দশ হাজার নগদ সেলামীর একটি আধলা কমেও আমি মিনুকে কারো হাতে তুলে দেবো না।

রথীন—কিন্তু রামদাস গোয়েঙ্কার প্রস্তাবটা আর একবার তুমি ভেবে দেখতে পারতে সরোজ!

সরোজিনী—খুব ভেবেছি। মেলা থেকে ওকে চার বছর আগে যখন আমি কুড়িয়ে পাই তখুনি বুঝেছিলাম ও ফুল অনেক দামে বিকোবে। চেয়ে দেখেছো আজকাল কি চেহারার খোলতাই হয়েছে। ওর রূপ দেখে মেয়েমানুষ আমারই মধ্যে মধ্যে মাথা ঘুরে যায়, তা···

রথীন—আহা, সেই জন্যই তো রামদাস দূর থেকে সেদিন ওকে সিনেমায় দেখা অবধি পাগল হয়ে গেছে।

সরোজিনী—পাগল! মাইরী বলছো? তাহলে মালটি কেমন খাইয়ে পরিয়ে তৈরী করেছি বলো!

রথীন—তা করেছো বৈকি। নইলে আর দাম পাবে কেন!

সরোজিনী—তাইতো ঠিক করেছি চড়া দামে এমন কারো হাতে ওকে তুলে দেবো, যাতে করে ও চিরদিনের মত রাজরাণী হয়ে থাকে আর আমারও বাকী জীবনটা স্বাচ্ছন্দ্যে কেটে যায়। নিচের চুনো পুঁটি নিয়ে ব্যবসা করতে আর ভালো লাগে না।

রথীন—তা রামদাসের হাতে ওকে তুলে দিলে সে আশা তোমার সফল হবে, দেখে নিও!

পাশের ঘরে রথীন ও সরোজিনীর প্রত্যেকটি কথা যেন তার মাথায় মুগুরের আঘাত হানছিল। ঝিম ঝিম করে মিনতির মাথাটা।

এসব সে কি শুনছে!

ইদানিং নিচের তলার মেয়েদের গোপনে গোপনে কিছু হাবভাব দেখে আবছা যে সন্দেহটা কাঁটার মত মিনতির মনের মধ্যে খচ্ খচ্ করে বিঁধছিল সেটা যেন আজ স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

সরোজিনী তাহলে তাকে এতদিন খাইয়ে পরিয়ে মানুষ করছে, এত ভালবাসা এত যত্ন ও প্রাচুর্য দিয়ে তার সর্বনাশ করবার জন্যই!

নিঃশ্বাস যেন বন্ধ হয়ে আসতে চায় মিনতির।

যত ব্যাপারটা চিন্তা করে, তলিয়ে বোঝবার চেষ্টা করে মিনতি ততই যেন কঠিন একটা প্রতিজ্ঞায় তার দেহটা ইস্পাতের মতই শক্ত ঋজু হয়ে যায়।

উঠে দাঁড়ায় মিনতি। এবং সহসাই দেওয়ালে প্রলম্বিত প্রমাণ আর্সীর মসৃণ গাত্রে তার নিজের প্রতিফলিত চেহারার দিকে তাকিয়ে স্তব্ধ হয়ে যায়।

মসৃণ আর্সীর গায়ে তার পূর্ণ অবয়বের প্রতিচ্ছায়া পড়েছে।

মিনতি যেন সেদিনই সেই মুহূর্তে প্রথম আবিষ্কার করে দেহের তটে রূপ যেন তার উথলে উঠছে, সাগর-জলে পূর্ণিমার চাঁদের আলোর মতই।

এই অনিন্দনীয় রূপ তার কামার্ত কতকগুলো পুরুষের হিংস্র নখরে ছিন্ন ভিন্ন হবে?

না, না—কিছুতেই না।

॥ পাঁচ ॥

সেই দিন থেকেই মিনতি লক্ষ্য করলো ও বাড়িতে রথীনবাবুর আসা যাওয়াটা যেন একটু ঘন ঘন হচ্ছে।

সরোজিনীর ঘরে বসে দু'জনার পরামর্শও চলে।

এদিকে চিন্তায় চিন্তায় দিশেহারা হয়ে পড়ে মিনতি।

তার সদা হাস্য আনন্দোৎফুল্ল কচি মুখখানিতে একটা চিন্তার ছায়া পড়ে।

ব্যাপারটা সরোজিনীরও দৃষ্টি এড়ায় না।

কি হয়েছে তোর মিনু, দিনকে দিন মুখটা অমন শুকিয়ে যাচ্ছে কেন রে ? সরোজিনী শুধান।

কেন, কি আবার হবে !

এক একবার মিনতি ভাবে স্পষ্টস্পষ্টিই সরোজিনীকে সে জিজ্ঞাসা করবে কিন্তু সাহস হয় না। অথচ ভেবেও কুলকিনারা পায় না। আসল কথা ইদানিং সরোজিনীকে মিনতি যেন রীতিমত ভয় করতেই শুরু করেছে।

এমনি করেই আরো একটা মাস কেটে গেল।

তারপর একদিন দ্বিপ্রহরে সরোজিনী মিনতিকে তাঁর ঘরে ডেকে পাঠালেন।

ডাকছিলে মা ?

হ্যাঁ, আয় বোস—তোর সঙ্গে কয়েকটা কথা আছে।

ভয়ে ভয়ে মিনতি সরোজিনীর মুখের দিকে তাকালো।

কি কথা বলতে চান সরোজিনী তাকে।

বিয়ে করবি !

অবাক বিস্ময়ে তাকায় মিনতি সরোজিনীর মুখের দিকে।

কিরে হাঁদা মেয়ে, কথার জবাব দিচ্ছিস না কেন ! বয়স হয়েছে, বিয়ে করবি না।

মিনতি তবু নির্বাক। ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে আছে তখনো সরোজিনীর মুখের দিকে।

সরোজিনী আবার নিজে থেকেই বলেন, শোন, পরশু দোল পূর্ণিমার রাত্রে তোর বিয়ে ঠিক করেছি আমি ! বিয়েতে তুই কি কি শাড়ী গয়না চাস একটা লিষ্ট করে দিস। সব আনিয়ে দেবো !

তুমি ! তুমি আমার বিয়ে দেবে মা !

এতক্ষণে কোন মতে কথাগুলো বলে মিনতি।

তা বয়েস হলো তোর, বিয়ে দেবো না !—শুনে খুব আনন্দ লাগছে নারে !

সহসা লজ্জায় মিনতির সমস্ত মুখখানা রক্তিম হয়ে ওঠে।

তাকাতে পারে না আর সরোজিনীর দিকে। মাথাটা নিচু করে নেয় মিনতি। তারপর কম্পিত পদে ঘর থেকে বের হয়ে সোজা একেবারে নিজের ঘরে এসে ঢোকে। বিয়ে। ঘরের আর্সীর সামনে এসে দাঁড়ায় মিনতি।

ওগো মিনুরাণী, তোমার বিয়ে।

রাঙা টুকটুকে বর আসবে টোপর মাথায় দিয়ে।

আনন্দে চোখের কোণে জল এসে যায় মিনতির। সরোজিনী তাহলে তাকে দেহপণ্য করছে না।

ছিঃ ছিঃ কি অবিচার করেছে সে সরোজিনীর প্রতি।

মা তাকে এত ভালবাসে।

যার সঙ্গে তার বিয়ে সে কেমন দেখতে কে জানে।

আজ বাদে কাল পরশুই বিয়ে।

শাঁখ বাজবে, উলু দেবে, মালা বদল, চার চোখের মিলন।

দুরু দুরু কেঁপে ওঠে মিনতির বুকটা!

ওগো প্রিয়তম, সত্যই তাহলে তুমি আসছো!

সে রাতটা ঘুমতে পারে না মিনতি! বার বার ঘুম ভেঙে যায়। মাঝখানে মাত্র একটা দিন। এতবড় শুভ সংবাদটা মা তাকে এত দেরি করে দিলেন কেন বুঝতে কিছুতেই যেন পারে না মিনতি।

তবু পরের দিন সকালেই ভেবে ভেবে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে একটা লিস্ট করে দেয় সে। সরোজিনী টাকা দিয়ে লোক পাঠিয়ে সব কিনে এনে দেন।

রাশীকৃত বাক্স ও নানা আকারের প্যাকেট এনে মিনতির সামনে ফেলে দিয়ে সরোজিনী বলেন, নে দেখ, তোর সব কিছু এসেছে তো!

রথীনবাবুর সঙ্গে সঙ্গে এসে ঘরে ঢুকে বলেন, এ আর কি, যে রূপ নিয়ে তুমি জন্মেছো, এমন কত রাশীকৃত জিনিস প্রত্যহ তোমার পায়ের উপর লুটিয়ে দিয়ে সবাই ধন্য হবে।

রথীনবাবুর তখনকার কথাটা যেন মিনতির কানে গিয়েও যায় না।

চারিপাশে ছড়ানো তার শাড়ী গহনা ও প্রসাধন দ্রব্যগুলোর দিকে সে সতৃষ্ণ নয়নে চেয়ে চেয়ে যেন বুঁদ হয়ে গিয়েছে। রাতারাতি সে যেন রাণীর ঐশ্বর্য তার হাতের মুঠোর মধ্যে পেয়েছে।

হাসতে হাসতে একসময় রথীনবাবুকে নিয়ে সরোজিনী ঘর থেকে বের হয়ে যান।

আর মিনতি অভিভূতের মত চারপাশে তখনো তার কবায়ত্ত ঐশ্বর্যের দিকে নেশাভরা চোখে চেয়ে থাকে। পৃথিবীটা এত সুন্দর, জীবনে এত মাধুর্য আনে, একথা কি সে কখনো ভেবেছে ইতিপূর্বে।

মধুময় এ জীবন, মধুময়।

শুধু বুঝি আনন্দ আর শুধু বুঝি গান।

পরের রাত্রে এলো সেই পরম লগ্ন।

নিচের তলার মেয়েরা যারা কোনদিন উপরে আসতো না, গত চারবছরে কখনো যাদের মিনতি উপরে আসতে দেখেনি, তারা সব সেজেগুজে একে একে উপরে এলো।

খিল খিল করে সব হাসে, অশ্লীল সব ইয়ার্কী দেয়, মিনতির যেন গা কেমন ঘিন ঘিন করে।

নিচের তলায় মেয়েরাই তাকে নানা প্রসাধনে সাজিয়ে দেয়।

একজন ওদের মধ্যেই মিনতিকে সাজাতে সাজাতে বলে, মাইরী, কি চেহারা তোর, আমাদেরই মাথা ঘুরে যাচ্ছে তা পুরুষ তো তোর চাকর হয়ে থাকবে।

ভালো লাগে না শুনতে ঐ সব বিশ্রী নোংরা কথাগুলো তবু মিনতি চুপ করে থাকে। ভাবে হয়তো বা ঐ রীতি।

মনকে সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করে মিনতি। আর একটা কি দুটো রাত বইতো নয়। তারপরই তো সে চলে যাবে স্বামীর সঙ্গে শ্বশুরঘরে।

স্বামী! তার প্রিয়তম।

এতদিন বুঝি তার সমস্ত চিন্তা ভাবনার অবসান হতে চলেছে।

যে অনিশ্চয়তার মধ্যে সে দিশেহারার মত কোন কুল কিনারা খুঁজে পাচ্ছিল না, আজ এতদিনে তার ভাগ্যদেবতা তাকে নিশ্চয়তার আশ্বাস এনে দিয়েছে। সে যেন নিজেকে খুঁজে পেয়েছে।

ভবিষ্যতের মধুর স্বপ্ন বর্তমানের সব কিছুই যেন মিনতিকে ভুলিয়ে দেয়।

ভীরু চোখের পাতা যেন কিছুতেই খুলতে চায় না।

চোখ মেলে তাকাতে পারে না মিনতি।

সামান্যই অনুষ্ঠান। সামান্যই মন্ত্র। বলতে গেলে যেন কিছুই নয়। কোন মতে নমো নমো করে চার হাত এক করে দিল।

কয়েকটা কঠিন কঠিন সংস্কৃত শব্দ কেবল কানে এসেছিল মিনতিব।

আধঘণ্টার মধ্যেই বিয়ের পাট চুকে গেল। বরের সঙ্গে তারপর মিনতি তার ঘরে এসে ঢুকলো। বাইবে থেকে ঘবের দরজাটা টেনে দিতে দিতে কে যেন পুরুষকণ্ঠে বললে, চললাম রে, কাল সকালে আবার দেখা হবে। বৌযের সঙ্গে ভাল করে আলাপ কর।

শয্যার পাশে দাঁড়িয়ে পাথরেব মত অবগুণ্ঠনের তলায় মিনতি তখন কেবল ঘামছে। ঘরের মধ্যে স্বল্প শক্তিব একটা নীল বিদ্যুৎ বাতি জ্বলছিল।

সেই মৃদু আলোয় দামী সিল্কের শাড়ীব অবগুণ্ঠনের আড়াল থেকে ভীরু চোখের দৃষ্টি তুলে দেখবার চেষ্টা কবে মিনতি।

কিন্তু কিছুই দেখতে পায় না।

কেবলই মনে হয, আগাগোড়াই সবটা স্বপ্ন নয়তো।

ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে সে একটা স্বপ্ন দেখছে না তো।

হঠাৎ স্বপ্নটা ভেঙে যাবে না তো।

ঘরের মধ্যে সে একা না সত্যিই আর কেউ আছে। কারোর তো কোন সাড়া শব্দই পাওয়া যাচ্ছে না। অথচ চোখ তুলে তাকিয়ে ভাল করে দেখবারও সাহস হয় না মিনতির। কি একটা অজানিত আশংকায় বুকের ভিতরটা খালি তখন থেকে কাঁপছে আর কাঁপছে।

একটা মৃদু পদশব্দ পাওয়া গেল।

তারপরই দু'খানি পা। এগিয়ে আসছে পা দুটি তারই দিকে বুঝি কাছে, আরো কাছে। এবারে একেবারে সামনা সামনি এসে পা দুটো থামল।

তারপরই কে যেন দু হাত দিয়ে তার অবগুণ্ঠনটি তুলে দিল।

ভীরু চোখের পাতা যেন আপনা হতেই বুজে গেল মিনতির।

॥ ছয় ॥

চোখ খুলবে না। চাইবে না আমার দিকে!

কণ্ঠস্বর তো নয় যেন সংগীতের দুটি চরণ। সুরে সুরে ঝংকৃত কয়টি কথা। এত মিষ্টি কথা কি মানুষে কখনো বলতে পারে!

কই চাও আমার দিকে !

আবার সেই প্রাণ নিঙড়ানো অনুরোধ। আবার সেই গানের সুর।

শেষ পর্যন্ত চোখের পাতা খুলতেই হয় মিনতিকে।

ঘরের সেই নীল আলোয় তাকায় সামনের দিকে।

প্রশস্ত ললাট। রুক্ষ এলো মেলো মাথার চুল।

দুটি জোড়া ভ্রুর মাঝখানে দীর্ঘ একটি ক্ষত চিহ্ন !

ক্ষত চিহ্ন নয় মনে হলো যেন রাজতিলক।

টানাটানা দুটি চক্ষু। পুরু ওষ্ঠ। ওষ্ঠের উপরে সূক্ষ্ম গোঁফের রেখা।

কি নাম তোমার ?

মিনতি, ডাক নাম মিনু—

মিনু ! আমিও তোমাকে মিনু বলেই ডাকবো, কেমন ?

মৃদুভাবে ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানায় মিনতি।

আশ্চর্য !

কি ! মৃদু কণ্ঠে প্রশ্ন করে মিনতি।

টাকার আমার অভাব ছিল সত্যি ! আর সুবোধ যখন বিয়ের কথা বলেছিলো সেই টাকার লোভেই রাজী হয়েছিলাম, তাও সত্যি। কিন্তু টাকার সঙ্গে সঙ্গে যে তোমাকে পাবো এ সত্যিই আমার স্বপ্নেরও বুঝি অতীত ছিল।

কেন ? প্রশ্নটা করে ভীরু দৃষ্টিতে তাকায় মিনতি তার স্বামীর মুখের দিকে।

কেন ! মৃদু হাসলো সে।

আমার পরে আপনি রাগ করেননি তো ?

রাগ ! কেন বলতো ?

আপনি বিশ্বাস করুন, একটু আগে আপনি যা বললেন সে সব কিছুই আমি জানিনা।

তোমার মা যে আমাকে টাকার লোভ দেখিয়ে তোমাকে বিয়ে করতে সম্মত করিয়েছিলেন সে সম্পর্কে কিছুই তুমি জানো না !

না।

আশ্চর্য ! তোমার মা আমার সঙ্গে কড়ার করেছিলেন—

কড়ার ?

হ্যাঁ, বলেছিলেন, তোমাকে শুধু আমাকে বিয়েই করতে হবে। স্ত্রীর কোন দায়িত্বই নাকি জীবনে আমাকে নিতে হবে না। এমন কি ইচ্ছে করলে আবার আমি বিয়েও করতে পারি।

আপনি—আপনি কি তাহলে আমাকে ত্যাগ করে আবার বিয়ে করবেন !

না মিনু ! তোমাকে দেখার আগে মনে আমার যাই থাক না কেন, আজ থেকে তুমিই হলে আমার স্ত্রী ! জেনো আর কখনো দ্বিতীয় নারী আমার জীবনে আসবে না।

সত্যি—সত্যি বলছেন ?

দু'হাতে সেদিন পরমুহূর্তেই মিনতির স্বামী মিনতিকে বুকের একেবারে মাঝখানটিতে টেনে নিয়ে বলে, হ্যাঁ, এর চাইতে বড় সত্য জীবনে আর আমার কিছুই নেই জেনো।

ঠিক সেই সময় দরজাটা খুলে গেল ঘরের। সরোজিনী এসে ঘরে প্রবেশ করলেন। আয় মিনতি, তোদের খাবার দেওয়া হয়েছে। এসো বাবা—রাত অনেক হলো এবারে খাওয়া দাওয়া সেরে ঘুমাবে।

সে রাত্রে মিনতির খাওয়ার ইচ্ছা একটুও ছিল না।

কিন্তু সরোজিনী শুনলেন না। শেষ পর্যন্ত কিছু মিষ্টি খেয়ে দু'জনে দু গ্লাস সরবৎ খেয়ে ঘরে ফিরে এলো।

দু'জনারই ইচ্ছা ছিল সে রাতটা তারা ঘুমাবে না।

জেগেই রাতটা কাটিয়ে দেবে।

কিন্তু আধ ঘণ্টার মধ্যে যে কি ঘুমই মিনতির দু'চোখ ভরে নেমে এলো, কিছুতেই আর চোখ খুলে রাখতে পারে না।

করুণ কণ্ঠে মিনতি বলে, বড্ড ঘুম পাচ্ছে যে।

মিনতির স্বামী বলে, আমারও। কিন্তু ঘুমাতে যে আমি চাই না মিনু!

আমিও চাই না!

তবু তারা সে রাত্রে কেউ জেগে থাকতে পারেনি।

দু'জনাই ঘুমিয়ে পড়েছিল।

উঃ! কি কাল ঘুমই যে সে রাত্রে তার দু'চোখ ভরে নেমেছিল।

হায়রে। যদি না ঘুমাতো!

ঘুম ভাঙল পরের দিন সকালে সরোজিনীর ডাকে।

অ মিনু, আর কত ঘুমাবি মা, ওঠ, ওঠ—ঘরে যে রোদ এসে গিয়েছে।

তবু যেন মিনতির ঘুম ভাঙতে চায় না।

অতি কষ্টে চোখের পাতা দুটো টেনে তাকাল মিনতি।

ওঠ্ মা অনেক বেলা হয়েছে। যা হাত মুখ ধুয়ে চা খাবি আয়।

আরো কিছুক্ষণ পরে মিনতি যখন ঘুমক্লান্ত ভারী চোখের পাতা মেলে চারপাশে তাকালো শয্যার উপর উঠে বসে. প্রথমেই তার মনে হলো কি যেন ঘরের মধ্যে নেই।

ঘরটা যেন কেমন খালি খালি মনে হচ্ছে।

কি নেই, কেন নেই, প্রথমটায় ঠিক যেন ঘুমক্লান্ত চেতনার উপলব্ধিতে পৌঁছায় না। কিন্তু সেটা বেশীক্ষণের জন্য নয়।

বুঝতে পারে সে ঘরে তার স্বামী নেই।

আশ্চর্য! এত সকালে ঘর ছেড়ে কোথায় গেলেন তিনি।

পরক্ষণেই মনে হয় হয়তো মার ঘরেই তিনি আছেন।

ক্লান্তি ভরে একটা হাই তুলে, দীর্ঘ ঘুমের শিথিল দেহে আরমোড়া ভেঙে শয্যা থেকে নেমে সোজা চলে যায় মিনতি বাথরুমে।

চোখে মুখে ঠাণ্ডা জল দিতে দিতে একটু একটু করে গত রাত্রির সব কথা মনে পড়ে। জীবনে কালকের রাতটা যেন একটা স্বপ্ন।

গল্পে পড়া পরীর দেশ থেকে একটা মধুর স্বপ্ন যেন নেমে এসেছিল জীবনের পাতায়।

দু'জনাই মনে মনে স্থির করেছিল রাতটা তারা কিছুতেই ঘুমাবে না। মুখোমুখি বসে কথা বলে বলে রাতটা কাটিয়ে দেবে।

কিন্তু কি ঘুম যে নেমে এলো চোখের পাতায়!

সলজ্জ একটুখানি হাসি জেগে ওঠে মিনতির ওষ্ঠপ্রান্তে।

ছিঃ ছিঃ কি লজ্জা, কি লজ্জা!

কি ভাবলেন তিনি! ঘুমাবে না বলেও সে ঘুমিয়ে পড়েছিল।

ঠিক আছে, আজ রাত্রে সে ঘুমাবে না। কিছুতেই ঘুমাবে না।

যত ঘুমই আসুক সে জেগে থাকবেই।

নিশ্চয়ই জেগে থাকবে। নিশ্চয়ই!

ঘরে ফিরে এসে জামা কাপড় বদলাতে বদলাতে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে মিনতি আবার যেন লজ্জায় লাল হয়ে ওঠে।

পাশের ঘরে গিয়ে মুখ দেখাবে তাঁকে ও কেমন করে।

তারপর যখন জিজ্ঞাসা করবেন, কি গো মিনুরাণী, ঘুমাবে না বলেও ঘুমিয়ে পড়েছিলে যে?

কিন্তু পাশের ঘরে এসে পা দিয়েই যেন থমকে দাঁড়ায় মিনতি। কই, ঘরে তো তিনি নেই।

টেবিলের পরে প্লেটে খাবার, সরোজিনী কাপে চা ঢালছেন, একটা চেয়ারে বসে রথীনবাবু চায়ের কাপে চুমুক দিচ্ছেন।

সামনেই তার টেবিলের 'পরে পড়ে একটা শূন্য প্লেট।

সরোজিনী ডাকেন, আয় বোস। কাল তো কিছুই খাসান! আজ কিছু খা।

একান্ত অনিচ্ছার সঙ্গেই মিনতি গিয়ে একটা চেয়ার টেনে নিয়ে টেবিলের সামনে বসলো। কিন্তু কি জানি কেন, চা বা খাবার ওর গলা দিয়ে যেন নামতে চায় না, অকারণেই চোখের কোল দু'টো জলে ভরে আসে।

আকুলি বিকুলি করে তার প্রাণটা সংবাদটা পাবার জন্য, কিন্তু কেমন করে শুধাবে সে সেই কথা! কোন লজ্জায় সে জিজ্ঞাসা করবে, তাঁকে দেখছি না কেন! তিনি কোথায় গেলেন মা!

কিরে খা! কিছুই যে খাচ্ছিস না, সরোজিনী বলেন।

মৃদু কণ্ঠে মিনতি কেবল বলে, ইচ্ছা করছে না মা খেতে!

সে কিরে, কাল তো কিছুই গোলমালে খাসনি!

ভাল লাগছে না। বলে টেবিল থেকে উঠে পড়ে মিনতি।

তারপর ক্রমে বেলা গড়িয়ে যায়।

দ্বিপ্রহর, সন্ধ্যা—তবু তার দেখা নেই।

অসহ্য একটা আকুতিতে ছটফট করতে থাকে মনে মনে মিনতি। তবে কি! তবে কি তিনি সত্যিই তাকে ফেলে চলে গেলেন।

না, না—কখনোই না। তিনি যে কাল রাতে তার হাত দু'টি ধরে

বলেছেন, সেই তার স্ত্রী !

শেষ পর্যন্ত সন্ধ্যার পরে সরোজিনী এসে যখন তাকে গা ধুয়ে সাজগোজ করতে বললেন তখন আর চুপ করে থাকতে পারে না মিনতি।

মা ! মিনতি সহসা ডাকে।

ঘর ছেড়ে চলে যাচ্ছিলেন সরোজিনী, মিনতির ডাকে ফিরে দাঁড়ালেন। বললেন, কি রে !

তাকে—তাকে দেখছি না কেন মা !

কাকে রে ! পরক্ষণেই বুদ্ধিমতী সরোজিনী ব্যাপারটা বুঝতে পেরে মৃদু হেসে বলেন, ও কালকের সেই ছেলেটি ?

হ্যাঁ—

ব্যস্ত কি ! আজ রাত্রেই আসবেখন।

আঃ, ঘাম দিয়ে যেন জ্বর ছাড়ে মিনতির সরোজিনীর কথায়।

সারাটা দিনের সমস্ত দুর্ভাবনা চিন্তা যেন নিমেষে অন্তর্হিত হয়।

আনন্দের লঘুপক্ষ মেলে ওর মন নতুন স্বপ্নের দেশে উড়ে চলে। গা ধুয়ে আজ নিজেই নিজের প্রসাধন শুরু করে মিনতি।

আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজের মনেই কেশ রচনা করতে করতে গুণ গুণ করে গান গায় ঃ

শতেক বরষ পরে
বধূয়া মিলাল ঘরে
রাধিকার অন্তরে উল্লাস—

কপালে এঁকে দেয় ঝোরো কুমকুমের টিপ ! চোখের কোণে কাজল, ওষ্ঠে লিপস্টিক ! রাশীকৃত শাড়ী একটার পর একটা অঙ্গে জড়ায় কিন্তু কোনটাই যেন পছন্দ হয় না মিনতির, শাড়ীর কোন রঙটি তিনি পছন্দ করেন, কে জানে ?

সাদা, লাল, নীল, সবুজ, জাফরাণী না ভায়োলেট না সিল্ক।

অনেক বেছে অনেক দেখে একটা ফিকে নীল রঙের সিল্কের শাড়ী পরিধান করে মিনতি। কানে দেয় কর্ণাভরণ, হাতে বলয় চুড়ি, কঙ্কণ, গলায় হার।

নানান ছাঁদে ঘুরে ফিরে আর্সীর বক্ষে নিজের প্রতিবিম্ব দেখে দেখে যেন আশ মেটে না। মনে হয় কেবলই কোথায় যেন কি বাকী রয়ে গেল ঃ

তার মনোমত সাজ যেন হয়নি পরা !

তারপর ঘরের মধ্যে পালঙ্কের উপরে বসে ভেজানো দরজাটির দিকে চেয়ে চেয়ে ব্যাকুল প্রতীক্ষায় প্রহর গোনা।

।। সাত ।।

ঢং ঢং ঢং···

রাত্রি দশটা বাজবার একটু পরেই সহসা ঘরের ভেজানো দরজাটা গেল খুলে। সঙ্গে সঙ্গে ভীরু সলজ্জ চোখের দৃষ্টি মিনতির আপনা থেকেই যেন বুজে আসে।

ছিঃ ছিঃ, উপযাচিকার মত সে জানিয়ে দেবে নাকি, এতক্ষণ তারই প্রতীক্ষায়

সে সেজেগুজে বসে আছে।

একটা মধুর সম্বোধন!

একটা মধুর স্পর্শের লোভে, প্রতীক্ষায় ব্যাকুল স্বেদ সিক্ত দেহটা তার রোমাঞ্চিত, শিহরিত হয়ে ওঠে।

মৃদু পায়ের শব্দ শোনা যাচ্ছে।

গত রাত্রিই মতই ঘরের দরজাটা বন্ধ করার শব্দটা শোনা গেল।

এতক্ষণ অদর্শনের অভিমানে, প্রতীক্ষার আনন্দে একটিবারও যে কথাটি মনে পড়েনি, সহসা ঘরের মধ্যে পদশব্দে সেই কথাটি-ই যেন মনে পড়ে গেল মিনতির!

বইতে পড়েছে সে বিবাহের পরের রাত্রিই তো কালরাত্রি।

আজ রাতে তো স্বামী স্ত্রীর পরস্পরের মুখ দেখতে নেই।

তবে সব দেখে শুনেও মা এ কি করলেন।

তবে—তবে কি সে ফিরিয়ে দেবে।

বলবে কি—প্রিয়তম, আজ নয়, আজকের রাতটা কালরাত্রি।

কিন্তু ততক্ষণে পদশব্দ একেবারে কাছাকাছি এসে গিয়েছে।

বাঃ চমৎকার! চমৎকার সেজেছো তো রাণী।

অপরিচিত পুরুষকণ্ঠে বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মতই যেন পরমুহূর্তে, সব কিছু ভুলে পরিপূর্ণ দৃষ্টি তুলে, সামনের দিকে তাকাতেই পাথর হয়ে গেল বুঝি মিনতি। নিজের অজ্ঞাতেই অস্ফুট ভয়ার্ত একটা আর্ত চিৎকারের মতই কণ্ঠ দিয়ে তার একটি মাত্র শব্দ, একটি মাত্র প্রশ্ন বের হয়ে এলো, কে? কে—

একেবারে অতি নিকটে দাঁড়িয়ে নাদুস নুদুস চেহারা, দামী ধুতি পাঞ্জাবী পরিহিত ইয়া গোঁফ—এক অপরিচিত পুরুষ। দু চোখের দৃষ্টি তার বন্য লালসায় যেন মিনতির সর্বাঙ্গ লেহন করছে।

কে বলার সঙ্গে সঙ্গেই উঠে দাঁড়ায় মিনতি শয্যা থেকে।

কে? কে আপনি! এ ঘরে, এ ঘরে কেন আপনি এসেছেন! বলেই চাপা আর্তকণ্ঠে চিৎকার করে ওঠে, মা! মা—

হোঃ হোঃ করে কুৎসিৎ হাসিতে লোকটা যেন উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলো। ভয় পেলে রাণী, ভয় কি! আমিও তোমাকে ভালবাসবো—বলতে বলতে চোখের সেই কুৎসিত চাউনি দিয়ে মিনতির সর্বাঙ্গ লেহন করতে করতে লোকটা তার বেমানান দুই বাহু বাড়িয়ে এগিয়ে আসে ওর দিকে।

বিদ্যুৎচমকের মতই যেন সরে যায় বাঁ দিকে মিনতি লোকটার আলিঙ্গন থেকে নিজেকে বাঁচাতে।

লোকটা আবার হাঃ হাঃ করে হেসে ওঠে। ভয় পাচ্ছো কেন সুন্দরী আমি তোমার রাজরাণী করে রাখবো! গাড়ি, বাড়ি, গয়না সব—সব দেবো। বলতে বলতে আবার লোকটা এগিয়ে আসে।

ছুটে ঘরের এককোণে চলে যায় মিনতি।

চিৎকার করে আবার ডাকে, মা—

আরে পাগলী, তোর মা-ই তো এ ঘরে পৌঁছে দিয়ে গেল। গুনে গুনে পাঁচ পাঁচটি হাজার টাকা দিয়েছি না। কাল আবার পাঁচ হাজার দিতে হবে।

লোকটার শেষের কথাগুলো যেন কানে গরম শিষে ঢেলে দিল মিনতির।

তবে, তবে কি এ সবই তার মা-র কারসাজী! মায়েরই ষড়যন্ত্র।

তার মা-ই তাকে ঐ নরপিশাচটার হাতে তুলে দিয়েছে।

মিনতি যত লোকটার নাগাল থেকে সরে যাবার চেষ্টা করে, সে-ও যেন ততই ওকে ধরবার জন্য ব্যাকুল হয়ে ওঠে।

কি করবে, কি করবে মিনতি? কোন পথে পরিত্রাণ তার।

হঠাৎ মনে পড়ে যায় মিনতির একটা কথা।

দোতলার দক্ষিণদিকের ব্যালকনীটা তারই ঘরের সংলগ্ন।

তার ঘরের দক্ষিণ দিকের দরজাটা দিয়ে সেই ব্যালকনীতে যাওয়া যায়। চেয়ে দেখলো মিনতি ব্যালকনীর দরজাটা তখন খোলাই রয়েছে। কিন্তু কেমন করে, কেমন করে ওই নরপিশাচটার চোখের সামনে দিয়ে যাবে ও ব্যালকনীতে।

লোকটা ততক্ষণে আবার এগিয়ে আসছে তার দিকে।

চোখের মণি দুটো যেন বর্বর ক্ষুধায় জ্বলছে।

না, না—যেমন করেই হোক তাকে পালাতেই হবে।

ঘরের দরজাটা আগেই খুলবার চেষ্টা করেছিল মিনতি কিন্তু দরজাটা বাইরে থেকে বন্ধ।

তাতে সে আরো বুঝেছিল এ সবই তার মা, সরোজিনীরই শয়তানী!

লোকটা সহসা দুহাত বাড়িয়ে বাহু বন্ধনে ধরে ফেলতেই অনোন্যপায় মিনতি, সজোরে লোকটার ডান হাতের উপর দাঁত বসিয়ে দিল এবং সঙ্গে সঙ্গে অস্ফুট একটা চিৎকার করে লোকটা তাকে মুহূর্তের জন্য ছেড়ে দিতেই, একেবারে ছুটে গিয়ে ব্যালকনীতে প্রবেশ করে বাইরে থেকে দরজাটা বন্ধ করে দিল মিনতি।

নিচেই রাস্তা। রাস্তাটা তখন প্রায় নির্জন বললেও অত্যুক্তি হয় না।

কোথায় যাবে সে।

কিন্তু তখন বুঝি আর অতশত ভাববারও সময় ছিল না।

রেলিং টপকে পরক্ষণেই পাগলের মতই যেন নিচে ঝাঁপ দিল মিনতি চোখ কান বুজে।

মন্থর গতিতে একটা হুড খোলা মোটর গাড়ি এ সময় নিচের রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিল। একটি মাত্র লোক আরোহী ছিল গাড়িতে। এবং সেই চালাচ্ছিল।

ঝুপ করে একেবারে মিনতি গিয়ে সেই গাড়ির পিছনের গদীর উপর পড়লো। থতমত খেয়ে লোকটা সহসা ব্রেকটা চেপে গাড়ি থামিয়ে দেয় সেই শব্দ শুনে ও একটা ঝাঁকুনি খেয়ে।

হাতের কনুই ও পায়ে খুব আঘাত লেগেছিল মিনতির। কিন্তু সে কথা ভাববার তখন তার অবস্থা নয়। কোন মতে সে উঠে বসে। মাথাটা তখনও ঝিম ঝিম করছে।

এদিকে গাড়ির চালক পিছন ফিরে রাস্তার গ্যাসের আলোয় অপূর্ব, সুন্দরী ও দামী বেশভূষায় সজ্জিত তার গাড়ির মধ্যে এক কিশোরীকে দেখে সবিস্ময়ে বলে ওঠে, কে! কে তুমি?

ছেড়ে দিন, গাড়ি ছেড়ে দিন—নইলে এখুনি হয়তো ওরা আমাকে ধরে ফেলবে।

কিন্তু কে! কে তুমি!

বলবো, সব বলবো আপনাকে, আগে আপনি আমাকে বাঁচান। ধরতে পারলে ওরা আমার সর্বনাশ করবে। হাঁপাতে হাঁপাতে মিনতি বলে।

হঠাৎ ঐ সময় উপরের ব্যালকনীতে একজন মানুষ দেখা গেল।

মিনতি আবার করুণ কণ্ঠে মিনতি জানায়, কি করছেন আপনি, চলুন এখান থেকে তাড়াতাড়ি।

কি ভেবে এবারে চালক গাড়িতে ষ্টার্ট দিয়ে গাড়ি ছেড়ে দিল।

অনেকটা পথ গাড়ি চালিয়ে অবশেষে গাড়ির চালক একটা বড় পার্কের সামনে এসে গাড়িটা থামালো।

এবারে চালক মুখোমুখি তাকালো মিনতির দিকে ঘুরে।

রাস্তার ইলেকট্রিক পোষ্টের আলো মিনতি চোখে মুখে সর্বাঙ্গে এসে পড়েছে! অনেক রাত, রাস্তাটা একেবারে নির্জন!

কে তুমি বলতো! আর কেনই বা অমন করে নিচে লাফিয়ে পড়েছিলে, যদি আমার গাড়ির উপর এসে না পড়ে রাস্তায় পড়তে! মরে যে একেবারে ভূত হয়ে যেতে! বলে গাড়ির চালক।

মিনতি চুপ করে থাকে।

শুধু তার চোখের কোল দুটো অশ্রুতে ছল ছল করে ওঠে।

কি আশ্চর্য! কথা বলছো না কেন, কি নাম তোমার।

মিনতি!

মিনতি! তা অমন করে দোতলা থেকে লাফিয়ে পড়েছিলে কেন!

ভয়ে!

ভয়ে! কিসের ভয়ে!

একটা লোক আমার সর্বনাশ করবার জন্য—আর বলতে পারে না মিনতি ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে ওঠে।

আরে—কাঁদছো কেন! সব কথা খুলেই বল না!

আপনি, আপনি আমাকে—বাঁচাবেন বলুন! বলতে বলতে জল ভরা চোখে এতক্ষণে ভাল করে তাকালো মিনতি লোকটার মুখের দিকে।

চল্লিশ থেকে পঁয়তাল্লিশের মধ্যে লোকটার বয়স হবে, রোগা চেহারা। দাড়ি গোঁফ নিখুঁত ভাবে কামানো, পরিধানে সুট।

সে দেখবোখন। আগে বলতো ব্যাপারটা কি।

মিনতি তখন সংক্ষেপে তার অতীত কাহিনী বলে যায়।

গভীর মনোযোগের সঙ্গে সব কথা শুনে লোকটি বলে, তাইতো তাহলে এখন কি করবে, কোথায় যাবে?

আমার স্বামীকে কি আমি খুঁজে বের করতে পারবো না ?

লোকটি মিনতির ইতিহাস শুনে মোটামুটি ব্যাপারটা বুঝতে পেরেছিল। মৃদু হেসে বললে, তার নাম ধাম ঠিকানা তো কিছুই জানো না খুঁজে বের করবে কি করে।

সে আমি নিশ্চয়ই পারবো। তাঁকে দেখলেই আমি চিনতে পারবো।

এবারেও লোকটি মৃদু হাসলো।

তারপর বললে, তা সে তো পরের কথা। এখন কোথায় যাবে ?

আপনি বলুন কোথায় যাবো !

আমি বলবো ?

হ্যাঁ। তা ছাড়া কে আর বলবে। কাকেই বা জিজ্ঞাসা করবো।

তার চাইতে চল থানায় গিয়ে তোমাকে পৌঁছে দিয়ে আসি—

না, না—থানায় আমি যাবো না। তারা তাহলে নিশ্চই আবার আমাকে তাদের হাতেই তুলে দেবে।

না, না—তা কেন হবে। থানাতে সব কথা তুমি বলবে।

না—থানায় আমি যাবো না।

তবে কোথায় যাবে ?

আপনার বাসায় কদিনের জন্য আমাকে একটু স্থান দিতে পারেন না ?

আমার বাসায়।

হ্যাঁ তারপর আমার স্বামীকে খুঁজে পেলেই আমি চলে যাবো।

কি ভেবে লোকটি এবারে বললে, বেশ ! বেশ তাই না হয় আজকের রাত্রের মত চলো।

॥ আট ॥

লোকটির নাম রতিকান্ত মল্লিক। সিনেমা ও থিয়েটারের অভিনেত্রীর জোগান দেওয়াই তার পেশা। গত আটবৎসর থেকে রতিকান্তর ঐ ব্যবসা। এবং ব্যবসায় তার বেশ দু' পয়সা উপার্জনও হয়।

সিনেমা ও থিয়েটার লাইনে ঘুরলেও রতিকান্তর আজ পর্যন্ত কিন্তু কেউ তার চরিত্রের বদনাম দিতে পারেনি।

ছোট সংসার। রতিকান্ত ও তার স্ত্রী মল্লিকা। মল্লিকা সন্তানহীনা।

রীতিমত রাশভারী মেয়ে মল্লিকা। গিন্নীবান্নী প্যাটার্ণের চেহারাটি। এবং স্বামী রতিকান্তর উপরে তার অসাধারণ প্রতিপত্তি।

সাদা কথায় রতিকান্ত মল্লিকাকে রীতিমত ভয়ই করে, যদিও মুখে সেটা কখনোই সে প্রকাশ করে না।

বরং উল্টোটাই বন্ধু মহলে রতিকান্ত গলা উঁচিয়ে প্রকাশ করে, স্ত্রী জাতটাকেই কখনো কোন ব্যাপারে ইমপরটেন্স্ দিতে নেই, তা হলেই তারা মাথায় চেপে বসবে।

বন্ধুরা যদি কখনো প্রতিবাদ করে বলেছে, এটা কিন্তু তোমার ভুল ধারণা রতিকান্ত।

ভুল মানে। মেয়েদের ব্যাপার কতটুকু তোমরা জানো ?

তা তোমারও তো একটিরই একস্‌পিরিয়েন্স। বন্ধুটি হয়তো বলেছে।

ডোণ্ট টক রাবিশ! বলে সারাটা জীবন মেয়েদের নিয়ে কাটিয়ে দিলাম। ওরা হচ্ছে সেই জাত, লাই দিয়েছো কি, দুদিনেই বলবে তোমাকে গো টু হেল! ওদের কাছে থাকতে হবে ষ্ট্রং আয়রণের মতো। ওরা যদি বলে ডাইনে চলো, নো টু দি লেফট্‌।

কিন্তু ঘনিষ্ঠ দুএকজন যারা রতিকান্তর বাড়ির ভিতরের সংবাদটা জানতো তারা কিন্তু রতিকান্ত কথায় মৃদু মৃদু হাসতো।

হয়তো বাইরে প্রচণ্ড ধারায় বর্ষা নেমেছে, রতিকান্ত স্ত্রীকে ডেকে বললে, ওগো শুনছো, এক কাপ বেশ ষ্ট্রং করে চা করে দেবে।

স্ত্রী কিন্তু আদা মরীচ, তেজপাতা ও মিছরী সহযোগে এক গ্লাস গরম কাত তৈরী করে এনে সামনে ধরলো।

একি!

মিছরির কাত্‌—খেয়ে নাও। ঠাণ্ডায় বেশ কাজ দেবে!

কিন্তু আমি যে বললাম চা—

সকাল বেলাতো এক কাপ খেয়েছো, খালি খালি চা খেলে ডিস্‌পেপসিয়া হবে। এবং শুধু বলা নয়, সেই কাত্‌ সবটুকু স্বামীকে খাইয়ে, ঘরের জানালা দরজা বন্ধ করে, একটা উলের কমফর্টার এনে স্বামীর গলায় জড়িয়ে দিয়ে তবে নিশ্চিন্ত।

তারপর হয়তো কোন দিন যদি রাত করে রতিকান্ত ফিরেছে, মল্লিকা সারাটা রাত ধরে প্রশ্নবাণে করবে তাকে জর্জরিত।

দিন দিন দেখছি তোমার পাখা গজাচ্ছে। মল্লিকা হয়তো বলেছে।

তার মানে!

মানেটা যে কি তা কি আমি বুঝি না ভাবো। কথায় বলে ঘি আর আগুন—

কি বলছো মল্লিকা!

হ্যাঁ, ঐ সব মেয়েছেলেদের নিয়ে কারবার করো আর যাই করো সন্ধ্যের পরেই ফিরতে হবে জেনো।

ভয়ে ভয়ে অতঃপর রতিকান্ত চুপ করেই থাকে, কি জানি মল্লিকা যদি যদি বাইরে যাওয়াই একেবারে বন্ধ করে দেয়।

গাড়ি চালাতে চালাতে রতিকান্ত গৃহিনী মল্লিকার কথাই ভাবছিল।

একে নতুন একজন হিরোইনের খোঁজে বেশ রাত হয়ে গিয়েছিল। তারপর যদি সঙ্গে করে এত রাত্রে ঐ সুন্দরী কিশোরীটিকে নিয়ে গিয়ে বাড়িতে হাজির করে, মল্লিকা না একটা কেলেঙ্কারী করে বসে, এত রাতে চেঁচামেচি করে।

মিনতির প্রস্তাবে রাজী হওয়ার অবশ্য আরো একটি কারণও ছিল রতিকান্তর। মেয়েটাকে যদি কাজে লাগানো যায় তো মোটা অর্থ প্রাপ্তি হবে মনে মনে সে ইতিমধ্যেই কথাটা ভাবতে শুরু করেছিল।

অনুচিত রায় তার নতুন বইয়ের জন্য একটি হিরোয়িন খুঁজছে। এ মেয়েটিকে দেখলে অনুচিতের মাথা একেবারে ঘুরে যাবে।

কিন্তু সরাসরি মেয়েটিকে নিয়ে একেবারে বাড়ির মধ্যে তোলা যাবে না। বাইরের ঘরে বসিয়ে রেখে আগে মল্লিকার সঙ্গে কথাবার্তা বলে নিতে হবে। তারপর। নচেৎ বিশ্বাস নেই মল্লিকাকে।

বাড়ির প্রায় কাছাকাছি এসে রতিকান্ত মিনতিকে সম্বোধন করে বললে, ইয়ে, মানে একটা কথা তোমাকে বলতে চাই মিনতি।

কি!

বাইরের ঘরে তুমি একটু অপেক্ষা করবে। আমার স্ত্রীকে ডেকে এনে আগে তার সঙ্গে তোমার পরিচয়টা করিয়ে দেবো।

তিনি আমাকে থাকতে দেবেন তো!

দেবেন না মানে। নিশ্চই দেবেন! অমন কাইণ্ড হার্টেড্ ব্রড মাইনডেড্ লেডি তুমি বড় একটা দেখোনি! আমার স্ত্রী বলে বলছি না, দেখবে আলাপ হলে, তা ছাড়া আমার বাড়িতে তোমাকে আমি স্থান দিচ্ছি, তার বলবার কি থাকতে পারে! আর বললেই বা শুনছে কে, আই ডোণ্ট কেয়ার!

রতিকান্তর এলোমেলো কথার অর্থ ঠিক ধরতে পারে না মিনতি।

তবে জবাবও দেয় না। উত্তেজনায় এতক্ষণ বুঝতে পারেনি।

কিন্তু এখন সর্বশরীর বেদনায় যেন টনটন করছিল। বিশেষ করে কনুই আর পা যেন ব্যথায় ভেঙে যাচ্ছে।

ভবানীপুর অঞ্চলে বকুলবাগান রোডের উপরেই রতিকান্তর বাড়ি।

বাড়িটা পৈতৃক হলেও নেহাৎ ছোট হয়।

দোতলা বাড়ি। উপর নিচে সর্বসমেত আটখানি ঘর। সংলগ্ন একটি গ্যারাজও আছে। অতগুলো ঘর প্রয়োজন নেই বলে উপরের তলাটা ভাড়া দিয়ে নিচের তলাতেই রতিকান্ত থাকে।

গাড়িটা গ্যারেজে তুলে দিয়ে কলিংবেল টিপতেই চাকর হরিয়া এসে দরজা খুলে দিল।

মিনতিকে বাইরের ঘরে বসতে বলে রতিকান্ত ভয়ে ভয়ে অন্দরে গিয়ে ঢুকলো মধ্যবর্তী দরজা পথে। শয়ন ঘরে আলো জ্বলছে।

রতিকান্ত বুঝতে পারে স্ত্রী মল্লিকা তার অপেক্ষায় তখনো জেগে।

বসবার ঘরের পাশের ঘরটিই রতিকান্তর শয়ন ঘর!

মাঝখানে একটি দরজা।

ঘরে ঢুকে মধ্যবর্তী দরজার কপাট দুটো ওদিকে থেকে টেনে ভেজিয়ে দিলেও পাশের ঘরের যাবতীয় কথাবার্তা মিনতির কানে আসে।

মলি!

এত রাত হলো ফিরতে?

হয়ে গেল। মানে হঠাৎ একটা এ্যাকসিডেণ্ট—

এ্যাকসিডেণ্ট! মল্লিকা বিস্মিত দৃষ্টিতে স্বামীর দিকে তাকায়।

হ্যাঁ, মানে একটা মেয়ে—

ও, মেয়েছেলে নিয়ে স্ফুর্তি করতে গিয়েছিলে।

আঃ, কি যে চেঁচাও—

চেঁচাবো না মানে! বলি তুমি ভেবেছো কি!

আঃ মল্লিকা—মেয়েটি পাশের ঘরে বসে আছে, শুনতে পেলে—

কি! একেবারে বাড়িতে এনে তুলেছো।

ঐ দেখো! বাড়িতে তুলবো কেন! আগে শোনোই না ছাই কথাটা!

শোনাচ্ছি! দাঁড়াও—দু'জনকেই ভাল করে শোনাচ্ছি—

মিনতির অবস্থা তখন ন যযৌ ন তস্থৌ।

কি করবে সে ভেবে পায় না।

পরক্ষণেই ঘরের দরজার কপাট খুলে মল্লিকা এসে ঘরে ঢুকলো।

কিন্তু ঘরে ঢুকেই ভীত শংকিত অথচ ইন্দ্রানীর মত সুসজ্জিতা রূপবতী মিনতিকে ঘরের মধ্যে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে হঠাৎ যেন দাঁড়িয়ে যায় থমকে।

কয়েকটা মুহূর্ত মুখ দিয়ে তার যেন কোন কথাই সরে না।

ভীরু শংকিত দৃষ্টিতে মিনতি চেয়ে আছে মল্লিকার মুখের দিকে।

পিছু পিছু তখন রতিকান্তও এসে দাঁড়িয়েছে মল্লিকার পিছনে।

আমাকে, আমাকে—তাড়িয়ে দেবেন না দয়া করে। তাহলে তারা আমার সর্বনাশ করবে। আমি প্রতিজ্ঞা করছি, আমার স্বামীর সন্ধান পেলেই আমি,—আমি এখান থেকে চলে যাবো।

কান্নাঝরা সুরে মিনতি একটানা কথাগুলো বলে যায় এবং পরক্ষণেই সহসা ছুটে এসে মল্লিকার পায়ের কাছে উপুড় হয়ে পড়ে।

ঘটনার আকস্মিকতায় মল্লিকা যেন কেমন বিহ্বল হয়ে যায়।

মেয়েমানুষ সে, মিনতিকে বুঝতে তার দেরি হয় না।

আহা! ওঠো—ওঠো—

তাড়াতাড়ি হাত বাড়িয়ে সস্নেহে মল্লিকা মিনতিকে তুলে ধরে।

কি নাম তোমার?

মিনতি।

স্বামীর কথা তোমার কি বলছিলে, বিয়ে হয়েছে?

ঐ সময় রতিকান্ত কথা বলে উঠে, সে অনেক কথা মল্লিকা! একটা লোমহর্ষক ব্যাপার—

তুমি যাওতো পাশের ঘরে।

না মানে—আমি বলছিলাম কি—

কিছু বলতে হবে না। যাও, রাত অনেক হয়েছে, হাত মুখ ধুয়ে টেবিলে বোস গিয়ে আমি আসছি!

স্বামীকে কথাগুলো বলে এবারে মল্লিকা মিনতির দিকে ফিরে তাকায় বলে, চলো, ভিতরে চলো, তোমার কথা সব শুনবো'খন।

অতঃপর মল্লিকাই মিনতির হাত ধরে ভিতরে গিয়ে প্রবেশ করে।

রতিকান্তকে খাইয়ে শয্যায় পাঠিয়ে দিয়ে মল্লিকা মিনতিকে নিয়ে গিয়ে

অন্য একটি ঘরে মুখোমুখি বসলো।

খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে মল্লিকা মিনতির যাবতীয় ইতিহাস শুনলো।

আসলে মল্লিকা বাইরে একটু খিট-খিটে প্রকৃতির হলেও মনটি কিন্তু ছিল তার ভারি কোমল। তাই মিনতির ইতিহাস শুনতে শুনতে মল্লিকার দু'চোখের কোণে জল জমে ওঠে।

বেচারী! মল্লিকা মিনতিকে দু'হাতে বুকের মধ্যে টেনে নিয়ে বলে, কোন চিন্তা নেই তোমার। এখানে এসে পড়েছো যখন, যতদিন তোমার স্বামীকে না খুঁজে পাও এখানেই থাকবে।

পরের দিন সকালে মল্লিকা স্বামীকে বললে, ও এখানেই থাকবে।

হ্যাঁ দু চারটে দিন থাকুক না।— অনুচিতবাবু তার বইয়ের জন্য একজন নায়িকার কথা বলেছিলেন—

কি বললে, দেখো ওকে নিয়ে ঐ সব মতলব কর তো তোমারই একদিন কি আমারই একদিন—

আরো না, না—তাই বলছি নাকি আমি। আমি বলছিলাম—

তুমি যা বলছিলে তা হবে না। ভদ্র ঘরের বৌ যাবে ফিল্মে অভিনয় করতে! ওর জন্য তোমার মাথা ঘামাতে হবে না। ওর যা করবার আমি করবো।

তা—তা হলে তো ভালই হয়। তা বেশ, তা বেশ—কোনমতে রতিকান্ত তখনকার মত স্ত্রীর সামনে থেকে যেন পালিয়ে বাঁচে।

কিন্তু ইচ্ছাটা তার মনের মধ্যে কেবলই ঘুরতে থাকে।

যেমন করে হোক ওকে ফিল্মে নামাতেই হবে।

মিনতি রতিকান্তর গৃহেই স্থান পেল।

কিন্তু যে কারণে মিনতি জীবন পর্যন্ত সংশয় করে সরোজিনীর আশ্রয় থেকে অমন করে দোতলা থেকে একতলার রাস্তায় লাফিয়ে পড়ে পালিয়ে এলো, সেই তার সন্ধানই সে পেল না।

কোন হদিসই সে করতে পারে না।

মাস চারেক মিনতির রতিকান্তর আশ্রয়েই কেটে গেল।

মল্লিকা ছোট বোনের মতই ভালবাসে মিনতিকে। কোন দুঃখই তার এখানে নেই।

॥ নয় ॥

তারপর এক রাত্রে।

রতিকান্তদের শয়ন ঘরের পাশের ঘরটিতেই রাত্রে মিনতি শয়ন করতো।

সেদিন মাঝ রাত্রে হঠাৎ তার ঘুম ভেঙে গেল পাশের ঘরে রতিকান্ত ও মল্লিকার কথাবার্তায়। এবং তাদের স্বামী-স্ত্রীর কথার মধ্যে তার নিজের নামটা হঠাৎ কানে যেতেই মিনতি যেন সচকিত হয়ে ওঠে।

সজাগ হয়ে কান পেতে শোনে।

স্পষ্ট শোনা যায় ওদের কথাবার্তা !

তোমাকে যে বলেছিলাম মিনুর স্বামী খোঁজ করতে তার কি করলে ?

মল্লিকার প্রশ্নে রতিকান্ত জবাব দেয়, তোমার কি মাথা খারাপ হলো। সে আবার একটা বিয়ে—তার আবার স্বামী।

কি আবোল তাবোল বকছো !

হ্যাঁ, মিনু যাব ওখানে থাকতো, ঐ সরোজিনী না কি নাম ! সেটা তো একটা ডাক-সাইটে বেশ্যা !

বেশ্যা !

হ্যাঁ ! খুব সম্ভবত প্রয়োগে গঙ্গাস্নান করতে গিয়ে মিনু—ভিড়ের মধ্যে তার মার হাত থেকে ছিটকে ভিড়ের চাপে অজ্ঞান হয়ে যায়। সেই সময় হয়তো ঐ ফুটফুটে মেয়েটিকে সরোজিনী দেখতে পেয়ে তুলে নিয়ে আসে। তারপর একটু বড়-সড় হলে তারই বৃত্তিতে লাগিয়ে দিয়ে মোট টাকা লাভের আশায় আশায় সে অপেক্ষা করে।

সে কি গো !

তাই ! ওর সব কথা শুনলেই তো সব বোঝা যায়। বার-বণিতাদেরও একটা আইন কানুন আছে। ব্যবসায় লাগানোর আগে ঐরকম একটা বিয়ের অনুষ্ঠান করে। কখনো কোন মানুষের সঙ্গে বিয়ে দেয় আবার কখনো মানুষ না পেলে একটা কলাগাছের সঙ্গেই বিয়ে দিয়ে দেয় শুনেছি !

সত্যি বলছো !

হ্যাঁ—

তাহলে ওর কি হবে ! ওযে সেই স্বামীকেই সত্যিকারের স্বামী ভেবে হেদিয়ে মরছে এখনো !

সে আর এসেছে। সে তার কাজ গুছিয়ে সবে পড়েছে।

তাইতো বলছিলাম মেয়েটা যখন আমাদের হাতে এসে পড়েছে, ওর একটা যা হোক হিল্লে আমাদেরই করে দেওয়া কর্তব্য নয় কি !

কি করবে শুনি ?

তা ওকে স্কুলে ভর্তি করে দিলে কেমন হয়।

স্কুলে-কলেজে পড়েতো একেবারে চতুবর্গ ফল লাভ হবে। তার চাইতে যদি একটু গান বাজনা, নাচ শিখতো তো দুটো পয়সা উপার্জন করতে পারতো।

তা বেশ, তাই না হয় ব্যবস্থা করে দাও। আহা, বেচারী ! তাই বলে তোমার ঐ সব সিনেমা টিনেমায় কিন্তু নামতে দেবো না বলে রাখছি ওকে।

না, না—সিনেমায় নামবে কেন। গান বাজনা নাচ জানলে তো এমনিই কত রোজগার হয়।

আর পাশের ঘরে অন্ধকারে একাকী শয্যায় শুয়ে শুয়ে মিনতির সর্বাঙ্গ যেন পাথর হয়ে যায়।

বিয়েটা তার তাহলে বিয়েই নয়। সমস্ত ব্যাপারটাই সে রাত্রে একটা ছেলেখেলা। কিন্তু পুরোহিত তাহলে যে মন্ত্রোচ্চারণ করলো তাও

অর্থহীন। তাদের স্বামী-স্ত্রী সম্পর্ক সমাজ মেনে নেবে না। কেমন যেন সব গুলিয়ে একাকার হয়ে যায় মিনতির। নিঃশব্দে অশ্রুর ধারা তার দু চক্ষুর কোল বেয়ে গড়িয়ে পড়তে থাকে।

সব মিথ্যা! সব ফাঁকি!

তবে যে তিনি সে রাত্রে তার হাতদুটি ধরে বলেছিলেন, তুমি, তুমিই আমার স্ত্রী! আর কোন নারীই জেনো এ জীবনে আমার আসবে না।

সেও তাহলে মিথ্যা স্তোক। মিথ্যা বলেছেন তিনি।

পাশের ঘরে একসময় স্বামী স্ত্রীর আলাপ থেমে যায়।

ত্রিযামা রাত্রি উদয়দিগন্তে বিলীন হতে চলে।

মিনতির চোখে কিন্তু ঘুম আসে না।

ক্রমে অশ্রুও এক সময় যায় শুকিয়ে। অশ্রুহীন দুটি চক্ষু শুধু অন্ধকারে একখানি ক্ষণ-পরিচিত মুখ খুঁজে খুঁজে ফিরতে থাকে।

পরের দিন মল্লিকা সকালে মিনতির মুখের দিকে তাকিয়ে চমকে ওঠে। শুধু রাত্রি জাগরণ নয়, অশ্রুর চিহ্নও যেন ছড়িয়ে রয়েছে।

কি হয়েছে রে মিনু!

কই, কিছু হয়নি তো দিদি!

নিশ্চয়ই হয়েছে। আমার চোখকে তুই ফাঁকি দিবি ভেবেছিস! বল, কি হয়েছে।

সহসা অশ্রুবাষ্পে দুটি চক্ষু মিনতির ঝাপসা হয়ে যায় যেন।

মিনু!

আমার কি হবে দিদি!

কেন, কি আবার হবে!

সব। সব তোমাদের কথা কাল রাত্রে আমার কানে এসেছে দিদি! রতিবাবু যা বলেছেন সব তাহলে সত্যি! বিয়ে আমার হয়নি! সবই একটা ছেলেখেলা।

মল্লিকা প্রথমটায় যেন স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিল।

কি জবাব দেবে ভেবে পায় না। কিন্তু পরক্ষণেই মনে হয়, ভালই হলো, একপক্ষে বুঝি ভালই হলো। সত্যি কথাটা যা একদিন বলতেই হতো হতভাগিনীকে, দৈবক্রমে সবই তা সে জানতে পেরেছে। ভালই হলো।

একটা গুরুদায়িত্ব থেকে সে নিষ্কৃতি পেয়ে গেল যেন।

সস্নেহে মল্লিকা মিনতিকে দু'হাত দিয়ে বুকের মধ্যে টেনে নিয়ে বলে, মন জগদ্ধাত্রীর মত রূপ নিয়ে জন্মেছিস, তোর কখনো খারাপ হবে না। আমি বলছি ভগবান তোর ভালই করবেন, তুই কিছু ভাবিস না।

তবু সান্ত্বনা পায় না মিনতি। কেঁদে কেঁদে তার চোখ ফুলে যায়।

তার বিয়েটা মিথ্যা, তার স্বামী মিথ্যা, এ যেন ভাবতেই পারে না মিনতি।

তারপর মল্লিকাই একদিন বলে, এমনি করে বসে থাকবি কেন? তোর রতিবাবু বলছিলেন তুই গান বাজনা নাচ শেখ, নিজের পায়ে নিজে দাঁড়াতে পারবি।

তা হয় না দিদি!

কেন! হয় না কেন?

না। তোমাদের উপর আর কত অত্যাচার করবো! আমার পথ আমিই দেখে নেব।

মল্লিকা মিনতির কথায় সহসা রেগে ওঠে। বলে, সে তো নিশ্চয়ই, রূপ নিয়ে পাখা মেলবি তাই না—

তুমি আমাকে ভুল বুঝো না দিদি।

থাক। থাক—আর দিদি ডেকে সোহাগ দেখাতে হবে না। যা মরতে চাস যখন তাই যা তোর যেখানে খুশি!

দিদি, লক্ষ্মী দিদি শোন—

না, না—তোর কোন কথাই শুনতে চাই না!

রাগে গজ গজ কবতে করতে মল্লিকা ঘর ছেড়ে চলে যায়।

কি করবে মিনতি বুঝে পায় না।

কিন্তু সত্যিই তো। যাবো বললেই বা সে যাবে কোথায়? এ দুনিয়ায় কে তার আপনার জন আছে। কে তাকে আশ্রয় দেবে।

তার চাইতে গান বাজনা ও নাচ শিখে যদি সে তার পায়ে ভর দিয়ে নিজে দাঁড়াতে পারে সেটাই ভাল নয় কি।

দুদিন পরে মিনতি মল্লিকার সামনে গিয়ে ডাকে, দিদি!

মল্লিকা তরকারী কুটছিল, কোন সাড়া দেয় না।

রাগ করেছো দিদি?

তবু সাড়া দেয় না মল্লিকা।

বেশতো তোমার কথাই শুনবো। ব্যবস্থা করে দাও, শিখবো গান বাজনা।

সত্যি বলছিস!

হ্যাঁ!

কয়েক দিনের মধ্যেই রতিকান্ত উপযুক্ত শিক্ষকের ব্যবস্থা করে দিল মিনতির গান বাজনা ও নৃত্য শিখবার।

মিনতিও যেন প্রাণ ঢেলে দিল নাচ ও বাজনার মধ্যে।

মিনতির গলায় গান শুনে মল্লিকা পর্যন্ত যেন মুগ্ধ হয়ে যায়। কি মিষ্টি সুরেলা কণ্ঠ মিনতির।

সন্ধ্যার দিকে মিনতি যখন তানপুরা নিয়ে গান গায় ওস্তাদের সামে দরজার পাশে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে একমনে সেই গান শোনে মল্লিকা।

বঁধু, কি আর বলিব আমি।
জীবনে মরণে জনমে জনমে
প্রাণনাথ হইও তুমি॥
তোমার চরণে আমাব পরাণে
বান্ধিল প্রেমের ফাঁসি।
সব সমর্পিয়া একমন হইয়া
নিশ্চয় হইলাম দাসী॥

মিনতির পায়ের তালে তালে ঘুঙুর যখন ঝুম ঝুম শব্দে বেজে ওঠে মল্লিকা দু'কান পেতে শোনে।

মেয়েটার এত রূপ এত গুণ তবু ভগবান কি ওর দিকে চোখ তুলে চাইবেন না।

কিন্তু মিনতি তখন বুঝি সব ভুলে গিয়েছে। সমস্ত দুঃখ যেন তার সুরের মধ্যে হারিয়ে গিয়েছে। এতদিনে, এতদিনে সে যেন তাকে খুঁজে পেয়েছে।

॥ দশ ॥

আরো চারটে বছর মিনতির জীবনে গ্রীষ্ম বর্ষা শরৎ হেমন্ত বসন্ত এলো এবং চলে গেল। এবং সেই চার বছর গত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কৈশোর পার হয়ে কিশোরী মিনতি যৌবনে পা দেয়। যৌবন ঢল ঢল দেহে রূপ যেন উছলে পড়ে মিনতির।

আর সেই সময়, এক সন্ধ্যায় মিনতি যখন তার ঘরের মধ্যে বসে আপন মনে তানপুরাটা নিয়ে গান গাইছে, রতিকান্তর গৃহে এলো ফিল্ম ডাইরেকটার সুকোমল চৌধুরী।

শুধু সুকোমল চৌধুরী নয় কুমার সুকোমল চৌধুরী।

মৌরীপুর ষ্টেটের কুমার! বয়স আঠাশ উনত্রিশের মধ্যে। রোগা পাতলা চেহারা। প্রশস্ত উন্নত ললাট, মাথা ভর্তি বিস্রস্ত কোঁকড়া কোঁকড়া চুল, খড়্গের মত উন্নত নাসা। দুটি চোখে বুদ্ধির প্রাখর্য! দৃঢ়, বদ্ধ ওষ্ঠ। রাজবাড়ির ছেলেই শুধু নয়। শরীরে যেন রাজকীয় আভিজাত্য স্পষ্ট।

দামী গাড়ি থেকে এসে নামলেন সুকোমল চৌধুরী।

ওষ্ঠে ধৃত দামী সিগারেট।

একদা রতিকান্তর সঙ্গে কলেজ জীবনে বন্ধুত্ব হয়েছিল। সেই বন্ধুত্বের খাতিরেই বহুবার রতিকান্ত কুমারকে তার নিজ গৃহে আমন্ত্রণ জানিয়েছে, কিন্তু কুমার আসেনি এতদিনে। অকস্মাৎ আজ এসে হাজির।

কিন্তু গাড়ি থেকে নেমে মিনতির গানের সুর শুনেই থমকে দাঁড়ায় কুমার সুকোমল। এবং যতক্ষণ গান চলে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শোনে।

তারপর ডাকে, রতিকান্ত!

কে?

কোথায় হে? আমি সুকোমল!

বাইরে বের হয়ে সাদর অভ্যর্থনা জানায় রতিকান্ত, আরে সুকোমল যে, এসো, এসো—কি সৌভাগ্য? য়্যাঁ, সত্যিই তাহলে তুমি এলে!

কিন্তু একটু আগে তোমার বাড়ির মধ্যে কে গান গাইছিল বলতো! মিনতি নাকি!

আরে না, না—ও তো মিনতি!

মিনতি! হু ইজ সি?

বোস, বোস—রিয়েলি সি ইজ এ জুয়েল!

মল্লিকা সেদিন বাড়ি ছিল না ঐ সময়। তার বোনের বাসায় বেড়াতে গিয়েছিল।

মিনতির অনিচ্ছা সত্ত্বেও তাকে একপ্রকার জোর করে টেনে এনে কুমার সুকোমল চৌধুরীর সঙ্গে রতিকান্ত মিনতির আলাপ করিয়ে দিল। এবং ঐ ঘটনারই দিন দুই পরে কুমার স্টুডিওতে ডেকে পাঠালো রতিকান্তকে।

কুমার তখন তার বইয়ের সুটিংয়ে ব্যস্ত ছিল। রতিকান্তকে তার অফিসে বসতে বললে। সুটিং শেষ হলে অফিস ঘরে এসে ঢুকলো কুমার সুকোমল।

তারপর, কি ব্যাপার, এত জরুরী তলব ?

একটা প্রস্তাব আছে তোমার কাছে।

প্রস্ত ব !

হ্যাঁ ! সেদিন যে মেয়েটিকে তোমার ওখানে দেখলাম ! ঐ যে মিনতি না কি সে তোমার কে হয় বলতো !

কেন ?

বলই না !

কোন রিলেশন নেই ! বলে সংক্ষেপে মিনতির পরিচয়টা দিল রতিকান্ত।

আই সি ! তা ওকে যদি আমার কম্পানীতে এক্সক্লুসিভ্ আর্টিষ্ট করে নিই ! আপাততঃ পাঁচশ করে মাস মাস মাইনে দেবো। কি বলো রাজি আছো ?

এ তো আনন্দের কথা। তবে আমার স্ত্রীর সঙ্গে ও মিনতির সঙ্গে একবার পরামর্শ করে তবে তোমাকে জানাবো।

বেশ। তাই জানিও। নেকস্ট্ বই আমার সামনে মাস থেকেই শুরু করবো। ওকে পেলে নায়িকার রোলটা আমি ওকেই দেবো।

তোমাকে আমি দু' একদিনের মধ্যেই জানাবো ভাই !

সেদিনকার মতো রতিকান্ত বিদায় নিয়ে চলে এলো।

বাড়ি ফিরে রতিকান্ত মিনতির সামনেই মল্লিকাকে কথাটা জানালো।

মল্লিকা শুনেই বলে, না, ও ফিল্মে নামবে না।

কিন্তু এবারে প্রতিবাদ জানায় মিনতিই।

সে বলে কেন দিদি, এতে তুমি অমত করছো কেন ! এমন একটা চান্স যখন এসেছেই—

থামতো তুই ! ঝাঁঝিয়ে ওঠে মল্লিকা।

না, না—মল্লিকা, সত্যিই, এ ব্যাপারে তুমি অমত করো না, রতিকান্ত বলে, এ সুযোগ যখন মিনুর জীবনে এসেছেই। তাছাড়া কুমারের মত অমন বড় ডাইরেক্টার—দেখবে মিনু নিশ্চয়ই একদিন এ লাইনে সেনসেশান ক্রিয়েট করে দেবে।

হ্যাঁ, হ্যাঁ—আরো দশজন যেমন এ লাইনে চমক লাগাচ্ছে—তাদেরই মতো ও চমক লাগাবে তা কি আমি জানি না। বলতে বলতে মল্লিকা ঘর থেকে বের হয়ে গেল। আসল কথা সন্তানহীনা মল্লিকা এই চার বৎসরে সত্যি মিনতিকে ভালবেসেছিল।

আর সেই কারণেই আজ আর সে মিনতিকে ঐ লাইনে যেতে দিতে চায় না। ঐ লাইনের অভিনেতা ও অভিনেত্রীদের সম্পর্কে অনেক কথাই তো অনেক সময় মল্লিকার কানে আসতো।

কিন্তু মিনতি তার জীবনের এতবড় সুযোগটা হারাতে চাইলো না।

স্বামী, স্বামীর ঘর, আজ সে সব স্বপ্নই কৈশোরউত্তীর্ণ মিনতির মন থেকে মিলিয়ে গিয়েছে। সেই মধুরাতটির কথা আর সেই একটি রাত্রের পরিচিত মানুষটির কথাও প্রায় তার স্মৃতি পট থেকে মুছে গিয়েছে। নিষ্ঠুর বাস্তবের সামনে মুখো-মুখি আজ সে দাঁড়িয়ে।

সংসারে আজ যখন আপনার জন কেউ নেই, তখন তার পক্ষে এমনি সুযোগটাকে অস্বীকার করবার মত বাতুলতা আর কি থাকতে পারে।

তাই মিনতি নিজেই মল্লিকাকে বোঝাবার চেষ্টা করে।

কিন্তু মল্লিকার সেই এক কথা।

ও লাইনে মিনতিকে সে যেতে দেবে না।

মিনতি বলে, তবে আমিই বা কি করবো বলো?

তোর আমি বিয়ে দেবো মিনু!

কি বললে? মিনতি চমকে উঠে বলে, বিয়ে! না দিদি, আর বিয়ে নয়। তাছাড়া বিয়ে তো আমার একবার হয়ে গিয়েছে—

সে আবার একটা বিয়ে নাকি!

সেটা অন্যের চোখে বিয়ে কিনা জানিনা তবে আমার স্বামী সেই।

অবাক বিস্ময়ে তাকায় মল্লিকা কথাটা শুনে মিনতির মুখের দিকে!

মিনু—

হ্যাঁ দিদি, বিয়ে আর আমার হতে পারে না। আর আমার ধারণা যে আজও তিনি বেঁচে আছেন। এবং তাঁর দেখাও একদিন আমি পাবোই। লক্ষ্মীটি, তুমি আর অমত করো না চাকরিটা আমাকে নিতে দাও।

বেশ। তাহলে যা তোর মন চায় কর। আমি আর কি বলবো।

না. তোমাকে সন্তুষ্ট মনে মত দিতে হবে।

বললাম তো যা—

উহুঁ! ওরকম করে না। হাসি মুখে বলো তুমি!

বিরক্ত করিস না মিনু, যথেষ্ট ভালো মন্দ বুঝবার তোর বয়স হয়েছে। যা ভাল বুঝবি করবি!

বেশ, তাহলে সেইটুকু ভেবেই সম্মতি দাও দিদি।

মল্লিকা আর কোন জবাব দেয় না।

দু'হাতে মল্লিকাকে জড়িয়ে ধরে মিনতি বলে, ভয় নেই তোমার দিদি একটি মাত্র পুরুষই জীবনে আমার এসেছে, সেই প্রথম ও সেই শেষ। এইটুকু মিনতির পরে তুমি বিশ্বাস রাখতে পারো।

।। এগারো ।।

মিনতির জীবনের সেটা যেন চতুর্থ পর্যায়।

প্রথম জীবনটা কেটেছে নিজেদের বাড়িতে এক গণ্ডগ্রামে, প্রতিটি দিন ও রাত্রি এক হতভাগিনী মুখ চোরা বিধবা মায়ের পাশে পাশে, দুঃখ বেদনা, হতাশা ও অপমানের জ্বালায়।

তারপর সহসা এক নিশি রাত্রে উল্কার মতই ছিটকে সেই মৃত্যু আবেষ্টনীর থেকে বের হয়ে এলো। এবং মা গেল সেই মুহূর্তে হারিয়ে চিরকালের মতই! এলো সরোজিনী আর সেই সঙ্গে গোপন কুৎসিত লালসার জাল বিস্তার।

জীবনের দ্বিতীয় পর্যায়। কাটলো আরো চারটি বছর। সহসা আবার এলো একটি রাত। এবারও রাত বটে তবে অন্ধকার নয়। শুধু আলো আর আলো।

কিন্তু এত আলো তবু যে কি কালঘুম দু'চোখের পাতায় নেমে এলো সে রাত্রে, ঘুম ভাঙতেই দেখলো সব শূন্য, সব ফাঁক।

জীবনের সেই একটি আলো-ঝরা রাতের জ্যোতির্ময় পুরুষটি প্রভাতের আলোয় কোথায় যেন হারিয়ে গিয়েছে, মিলিয়ে গিয়েছে।

আবার জীবনের পৃষ্ঠা ওল্টালো মিনতির।

জীবনে এলো রতিকান্ত ও মল্লিকা।

এবং আরো চার বছর পরে এক সন্ধ্যায়, বালীগঞ্জ সারকুলার রোডের একটি বিরাট গেটওয়ালা, একতলা বাংলো প্যাটার্নের বাড়ির গেট দিয়ে প্রবেশ করে সুসজ্জিত পারলারে রতিকান্তর সঙ্গে সঙ্গে গিয়ে প্রবেশ করলো মিনতি।

মৌরীপুর ষ্টেটের কুমার বাহাদুর সুকোমল চৌধুরীর কলকাতার বাড়ির চারিদিকে রাজকীয় রুচি আর আভিজাত্যের প্রকাশ।

গদী আঁটা সোফার 'পরে বসে দু'জনে অপেক্ষা করে।

একটু পরে কুমার সাহেব এসে ঘরে ঢুকলো।

পরিধানে পায়জামা ও হাইকলারের ঢোলা হাতা, হাঁটু পর্যন্ত ঝুল পাঞ্জাবী, পায়ে চপ্পল। ওষ্ঠে ধরা দামী সিগারেট।

মাথার চুল তেমনি এলোমেলো তৈলহীন রুক্ষ।

চোখে সেই অন্তর্ভেদী অথচ যেন নেশায় ঢুলু ঢুলু দৃষ্টি!

পুরুষের কণ্ঠস্বর জীবনে অনেক শুনেছে মিনতি কিন্তু কুমার সাহেবের মতন কণ্ঠস্বরের অমন বৈশিষ্ট্য জীবনে কমই সে শুনেছে!

সেই সন্ধ্যায়ই এগ্রিমেন্ট সই হয়ে গেল চৌধুরী পিকচার্সের সঙ্গে আপাততঃ একবছরের এক্সক্লুসিভ আর্টিষ্ট হিসাবে এবং অগ্রিম ৫০১ টাকাও মিনতি পেল।

আর সেই দিনের এগ্রিমেন্ট করবার সময় কুমার সাহেব বললে, ফিল্মে মিনতি নামটা তার চলবে না।

তার নতুন নামকরণ করলো কুমার সাহেব : মিতা রায়। এবং দিন সাতেক বাদে কাগজে প্রথম বিজ্ঞপ্তি পড়লো। চৌধুরী পিকচার্সের নবতম অবদান : বহ্নিশিখা। প্রধান ভূমিকায় নবাগতা মিতা রায়।

জীবনে চতুর্থ পর্যায়ে পা দিল মিনতি নয় মিতা রায়।

সুকোমল চৌধুরীর নিজস্ব স্টুডিও ফ্লোর।

বিরাট হোটেলের অভ্যন্তরের একটি সেট্ পড়েছে।

একটা বিরাট গ্যাঙের দ্বারা বালিকা বয়সে অপহৃত একটি মেয়ে, যৌবনে আজ তার অসামান্য রূপ—সেই আজ দলের অন্যতমা নেত্রী।

অন্ধকার সমাজে স্বচ্ছন্দ-বিহারিনী সেই তরুণী আজ ঐ হোটেলে এসেছে আভিজাত্যর মুখোস এঁটে কোন একটি হতভাগা ধনী যুবকের সর্বনাশ সাধনে। সেই দৃশ্যর-ই টেকিং।

সুটিং দেখতে আজ যারা সেটে উপস্থিত তারা অবাক বিস্ময়ে দেখছিল, অসামান্য রূপসী নবাগতা অভিনেত্রী মিতা রায়ের দিকে চেয়ে চেয়ে।

টেকিংয়ের পূর্বে পাখীপড়ার মতই পড়িয়ে ও অভিনয় করিয়ে বুঝিয়ে দেয় পার্টটা কুমার সাহেব মিতাকে।

তারপরই কুমার সাহেবের কণ্ঠস্বর শোনা যায়, লাইট রেডি, ক্যামেরা রেডি, সাউণ্ড—

স্টুডিওর বাইবে সাউণ্ড ভ্যান থেকে সাউণ্ড ইঞ্জিনীয়ারের কণ্ঠস্বব ভেসে এলো, ও, কে!

সাইলেন্স প্লিজ! অল লাইটস্—

নিস্তব্ধ চাবিদিক। সুঁচ পতনের শব্দটিও বুঝি শোনা যায়।

প্রখর শক্তিশালী বিদ্যুৎ বাতির উত্তাপে যেন আগুনের হলকা ছড়ায়।

ক্ল্যাপস্টিকে সিকোয়েন্স, সিন নাম্বার, টেক নাম্বার ও বইয়ের নাম লিখে এ্যাসিসটেণ্ট ডাইরেকটর ক্যামেরার সামনে এগিয়ে যায়।

স্টার্ট ক্যামেরা।

এ্যাসিসটেণ্ট বলে, 'বহ্নিশিখা' সিন নাম্বার সিকস্টিন, টেক ওয়ান।

ক্যামেরা চলতে থাকে।

মিনিট চারেক বাদ ডাইরেকটার বলে, কাট! লাইটস্ অফ্।

বিচিত্র অভিজ্ঞতার অনুভূতি নিয়ে বাসায় ফিরে এলো মিতা।

সারাটা রাত মিতা দু'চোখের পাতা এক করতে পারে না। স্টুডিওর টেকিংয়ের সময় চোখ ঝলসানো আলো, ডাইরেকটর সুকোমল চৌধুরীর টুকরো টুকরো কথা, কর্মব্যস্ততার মধ্যেও বিচিত্র একটা স্তব্ধতা—সব কিছু যেন তার মনটা জুড়ে থাকে।

মল্লিকাদির ইচ্ছা ছিল না সে ফিল্মে নাম লেখায়, সে অভিনেত্রীর জীবন পেশা হিসাবে গ্রহণ করে।

কে জানে সে ভুল করলো কি না!

ভুলই করুক আর যাই করুক জীবনে এইখানে এসে আজ তার থেমে থাকলে চলবে না। এগিয়ে তাকে যেতেই হবে। পশ্চাতের অন্ধকারে আর সে ফিরে তাকাবে না। কোন সান্ত্বনা কোন স্মৃতিই আজ নেই তার ফেলে আসা জীবনের কোথায়ও।

শুধু অস্পষ্ট একখানি মুখ। কিন্তু সে মুখও আজ তার ভুলতে হবে।

আর কেনই বা সে ভুলবে না।

সে যখন তাকে এমনি করে ত্যাগ করে চলে গেছে, একটিবার তার কথা ভাববারও প্রয়োজন বোধ করেনি, তখন সেই বা কেন তার স্মৃতি বুকের মধ্যে জিইয়ে রাখবে আজও।

কিন্তু আশ্চর্য! কথাটা ভাবতে গিয়েও যেন বুকটার ভিতর টনটন করে ওঠে কি এক ব্যথায়। সমস্ত মন বিদ্রোহী হয়ে উঠতে চায় সমাজ ও তার নীতি ও আইনের বিরুদ্ধে।

কেন, কেন তার বিবাহটা সমাজ মেনে নেবে না।

কেন তার বিবাহটা ছেলেখেলা মাত্র।

সে তো সর্বান্তঃকরণেই সে রাতে তার স্বামীকে গ্রহণ করেছিল।

মন্ত্রর কি অর্থ তা সে জানে না। আর তার অর্থ দিয়েও কোন প্রয়োজন নেই তার, সেই মুহূর্তে আর অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে যে মন্ত্র আপনা হতেই উচ্চারিত হয়ে উঠেছিল সেতো মিথ্যা নয়।

তার মধ্যে তো এতটুকু ফাঁকিও সেদিন ছিল না তার দিক থেকে।

তবে কেন হবে তাদের বিবাহটা মিথ্যে! কেন হবে সবটাই একটা ছেলেখেলা। তাছাড়া তার স্বামী। হ্যাঁ স্বামী বৈকি? তিনিও তো সে রাত্রে অকপটেই স্বীকার করেছিলেন জীবনে সেই তাঁর একমাত্র নারী।

আর অন্য কোন নারীই জীবনে তাঁর আসবে না। সেই তার স্ত্রী।

তবু মনের মধ্যে কোথায়ও কোন জোরই যেন পায় না মিতা। প্রচণ্ড একটা হাহাকারে বুকটা যেন গুমরে গুমরে উঠতে থাকে।

•

দিন আসে যায়।

স্টুডিও জীবনের বৈচিত্র্যের আস্বাদটা যেন থিতিয়ে আসে। এবং যত বইটা সমাপ্তির পথে এগিয়ে আসে, ততই যেন মনের মধ্যে একটা ভয়, একটা আশংকা দোলা দিতে থাকে।

কে জানে তার অভিনয় লোকে কি ভাবে নেবে।

এখনো পর্যন্ত কি সে করলো বা না করলো কিছুই বুঝতে পারেনি।

সুকোমল চৌধুরীর মুখের দিকে তাকিয়েও কিছুই বুঝবার উপায় নেই। অসম্ভব রকম গম্ভীর মানুষটা! যেন একটা মেসিনের মতোই মনে হয়।

স্টুডিওর মধ্যে সকলেই অল্পবিস্তর গল্প করে তার সঙ্গে। ভাবও হয়েছে ইতিমধ্যে অনেকের সঙ্গে। কেবল যেন আজও দূরের মানুষ থেকে গিয়েছে ঐ সুকোমল চৌধুরী। অদ্ভুত একটা আভিজাত্যের স্বাতন্ত্র্যবোধে যেন সুকোমল চৌধুরীকে স্টুডিওর সবার থেকে চিহ্নিত করে রেখেছে সর্বদা!

রুক্ষ চুল, প্রশস্ত ললাট, বুদ্ধিদীপ্ত দু'টি চক্ষুর স্থির অনুসন্ধানী দৃষ্টি। উন্নত নাসা। দৃঢ়বদ্ধ ওষ্ঠ। ধারালো চিবুক।

লোকটির মুখের দিকে তাকালেই যেন মনের মধ্যে শ্রদ্ধা ও ভয় একসঙ্গে জাগে। ওর শরীরের ধমনীতে যে রাজরক্ত প্রবাহিত সেটা যেন ওর সংযত কথাবার্তা, চালচলন ও গাম্ভীর্য সব কিছুর ভিতর দিয়েই সুপ্রকাশ।

দীর্ঘ চারমাস একটানা সুটিং হবার পর সেদিন ঠিক প্যাক আপের পূর্ব মুহূর্তে সুকোমল চৌধুরী মিতার সামনে এসে দাঁড়ালো।

কেমন অভিনয় করলে ছবিতে দেখবে নাকি মিতা ?

কেমন করে দেখবো! মিতা যেন অসহায় দৃষ্টি তুলে তাকালো। সুকোমল চৌধুরীর মুখের দিকে।

এখুনি প্রজেকশন রুমে প্রথম পাঁচটা রীল প্রজেকশন করে দেখা হবে, দেখতে চাও তো দেখতে পারো।

নিশ্চয়ই দেখবো।

স্টুডিওর নিজস্ব প্রজেকশন রুম।

ঘরের দরজা বন্ধ করে আলো নিভিয়ে প্রজেকশন শুরু হলো।

মিতার বুকের মধ্যে সে সময় কি এক অসহ্য কাঁপুনি। পাশেই বসে তার অন্ধকারে সুকোমল চৌধুরী! এত কাছাকাছি সুকোমল চৌধুরীর কখনো মিতা বসেনি। আজ এই প্রথম! অন্ধকার ঘরের মধ্যেও যেন মিতা লোকটির উপস্থিতি অনুভব করে।

অন্ধকারে সুকোমল চৌধুরীর জ্বলন্ত সিগ্রেটের রক্তাভ অগ্রভাগটা চুণির মত জ্বল জ্বল করে যেন জ্বলছে।

সিগারেটের গন্ধর সঙ্গে একটা পাতলা মিষ্টি সেন্টের গন্ধ মেশামেশি হয়ে ওর সমস্ত ঘ্রাণেন্দ্রিয়কে যেন অবশ আচ্ছন্ন করে দেয়।

অবাক বিস্ময়ে অদূরস্থিত রুপালী পর্দার বুকে প্রতিফলিত সঞ্চরণশীল নিজের ছায়াটা দেখছিল মিতা।

বিশেষ করে যে সব দৃশ্যে সুকোমল চৌধুরীর সঙ্গে সঙ্গে সে অভিনয় করছে। গরীব আত্মভোলা চিত্রশিল্পীর ভূমিকায় নেমেছে সুকোমল চৌধুরী আর তার স্ত্রীর ভূমিকায় অভিনয় করছে সে।

ধনীর দুলালী, শিক্ষিতা প্রগলভা, হৃদয় বলে সত্যিকারের কোন বস্তু নেই যার। নেহাৎ খেয়ালে আর মোহের বশে একদিন যে ভালবাসার মালা দুলিয়ে দিয়েছিল শিল্পী অরুপের গলায়। আজ তার সেই ভুল বুঝি ভেঙে গিয়েছে, দারিদ্র আর অভাবের নিষ্ঠুর বাস্তব আঘাতে। মেজাজ তার আজ তাই রুক্ষ হয়ে উঠেছে। প্রতি পদে পদে আজ তাই সংঘাত!

অথচ মৌনী শিল্পীর সেজন্য কোন ক্ষোভ নেই।

রাগের মাথায় সেদিন প্রায়-সমাপ্ত একখানি তৈল-চিত্র নিষ্ঠুর জিঘাংসায় নষ্ট করে দিয়েছে মীনা।

একি করলে মীনা, আমার এতদিনকার চেষ্টা এমনি করে তুমি নষ্ট করে দিলে ?

ক্ষিপ্তা মীনা জবাব দেয়, বেশ করেছি, আগুন জ্বালিয়ে সব পুড়িয়ে ছাই করে দেবো।

কিন্তু কেন! কেন তা তুমি করবে ?

আমার ইচ্ছা, আমার খুশি! বলতে বলতে মীনা সামনের টেবিল থেকে

পেন নাইফটা তুলে প্যাশের ক্যানভাসটার দিকে এগিয়ে যাবার চেষ্টা করতেই অরূপ মীনার হাতটা চেপে ধরে বাধা দেয়।

বলে, না—

কিন্তু মীনা তখন যেন ক্ষেপে গিয়েছে। এক ঝটকা দিয়ে অরূপের মুঠি থেকে নিজের কব্জীটা ছাড়িয়ে নেয়। তারপর আবার এগিয়ে যেতেই বাঘের মতই যেন গর্জন করে ওঠে অরূপ, দাঁড়াও মীনা—

মীনা তথাপি কোন ভ্রূক্ষেপ করে না। ছুটে গিযে ক্যানভাসটা হাতে তুলে নিতেই অরূপ ঝাঁপিয়ে পড়ে মীনাকে এক ধাক্কা দেয়। ছিটকে পড়ে যায় মীনা। এবং পড়ে যাবার সময় ত্রি'পয়ের পরে রক্ষিত রংয়ের জলের টামলারটা তার কপালে এসে পড়লো।

চিৎকার করে কেঁদে ওঠে মীনা। রাস্কেল, ব্রুট—

সঙ্গে সঙ্গে ঘরের আলো জ্বলে ওঠে। প্রজেকশন ঐ পর্যন্তই।

প্রজেকশন শেষ হলো যখন, রাত নয়টা বাজে প্রায়।

॥ বারো ॥

কুমারের বিরাট প্লিমাউথ গাড়িতেই ফিরছিল ওরা দুজনে স্টুডিও থেকে। পিছনের সীটে পাশাপাশি দু'জনে বসে। কারো মুখেই কোন কথা নেই। অনেকক্ষণ পরে সুকোমল চৌধুরী মৃদু কণ্ঠে বল্লে, কেমন লাগলো নিজের ছবি তোমার!

আপনার কেমন লাগলো!

তোমার ভিতর অভিনয়ের স্পার্ক আছে মিতা! নিষ্ঠা রাখতে পারো যদি আমার মনে হয় একদিন স্বীকৃতি পাবে তুমি।

সবই আপনার কৃতিত্ব।

সব নয়, কিছুটা তোমারও আছে।

আর কোন কথা হয়নি সে রাত্রে ফিরতি পথে গাড়িতে।

সামান্য কিছু প্যাচ্ ওয়ার্ক বাকী ছিল। সে কাজ যেদিন শেষ হলো সেদিন ফ্লোরে সুকোমল চৌধুরী উপস্থিত ছিল না। তার এ্যাসিসটেণ্ট অবনী মজুমদারই ডাইরেকশন দিচ্ছিল।

কাজ শেষ হবার পর বিদায়ের পূর্ব মুহূর্তে মিতাই অবনীকে জিজ্ঞাসা করলো, মিঃ চৌধুরীকে আজ ফ্লোরে দেখলাম না!

না, তিনি আসেন নি। কুমার সাহেব কয়দিন থেকে অসুস্থ।

অসুস্থ! কি হয়েছে?

তা জানি না। তবে শুনেছি সাত আটদিন বাড়ি থেকে বের হন না।

ফিরতি পথে ট্যাকসীতে বসে হঠাৎ মিতার মনে হয়, সুকোমল চৌধুরীর একটা খোঁজ নিয়ে যাওয়া তার উচিত। তাঁরই দয়ায় তার চাকরি। তাঁর অসুস্থতার সংবাদ পেয়েও সে কোন খোঁজ খবর নেয়নি শুনলে হয়তো তিনি কিছু ভাবতে পারেন।

সঙ্গে সঙ্গে মিতা ড্রাইভারকে নির্দিষ্ট ঠিকানায় যাবার জন্য নির্দেশ দিল।

কিন্তু নির্দিষ্ট বাড়ির গেট দিয়ে ট্যাক্সী প্রবেশ করে পোর্টিকোর নিচে এসে দাঁড়াতেই মিতার ক্ষণ পূর্বের সমস্ত উৎসাহ যেন দপ্ করে সহসা নিভে যায়।

গাড়ি থেকে নেমে ট্যাক্সী ড্রাইভারকে অপেক্ষা করতে বলে দু'পা এগিয়ে গিয়েও পোর্টিকোর নিচে সে দাঁড়িয়ে যায়।

না ভেবে চিন্তে ঝোঁকের মাথায় হঠাৎ এখানে তার চলে আসাটা ভালো হলো কিনা কে জানে। মনে হয় ফিরেই সে যায়।

এগুতেও পারে না পিছুতেও পারে না। সে এক বিশ্রী অবস্থা।

সহসা ঐ সময় ড্রয়িংরুম থেকে একটি ভৃত্য পোর্টিকোয় এসে অন্ধকারে মিতাকে ঐভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে প্রশ্ন করে, কে, কে ওখানে?

আমি।

খুট করে সুইচ টেপার শব্দ হয়। পোর্টিকোর আলোটা জ্বলে উঠলো।

কে আপনি! কাকে চান?

কুমার সাহেব আছেন?

আছেন, কিন্তু—

তাঁকে একটু খবর দিতে পারো, ষ্টুডিও থেকে মিতা রায় এসেছে—

আপনি ভিতরে গিয়ে বসুন, খবর দিচ্ছি।

মিতাকে ড্রয়িংরুমে বসিয়ে ভৃত্য ভিতরে চলে গেল।

আবার মনে হয় মিতার, চলে গেলেই বোধ হয় ভাল হতো। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে মনে হয়, এতদূর এসে খবর দেবার পর চলে গেলে ব্যাপারটা বিশ্রী হবে।

একটু পরেই ভৃত্য এসে আহ্বান জানালো, আসুন—

সিঁড়ি দিয়ে উঠে দোতলায় একটা আলোকিত পর্দা ফেলা ঘরের দরজার সামনে দাঁড়িয়ে, ইংগীত করে ভৃত্য বলে, যান ভিতরে।

বারেকের জন্য বুঝি মিতা ইতঃস্তত করে। তারপরই কম্পিত পদে পর্দা তুলে ঘরে প্রবেশ করেই থমকে দাঁড়িয়ে যায় মিতা।

দামী আসবাব পত্রে সুসজ্জিত একটি কক্ষ।

মেঝেতে দামী কার্পেট বিছানো।

একটা সোফার উপর বসে সুকোমল চৌধুরী। সামনে একটা গোল টেবিলের উপর ড্রিংকের সব সাজ সরঞ্জাম।

গায়ে কিমোনো সোফার উপর বসে সুকোমল চৌধুরী।

মাথার চুল রুক্ষ।

কি খবর মিতা, এসো—

মিতা ঘরের মধ্যে এগিয়ে এলো।

পাশেই একটা শূন্য সোফা দেখিয়ে সুকোমল চৌধুরী পুনরায় সাদর আহ্বান জানালো, এসো, বোস—

ভীরু হরিণীর দৃষ্টি যেন ফুটে ওঠে মিতার দু'চোখের তারায়। অন্যদিক দৃষ্টি ফিরিয়ে নেয় মিতা। এগিয়ে যাবে কি যাবে না ভাবতে ভাবতেই আবার তাকায় সুকোমল চৌধুরীর দিকে।

এসো মিতা!

নরম কার্পেটের উপর পা ফেলে ফেলে সত্যি সত্যিই এবারে গিয়ে নির্দিষ্ট সোফার উপর বসলো মিতা। ঘামচে তখন তার সর্বাঙ্গ।

এ সে কি করলো। এখানে সে মরতে এলো কেন!

সহসা ঐ সময় ঘরের কোণে মিতার নজর পড়তেই দৃষ্টি তার যেন আর ফিরতে চায় না। ট্যান করা বিরাট একটা রয়েল বেঙ্গল টাইগার।

চার পায়ে মুখ ব্যাদান করে এই দিকেই তাকিয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

চোখের কাচ খণ্ড দুটো জ্বল জ্বল করে জ্বলছে আলোয়।

ও বাঘটা আমিই আসামের জঙ্গলে একবার শিকার করেছিলাম।

ম্যান-ইটার—তিন তিনটে মানুষকে ও শেষ করেছিল।

নিজের অজ্ঞাতেই আবার সুকোমল চৌধুরীর চোখের সঙ্গে তার দৃষ্টি মিলিত হলো।

আপনি বুঝি শিকার করেন?

এখন আর করিনা, তবে প্রথম যৌবনে করতাম। অনেক করেছি। মৃদু হেসে জবাব দিল সুকোমল চৌধুরী।

কথাটা বলে পাশের কলিং বেলটা টিপল কুমার।

পূর্বোক্ত ভৃত্য এসে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করলো।

চা নিয়ে আয়—

না, না—এখন চায়ের প্রয়োজন নেই।

তবে কি খাবে বলো! এনি কোল্ড ড্রিংক!

না

একেবারে কিছুই খাবে না!

ভৃত্য তখনো অপেক্ষা করে দাঁড়িয়ে আছে। মিতা যেন কেমন বিব্রত বোধ করে। ভৃত্যের দিকে চেয়ে বলে, কিছুর দরকার নেই, যাও।

ভৃত্য চলে গেল।

আমাদের এ বইটা সামনের মাসেই রিলিজ হচ্ছে, শুনেছো বোধ হয়! কুমার বলে।

না তো!

হ্যাঁ, আমাদের নেক্সট প্রোডাকশন সামনের মাসের গোড়াতেই শুরু হবে। অবনীকে আমি বলে দিয়েছি স্ক্রিপট্‌টা তোমাকে একবার এর মধ্যে শুনিয়ে দিতে।

এবারেও বুঝি গল্প আপনারই লেখা!

না একজন অনামা নতুন লেখকের লেখা গল্প। দু চারটে গল্প মাত্র বের হয়েছে এদিক ওদিক মাসিক ও সাপ্তাহিকে। তারই একটা গল্প আমি কিনেছি।

ঐ সময় সহসা চুড়ির মৃদু শব্দে চোখ তুলে তাকাতেই মিতার অপূর্ব সুন্দরী এক ২৫।২৫ বৎসর বয়স্কা নারীর সঙ্গে চোখা চোখি হলো।

পরিধানে দামী শাড়ী, গা ভর্তি গহনা। দরজার গোড়াতেই দাঁড়িয়ে।

কি চাও রমা।

ইনি কে?

ও মিতা রায়, আমার বইয়ের নতুন হিরোয়িন। মিতা এ আমার স্ত্রী, রমলা।

মিতা হাত তুলে নমস্কার জানায় কুমারের স্ত্রীকে।

এবং এতক্ষণে সর্বপ্রথম যেন এ বাড়িতে পা দেওয়া অবধি, মিতা একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস নেয়। বুকের ভিতটা যেন হালকা বোধ করে।

কুমার সাহেবের স্ত্রী আর ঘরের মধ্যে দাঁড়ালো না। পরক্ষণেই তীব্র দৃষ্টিতে বারেক মাত্র মিতার দিকে তাকিয়ে ঘর থেকে বের হয়ে গেল, মিতার নমস্কারের কোন প্রত্যুত্তর বা স্বীকৃতি না দিয়েই।

মিতা যেন কেমন স্তম্ভিত হয়ে যায়।

উনি চলে গেলেন কেন?

ওর কথা বলো না মিতা, ওর না আছে কোন কালচার না আছে কোন শিক্ষা।

আমি তাহলে এবার উঠি—

উঠবে? কিন্তু কেন এসেছিলে তাতো বললে না!

না সে তেমন কিছু নয়। অবনীবাবুর মুখে শুনলাম আপনি অসুস্থ তাই খোঁজ নিতে এসেছিলাম। বলতে বলতে মিতা ততক্ষণে যাবার জন্য প্রস্তুত হয়ে উঠে দাঁড়িয়েছে।

চপ্পলটা পায়ে গলাতে গলাতে সুকোমল চৌধুরীও উঠে দাঁড়ায়। বলে, চল তোমাকে পৌঁছে দিয়ে আসি—

না, না—তার কোন প্রয়োজন হবে না। নিচে ট্যাক্সী আমি দাঁড় করিয়েই রেখেছি, চলে যেতে পারবো।

তা হোক! ট্যাক্সী ছেড়ে দেবে চল, আমিই তোমাকে পৌঁছে দিয়ে আসবো! তুমি একটু অপেক্ষা করো আমি আসছি।

মিতাকে কোনরূপ প্রত্যুত্তরের অবকাশ মাত্রও না দিয়ে বের হয়ে গেল ঘর থেকে সুকোমল চৌধুরী।

মিতা আবার সোফার ওপর বসে পড়ে। সোফায় বসে অন্যমনস্ক মিতা সুকোমল চৌধুরীর স্ত্রী রমলা দেবীর কথায় ভাবছিল!

ভদ্রমহিলা ঘরের মধ্যে ঢুকেই তার নমস্কার করা সত্ত্বেও কোন প্রতি-নমস্কার না জানিয়েই অমন করে বের হয়ে গেলেন কেন ঘর থেকে।

কেন তুমি এসেছো এখানে?

সহসা ঠিক পিছনেই ক্ষণমুহূর্তে শ্রুত নারীকণ্ঠ শুনে যেন ভূত দেখার মতই চমকে ফিরে তাকায় মিতা।

ঠিক তার সোফার পশ্চাতেই দাঁড়িয়ে রমলা!

কখন যে সে তার সোফার পশ্চাতে এসে দাঁড়িয়েছে টেরও পায়নি সে।

চোখ তো নয় দুখণ্ড অঙ্গারের মতই জ্বলছে রমলার চোখের মণি দুটো।

ভেবেছো ও তোমাকে মাথায় করে নাচবে, তাই না! ভুল! ভুল করেছো

তাহলে। সখ মিটে গেলেই তোমাকে ও ঠেলে সরিয়ে দেবে! চিনতেও তখন পারবে না—কথাগুলো বলেই আর দাঁড়ালো না রমলা, ঘর থেকে বের হয়ে গেল অন্য দ্বারপথে।

স্তম্ভিত মিতা পাথরের মতই যেন জমাট বেঁধে সোফার উপর বসে থাকে।

তারও মিনিট দুই বাদে ঘরে এসে ঢুকলো সুকোমল চৌধুরী। পায়জামার উপরে একটা পাঞ্জাবী চাপিয়ে এসেছে মাত্র।

চলো মিতা! কুমার আহ্বান জানায়।

যান্ত্রিক পুতুলের মতই উঠে দাঁড়ালো মিতা।

বাড়িতে ফিরতে সে দিন একটু রাতই হয়ে গিয়েছিল মিতার।

এবং মিতাকে দরজার গোড়াতে নামিয়ে দিয়েই চলে গিয়েছিল সুকোমল চৌধুরী। তারপর মাসখানেক আর দেখা হয়নি মিতার সঙ্গে সুকোমল চৌধুরীর।

সংবাদপত্র মারফৎই জেনেছিল মিতা, সুকোমল চৌধুরী তার পরবর্তী বইয়ের লোকেশনের জন্য মনিপুর অঞ্চলে গিয়েছে।

ওদিকে যথা সময়ে মিতার প্রথম বই হাউসে রিলিজ হলো এবং বই রিলিজ হওয়ার সঙ্গেই মিতা যেন বেশ কিছুটা জনগণের চিত্ত জয় করে নিল।

চারিদিকে কাগজে মিতাকে নিয়ে প্রচুর সমালোচনা হলো। চিত্রজগতে নবোদিত তারকা মিতা রায়। তার মধ্যে আছে নাকি প্রচুর সম্ভবনার ইংগীত।

হাউসে বই রিলিজ হবার হপ্তা দুই পরে একদিন দ্বিপ্রহরে স্টুডিয়োর গাড়ি এলো মিতাকে নিতে।

॥ তেরো ॥

মল্লিকার পাশে শুয়ে মিতা মল্লিকার সঙ্গে গল্প করছিল। এমন সময় ভৃত্য এসে জানাল, স্টুডিও থেকে গাড়ি এসেছে মিতাকে নিয়ে যেতে।

একটু যেন বিস্মিত হয়েই মিতা ড্রাইভারকে প্রশ্ন করে জানতে পারলো, ডিরেক্টার সাহেব নিজে তার গাড়ি পাঠিয়েছেন। হয়তো নতুন বই সংক্রান্ত কোন ব্যাপারেই সুকোমল চৌধুরী ডেকে পাঠিয়েছে। তাড়াতাড়ি সাজ গোজ করে মিতা প্রস্তুত হয়ে এসে গাড়িতে উঠে বসলো।

সুকোমল চৌধুরী বলেছিলো বটে তার এ্যাসিস্‌টেন্ট ইতিমধ্যে একদিন এসে নতুন বইয়ের স্ক্রিপট্‌টা শুনিয়ে যাবে। কিন্তু অবনী আসেনি।

মিতা এখনো জানে না পরবর্তী বইয়ে তার কি ধরণের রোল। কাগজে অবশ্যি বিজ্ঞাপন দেখেছিল মিতা, সুকোমল চৌধুরী শীঘ্রই তার নতুন বই শুরু করবে। কিন্তু মিতা একটু আশ্চর্যই হয় যখন পরিচিত স্টুডিওর বদলে অন্য স্টুডিওতে গিয়ে গাড়ি প্রবেশ করে।

সে ড্রাইভারকে জিজ্ঞাসা করে, এ কোন স্টুডিওতে এলে ড্রাইভার?

ড্রাইভার জবাব দেয়, সাহেব এখানেই আছেন।

নতুন স্টুডিও।

গাড়ি থেকে নামতেই সুকোমল চৌধুরীর এ্যাসিসটেণ্ট অবনী এগিয়ে এলো, আসুন মিস্ রয়, মিঃ চৌধুরী ডাইরেক্টরস রুমে আছেন।

লম্বা ব্যারাকের মত রাস্তার ডানদিকে পর পর সব ছোট ছোট ঘর। স্টুডিওতে বর্তমান যে যে ডাইরেক্টর কাজ করছেন তাদের জন্য প্রত্যেকের আলাদা আলাদা ঘর। ঘরের দরজায় নেমপ্লেটে ডাইরেক্টারের নাম ও বইয়ের নাম লেখা।

অবনীর সঙ্গে একেবারে শেষ প্রান্তের ঘরটিতে গিয়ে প্রবেশ করলো মিতা পর্দা তুলে। ঘরের মধ্যস্থলে একটি টেবিল। ঘরের দরজার মুখোমুখি বসেছিলো সুকোমল চৌধুরী একটা চেয়ারে। তার পাশে দুটো চেয়ারে দু'জন মধ্যবয়েসী অজানা ভদ্রলোক বসে। একজনের বেশ ভূষা দেখলেই বোঝা যায় তিনি মাড়োয়ারী। অন্যজনের পরিধানেও দামী সুট।

মিতা ঘরে প্রবেশ করতেই একটা খালি চেয়ার নির্দেশ করে কুমার সাহেব তার স্বভাবসিদ্ধ গম্ভীর গলায় বলে, বোস মিতা!

নমস্তে মিতা দেবী!

মাড়োয়ারী ভদ্রলোক নমস্কার জানালো।

নমস্তে। মৃদুকণ্ঠে মিতা জবাব দেয় চেয়ারে বসতে বসতে।

দ্বিতীয় ভদ্রলোকটিও নমস্কার জানালো।

এবার সুকোমল চৌধুরীই কথা বলে, মিতা, ইনি হচ্ছেন রামদাস চামেরীয়া। এঁর সঙ্গেই আমি আমার পরবর্তী বইয়ের কনট্রাক্ট সই করেছি। এঁদের ইচ্ছা তুমিই এঁদের বইতে হিরোয়িন থাকো। আমার বইতে যে রেমিউনারেশন পেয়েছ এঁরা তাই দেবেন।

মিঃ চামেরীয়া তাড়াতাড়ি সায় দিয়ে ওঠেন, চৌধুরী সাবকে দিয়ে আমরা আরো দুটো বই করবো। সব বইতে আপনি থাকবেন। তিনটি বইয়ের জন্যই আপনার সঙ্গে আজ আমরা কনট্রাক্ট সই করিয়ে নিতে চাই--

তিন তিনটে বইয়ের এক সঙ্গে কনট্রাক্ট—

বিহ্বল কৃতজ্ঞ দৃষ্টিতে তাকায় মিতা সুকোমল চৌধুরীর দিকে।

কি জবাব দেবে সে ভেবে পায় না।

সহসা সুকোমল চৌধুরী কথা বলে ওঠে, না মিঃ চামেরীয়া তিনটে বইয়ের একত্রে কনট্রাক্ট হবে না। মাত্র একটি বইয়ের জন্যই আপাততঃ উনি কনট্রাক্ট করবেন। সেই মতই কনট্রাক্ট সই করিয়ে নিন।

দ্বিতীয় ভদ্রলোকটি এবার কথা বললেন, আমরা মিতাদেবীকে এক্সক্লুসিভ আর্টিষ্ট করে নিতে চাই তিন বছরের জন্য। সেজন্য উনি কি মাইনে মাস মাস এক্সপেক্ট করেন তাই না হয় বলুন না।

বেশ তো উনি যদি তাতে রাজী থাকেন তো সই করুন। কুমার সাহেব এবার বলে।

মিতা সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবাদ জানায়, না, কুমার সাহেব যা বলেছেন তাই হবে। আমি একটা বইয়ের জন্যই সই করবো।

অতঃপর মাড়োয়ারী ভদ্রলোক, তার বন্ধু পরস্পরের সঙ্গে চোখ চাওয়া

চাওয়ি করে বললেন, বেশ তবে তাই হোক।

হাজার এক টাকা নগদ দিয়ে মাস মাস পাঁচ শত টাকা মাইনা হিসাবে তখুনি কনট্রাক্ট সই হয়ে গেল।

কনট্রাক্ট সই হতে হতে ওদিকে সন্ধ্যা হয়ে গিয়েছিল।

সুকোমল চৌধুরী মিতাকে সঙ্গে নিয়ে এসে তার গাড়িতে উঠলো। পাশাপাশি দুজনে বসে।

চল আমাব বাড়ি থেকে চা খেয়ে যাবে। কুমার বলে মিতাকে।

কুমাব সাহেবের বাড়িতে যাবাব কথায় মিতার সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ে ওর স্ত্রী রমলা দেবীর কথা এবং মনটা সংকুচিত হযে পড়ে কিন্তু তবু কেন না জানি কোন প্রতিবাদ জানাতে পারে না কুমারের প্রস্তাবে।

প্রকৃতপক্ষে বলতে গেলে কুমার সাহেবেরই সহায়তায় চিত্রজগতে তার পরিচিতির এই শুভক্ষণে মনে যেন তাব কুমার সাহেবকে না বলতে সংকোচ হয়।

কিন্তু ঐ সঙ্গে সেদিনকাব ক্ষণ-পবিচিত রমলা দেবীর কথাগুলোও যেন সে ভুলতে পারে না। সঙ্গে সঙ্গে আবার মনে হয়, এই কযমাসের আলাপে আজ পর্যন্ত সে কুমারের দিক থেকে কোন অসংগত আচরণ বা অসৌজন্যের আভাষ মাত্রও দেখেনি। সেদিক থেকেও তো তার কুমারের বিরুদ্ধে কোন নালিশ নেই। তাই কুমাবের প্রস্তাবে হ্যাঁ বা না কিছুই বলেনা মিতা।

দোতলাব কুমার সাহেবেব সেই পবিচিত ঘর। শুধু তফাতের মধ্যে আজ কুমারের সামনে মদেব বোতল বা গ্লাস ছিল না। ট্রেব পরে সাজানো ছিল চায়ের সাজ সরঞ্জাম।

চাযেব কাপে চুমুক দিতে দিতে সুকোমল চৌধুরী বলছিল, একটা কথা তোমাকে আজ বলছি মিতা, ভাগ্য সুপ্রসন্ন হলে এ লাইনে স্বীকৃতি পেতে দেরি হয় না। তাছাড়া তোমার মধ্যে যে অভিনয়ের স্পার্ক আছে তাতে করে সে স্বীকৃতি পেতে তোমার হয়ত খুব কষ্ট হবে না। কিন্তু মনে রেখো, সে স্বীকৃতি নষ্ট হতেও বেশি দেবি হয না।

মিতা কোন জবাব দেয না, চুপ করেই থাকে।

তাই বলছিলাম, কুমার বলতে থাকে, সেই স্বীকৃতি আসবার মূলে কখনো বেসামাল হযো না। তাছাড়া আরো একটা কথা মনে রেখো, পর্দায় বলো, মঞ্চে বলো, অভিনেতা অভিনেত্রীদের স্বীকৃতিটা জনগণের কাছ থেকে যেমন আচমকা উচ্ছ্বসিত হযে ওঠে তেমনি আচমকাই আবার একদিন তারা মুখ ফিবিযেও নিতে পাবে। আবো ঐ সঙ্গে একটা কথা মনে রেখো মিতা এই লাইনে সত্যিকারেব বন্ধু কেউ নেই।

কথায় কথায যেদিন রাত দশটা হয়ে গিয়েছিল। মিতার খেয়ালই ছিল না।

আচমকা হাত ঘড়ির দিকে নজর পড়ায় খেয়াল হতেই মিতা চমকে ওঠে বাত দশটা।

এবার আমি বাড়ি যাবো মিঃ চৌধুরী।

হ্যাঁ, চল তোমাকে পেঁাছে দিয়ে আসি।

কুমার সাহেব উঠে দাঁড়ালেন এবং ভৃত্যকে ডেকে আদেশ দিলেন ড্রাইভারকে গাড়ি বের করবার জন্য।

ড্রাইভার গাড়ি চালাচ্ছিল। পিছনের সীটে পাশাপাশি বসেছিল মিতা আর কুমার সাহেব! নিঃশব্দে এক সময় অন্ধকারেই কুমার সাহেব মিতার হাতটা স্পর্শ করলো।

প্রথমটা মিতা ঠিক বুঝতে পারেনি ব্যাপারটা।

ভেবেছিল হয়তো পার্শ্বে উপবিষ্ট কুমারের হাতটা এমনিই তাকে স্পর্শ করেছে। কিন্তু পরমুহূর্তেই তার সে ভুল ভেঙে গেল যখন কুমার তার হাতটা ধরে নিজের কোলের উপর তুলে নিল।

সঙ্গে সঙ্গে মিতা হাতটা টেনে নেয় কারণ পুরুষের স্পর্শের মধ্যে কোথায় আছে শংকা নারী হয়ে সেই মুহূর্তে মিতার বুঝতে দেরি হয়নি। এবং অজানিত একটা ভয়ে ঐ মুহূর্তে বুকের ভিতরটাও যে দুর দুর করে কেঁপে ওঠেনি তাও নয়।

তবু আশ্চর্য, মিতা এতটুকু শব্দ করেনি। গাড়ির জানালা পথে প্রচুর হাওয়া আসলেও ঘামছিল মিতা।

কুমার এবারে সসংকোচেই মিতার টেনে নেওয়া হাতটা চেপে ধরলো। মিতা!

বলুন।

আমি এবারে তোমার সঙ্গে চারবছরের একটা লঙ্ কনট্রাক্ট্ করবো ভাবছি।

হাতটা ছাড়ুন কুমার সাহেব!

কেন, তুমি কি আমাকে বিশ্বাস করতে পারছো না।

বিশ্বাস যদি আপনি রাখতে পারেন তো কেন করবো। আপনাকে বিশ্বাস!

গাড়িটা ঐ সময় ধীরে ধীরে থেমে গেল।

মিতার বাড়ি পেঁাছে গিয়েছে। হাতটা ছেড়ে দিল কুমার।

মৃদু কণ্ঠে নমস্কার জানিয়ে গাড়ি থেকে নেমে গেল মিতা।

কুমার সাহেবের দ্বিতীয় চিত্রের শুটিং যথা সময়ে শুরু হলো।

এবং যত শুটিং এগিয়ে যেতে লাগলো মিতা লক্ষ্য করলো, আসলে সে বইয়ের নায়িকা থাকলেও স্ক্রিপ্টে গল্পের গতি কুমার সাহেব এমনি অদল বদল করে দিয়েছেন যে, নায়িকার ভূমিকা থেকে সমস্ত সহানুভূতি গিয়ে পড়ে উপনায়িকার উপরেই। এবং মিতা বুঝতে পারে ইচ্ছা করেই কুমার সাহেব ছবির নায়িকাকে কোন্ ঠাসা করে উপনায়িকাকেই প্রাধান্য দিয়েছেন বেশি।

রুদ্ধ আক্রোশে ভিতরে ভিতরে মিতা ফুলতে থাকে। কিন্তু উপায় নেই।

সামান্য দিনেই সে বুঝতে পেরেছে ছবির ডাইরেকটারই সর্বেসর্বা। তার তার ইচ্ছা ও খেয়াল খুশিতেই ছবি।

এ ক্ষেত্রে কিছু বলতে যাওয়া মানেই অপমানিত হওয়া।

এ যে তার সেদিনকার গাড়ির মধ্যে কুমারের প্রতি ব্যবহারেরই প্রতিক্রিয়া সেটুকু বুঝতে মিতার মত বুদ্ধিমতী মেয়ের দেরি হয় না।

উপায় নেই। কনট্রাকট্ যখন সে সই করেছে ছবি তাকে শেষ করতেই হবে। ছবিতে সে স্বীকৃতি পাক বা না পাক। তা ছাড়া এ লাইনেও সে নবাগতা।

এই তার দ্বিতীয় ছবি। সে ক্ষেত্রে কুমার সাহেবের মত একজন স্বনামধন্য ডাইরেকটারের বিরুদ্ধে যাবার কথা কল্পনাতেও ভাবতে পারে না।

ভাগ্যের উপর নিজেকে সম্পূর্ণভাবে ছেড়ে দিয়ে মিতা চুপ করেই থাকে। এবং যথা সাধ্য সে নিজের বুদ্ধি বিবেচনা মত অভিনয় করবার চেষ্টা করে যায়।

প্রথম ছবিতে কুমার সাহেব তাকে পাখী পড়ার মতো করে বুঝিয়ে বুঝিয়ে অভিনয় করিয়েছিলেন আর এবারে মিতা সম্পর্কে তিনি সম্পূর্ণ নিস্পৃহ, উদাসীন যেন।

মিতার প্রতি কুমার সাহেবের ঈদৃশ আচরণ কুমারের সহকারী অন্যান্য কর্মীদের কারোই দৃষ্টি এড়ায় না। তারাও কম বিস্মিত হয় না।

এমন কি কুমার সাহেবের এ্যাসিস্টেন্ট অবনী একদিন শুটিংয়ের অবসরে কথাটা কুমার সাহেবকে বলেছিলও।

কুমার জবাবে বলেছিল, তাতে করে ভস্মে ঘি ঢালাই হবে অবনী, ওর কোন পার্টস আছে বলে আমার মনে হয় না।

অল্প দূরেই ঐ সময় একটা চেয়ারে ফ্লোরের একপাশে মিতা বসেছিল মেকআপ নিয়ে, কথাটা তার কানে যায়।

কুমারের কথায় মিতার দু' চক্ষু বেয়ে সেদিন দু'ফোঁটা অশ্রু গড়িয়ে পড়েছিল। ইচ্ছা হয়েছিল চিৎকার করে সে সকলকে শুনিয়ে শুনিয়ে বলে, স্কাউণ্ড্রেল, লম্পট—

কিন্তু গলা দিয়ে তার স্বর বের হয় না। ফোঁটার পর ফোঁটা অশ্রু গড়িয়ে গালে কেবল চোখের কোণ বেয়ে পড়তে থাকে।

॥ চোদ্দ ॥

যথা সময়ে দ্বিতীয় ছবি একদিন হাউসে রিলিজ হলো। কিন্তু মনে মনে যা সে ভয় করেছিল তাই হলো। ছবির সমস্ত কৃতিত্ব পেলো উপনায়িকাই।

কোন কাগজেই এবারে সমালোচকরা মিতা সম্পর্কে বিশেষ কিছু বলল না। কেবল একটা অখ্যাতনামা কাগজে ছবিতে নায়িকাকে কোন ঠাসা করা সত্ত্বেও এবং তার দেখবার কিছু না থাকা সত্ত্বেও সে যে, জায়গায় জায়গায় তার অপূর্ব অভিনয় প্রতিভার নিদর্শন দেখিয়েছে সে কথা লিখলো।

কিন্তু তাতে করে বিশেষ কোন ফল হলো না।

তৃতীয় ছবির জন্য তার পূর্ব কনট্রাকট থাকা সত্ত্বেও তৃতীয় ছবিতে কুমার সাহেব তাকে নিল না।

ছয় মাস চুপ চাপ বসে রইলো মিতা। হাতে কোন কাজ নেই।

নিশ্চিন্ত একটানা অবসরে মিতা যখন প্রায় হাঁপিয়ে উঠেছে, নবাগত এ তরুণ পরিচালক গোষ্ঠী একদিন দ্বিপ্রহরে এসে তাদের ছবিতে মিতাকে কাজ করবার জন্য অনুরোধ জানালো। ভদ্রলোকেরা স্পষ্টই বললেন, টাকা তারা বিশেষ কিছু দিতে পারবেন না। সামান্যই দেবেন। কিন্তু গল্পটা শুনে মিতার চরিত্রটি এত পছন্দ হয়ে গেল যে সে ঐ সামান্য টাকাতেই কনট্রাকট সই করে দিল।

পরিচালক গোষ্ঠীতে তিনজন তরুণ কর্মী ছিল। তাদের অনন্য সাধারণ অধ্যবসায়, প্রচেষ্টা ও সহযোগিতায় সত্যিই মিতা যেন মুগ্ধ হয়ে যায়। মিতার বিপরীতে যে তরুণ সুদর্শন অভিনেতাটি অভিনয় করছিল, ছবিতে সে একেবারে নবাগত না হলেও ছবির বাজারে তার তখনো বিশেষ কোন নাম হয়নি। সেই তরুণটির নাম কৃষ্ণকুমার।

মিতা তার বিপরীতে নায়িকার ভূমিকায় অভিনয় করে সত্যিই ভারী আনন্দ পায়।

ছবি একদিন শেষও হলো। কিন্তু নায়ক নায়িকাকে নিয়ে ছবি এবং ডাইরেকটার গোষ্ঠীও নতুন, চিত্রগৃহের মালিকরা ছবির বুকিংয়ের ব্যাপারে নানা রকম টাল বাহানা শুরু করে দেয়। তারিখ তারা দিতে চায় না।

আসামের জংগলের পটভূমিকায় ঐ সময় কুমার সাহেবের নতুন একখানি ছবি তখন ছবির বাজারকে রীতিমত গরম করে রেখেছে।

কুমার সাহেব পরিচালিত ও অভিনীত 'জংগল' ছবিটির কথা যেন লোকের মুখে মুখে। শহরের সর্বত্র দেওয়ালে দেওয়ালে 'জংগলে'র পোস্টার পড়েছে।

শেষ পর্যন্ত একই দিনে 'জংগল' ছবির সঙ্গে বিভিন্ন চিত্রগৃহে মিতা ও কৃষ্ণকুমার অভিনীত 'চাওয়া না চাওয়া' ছবিটি রিলিজ হলো।

যে চিত্রগৃহে 'জংগল' ছবিটি রিলিজ হলো সেখানে দর্শকদের ভিড়ে পা ফেলবার জায়গা নেই। আর যে চিত্রগৃহে 'চাওয়া না চাওয়া' রিলিজ হলো সে চিত্রগৃহে একেবারে খালি। নতুন পরিচালক গোষ্ঠী, নতুন অভিনেতা অভিনেত্রী, কারো সেদিকে দৃষ্টিই নেই। কিন্তু দিন দশেক যেতে না যেতেই সহসা যেন ভাগ্যের চাকা ঘুরে গেল। 'জংগল'কে ছাপিয়ে গেল 'চাওয়া না চাওয়া'র বিক্রি।

এবং একাধিক্রমে পঞ্চাশ সপ্তাহ 'চাওয়া না চাওয়া' চলে চিত্রজগতে একটা যুগান্তকারী রেকর্ডের সৃষ্টি করলো। কাগজে কাগজে মিতা ও কৃষ্ণকুমারের উচ্ছ্বসিত প্রশংসায় মুখর হয়ে উঠলো।

রোমান্টিক এমন জুড়ি নাকি আর হয় না।

পর পর আরো দুখানি কৃষ্ণকুমার ও মিতা অভিনীত ছবি চিত্রজগতে প্রচুর পয়সা দিয়ে সাড়া জাগিয়ে তুললো।

শুধু মিতাই নয় কৃষ্ণকুমারও চিত্রজগতে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়ে গেল।

সঙ্গে সঙ্গে অর্থ আসতে শুরু হলো যেন জোয়ার মত। সাফল্যের সঙ্গে সঙ্গে মিতা তার চাহিদা অনুযায়ী পারিশ্রমিকের অঙ্কটা বাড়িয়ে চললো।

মিতার সাফল্যে সর্বাপেক্ষা আনন্দ যেন রতিকান্তর।

উচ্ছ্বসিত আনন্দে সে বলে, এ আমি জানতাম, মিতা একদিন চিত্রজগতের সর্বশ্রেষ্ঠ তারকা হবে।

কিন্তু রতিকান্তর মত আনন্দিতা হয়নি মল্লিকা। অর্থ ও সাফল্যের সঙ্গে সঙ্গে মিতার মধ্যে যে পরিবর্তন আসতে শুরু করেছিল রতিকান্তর চোখে সেটা না পড়লেও মল্লিকার চোখের দৃষ্টিকে সেটা ফাঁকি দিতে পারেনি।

পর পর কয়েকখানি ছবি কৃষ্ণকুমারের সঙ্গে অভিনয় করে অলক্ষ্যে মিতার মনে যে ক্রমশঃ একটু একটু করে কৃষ্ণকুমারের প্রতি আকর্ষণ জন্মাচ্ছিল সেটা মল্লিকার দৃষ্টিকে এড়ায়নি।

প্রায়ই কৃষ্ণকুমারের সঙ্গে এদিক ওদিক যাওয়া, দুজনে একত্রে কখনো রেঁস্তোরায়, কখনো সিনেমায়, কখনো ক্লাবে বা পার্টিতে, মিতার ব্যাপারটা প্রথম থেকেই মল্লিকা সুনজরে দেখতে পারেনি।

শুটিং থাকলে তো কথাই নেই অন্যদিনও প্রায় রাত করে মিতা বাড়িতে ফিরতে শুরু করলো। এবং শুধু কৃষ্ণকুমারই নয় ঐ সঙ্গে আরো দু'চারজন করে পুরুষ বন্ধু এসে তার চারপাশে ভিড় করতে লাগলো যখন তখন একদিন মল্লিকা মিতাকে কথাটা না বলে পারল না।

বলে, কি শুরু করেছিস বলতে পারিস মিনু?

সেদিন অনেক রাত্রে বাড়ি ফিরে মিতা ড্রেসিং টেবিলের সামনে বসে গুন গুন করে একটা গান গাইতে গাইতে শয়নের পূর্বে কেশ প্রসাধন করছিল একটা সাদা চিরুণী দিয়ে।

মল্লিকার আকস্মিক প্রশ্নে ঘাড় বেঁকিয়ে সহাস্য মুখে তাকালো মিতা। এবং হাস্যস্ফুরিত ওষ্ঠে বললে, কেন কি আবার হলো!

কচি খুকীটি আজ আর তুই নোস মিনু! আমার কথাটা না বুঝবার মত বয়স তোর নয়।

আহা, তাই তো জিজ্ঞাসা করছি দিদি কি হলো?

ভুলিস না হতভাগী তুই শুধু মেয়েমানুষই নোস, গা ভর্তি তোর চোখ ঝলসানো রূপ রয়েছে—

উঠে আসে মিতা। এবং দু'হাতে আদর করে মল্লিকার গলাটা জড়িয়ে ধরে হাসতে হাসতে গুণ গুণ করে গেয়ে ওঠে,

রূপ লাগি' আঁখি ঝুরে গুনে মন ভোর।
প্রতি অঙ্গ লাগি' কান্দে প্রতি অঙ্গ মোর॥

সরে যা হতভাগী, ভাল হবে না বলছি—

কৃত্রিম রোষে দু'হাত দিয়ে টেনে সরিয়ে দেয় মিতাকে মল্লিকা।

মিতা পুনরায় দুহাত দিয়ে মল্লিকাকে আরো নিবিড় করে একেবারে

আঁকড়ে ধরে পূর্বৎ গেয়ে চলে,

হিয়ার পরশ লাগি' হিয়া মোর কান্দে।
পরাণ-পুতুলি মোর স্থির নাহি বান্ধে।।

রাগ করছিস দিদি। ভয় নেই রে ভয় নেই ও জাতটাকে আমি ভাল করেই চিনে নিয়েছি। মরতে হয় ওরাই মরবে, আমি মরব না বুঝলি ?

থাক, থাক—আর বড়াই করিস না। সরোষে বলে ওঠে মল্লিকা, মুনি ঋষিরও মতিচ্ছন্ন হয় তা তুই তো অল্প বয়সের একটা মেয়ে। কিন্তু এ আমি সহ্য করবো না মিনু জেনে রাখিস !

কৌতুকভরা দৃষ্টিতে মল্লিকার দিকে চেয়ে বলে মিতা, কি করবে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দেবে ?

শুধু তাড়িয়ে নয়, দরকার হয় তো ঝেঁটিয়ে বের করে দেবো বাড়ি থেকে।

পারবে !

খুব পারবো। পারবো না আবার ! বলে রাগে গর গর করতে করতে মল্লিকা ঘর থেকে বের হয়ে যায়।

কথাটা যে মল্লিকা মিথ্যা বলেনি, কথার মধ্যে যে তার একটুকুও অতিশয়োক্তি ছিল না সেটা প্রমাণ হতে দেরি হয় না।

প্রথম যেদিন মদ্যপান করে রাত্রে মিতা বাড়িতে এসে ঢুকলো মল্লিকা যেন একেবারে পাথরের মতই স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল।

টলতে টলতে অসংবৃত পদবিক্ষেপে মিতা শয়ন ঘরের দিকে এগুচ্ছিল, তীক্ষ্ণ অনুচ্চ-কণ্ঠে মল্লিকা ডাকলো, মিনু !

কি ? ঈষৎ মুদ্রিত আঁখির দৃষ্টি নিয়ে ফিরে দাঁড়ালো মিতা মল্লিকার মুখের দিকে।

তুই—তুই মদ খেয়েছিস ?

খুব বেশী না, Just two ছোটা পেগস্—

ছিঃ ছিঃ, গলায় দড়ি দিয়ে মরগে যা !

কোন দুঃখে ! বলেই আপন মনে মিতা গুণ গুণিয়ে ওঠে—

জীবনের যে ক'টা দিন কাটিয়ে যাবো প্রিয়ে,
সঙ্গে রবে সুরার পাত্র,
অল্প কিছু আহার মাত্র
আর একখানি ছন্দ মধুর কাব্য হাতে নিয়ে।

বলতে বলতে টলে পড়ে যাচ্ছিল মিতা। তাড়াতাড়ি মল্লিকা গিয়ে তাকে ধরে ফেললো। সযত্নে ধরে, মিতাকে অতঃপর শয্যায় শুইয়ে দিল। মল্লিকার দু'চক্ষুর কোল বেয়ে তখন অজস্র ধারায় অশ্রু গড়িয়ে গড়িয়ে পড়ছে।

জায়গা কিনে রতিকান্ত মিতার বাড়ি তৈরী করছিল।

কথা ছিল আগামী পূজার সময় বাড়ি তৈরী হয়ে গেলে ওরা সকলে

সেই বাড়িতে উঠে যাবে। এবং রতিকান্তর বাড়িটা ভাড়া খাটবে।

রতিকান্ত ইদানিং মিতার সেই বাড়ি তৈরীর ব্যাপার নিয়েই দিবারাত্র ব্যস্ত। সে তার পূর্বের কাজও ছেড়ে দিয়েছিল।

পরের দিন প্রত্যুষে চা পানের পর রতিকান্ত যখন নতুন বাড়ি তদারক করবার জন্য বেরুচ্ছে সামনে এসে দাঁড়ালো মল্লিকা।

সারাটা রাত সে ঘুমায়নি! বসে বসে কেঁদেছে। দু চোখ ফোলা। মুখটা থম থম করছে।

কোথায় চললে শুনি!

ইলেকট্রিক ওয়্যারিং প্রায় কমপ্লিট হয়ে এলো, কিছু অদল বদল করতে হবে, ইঞ্জিনীয়ার মিঃ দত্তকে আজ সে সবগুলো বুঝিয়ে দিতে হবে। সকাল সকাল আসতে বলেছি তাকে।

সহসা যেন বিনা মেঘে বজ্রাঘাত হলো। গম্ভীর কণ্ঠে মল্লিকা বললে, এ বাড়িতে মিতার আর এক মুহূর্তও থাকা চলবে না।

কেন, হঠাৎ আবার কি হলো?

ইদানিং মিতার রাত করে বাড়ি ফেরার ব্যাপার নিয়ে তার সঙ্গে মল্লিকার খিটি মিটি বাধছিল, রতিকান্তর সেটা অজানা ছিল না।

ভাবলে বুঝি সে রকমই কিছু হবে বা।

ওর বাড়ির একতলা তো কমপ্লিট হয়ে গিয়েছে, বলে দিও আজই যেন ও তার নিজের বাড়িতে উঠে যায়, মল্লিকা বলে।

কিন্তু ব্যাপারট হলো কি?

যা বললাম তাই করো গে। নচেৎ জেনো আজই আমি এ-বাড়ি ছেড়ে চলে যাবো। বলে আর দাঁড়ায় না মল্লিকা, সোজা রান্নাঘরের দিকে অগ্রসর হয়।

মিতা তখন সবে ঘুম ভেঙে উঠে দরজার উপর এসে দাঁড়িয়েছে, মল্লিকার প্রত্যেকটি কথাই তার কানে যায়।

আচ্ছা, শোনই না কথাটা! রতিকান্ত আবার স্ত্রীকে ডাকে, বলে, আবার নতুন করে কি নিয়ে গোলমাল বাধলো?

এটা ভদ্রলোকের বাড়ি, বেশ্যাবাড়ি নয়!

মল্লিকা!

হ্যাঁ, হ্যাঁ—তোমার সোহাগের মিনতি দেবীকে ভাল করেই কথাটা বুঝিয়ে দিও।

মল্লিকা আর দাঁড়ালো না। হন হন করে সেখান থেকে চলে গেল।

হতভম্ব রতিকান্ত কি করবে বুঝতে না পেরে ঘুরে তাকাতেই অদূরে শয়নঘরের খোলা দরজার উপরে দণ্ডায়মান পাথরের মত মিনতির সঙ্গে চোখা চোখি হয়ে গেল—

কি ব্যাপার মিনু! তোমার দিদি হঠাৎ সকাল বেলাতেই ঐ রণচণ্ডি মূর্তি কেন?

আমি কাল রাত্রে মদ খেয়ে এসেছিলাম রতিদা!

মদ !

হ্যাঁ, কিন্তু আর খাবো না, বলে সোজা মিতা রান্নাঘরের দিকে চলে গেল।

।। পনেরো ।।

কিন্তু মল্লিকাকে মিতা ঠিক চিনতে পারেনি।

আর সে বুঝতেও পারেনি মল্লিকার কতবড় ব্যথার স্থানে সে গত রাত্রে মর্মান্তিক আঘাত হেনেছিল।

মল্লিকা রান্নাঘরে বঁটি পেতে তরকারী কুটছিল। নিঃশব্দে এসে পেছনে দাঁড়ালো মিনতি। মৃদু স্বরে ডাকল, দিদি !

কোন সাড়া দেয় না মল্লিকা।

আমাকে ক্ষমা কর দিদি, সত্যিই আমার অন্যায় হয়েছে।

তবু কোন সাড়া দেয় না মল্লিকা। যেমন তরকারী কুটছিল তেমনি কুটতে থাকে।

দিদি, কথাও বলবে না আমার সঙ্গে ?

আমার যা বলবার ছিল একটু আগেই তা বলে এসেছি। কঠিন কণ্ঠে এবারে প্রত্যুত্তর দেয় মল্লিকা।

তাহলে সত্যিই তুমি এ-বাড়ি থেকে আমাকে তাড়িয়ে দিচ্ছ ?

যদি তাই মনে করো তো তাই।

অন্যায় একটা করে ফেলেছি সত্যি, কিন্তু তার কি ক্ষমা নেই ! আমি প্রতিজ্ঞা করছি আর কখনো তোমার অবাধ্য হবো না !

আমাদের প্রয়োজন তোমার ফুরিয়েছে মিনতি ! আজ তুমি টাকা, সম্মান, প্রতিপত্তি, সব পেয়েছো, যত দিন যাবে আরো আসবে, আজ আর আমাদের আঁকড়ে থেকে তোমার কোন তো লাভ নেই ! তাই সময় থাকতে আমাদের পরস্পরের কাছ থেকে পরস্পরের বিদায় নেওয়াটাই মঙ্গল ভেবে তোমাকে চলে যেতে বলছি !

তাহলে এই তোমার শেষ কথা !

প্রচণ্ড অভিমানে বুকটা ফুলে ওঠে মিতার।

দুঃখ করো না মিনতি ! আজ যে পথে তুমি এগিয়ে চলেছো আমাদের মত মধ্যবিত্ত সংসারের সেটা চেনা রাস্তা নয়। তুমিও তাই আমাদের মানিয়ে নিতে পারবে না, আমরাও পারবো না মানিয়ে নিতে তোমাকে !

কিন্তু—

না, সাফল্যের দিনে প্রলোভনটা চারিদিক থেকে আসা যেমন স্বাভাবিক যেমনি তাকে এড়িয়ে চলাটাও দুঃসাধ্য। আজকে তোমার সেই দিন এসেছে যখন, আমি-ই বা আমার সংস্কার আর নিজস্ব বিচারবুদ্ধি নিয়ে তোমাকে পদে পদে বাধা দিই কেন। আর এখানে থাকলে সেটাকে এড়িয়ে চলাও যাবে না যখন তখন আজ তোমার এখান থেকে চলে যাওয়াই ভাল।

বেশ তাই হবে—

মিতা আর দাঁড়ালো না। নিঃশব্দে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

এবং সোজা ঘরে এসে একটা সুটকেশ টেনে নিয়ে ক্ষিপ্র হস্তে হাতের কাছে যা জামা কাপড় ছিল ভরতে থাকে।

হ্যাঁ, চলেই যাবে সে। তুচ্ছ একটা ভ্রান্তির যদি এমনি গুরুদণ্ড হয়, থাকতে আর চায় না সে এ বাড়িতে।

কোনমতে শাড়ীটা পরে নিয়ে পায়ে জুতোটা ঢুকিয়ে একহাতে সুটকেশ ও অন্য হাতে ভ্যানিটি ব্যাগটা নিয়ে দরজার দিকে যেমন অগ্রসর হয়েছে মিতা, জলখাবারের প্লেট ও চায়ের কাপ হাতে নিয়ে মল্লিকা এসে ঘরে প্রবেশ করলো।

একি! এখুনি কোথায় যাচ্ছো? যেতে বলেছি বলে কি এখুনি চলে যেতে হবে নাকি!

পথ ছাড় মল্লিকাদি, আমি এখুনি যাবো!

বেশ, কাল সারারাত তো পেটে কিছু পড়েনি, খেয়ে নাও আগে।

না! সরো—

ছেলেমানুষি করোনা মিনতি, যেতে তোমাকে আমি বলেছি সত্যি, তাই বলে এখুনি বলিনি! নাও বোস, খেয়ে নাও—

মিনতি মল্লিকার কথার কোন জবাব না দিয়ে তাকে পাশ কাটিয়েই দরজা দিয়ে বের হয়ে গেল।

মিনতি! পিছন থেকে ডাকলো মল্লিকা।

মিনতি কোন সাড়া দিল না। বাইরে তার জুতোর শব্দটা মিলিয়ে গেল।

জলখাবারের প্লেট ও চায়ের কাপ হাতে পাথরের মতই ঘরের মধ্যে দাঁড়িয়ে রইলো মল্লিকা।

নিজের বাড়িতে নয়, মিনতি এসে উঠলো একটা হোটেলে।

মল্লিকার কথায় যতই রাগ করে সে চলে আসুক না কেন, হোটেলের নিভৃত কক্ষে, শয্যায় শুয়ে তার দু'চোখের কোল ছাপিয়ে অশ্রু নেমে আসে।

আজ সে সত্যিই একা! কেউ তার পাশে নেই! অনাত্মীয় হয়েও পরমাত্মীয়ের মত যার সদা সশংকিত, সতর্ক স্নেহদৃষ্টি গত চার বৎসর তাকে অনুক্ষণ মায়ের মতই ঘিরে ছিল, আজ আর সেই দৃষ্টির প্রহরা তার উপরে নেই! চরম আনন্দের মুহূর্তেও আনন্দ জানাবার যেমন কেউ নেই তেমনি চরম দুঃখের মুহূর্তেও সমবেদনায় পাশটিতে এসে দাঁড়াবার মত আজ আর কেউ তার রইলো না এ সংসারে।

একা। সে আজ একা!

ভুল তারই হয়েছিল। নইলে পর কখনো আপনার হয় কোনদিন! জন্মমুহূর্ত থেকেই ভাগ্য যেখানে বিরূপ, ভাগ্যের নিষ্ঠুর পরিহাস তাকে বারবার পর্যুদস্ত হতে হয়েছে।

সারাটা দিন মিতা উঠলোও না শয্যা থেকে, কিছু মুখে পর্যন্ত দিল না। মুখ গুঁজে শয্যার উপর শুয়েই রইলো।

মল্লিকা যেমন মিতাকে ভালবেসেছিল মিতাও তেমনি সমস্ত অন্তর দিয়ে ভালবেসেছিল বুঝি মল্লিকাকে।

মল্লিকার ভিতরে যেন সে তার হারানো মাকে খুঁজে পেয়েছিল।

সেই মল্লিকা যখন একদিন মাত্র সে দু পেগ মদ খেয়েছে বলে এমনি নিষ্ঠুরের মত তাকে তার গৃহ থেকে চলে যেতে বললো, অভিমানে মিতার বুকখানা যেন গুঁড়িয়ে গেল।

পরম বিশ্বাস ও নির্ভরতায় যেখানে সে নিশ্চিন্তে দাঁড়িয়েছিল সেই পায়ের তলার মাটিটাই যখন তাকে এতবড় আঘাত দিয়ে ধ্বসে গেল, মিতা যেন কোথায়ও আর কোন আশ্বাসই দেখতে পেল না।

এবং যত সে ব্যাপারটা ভাবতে লাগলো ততই যেন মল্লিকার প্রতি অভিমানটা তার দুর্জয় হয়ে উঠতে থাকে।

সব শূন্য, সব যেন বিরাট একটা ফাঁকি, মিতার কেবলই মনে হয়। আর কেমন করে মল্লিকার পরে সে প্রতিশোধ নেবে, তাকে জব্দ করবে এই কথাটাই বার বার ভাবতে থাকে। এবং শেষ পর্যন্ত সেই অভিমানে অন্ধ হয়েই একসময় বেল টিপে বেয়ারাকে ঘরের মধ্যে ডাকলো।

এক বোতল হুইস্কী, দু বোতল সোডা আর গ্লাস দিয়ে যাও।

বেয়ারা প্রথমটায় মিতার কথায় যেন একটু অবাক হয়েই তার দিকে তাকায়। বলে কি মেয়েটা, এক বোতল হুইস্কী।

কিঁউ হামরা বাত সমঝা কি নেই।

জি মেমসাব। আভি লাতে হুঁ!

হাঁ, জলদি।

একটু পরেই ট্রেতে করে মদের বোতল, সোডার বোতল ও গ্লাস এনে ছোট টেবিলটার পরে নামিয়ে রাখল বেয়ারা।

আউর কুছ জরুরত হ্যায় মেম্‌সাব্‌।

নেহি। তুম যানে সেকতা।

সেলাম জানিয়ে বেয়ারা চলে গেল ঘর থেকে।

।। পনের ।।

খাবো, আরো খাবো, তোমার কি, যত খুশী আমার আমি খাবো! মনে মনে বলতে বলতে মিতা পেগের পর পেগ হুইস্কী নিঃশেষ করতে থাকে।

মাথায় যেন মিতার খুন চেপেছে। এক সময় বোতলটা শেষ হয়ে গেল।

আবার বেল বাজিয়ে মিতা হোটেলের বেয়ারাকে কামরায় ডেকে পাঠালো।

পুরো এক বোতল হুইস্কী পান করে মিতার সর্বাঙ্গ তখন শিথিল। দুটি চক্ষু ঢুলু ঢুলু। কথা জড়িয়ে এসেছে—

আউর এক বোতল হুইস্কী লাও।

বেয়ারাটা কোন সাড়া দেয় না। শুধু নির্বাক হয়ে তাকিয়ে থাকে মিতার নেশায় রক্তিম থম থমে মুখখানির দিকে।

বুদ্ধুর মত হাঁ করে দাঁড়িয়ে আছিস কি নিয়ে আয়—

বেয়ারাটা চলে গেল।

উঠে বুঝি ঐ সময় দাঁড়াবার চেষ্টা করে মিতা কিন্তু পারে না।

সমস্ত শরীর তখন টলছে। দেহের ভারসাম্য রাখাই কষ্টকর।

টাল সামলাতে পারে না মিতা, সোফার হাতলের উপর এলিয়ে পড়ে যায়। গতরাত থেকে পেটে বিন্দু মাত্রও আহার্য পড়েনি। তার উপর এক বোতল মদ শূন্য পাকস্থলীতে।

যা হবার তাই হয়েছে।

নেশার ঘোরে সমস্ত কেমন যেন সব গুলিয়ে যাচ্ছে।

সব কেমন ধোঁয়ার মত অস্পষ্ট। গায়ের বস্ত্র শিথিল এলো মেলো, খোঁপা খুলে নিবিড় কেশরাশি এলিয়ে পড়েছে।

নেশার ঘোরেই গুণ গুণ করে গান গাইতে থাকে মিতা জড়িয়ে জড়িয়ে ঃ

আমার এপথ তোমার পথের থেকে অনেক দূরে গেছে বেঁকে ॥

আমার ফুলে আর কি করে তোমার মালা গাঁথা হবে,

তে মার বাঁশী দূরের হাওয়ায় কেঁদে বাজে কারে ডেকে ॥

আর এক বোতল হুইস্কী নিয়ে ঘরে এসে প্রবেশ করে বেয়ারাটা থমকে দাঁড়ায়।

গুণ গুণিয়ে চলেছে তখনো মিতা জড়িত কণ্ঠে।

মেমসাব!

কৌন?

হুইস্কী লায়া!

গ্লাস মে ডাল দো!

আর মাত পিও মেমসাব!

কেয়া?

আর মাত পিও—

Get Out! Get Out—নেশার ঝোঁকে চিৎকার করে ওঠে মিতা জড়িত কণ্ঠে।

চার চারটে দিন ক্রমান্বয়ে মিতা কেবল দিবারাত্র মদ্যপানই করে গেল। কিন্তু শরীরে অত অত্যাচার সহ্য হবে কেন!

মিতা অসুস্থ হয়ে পড়ে।

মল্লিকাকে কিছু না বলে একটা মাত্র সুটকেশ ও ভ্যানিটি ব্যাগটা নিয়ে মিতা রতিকান্তর বাড়ি থেকে বের হয়ে এসেছিল তারপর কেউ আর কোন তার সন্ধান পায় না।

রতিকান্ত ঐ দিন দ্বিপ্রহরে বাড়িতে ফিরে মল্লিকার কাছে সব শুনে অত্যন্ত

ব্যস্ত হয়ে উঠে। রাগ হোক বা অভিমান হোক ঝোঁকের মাথায় মেয়েটা কোথায় গেল।

নিজের বাড়িতে সে যায়নি।

এ দুনিয়ায় মেয়েটার এমন কোন আত্মীয়স্বজনও নেই যেখানে গিয়ে একবেলা থাকতে পারে।

পরে একদিন রতিকান্ত মুখেই শুনেছিল মিতা, চার চারটে দিন নাকি সে পাগলের মতই শহরের সর্বত্র মিতাকে খুঁজে বেড়িয়েছিল।

শেষ পর্যন্ত থানায় সে সংবাদ দেয়।

থানার ইন্সপেক্টর খোঁজ করতে করতে হোটেলে এসে মিতার সন্ধান পায় বটে তবে তখন মিতাকে অসুস্থ অবস্থায় হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

ইন্সপেক্টরের কাছে সংবাদ পেয়ে রতিকান্ত আর মল্লিকা ছুটে গেল হাসপাতালে। কিন্তু হাসপাতালের ডাক্তারের কাছে মিতার অসুস্থতার কারণ শুনে মিতার কেবিনের দিকে অগ্রসর হতে গিয়েও থেমে গিয়েছিল মল্লিকা।

স্ত্রীকে দাঁড়িয়ে পড়তে দেখে রতিকান্ত বলেছিল, কি হলো থামলে কেন, চল!

না। তুমিই যাও!

কেন, তুমি যাবে না?

না—তুমি যাও দেখে এসো, আমি এখানেই বসছি।

মল্লিকা কিছুতেই যায়নি।

রতিকান্তর কোন অনুরোধই সে শোনে নি।

অগত্যা রতিকান্তই একা গিয়ে কেবিনে ঢুকেছিল।

চোখ বুজে মিতা শুয়েছিল শয্যার উপর। সমস্ত মুখখানি জুড়ে মিতার যেন বিবর্ণ ক্লান্তির একটি ছায়া। মাথার রুক্ষ কেশ বালিশের দু'পাশে বিনুনি করা। চক্ষু দুটি বোজা।

মিনু!

কে! ক্লান্ত দৃষ্টি মেলে তাকালো মিতা।

ছিঃ ছিঃ, এ তুমি করেছো কি! এমনি করে নিজের সর্বনাশ কেউ করে!

মিতা তখন কিন্তু ঘরের চারিদিকে তার দৃষ্টিটা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখছে।

মৃদুকণ্ঠে সে ডাকে—রতিদা?

কি রে?

দিদি আসেনি?

হ্যাঁ, এসেছে তো!

এসেছে, সত্যি বলছো?

হ্যাঁ রে--

ডাকো না একবার তাকে এ-ঘরে।

নিশ্চয়ই। এখুনি তাকে আমি ডেকে নিয়ে আসছি। রতিকান্ত কেবিন

থেকে তখুনি বের হয়ে গেল।

কিন্তু ওয়েটিংরুমে গিয়ে দেখেছিল রতিকান্ত, মল্লিকা সেখানে নেই।

মল্লিকা বাড়ি ফিরে গিয়েছিল।

অল্পক্ষণ বাদেই একাকী রতিকান্তকে ফিরতে দেখে ব্যগ্র কণ্ঠে শুধায় মিতা, কই, দিদি এলো না!

হ্যাঁ, মানে আসবে বৈকি, নিশ্চয়ই আসবে, আমি নিজে তাকে নিয়ে আসবো।

না রতিদা, আর তাকে আসতে হবে না।

মুখটা ফিরিয়ে নেয় মিতা।

একটু বোধ হয় অভিমান হয়েছে। কাল এসে তোমাকে আমি নিয়ে যাবো। বাড়িতে গেলেই তোমার দিদির অভিমান মিটে যাবে।

বাড়ি কতদূর হলো রতিদা?

ও এক রকম কমপ্লিট বললেই চলে।

থাকা যাবে?

থাকা যাবে না মানে, থাকলেই হয়।

তাহলে কাল তুমি এসো আমি নতুন বাড়িতেই গিয়ে উঠবো।

কাল কি করে হবে! সব গোছগাছ না করে তা ছাড়া নতুন বাড়ি সব ধোয়া মোছাও করতে হবে।

দশ বারজন লোক লাগিয়ে কাল সারা দিনের মধ্যে সেই ব্যবস্থা করে ফেলবে রতিদা, কাল সন্ধ্যায়ই আমি বাড়িতে যাবো। টাকা যা লাগে, আমার বাক্সে চেক বই আছে নিয়ে এসো সই করে দেবো। ব্যাঙ্ক থেকে তুমি টাকা তুলে নিও।

বেশ তো কিন্তু—

তোমাকে যা বললাম তাই করো, তারপর একটু থেমে বললে, রতিদা, একটা কথা—মল্লিকাদি আমার বাড়িতে যাবে না জানি তবে তাকে বলো সেদিন সে আমাকে ক্ষমা করলে হয়তো সত্যিই আর জীবনে কখনো মদ স্পর্শ করতাম না।

কথাটা বলতে বলতে মিতা মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিল।

দিন দুই পরেই মিতা বালিগঞ্জ সারকুলার রোডের নতুন বাড়িতে উঠে এসেছিল।

গাড়ি থেকে নেমে মিতা আশা করেছিল অন্তত আর কাউকে না হোক রতিকান্তকে সে নিশ্চয়ই দেখতে পাবে। কিন্তু পায়নি।

দারোয়ান একগোছা চাবি ও একটা পুরু বড় খাম তার হাতে দিয়ে বলেছিল, বাবু সেগুলো দিয়ে গিয়েছে তাকে দেবার জন্যে।

বাবু কোথায় দারোয়ান?

বাবু তো সেই সকালেই আমার হাতে এগুলো দিয়ে চলে গেছেন মাইজী!

আর কিছু বলে যাননি !

নাতো !

কখন আবার আসবেন বলে গিয়েছেন কিছু ?

না।

সব গোছগাছ করে দিয়ে গিয়েছিল রতিকান্ত।

এমন কি একটি পাচক, একটি নেপালী আয়া, ফাইফরমাস খাটবার জন্য একজন ছোকরা চাকরও নিযুক্ত করে রেখে গিয়েছিল।

ভিতরে ঢুকতে যেন পা সরছিল না মিতার।

সুসজ্জিত পারলারে একটা সোফার পরে বসে পড়ে মিতা।

চিরদিন সকলে একসঙ্গে থাকবে।

কত আনন্দ ও সুখের কল্পনায় ওরা দুজনে গত আট মাস ধরে রাত্রি দিন মশগুল হয়ে থেকেছে।

মল্লিকা নিজে পছন্দ করে দেখে জায়গা কিনেছিল। বাড়ির প্ল্যানও তার পছন্দ মত করিয়েছে। বাড়ির প্রত্যেকটি খুটিনাটি সে পছন্দ করে দিয়েছে। এজন্য কত তার খুঁতখুতনী ছিল।

রতিকান্ত ঐ নিয়ে স্ত্রীকে কত সময় কত রাঙ্গ করেছে।

বলেছে, তবু যদি নিজের বাড়ি হতো তোমার।

কেন মিনুর বাড়ির বুঝি আমার বাড়ি নয়। মল্লিকা জবাব দিয়েছে।

কিন্তু যে রেটে মিনু বড়লোক হয়ে চলেছে যদি একদিন গরীব বলে তোমাকেও চিনতে না পারে !

চিনতে না পারলেই হলো অমনি ! ঝেঁটিয়ে বাড়ি থেকে বিদায় করে দেবো না।

রতিকান্ত বলেছে, শুনছো মিনু, তোমার দিদি কি বলছে !

ঠিকইতো বলছে দিদি, এতো দিদিরই বাড়ি।

শেষ পর্যন্ত কোথা থেকে কি হয়ে গেল !

বুকখানা কাঁপিয়ে মিতার একটা দীর্ঘশ্বাস পড়ে।

নেপালী আয়া কাঞ্চি এসে সামনে দাঁড়ালো, চা দেবো মেম্‌সাব !

চা ! নিয়ে আয়।

চা পান করতে করতেই মিতা খামটা ছিঁড়ে ফেললো একসময়।

বাড়ি তৈরী ব্যাপারে যাবতীয় বিল, মেমো, রসিদ, প্রত্যেকটি পাই পয়সার পর্যন্ত হিসাবে বুঝিয়ে দিয়ে গিয়েছে রতিকান্ত।

শূন্য দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে মিতা কাগজগুলোর দিকে।

তারপর একসময় উঠে পায়ে পায়ে ভিতরে প্রবেশ করে। এঘর থেকে ওঘর, এ বারান্দা থেকে ও বারান্দা অন্যমনস্কভাবে মিতা ঘুরে ঘুরে বেড়াতে থাকে।

এর যাবতীয় কৃতিত্ব রতিকান্তর, মল্লিকার।

গত তিন বৎসরে যা সে উপায় করেছে সব সঞ্চিত করে রেখেছিল ওরা

স্বামী স্ত্রী। একটি পয়সা অযথা ব্যয় করতে দেয়নি।

এমনকি যে পাঁচ ছয়টা বইতে সে কাজ করেছে গত একবৎসরে সব বইতে কনট্রাকট্ পর্যন্ত রতিকান্তর পরামর্শ মতো হয়েছে।

রতিকান্তই টাকার অঙ্ক নির্ধারিত করে দিয়েছে।

সেবারে একটিবারের জন্যেও মিতা দু'চোখের পাতা এক করতে পারলো না। নিরুপায় একটা অভিমানে সে গুমরাতে লাগলো।

মিতা ভেবেছিল সত্যিই কিছু আর চিরদিন মল্লিকা তার উপরে রাগ করে থাকতে পারবে না! তাছাড়া রতিকান্ত আছে সে নিশ্চয়ই মল্লিকাকে সঙ্গে নিয়ে তার ওখানে আসবে।

কিন্তু বৃথাই আশা।

দিন সপ্তাহ মাস প্রায় বছর ঘুরতে চলল, না এলো মল্লিকা না এলো রতিকান্ত একটি দিনের জন্যও ওর ওখানে।

ওদিকে মিতার তখন ছবির পর ছবি হিট্, সুপার হিট্ করে চলেছে। দুহাতে সে অর্থ উপায় করছে। নানা বয়েসী নতুন নতুন বন্ধুবান্ধবের দল তার চার পাশে এসে সব ভিড় করতে শুরু করেছে।

নতুন গাড়ি কিনেছে।

ব্যাংকে আরো অনেক টাকা জমেছে।

ছবি, ছবি আর ছবি।

চিত্রজগতে তখন মাত্র দুটি নাম, মিতা রায় আর কৃষ্ণ কুমার।

এমন সময় একদিন ফ্লোরে শুটিং শেষে বিশ্রাম নিচ্ছে মিতা, একজনের কাছে শুনলো, মাস দুই আগে হঠাৎ স্ট্রোকে প্যারালিসিস হয়ে নাকি রতিকান্ত পঙ্গু হয়ে গিয়েছে। চিকিৎসার ব্যাপারে প্রচুর অর্থব্যয় করে আজ তাদের অবস্থাও নাকি শোচনীয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। কথাটা শুনেই মিতার প্রাণটা যেন কেমন করে ওঠে।

ফিরতি পথে শুটিং শেষে গাড়ি নিয়ে সোজা মিতা সেই পরিচিত বাড়িটার সামনে গিয়ে নামলো। কিন্তু সদর দিয়ে প্রবেশ করতে গিয়ে থমকে দাঁড়ালো।

অপরিচিত মধ্যবয়সী এক ভদ্রলোক ঘরের মধ্যে বসে ছিলেন, তিনি শুধালেন, কে আপনি, কাকে চান?

এবাড়িতে রতিকান্তবাবু থাকতেন না?

হ্যাঁ থাকতেন। কিন্তু তারা তো আজ দিন দশেক হলো এবাড়ি আমাকে বিক্রি করে চলে গেছেন।

চলে গেছেন!

হ্যাঁ।

ও, তা তাঁরা কোথায় এখন আছেন বলতে পারেন?

না।

আচ্ছা আসি নমস্কার।

মন্থর পদে এসে মিতা আবার তার গাড়িতে উঠে বসলো

ড্রাইভার শুধায়, কোথায় যাবো ?

বাড়ি।

তারপর আরো একটা বৎসর চলে গিয়েছে। মিতার জীবনের আরো অনেক পরিবর্তন হয়েছে।

রতিকান্ত বা মল্লিকার আর কোন সন্ধানই পায়নি মিতা।

বর্তমান কালের শ্রেষ্ঠ তারকা, চিত্রাভিনেত্রী মিতা রায়কে নিয়ে আলোচনার আর অন্ত নেই। কৌতূহলেরও অন্ত নেই। তার জীবন যাত্রার প্রতিটি খুঁটিনাটি জনসাধারণের যেন আজ নখদর্পণে। মুগ্ধ স্তাবকের দ্বারা সর্বক্ষণ আজ সে পরিবৃত।

কিন্তু—

সহসা চিন্তাজাল যেন ছিন্ন হয়ে গেল মিতার। সুনীল, রতীশ, কৃষ্ণকুমার, স্যান্টি তার চারপাশে, কিন্তু তাদের মধ্যে যেন বিশেষ একটা বিশেষত্ব নিয়ে আজকের রাতের সেই ক্ষণ পরিচিত 'কাফে দ্য মণিকোর' নগণ্য একজন বেহালা বাজিয়ে বার বার তার সামনে এসে দাঁড়াচ্ছে।

অভিজাত সমাজের লক্ষপতি ধনীর পুত্রেরা আজ তার এতটুকু কৃপার জন্য লালায়িত, সর্বক্ষণ মধুলোভী মৌমাছির মত গুণ গুণ করে ফিরছে তার চারপাশে, তাদের মধ্যে ঐ নগণ্য হোটেলের সামান্য একজন বেহালা বাজিয়ে—

সত্যিই হাসি পায় মিতার। এখনো সে তারই কথা ভাবছে ভেবে সত্যিই তার হাসি পায়।

রাতের অন্ধকার ইতিমধ্যে যে কখন ফিকে হয়ে এসেছে টেরও পায়নি মিতা। সহসা কাঞ্চির কণ্ঠস্বরে মিতা যেন চমকে ওঠে।

চা !

কাঞ্চি প্রভাতী চা নিয়ে এসেছে নিত্যকার মতো।

চায়ের ট্রে-টা সামনে নামিয়ে রেখে কাঞ্চি নিঃশব্দে ঘর থেকে বের হয়ে গেল।

॥ দ্বিতীয় পর্ব ॥

ওয়েটারের মুখে কথাটা শুনে পার্থ একটু যেন অবাকই হয়ে গিয়েছিল। বিরাট একটা গাড়ি নিয়ে একজন সুন্দরী ভদ্রমহিলা নাকি তার জন্য বাইরে অপেক্ষা করছেন!

রাত তখন এগারটা বেজে গিয়েছে। হোটেল বন্ধ হয়ে গিয়েছে। বাড়ি ফিরবার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিল পার্থপ্রতিম। এমন সময় হোটেলের একজন ওয়েটার এসে সংবাদটা দিল।

তুমি বোধহয় ভুল করছো মণিরাম, আমার কাছে স্ত্রীলোক আবার কে আসবে। ভাল করে জেনে দেখগে অন্য কাউকে হয়তো খুঁজছেন তিনি।

না চৌধুরীবাবু, আপনার নামই তিনি বলেছেন।

দূর, তুমি আবার যাও, ভাল করে আর একবার জিজ্ঞাসা করগে—পার্থপ্রতিম বলে!

ওয়েটার মণিরাম চলে গেল এবং মিনিট কয়েক বাদেই ফিরে এসে বললে, আপনাকেই ডাকছেন তিনি।

আমাকেই।

আজ্ঞে হ্যাঁ—

নাম কিছু বললেন?

আজ্ঞে না। বললেন তিনি আপনাকে চেনেন আপনি তাকে চেনেন না!

ডি'সুজা পাশেই দাঁড়িয়েছিল, কৌতুকতরল কণ্ঠে এবার বললে, যাওনা দেখেই এসো না, হয়ত মনের মানুষও হতে পারেন।

আঃ কি হচ্ছে ডি'সুজা—

এত রাত্রে এসেছেন যখন তখন কি আর সাধারণ কেউ হবেন।

যাও, যাও—

বিশেষ একটু কৌতূহল নিয়েই যেন বের হয়ে এলো পার্থপ্রতিম। বিরাট প্লিমাউথ গাড়ি একটা পেভমেণ্টের সামনে পার্ক করে আছে। গাড়ির দিকে এগিয়ে যেতেই অন্ধকার গাড়ির ভিতর থেকে নারী কণ্ঠে আহ্বান শোনা গেল, নমস্কার—

চমকে ওঠে পার্থ কণ্ঠস্বর শুনেই! এ কণ্ঠস্বর তো ভোলবার নয়। এ যে তার অন্তরে অন্তরে গাঁথা হয়ে গিয়েছে সেই রাত্রেই!

নমস্কার! আ—আপনি—

কেমন যেন থতমত খেয়ে যায় পার্থপ্রতিম।

গাড়ির চৌকো জানালা পথের ফ্রেমে একখানি মুখ।

অদূরবর্তী লাইট-পোস্টের সামান্য আলো এসে মুখখানির একাংশে পড়েছে, আলো আঁধারে মেশামেশি তারই মধ্যে স্বপ্নের মত কিছুটা অস্পষ্ট

একখানি মুখ।

সুচারু কপালের পরে এসে লটিয়ে নেমেছে চুলের একটি নট্।

আবার প্রশ্ন হলো, চিনতে পারছেন না বুঝি ?

হ্যাঁ, মানে—

এখন তো বাড়ি ফিরবেন !

হ্যাঁ, কিন্তু—

আসুন আমিও ঐ পথেই ফিরছিলাম এই রাস্তা দিয়ে, হঠাৎ মনে পড়লো এতটা পথ একা একা যাবো, ভারি বোরিং, যদি আপনাকে কম্পানী পাওয়া যায়। ভাগ্য ভাল দেখছি দেখা পেয়ে গেলাম।

পার্থপ্রতিম যেন একেবারে বোবা।

বাঃ রে, দাঁড়িয়ে রইলেন কেন, আসুন—মিতা ডাকে।

তবু নিশ্চুপ যেমন দাঁড়িয়ে ছিল পার্থপ্রতিম তেমনিই দাঁড়িয়ে থাকে। সত্যি ও যেন একেবারে বোবা বনে গিয়েছে।

কি হলো আসুন ! ভয় নেই বিশ্বাস করুন একটি ফোঁটাও ড্রিংক করিনি আজ, এ্যাবসলুটলি নরম্যাল এণ্ড সোবার—বলতে বলতে গাড়ির দরজাটা খুলে দেয় মিতা।

কতকটা যন্ত্র চালিতের মতই যেন পার্থ এসে গাড়িতে ফ্রণ্ট সীটে মিতার পাশে উঠে বসলো ! সুইচ দিয়ে গাড়ি ছেড়ে দিল মিতা।

আজ সেই বাচ্চা সোফারটা গাড়িতে ছিল না, একাই ছিল মিতা।

মাত্র দিন পাঁচেক আগে এমনি একটি রাত্রে এই গাড়িতেই এই সীটে এরই পাশে বসে ছিল পার্থ।

আজও সেই মিষ্টি গন্ধটা নাকে এসে লাগে পার্থর।

হঠাৎ একসময় মিতা প্রশ্ন করে গাড়ি চালাতে চালাতে, কিন্তু সত্যিই তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরবার আপনার কোন প্রয়োজন আছে নাকি পার্থবাবু ?

হ্যাঁ, বাড়িতে তো ফিরতেই হবে।

না, না—ফিরবেন বৈকি ! কিন্তু একটু যদি ঘুরে যাই রেড রোড, স্ট্যাণ্ড রোডটা দিয়ে আপত্তি আছে ?

না, আপত্তি আর কি তার !

তবে আবার কি ! বলতে বলতে ততক্ষণে ষ্টিয়ারিং হুইলটা ডাইনে ঘুরিয়ে গাড়ি মোড় ফিরিয়ে দিয়েছে মিতা।

নির্জন মেটাল বাঁধানো রাস্তা দিয়ে দামী বড় গাড়ি নিঃশব্দে চল্লিশ মাইল স্পীডে ছুটে চলে।

কি ভাবছেন ! মিতা প্রশ্ন করে।

না, কই কিছু না তো।

কিছুই ভাবছেন না !

না তো।

উহুঁ ! নিশ্চয়ই ভাবছেন ! মৃদু হেসে মিতা বলে।

ভাবছি ! একটু যেন বিস্মিত হল পার্থ।

হুঁ! তারপরই একটু হেসে বলে মিতা, কিন্তু সত্যি সত্যিই আচমকা এতরাত্রে আপনাকে পাকড়াও করে নিয়ে এলাম কেন জানেন?

নাতো।

আপনার বেহালা বাজানো শুনবো বলে!

বেহালা বাজানো শুনবেন!

হুঁ! গঙ্গার ধারে বসে আপনার বেহালা বাজানো শুনবো।

ও, কিন্তু আমি তো—

বেহালাটা আনেননি, এই তো!

হ্যাঁ, মানে—

তাতে আর কি হয়েছে, আমার কাছে একটা আলাদীনের প্রদীপ আছে, তাকে হুকুম করলেই বেহালা এসে যাবে। বলতে বলতে মিতা মিষ্টি হাসি হেসে ওঠে।

গঙ্গার ধারে এসে বিরাট একটা পত্রবহুল বটগাছের সামনে গাড়িটা থামালো মিতা। গাড়ির দরজা খুলে নেমে বললে, আসুন—

মিতার ঈদৃশ ব্যবহারে সত্যি বলতে কি পার্থ যেন কেমন একটু বিহ্বলই হয়ে পড়েছিল। এতবড় একজন নামকরা অভিনেত্রী, এত গ্ল্যামার এত প্রতিপত্তি, আর কিইবা তার পরিচয়। অখ্যাত অতি সাধারণ রেস্তরার এক অর্কেস্ট্রার বেহালা বাজিয়ে।

অজ্ঞাত, অপরিচিত অতি নগণ্য!

এবং একটি রাতের কিছুক্ষণের যৎসামান্য আলাপ। সেই সামান্য আলাপটুকুর সূত্র ধরে তাকে এই মধ্যরাত্রে একাকিনী এই গঙ্গার নির্জন উপকূলে নিয়ে এসেছে, কিনা তার বেহালা শুনবে বলে।

ব্যবহারে আলাপে এমন একটা গভীর হৃদ্যতার স্পর্শ যেন কত কতকালের আলাপ ওদের দুজনার পরস্পরে।

একি ঐ অনন্য ধনী সুন্দরী অভিনেত্রীর তাকে নিয়ে খেয়াল, না নিছক একটা কৌতুক! খেয়ালই যদি হয় তো বিচিত্র খেয়ালই বলতে হবে। আর যদি হয় কৌতুক তো নিঃসন্দেহে মর্মান্তিক!

বটগাছের তলায় একটা পাথর পড়েছিল! কেমন করে পাথরটা ওখানে এলো কেউ হয়ত জানে না। জানবার প্রয়োজনও হয়ত আজ পর্যন্ত কেউ কখনো বোধ করেনি। আর জানবার প্রয়োজনটাই বা কি! এমনি কত পাথরই তো কত জায়গায় পড়ে থাকে।

মৃদু মৃদু বায়ু প্রবাহে পাতাগুলো অদ্ভুত কেমন একটা সিপ্ সিপ্ শব্দ করছে। আজ কোন তিথি কে জানে।

কাস্তের মত বাঁকা একফালি চাঁদ। তারই মৃদু আলোয় আকাশ, গঙ্গাবক্ষ চারিদিক যেন অদ্ভুত স্বপ্নের মতো মনে হয়। গঙ্গার অপর তীরভূমি, গাছপালা বাড়িগুলো অস্পষ্ট, একটা ধূসরপটে আঁকা যেন।

মুগ্ধদৃষ্টিতে সামনের দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়েছিল পার্থপ্রতিম।

স্নিগ্ধকণ্ঠে অনুরোধ এলো, বসুন।

চমকে চেয়ে দেখলো পার্থ, পাথরটার সামনেই একটা কালো বেহালার বাক্স দাঁড় করানো রয়েছে এবং পরিধানে দামী জর্জেটের শাড়ী নিয়েই নোংরা পাথরটার উপর ইতিমধ্যে কখন একসময় বসে পড়েছে মিতা।

একটু ইতস্তত করে পার্থ তারপরে মিতার পাশে বসে পড়ে।

ভারি সুন্দর, না! মিতা পার্থর দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করে।

হ্যাঁ—

এমনি রাতে এমনি জায়গায় কখনো এর আগে এসেছেন!

না।

কখনো আসেন নি!

না!

আশ্চর্য! কখনো এমনি রাতে এমন একটি নির্জন জায়গা কি মনে পড়ে না আপনার। কিন্তু জানেন, আমার পড়ে। এজায়গাটা আমার অত্যন্ত পরিচিত। প্রায়ই এমনি রাতে এখানে আমি এসে এই পাথরটার উপর একা একা বসে থাকি।

আশ্চর্য তো!

কেন, এতে আশ্চর্যের কি আছে?

ভয় করে না?

না। ভয় করবে কেন! তারপর একটু থেমে আবার মিতা বলে, জীবনে অনেক ভয়, অনেক আশংকা সামনে আমার এসেছে তাই, ভয় আর শংকা ও দুটো বস্তুকেই আমি আর আমল দিই না। কিন্তু যাক সে কথা। আমার কথা বলবার জন্য এমনি করে এই রাত্রে আপনাকে আমি ধরে আনিনি, এনেছি আপনার বেহালা শুনবো বলে। নিন বাক্স থেকে বেহালাটা বের করে শুরু করুন!

অগত্যা পার্থকে বাক্স থেকে বেহালাটা বের করে তুলে নিতেই হলো।

একেবারে নতুন আনকোরা বেহালা।

কিন্তু বেহালাটা যে বিশেষ ভাবে তৈরী ও অনেক দামী সেটা হাতে নিয়েই দক্ষ বাজিয়ে পার্থর বুঝতে দেরী হয় না।

কাঁধের উপর রেখে থুঁতনী দিয়ে চেপে ধরে বেহালার তারের গায়ে ছড়ির টান দিতেই, নিশীথের সেই গঙ্গাতীরের শান্ত নির্জনতা যেন শিহরিত হয়ে উঠলো। বার দুই ছড়িটা তারের বুকে এদিক ওদিক টেনে শুরু করলো পার্থ বাগেশ্রী আলাপ।

মধ্যরাত্রির সেই স্তব্ধ নিঃসঙ্গ প্রকৃতি, সুরের স্পর্শে যেন শিহরিত হয়ে ওঠে।

কত দিনকার ঐ পাথরটি। কত দিন ধরেই হয়তো ওখানে অমনি পড়ে আছে। কত কে হয়ত কত সময় ওর উপরে এসে বসেছে কিন্তু এমনি করে কি কোন নিশীথরাতে এমনি সুরের মধ্যে মগ্ন হয়েছে কেউ। লীন হয়ে গিয়েছে কেউ।

সব, সব—যেন ভুলে যায় পার্থ! সুরের মধ্যে সে যেন নিজেকে হারিয়ে

ফেলে! ভুলে যায় সে কোথায়, ভুলে যায় তার পার্শ্বে উপবিষ্ট শ্রোতাটির উপস্থিতির কথাটুকুও বুঝি।

বাজিয়ে চলে সে আপন মনেই একটার পর একটা সুর।

তারপর এক সময় বাজনা থামিয়ে পাশাপাশি দুজনে চুপ চাপ বসে থাকে আরো কিছুক্ষণ!

চলুন, ওঠা যাক—এক সময় মৃদুকণ্ঠে বলে মিতা।

চমকে ওঠে পার্থ যেন মিতার ডাকে।

উঠুন—তিনি হয়তো এখনো আপনি ফিরছেন না দেখে এতক্ষণে চিন্তায় চিন্তায় অস্থির হয়ে পড়েছেন!

কে?

কেন, যিনি আপনাকে প্রতি রাত্রে বাড়ির দরজা খুলে দেন!

গাড়িতে উঠে বসে গাড়ি চালাতে চালাতে আবার এক সময় প্রশ্ন করে মিতা, কিন্তু সত্যিই কে বলুন তো সে?

কার কথা বলছেন?

ঐ যে সেদিন রাত্রে যিনি এসে দরজা খুলে দিলেন।

ও।

কে সে!

আপনি তো চিনবেন না তাকে!

তা জানি। তাইতো জিজ্ঞাসা করছি তার পরিচয়।

আমরা যে বাড়িতে আছি সেই বাড়িরই নিচের তলায় থাকে তারা, ওর তিনটি বোন আর ওদের বৃদ্ধ দাদু।

কি নাম?

অনীতা।

তার পরই মিতা যেন কেমন অন্যমনস্ক হয়ে যায়।

স্তব্ধ নিঃসঙ্গ রাত্রির মধ্য প্রহর। কাস্তের মত সরু সেই একফালি চাঁদটা ইতিমধ্যে কখন যেন মহাশূন্যে দুলতে দুলতে পশ্চিম প্রান্তে হেলে পড়েছে।

মধ্য রাত্রির আলোছায়া ঘেরা বোবা রাত্রি।

॥ দুই ॥

রাত প্রায় পৌনে একটা বেজে যায় বাড়ি ফিরতে। এত রাত করে কখনো পার্থ বাড়ি ফেরে না। মিতার অনুমান মিথ্যা নয়। সত্যিই অনীতা পার্থের ফেরার পথ চেয়ে জেগে ছটফট করছিল।

আজও মিতা গলি পর্যন্ত তার পিছু পিছু এসে, অনীতা দরজা খুলে দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই কখন যে চকিতে গলির মুখে অন্ধকারে মিলিয়ে গিয়েছে পার্থ আদৌ টের পায়নি।

এবং সে রাত্রের মত আজও রাত্রে দরজা খুলতেই অনীতা পার্থর পিছনে অদূরে দণ্ডায়মান মিতাকে দেখতে পেয়েছিল।

কিন্তু আজ আর অনীতা সে রাত্রের মত চুপ করে থাকলো না মিতা সম্পর্কে।

সিঁড়ি দিয়ে উঠছে পার্থ, পিছনে দিক থেকে অনীতা ডাকলো মৃদু কণ্ঠে, পার্থবাবু!

ঘুরে দাঁড়ায় পার্থ, আমাকে কিছু বলছিলে অনু?

ঐ ভদ্রমহিলা কে? যিনি আপনার পিছনে ছিলেন!

ওকে চেনো না?

না তো!

মিতা রায়।

ও! মিতা রায় কে?

অনীতার কৌতূহল হওয়ার স্বাভাবিক কারণ সে বড় একটা সিনেমায় যায় না। আর সিনেমা জগতের কোন সংবাদও রাখে না।

কাল বলবো অনু। আজ বড্ড ঘুম পাচ্ছে।

পার্থ আর দাঁড়ালো না। সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠে গেল।

সত্যিই ঘুমে চোখ দুটো যেন বুজে আসছিল তখন পার্থর।

কিন্তু শয্যায় শোওয়ার পর চোখের ঘুম যে কোথায় চলে গেল পার্থ বুঝতে পারে না। অন্ধকারে খোলা জানালা পথে বাইরের রাতের কালো আকাশটার দিকে সে চেয়ে রইলো কেবল।

পরের দিন মিতা সন্ধ্যার পর স্টুডিও থেকে শুটিং করে ফিরে, শয়ন ঘরে ক্লান্ত দেহটা একটা আরাম কেদারার পরে এলিয়ে দিয়ে, চোখ বুজে পড়ে আছে, ভৃত্য এসে জানালো, স্যাণ্টি বোস এসেছে।

ভ্রূকুঞ্চিত করে ভৃত্যের মুখের দিকে তাকালো মিতা।

বাইরের ঘরে বসে আছেন বাবু! ভৃত্য বলে।

এখন দেখা হবে না বলে দিগে যা।

কি ব্যাপার?

সহসা ঐ মুহূর্তে স্যাণ্টির কণ্ঠস্বরে চমকে চোখ তুলে তাকালো মিতা সামনের খোলা দরজার দিকে।

তার অনুমতির অপেক্ষা রাখেনি স্যাণ্টি, সোজা একেবারে তার শয়নঘরে চলে এসেছে ভৃত্যকে দিয়ে সংবাদ দেবার সঙ্গে সঙ্গেই।

শিথিল দেহবাস সামলানোরও যেন সময় পায় না মিতা। তাড়াতাড়ি সামলাতে সামলাতে বলে ওঠে, পাশের ঘরে একটু বোস স্যাণ্টি, আসছি—

ও কে—বলে স্যাণ্টি পাশের ঘরে চলে গেল।

সহসা স্যাণ্টির ঈদৃশ ব্যবহারে মিতার মনটা যেন অত্যন্ত বিরূপ হয়ে ওঠে, বিরক্তি ও বিতৃষ্ণায়।

কিন্তু মিতা ভুলে যায় যে স্যাণ্টির আজকের ঐ ব্যবহারের পিছনে রয়েছে তারই দেওয়া দিনের পর দিন প্রশ্রয়। শুধু স্যাণ্টিই নয়। ওদের অনেককেই এত বেশি প্রশ্রয় ও দিয়ে এসেছে যে ওরা আজ পরস্পরের প্রতি বিশেষ করে

মিতাকে ঐটুকু সম্মান দেখানোও প্রয়োজন মনে করে না।

মিতার নিজেরই আচারে ব্যবহারে ওরা যেন মিতাকে গৃহস্থ ঘরের কোন মেয়ে বা বধূর মতো ভাবা প্রয়োজনই বোধ করে না।

এবং সে জন্য দোষ ওদের তো নয়, মিতারই।

একটু পরেই মিতা এসে পাশের ঘরে প্রবেশ করলো।

এই যে মিতা, কি ব্যাপার বলতো?

একটা সোফায় বসতে বসতে মিতা বলে, কেন কি ব্যাপার!

কয়দিন থেকে সন্ধ্যার পর তোমার খোঁজে এসে তোমার কোন পাত্তাই পাচ্ছি না। চাকরটাও বলছিল কয়দিন থেকে রাত করে বাড়ি ফেরো। কোন নাইট শুটিংয়ের প্রোগ্রাম চলছে নাকি?

না। সে রকম কিছু নয়।

তবে!

সব কথাই সকলকে বলতে হবে নাকি!

তাই বুঝি! বলতে বলতে স্যান্টি নিজের সোফা থেকে উঠে মিতার সোফায় তার একেবারে পাশ ঘেঁষে এসে বসে পড়লো।

আড়চোখে মিতা একবার তাকালো স্যান্টির দিকে।

মিতা!

কি?

স্যান্টি পরক্ষণেই হাত বাড়িয়ে মিতার একখানি হাত ধরতেই মিতা তার হাতটা ছাড়িয়ে নিয়ে একটু সরে বসলো।

আমার পরে রাগ করেছো মিতা?

হঠাৎ রাগ করতে যাবো কেন।

তবে?

অন্য সময় এসো সনৎ, শরীরটা বড় ক্লান্ত বোধ করছি, বলতে বলতে উঠে দাঁড়ালো মিতা এবং সনৎকে দ্বিতীয় আর কোন কথার অবকাশ মাত্রও না দিয়ে ঘর থেকে বের হয়ে গেল।

কেমন যেন বিশ্রী একঘেয়ে লাগছে এ জীবন।

কোন অর্থ, কোন উদ্দেশ্যই যেন আর মিতা খুঁজে পাচ্ছে না। কেমন যেন ক্লান্ত অবসন্ন লাগে সর্বক্ষণই। কোথায় যেন মনে হয় চেনা সুরটা হঠাৎ কেটে গিয়েছে।

কয়েক দিন আগে তার সর্বশেষ নতুন ছবি 'রাত হলো অনেক' শহরের চারটি হাউসে রিলিজ হয়েছে। প্রত্যেকটি শো-ও হাউস ফুল যাচ্ছে।

চারিদিকে তার অভিনয়ের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা শোনা যাচ্ছে।

কত নতুন ও পুরাতন চেনা প্রডিউসাররা বাড়ি বয়ে তাকে কনগ্র্যাচুলেশন জানাতে এসে তার দেখা না পেয়ে ফিরে গেছে এই দু'দিন ক্ষুণ্ণ মনে।

বাড়ি থেকেও মিতা আজকাল বড় একটা বের হয় না। দিবারাত্র নিজের শয়নঘরে শুয়ে থাকে না হয় বসে বসে অলসভঙ্গীতে কাটায়।

সেদিনও সন্ধ্যার পরে নিজের শয়ন ঘরে একটা সোফার পরে বসেছিল হঠাৎ কি খেয়াল হতেই উঠে পড়লো এবং ফোনটা তুলে শহরের নাম করা একটা হাউসে কনেকশন চাইল।

সে হাউসেও তখন তার 'রাত হলো অনেক' চলছে।

হ্যালো চিত্রবাণী!

বলছি বলুন, ওপাশ থেকে জবাব এলো।

রাত সাড়ে নয়টার শো-র হায়ার ক্লাসের কোন টিকিট আছে?

চার টাকার টিকিট পাবেন।

মিস রয়ের নামে দুখানা সীট রাখবেন দয়া করে।

রাখবো।

মিতা ফোনটা নামিয়ে রাখলো।

তারপর একটু পরেই আবার ডায়াল করে ফোনটা তুলে নিল। হ্যালো, ক্যাফে দা মনিকো'!

ইয়েস!

আপনাদের অর্কেস্ট্রার ভায়োলোনিসট্ মিঃ পার্থপ্রতিম চৌধুরী এসেছেন?

হ্যাঁ।

তাকে একটু অনুগ্রহ করে ডেকে দেবেন ফোনে।

কি নাম বলবো!

কোন নাম বলতে হবে না, বলুন, একজন ভদ্রমহিলা ডাকছেন।

আচ্ছা ধরুন, দেখছি।

॥ তিন ॥

একটু পরেই ওপাশ থেকে পার্থর গলা ভেসে এলো, হ্যালো কে?

মিঃ চৌধুরী!

কথা বলছি! কে আপনি?

বলুনতো কে!

সাড়া নেই অন্য পাশ হতে।

মিষ্টি হাসির শব্দ তরঙ্গ একটা, তারপরই মৃদু নারী কণ্ঠস্বর আবার পার্থর কানে ভেসে এলো, কি চিনতে পারছেন না?

চিনলাম। কিন্তু কি ব্যাপার?

চিনেছেন, বলুনতো কে!

মিতা দেবী!

বাঃ এইতো দেখছি, সত্যি সত্যিই চিনেছেন! শুনুন, ঠিক ন'টা পনেরয় আপনার ওখানে আমি পেঁাচাচ্ছি, আমার সঙ্গে এক জায়গায় আপনাকে যেতে হবে।

কিন্তু আমার যে রাত এগারটা পর্যন্ত অর্কেস্ট্রায় প্রোগ্রাম রয়েছে বাজাবার।

একটা রাত না হয় রাত ন'টায় আমার জন্য ছুটি নিলেনই! পারবেন না!

তা ঠিক নয় তবে –

তবে আবার কি ? আমি যাচ্ছি, প্রস্তুত থাকবেন।

শুনুন, মানে বলছিলাম—

কিন্তু অন্যদিকে মিতা তখন ফোন নামিয়ে রেখেছে !

আশীর সামনে দাঁড়িয়ে প্রসাধন করতে করতে গুণ গুণ করে আপন মনে গাইছিল তার প্রিয় গানটি, বকুল গন্ধে বন্যা এলো—

কাঞ্চি এসে ঘরে ঢুকলো, আমাকে ডেকেছিস ?

হ্যাঁ রে শোন, আজ রাত্রে এখানে একজন খাবে, বাজার থেকে মাংস নিয়ে আয়, ভাল করে যেন রান্না করে।

কাঞ্চি ঘর থেকে বের হয়ে গেল।

শাড়ী আর যেন পছন্দই হয়না মিতার। রং পছন্দ হয়তো পাড় পছন্দ হয়না, পাড় হয়তো রঙটা শাড়ীর মনে ধরে না।

শেষপর্যন্ত অনেক বাছাবাছি করে কালো জরিপাড় সাদা জমীনের একটা দামি সিল্কের শাড়ী ও কালো সিল্কের উপর সাদা জরির বুনোন একটা ব্লাউজও বেছে নিল। শাড়ীটা পরে মাথায় তুলে দিল গুণ্ঠন !

মাথায় ইতিপূর্বে কখনো গুণ্ঠন দেয়নি মিতা, এই প্রথম !

ঠিক রাত সোয়া নয়টায় মিতার বিরাট প্লিমাউথ গাড়ি এসে বিচিত্র শংখ হর্ণের শব্দ তুলে 'কাফে দ্য মনিকো'র পেভ্‌মেণ্টের সামনে পার্ক করলো।

প্রায় সঙ্গে সঙ্গে কাচের দরজা খুলে হোটেল থেকে বের হয়ে এলো পার্থ।

আজ আর গাড়িটা চিনতে পার্থর কষ্ট হয় না !

সোজা সে গাড়ির সামনে আসতেই গাড়ির সামনের দরজা খুলে মিতা আহ্বান জানায়, আসুন—

গাড়ির মধ্যে উঠে বসতেই সেই পরিচিত সেণ্টের গন্ধটা এসে পার্থর নাকে ঝাপ্‌টা দেয় !

গাড়ি ছেড়ে দেয় মিতা।

এদিক ওদিক খানিকটা অনির্দিষ্টভাবে ঘুরে অবশেষে মিতা গাড়ি এনে পার্ক করলো রাত পৌনে দশটা নাগাদ চিত্রবাণী হাউসের সামনে।

বসুন, আসছি—মিতা গাড়ি থেকে নেমে চলে গেল।

সামনেই বিরাট ব্যানার। ব্যানারে মিতা রায়ের বিচিত্রভঙ্গির মনোহারিণী বিরাট একটি মুখ আঁকা রয়েছে।

তার উপরে নিওনে লেখা ঃ রাত হলে অনেক।

একটু পরে মিতা ফিরে এসে বললে, চলুন !

গাড়ি থেকে নেমে তাকালো মিতার দিকে পার্থ।

কিন্তু গুণ্ঠনের তলায় মিতার মুখ ঢাকা পড়েছে।

নিঃশব্দে মিতাকে অনুসরণ করে পার্থ হলের মধ্যে গিয়ে প্রবেশ করলো।

অন্ধকার হলে তখন স্ক্রিনে নিউজ শেষে ইন্টারভ্যালের পরে ছবির টাইটেল পড়েছে।

নির্দিষ্ট সীটে গিয়ে বসলো দু'জনে পাশাপাশি।

রূপালী পর্দায় বিরাট দুটি নাম সর্বপ্রথম ভেসে ওঠে। মিতা ও কৃষ্ণকুমার অভিনীত, রাত হলো অনেক।

অপূর্ব লাস্যময়ী অভিনেত্রী মিতা রায় যেন কল্পনা দিয়ে গড়া, সৌন্দর্যের তিলোত্তমা।

ক্বচিৎ কখনো সিনেমা দেখে পার্থ। অবাক বিস্ময়ে তন্ময় হয়ে দেখছিল সে মিতার অভিনয়। আর যত দেখছিল ততই যেন মনের মধ্যে কোথায় একটা অস্বস্তির কাঁটা কিচ্ কিচ্ করে বিঁধছিল।

বেশভূষা ও অঙ্গভঙ্গি, হাসি ও চাহনির ভিতর দিয়ে অভিনয়ের যে যে মুহূর্তে মিতার যৌন আবেদন স্পষ্ট হয়ে উঠছিল সেইগুলোই যেন পার্থর কুৎসিত মনে হচ্ছিল। মনে হচ্ছিল রুচির বিকার।

কেমন লাগছে?

ভাল না!

সমস্ত হাউস তখন থেকে থেকে উল্লাস জানাচ্ছে!

মিতা যেন পার্থর কথায় চমকে ওঠে। বলে, ভাল না!

না।

কেন?

আপনার চোখ থাকলে আপনি বুঝতে পারতেন ছবির প্রডিউসার টাকা দিয়ে আপনার নগ্ন দেহের আবেদনকে কি জঘন্য ও বিশ্রীভাবে একস্প্লয়েট করেছে। এ রেস্পনস্ আপনার অভিনয়ের নয় নগ্ন দেহের—

পার্থর কথাটা শুধু রূঢ়ই নয় রীতিমত যেন আঘাতও করে মিতার মর্যাদাবোধে।

তাড়াতাড়ি সে উঠে পড়ে বলে, চলুন—

শেষ পর্যন্ত দেখবেন না?

না, চলুন—

অন্ধকারেই দুজনে হাউস থেকে বের হয়ে এলো।

ইতিপূর্বে দু একটা কাগজে এই ধরনের ঠিক না হলেও স্পষ্টস্পষ্টি অনুরূপ ইঙ্গিত দিয়ে বিশ্লেষণ মিতার করেনি তা নয়।

কিন্তু মুখের উপরে কেউ তাকে এমনি নিষ্ঠুর বিশ্লেষণে আঘাত করতে পারে এ যেন মিতার স্বপ্নেরও অতীত ছিল।

শুধু আঘাতই নয় বিশ্লেষণের দ্বারা অভিনেত্রী জীবনে আজ যেখানে তার সব চাইতে বড় স্বীকৃতি এবং যেটা সে মুখে না স্বীকার করলেও মনে মনে স্বীকার করা ছাড়া আর উপায় ছিল না সেই খানেই আজ পার্থ তাকে আঘাত করেছে অত্যন্ত স্পষ্ট ও রূঢ়ভাবে।

গাড়িতে এসে উঠে বসে গাড়ি ছাড়তেই পার্থ শুধালো, কি হলো অমন করে অর্ধেক বই হতে না হতেই উঠে এলেন কেন?

আমি তো দেখতে যাইনি, আপনাকে দেখাতে নিয়ে গিয়েছিলাম। তা আপনারই যখন ভাল লাগছিল না—

কে বললে আমার ভাল লাগেনি!

কেন, আপনি তো বললেন!

আমি বলেছি!

বলেন নি? কুৎসিত, জঘন্য—

হ্যাঁ, বলেছি কিন্তু সেটা তো আপনার অভিনয়কে বলিনি, বলেছি ডাইরেক্টার ও ক্যামেরাম্যান আপনার দেহটাকে যে ভাবে চোখের সামনে স্পষ্ট করে ফুটিয়ে তুলছে সেইটা সম্পর্কেই—

পার্থর শেষের কথাগুলোর জবাব দেয় না মিতা।

গত চারটে বছর ধরে চিত্রজগতে সাফল্যের সঙ্গে সঙ্গে মিতা দিনের পর দিন শুনে এসেছে জনে জনের কাছ থেকে উচ্ছ্বসিত প্রশংসাই কেবল।

শুনে এসেছে তার দেহের প্রশস্তি, অভিনয়ের অত্যাশ্চর্য ক্ষমতার কথাই।

চাটুকার আর তোষামুদের দল তারা।

কোন না কোন স্বার্থ ব্যতীত যাদের আর কোন উদ্দেশ্যই নেই।

আর তাদের সেই উচ্ছ্বাসের কল্পনার স্বর্গে সে করেছে স্বচ্ছন্দ বিহার লঘু পক্ষ ডানা মেলে যেন। কিন্তু পার্থ তো সে দলে পড়ে না।

আর সেটা বুঝতে পারেনি বলেই পার্থর সমালোচনাটা মিতাকে আঘাত করেছিল।

পার্থকে তার বাড়িতে নামিয়ে দিয়ে ভারাক্রান্ত হৃদয়ে বাড়ি পৌঁছে মিতা গাড়ি থেকে নেমে নিজের বসবার ঘরে ঢুকতেই থমকে দাঁড়ালো।

ঘরের মধ্যে বসে আছে সোফায় সনৎ বোস অর্থাৎ স্যাণ্টি!

সামনে টেবিলের পরে রক্ষিত বিচিত্র হাঙর-মুখ এ্যাসট্রেটা দগ্ধ সিগারেটের শেষাংশে ও ছাইয়ে স্তূপীকৃত হয়ে উঠেছে।

কি ব্যাপার স্যাণ্টি? এত রাত্রে?

সনৎ অর্থাৎ স্যাণ্টি উঠে দাঁড়ালো। দু'চোখে তার কুটিল দৃষ্টি।

কোমরে বেল্ট বাঁধা দামী ট্রপিক্যালের এ্যাসকলারের ট্রাউজার, গায়ে দামী ক্রিমরংয়ের সিল্কের সার্ট, কব্জির উপরে হাতাটা গোটানো।

হাতের জ্বলন্ত সিগারেটটায় একটা টান দিয়ে সনৎ বললে, হ্যাঁ, তোমারই অপেক্ষায় মিতা। অর্কেস্ট্রার ঐ ভায়লনিষ্ট ছোকরাটাকে কবে থেকে পাকড়াও করলে?

তীক্ষ্ণ জ্বলন্ত দৃষ্টিতে যেন তাকালো মিতা সনতের দিকে।

কি ম্যাডাম্, জবাব দিচ্ছ না যে!

তুমি বোধহয় প্রকৃতিস্থ নও সনত, ইউ বেটার গো হোম! তাছাড়া রাতও অনেক হয়েছে—

কথাগুলো বলে ভিতরে যাবার জন্য পা বাড়ায় মিতা।

সনৎ বোস অন্যকে ড্রিংক করায় নিজে ড্রিংক করে না অন্তত কথাটা তোমার অজানা তো নয়।

সনৎ ?

কাকে চোখ রাঙাচ্ছো ম্যাডাম ? সনৎ বোসকে বোধহয় আজো চেনোনি !

সহসা যেন সনতের শেষের কথায় মনের ভারসাম্য হারিয়ে ফেলে মিতা। একেই পার্থের কথায় মনটা বিষণ্ণ ও বিক্ষিপ্ত হয়েছিল কিছুক্ষণ থেকে, তার উপরে সনৎ বোসের ভদ্রতাবিরুদ্ধ ব্যবহার তাকে যেন মুহূর্তে একবারে ক্ষিপ্ত করে তোলে।

কঠিন কণ্ঠে বলে মিতা, জানবো না কেন, খুব জানি। বাপের পয়সায় কাপ্তানী করে বেড়াচ্ছো কতকগুলো লোফার গুণ্ডা ক্লাসের বয়াটে ছোকরা নিয়ে—

তাই বুঝি ! কিন্তু সুন্দরী, আর একটা কথা হয়তো জান না, যে মুখ আর চোখ ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে তুমি চিত্রজগতে গ্ল্যামারের সৃষ্টি করেছো ও মুখ আর চোখ একটি এ্যাসিড্ বাল্ব দিয়ে এমন করে দিতে পারে সনৎ বোস, যে—

গেট আউট, গেট আউট—

চিৎকার করে ওঠে মিতা।

চিৎকার আর চেঁচামেচি শুনে ততক্ষণে পাঞ্জাবী দারোয়ান বলবীর সিং পারলারে ছুটে এসেছে দরজার সামনে।

ইসকো ঘাড় পাকাড়কে আভি বাহার নিকাল দো বলবীর—

চিৎকার করে ওঠে মিতা।

ও কে—সনৎ বোসের পরিচয় এবার তুমি ভাল করেই পাবে ! ছায়াচিত্রের অভিনেত্রী—কুলটা—

ঝড়ের মতই কথাগুলি বলে সনৎ বোস বের হয়ে গেল।

দু'হাতে মুখ ঢেকে সোফার উপরে বসে পড়লো মিতা।

ঝর ঝর করে দশ আঙুলের ফাঁকে ফাঁকে অশ্রু গড়িয়ে পড়তে থাকে।

ফিরতে এতো রাত হলো যে পার্থ।

মা মৃন্ময়ী এসে পাশে দাঁড়ালেন।

একি মা, তুমি এখনো জেগে আছো !

হ্যাঁ, কিন্তু এত রাত হলো যে ফিরতে !

সিনেমায় গিয়েছিলাম। তাছাড়া এমনি রাত করেই তো বরাবর আমি ফিরি মা। আজ তো নতুন নয়।

কদিন থেকেই একটা কথা তোকে বলবো বলবো ভাবছিলাম।

কি কথা মা !

আর কেন, এবারে বিয়ে-থা কর একটা।

তুমি তো সব জান মা !

জানি বলেই তো বলছি, সে মরীচিকার আশায় আশায় আর থেকে লাভটা কি আর তা ছাড়া সেটা কি একটা বিয়ে ?

মরীচিকা কিনা জানি না মা, আর ভিতরে যে ব্যাপারই থাক না কেন

তোমাকে তো আমি বলেছি, সেদিন তাকে সর্বান্তঃকরণেই স্ত্রী বলে গ্রহণ করেছিলাম।

কোথায় থাকে, কি নাম ধাম পরিচয় গোত্র কিছুই জানিস না, টাকার লোভে পড়ে কাকে না কাকে গিয়ে হুট করে বিয়ে করে বসেছিলি। আমার তো মনে হয় ও কোন শয়তানের কারসাজী!

তবু সেই আমার স্ত্রী মা! এ জীবনে আবার তাকে খুঁজে পাই ভালই নচেৎ যতদিন পর্যন্ত না জানছি সে বেঁচে নেই বা মৃত ততদিন আর কাউকেই স্ত্রী বলে অন্তত আমি গ্রহণ করতে পারবো না মা।

এই নয় বছর ধরে তো কম খুঁজলি না। তাছাড়া সে যদি বেঁচেই থাকতো তবে কি একটা না একটা সন্ধান তার পাওয়া যেতো না ভাবিস?

আজো তেমন করে আর কোথায় তার খোঁজ করতে পারলাম মা!

কিন্তু আমিই বা আর কতদিন বাঁচবো পার্থ! এ শূন্য ঘরে আর মন বসে না। একমাত্র ছেলে তুই আমার, তোর বিয়ে দিয়ে বৌ ঘরে আনবো সে সাধও কি মিটবে না।

আর কিছুদিন তুমি অপেক্ষা কর মা। আমার ধারণা নিশ্চয়ই সে বেঁচে আছে, নিশ্চয়ই সে আমাকে খোঁজ করছে। তার সন্ধান আমি পাবোই!

মৃন্ময়ী আর কোন কথা বললেন না। ঘর থেকে বের হয়ে গেলেন।

॥ চার ॥

সত্যিই কি তাহলে এই দীর্ঘ নয়টা বৎসর ধরে মিথ্যে এক মরীচিকার পিছনেই আশার আশায় আজও দিন গুণছে সে।

কোন দিনই এ জীবনে তার সন্ধান আর সে পাবে না।

আশ্চর্য সেই রাতটি একটি স্বপ্নের মতই তার জীবনের পাতা থেকে চিরদিনের মতই মুছে গিয়েছে। সে তাকে ভুলে গিয়েছে একথা যেন মনে ভাবতেও পারে না।

মন যেন তার কিছুতেই বিশ্বাস করতে চায় না যে, সে তাকে সত্যি সত্যিই ভুলে যেতে পারে। আর এও তার মন বিশ্বাস করতে চায় না যে, সে আর বেঁচে নেই।

আছে। সে এই পৃথিবীর কোথাও না কোথাও নিশ্চয়ই আজো বেঁচে আছে। একদিন না একদিন তার সন্ধান সে পাবেই।

তার স্ত্রী! তার সহধর্মিনী!

মিথ্যা নয় তার জীবনের সেই আশ্চর্য রাতটি।

মিথ্যা নয় তার সেই স্ত্রী! তার বধূ!

সেই আশ্চর্য রাতটি! চোখ বুজলেই আশ্চর্য সেই রাতটি যেন স্মৃতির পাতায় জ্বলজ্বল করে ওঠে।

দুজনারই ইচ্ছা ছিল সে রাতটি ঘুমাবে না। জেগেই দু'জনা রাতটা কাটিয়ে দেবে। কিন্তু আধ ঘণ্টা যেতে না যেতেই দু'চোখে তার কি

ঘুম যে নেমে এলো।

করুণ কণ্ঠে সে যখন বললে, বড় ঘুম পাচ্ছে যে!

পার্থও বলেছিল, আমারও। কিন্তু ঘুমাতে যে চাই না মিনু!

মিনু বলে, আমিও চাই না।

তবু কেউই তারা সে রাত্রে জেগে থাকতে পারেনি।

ঘুমিয়ে পড়েছিল তারা দু'জনাই!

তারপর ঘুম যখন ভাঙলো—

ঘড় ঘড় একটা শব্দ কানে এসে বাজছে। দুলছে যেন সব কিছু! দে'লায় শুয়ে শুয়ে পার্থও যেন দুলছে।

প্রথমটায় কিছুই বুঝতে পারে না। সব অস্পষ্ট ধোঁয়াটে!

ক্রমশঃ সেই ধোঁয়াটে ভাবটা কেটে যেতে দেখলো অচেনা একটা বাড়ির ছোট অপরিসর একটা ঘরে লোহার একটা খাটের পরে শুয়ে আছে।

সেই আশ্চর্য রাত! তারপর সেখান থেকে অপরিচিত এই ঘরের মধ্যে সে এলো কি করে। সব যেন কেমন গোলমাল হয়ে যায়।

বোধশক্তিটা যেন জট পাকিয়ে যায়।

একাকী একটা ঘরের মধ্যে সে শুয়ে। দ্বিতীয় আর প্রাণী ঐ ঘরের মধ্যে নেই! খোলা জানালাপথে বাইরের দিকে তাকালো। কিন্তু কিছুতেই বুঝতে পারে না পার্থ কোথায় রয়েছে সে।

আর বুঝতে পারে না এখানেই সে এলো কি করে!

অনেক—অনেকক্ষণ ধরে যেন পার্থ ঘুমিয়েছে।

শরীর যেন শিথিল অবসন্ন। তবু উঠে বসলো পার্থ! চারদিকে তাকালো। অপরিচিত ঘর। এ ঘর সে কখনো দেখেনি।

ঘরের খোলা জানালাপথে সকালের রোদ এসে পড়েছে ঘরে।

কত বেলা হয়েছে কে জানে।

নিজের বেশভূষার দিকে তাকালো। নতুন একটা তাঁতের ধুতি ও একটা আদ্দির পাঞ্জাবী পরিধানে। খাট থেকে উঠে দাঁড়ালো পার্থ। ঘরের দরজাটার দিকে অতঃপর এগিয়ে গেল। দরজাটা বন্ধ! বোধ শিকল তোলা।

কি ভেবে বার দুই দরজায় ধাক্কা দিতেই দরজাটা খুলে গেল।

সামনেই দাঁড়িয়ে একজন প্রৌঢ় ভদ্রলোক।

আপনার ঘুম ভেঙেছে! দু বার এসে ইতিমধ্যে আমি দেখে গিয়েছি! আপনি ঘুমাচ্ছিলেন। একটু অপেক্ষা করুন আপনার নামে একটা চিঠি আছে। সুবোধবাবু আপনাকে দেবার জন্য বলে গেছেন।

সুবোধ কোথায়?

তাতো জানি না! কাল রাত্রে আপনাকে এখানে রেখে চলে গেছেন।

এ বাড়িটা কার?

রথীনবাবুর।

রথীনবাবু কে?

মস্ত বড় ব্যবসায়ী লোক! মস্ত ধনী!

আপনি বুঝি এখানে থাকেন ?

হ্যাঁ, এ বাড়ির দেখাশোনা আমি করি। আপনি একটু অপেক্ষা করুন চিঠিটা এনে দিচ্ছি আমি।

ঘরের মধ্যে ফিরে এসে আবার পার্থ খাটের উপর বসলো।

একটু পরেই ভদ্রলোক একটি মুখ আটা খাম এনে পার্থের হাতে দিলেন। খামটা হাতে করে নিয়ে পার্থ সেটা পকেটে রাখতে গিয়েও কি ভেবে আবার সেটার মুখ ছিঁড়ে খুলতেই ভিতর থেকে একশত টাকার দুইখানি নোট ও ছোট একটা চিঠি বের হয়ে এলো।

প্রথমেই চিঠিটা পড়লো পার্থ।

প্রিয় পার্থ,

তোমার বাকী দুইশত টাকা এই চিঠির সঙ্গে খামের মধ্যে রেখে দিলাম। এই চিঠি যে তোমাকে দেবে তাকে বললেই সে তোমাকে একটা গাড়ি ডেকে দেবে। রাত্রে তোমাকে নেশার দ্বারা ঘুম পাড়িয়ে এখানে তোমার অজ্ঞাতে সরিয়ে আনবার জন্য আমি দুঃখিত। এর প্রয়োজন হতো না কিন্তু মেয়ে দেখে যে তোমার মাথা ঘুরে যাবে আর তুমি তোমার প্রতিজ্ঞা ভুলে যাবে এটা ভাবতে পারিনি। অনন্যোপায় হয়েই এই ব্যবস্থা রাতারাতি অবলম্বন করতে হয়েছে। আর একটা কথা—গত রাত্রের কথা ভুলে যাবার চেষ্টা করো। কারণ ওটা একটা বিয়েই নয় এবং ও বিয়ে সমাজ বা আইন কোন দিনই স্বীকার করবে না। ইতি—

সুবোধ

গাড়ি ডেকে দেবো ?

দরকার হবে না। বলে পার্থ ঘর থেকে বের হয়ে এলো।

ভদ্রলোক তাকে বাড়ি থেকে বের হবার পথটা দেখিয়ে দিলেন।

কলকাতা শহরেই টালীগঞ্জ অঞ্চলে বাড়িটা একটু ভিতরের দিকে। এবং খানিকটা হাঁটতেই বড় রাস্তা পাওয়া গেল।

অত্যন্ত পিপাসা পেয়েছিল। একটা ছোট চায়ের দোকানে ঢুকে চা দিতে বললো পার্থ। নিম্ন শ্রেণীর কয়েকটি লোক দোকানে বসে চা পান করছিল। পার্থকে অমন পরিষ্কার বেশভূষায় দোকানে ঢুকতে দেখে তার দিকে তাকালো তারা।

চা পান করে পকেট থেকে পয়সা বের করে দিয়ে আবার পথে এসে নামল পার্থ। মেসে ফিরে এলো বেলা এগারটা নাগাদ।

চিৎপুর অঞ্চলে গলির মধ্যে অন্ধকার একটা মেসে সে সময় থাকতো পার্থ। মেসে এসে প্রথমেই পার্থ সুবোধের খোঁজ করলো কিন্তু ভৃত্যের কাছে শুনলো, আগের দিন দ্বিপ্রহরের দিকে নাকি সুবোধ মেসের পাওনা গণ্ডা সব মিটিয়ে দিয়ে চলে গেছে।

কোথায় গিয়েছে কেউ বলতে পারলো না।

স্নান সেরে কিছু মুখে দিয়ে পার্থ আবার শয্যার উপরে এসে শুয়ে

পড়লো। নতুন করে যেন গত রাত্রের ব্যাপারটা সে ভাববার চেষ্টা করে।

সমস্ত ব্যাপারটার যেন আগাগোড়া একটা স্বপ্ন।

পকেট থেকে সুবোধের চিঠিটা বের করে আবার পড়লো।

সুবোধের সঙ্গে আলাপ এই মেসেই বছরখানেক আগে।

বছরতিনেক আগে গ্রামের স্কুল থেকে ম্যাট্রিক পাস করার পরই মামা তাকে ডেকে বলেন, আর তার ভার তিনি বইতে পারবেন না। নিজের ব্যবস্থা সে এবারে নিজে করলেই ভাল হয়। তবে যতদিন না সে একটা কাজকর্ম জুটিয়ে নিতে পারে, তার মা তাঁর কাছে থাকতে পারে।

অগত্যা তার কয়েকদিনই পরেই পার্থকে বের হয়ে পড়তে হয়।

দশটি টাকা ও বেহালার বাক্সটি নিয়ে চলে আসে পার্থ কলকাতায়। দশটি টাকা মাত্র সম্বল নিয়ে কোন হোটেলে ওঠা যায় না। আর উঠলেও দু'তিন দিনের বেশি সেখানে থাকা চলবে না। এবং শুধু তো তাই নয়। ঐ দশটি টাকাই তো মাত্র সম্বল। শেষ হয়ে গেলে তখন কিসে চলবে তার।

পাইস হোটেলে এক বেলা খায়, স্টেশন প্ল্যাটফরমে শুয়ে রাত কাটায় এবং সারাটা দিন চাকরি ও আশ্রয়ের সন্ধানে ঘুরে ঘুরে বেড়ায় পার্থ।

অপরিচিত শহর, কেউ তাকে চেনে না, কোন সুপারিশ পত্রও নেই, কে দেবে এই শহরে তাকে চাকরি আর কেই বা দেবে তাকে আশ্রয়।

ক্রমে হাতের সম্বল দশটি টাকাও ফুরিয়ে আসে। চোখে অন্ধকার দেখে পার্থ!

ঐ সময় একদিন শ্যামবাজার অঞ্চলে ঘুরতে ঘুরতে মায়ের দূরসম্পর্কীয় ভাই নকুড় মামার সঙ্গে পথের মাঝখানে দেখা হয়ে গেল পার্থর।

॥ পাঁচ ॥

পার্থর নকুড় মামা যাত্রার দলে চাকরি করেন। যাত্রার দলে অভিনেতা। দেখতে কালো হলেও বেশ সুন্দর চোখ মুখের গঠন ও চেহারা। মাথায় বাবরী চুল। যাত্রার দলে ভাল ভাল পার্ট অভিনয় করেন। অভিনয়ে নামও আছে যথেষ্ট।

অনেক দিন দেখাসাক্ষাৎ নেই,—প্রথমটায় চিনতে পারেননি নকুড় মামা পার্থকে। কিন্তু পার্থ যখন নকুড়চন্দ্রের পায়ের ধুলো নিয়ে বললে, আমাকে চিনতে পারছেন না নকুড় মামা! আমি পার্থ! পলাশডাঙার—

আরে, আরে—আমাদের মৃন্ময়ীর ছেলে না তুই!

আজ্ঞে হ্যাঁ—

তা এখানে কি করছিস?

একটা চাকরির চেষ্টায় ঘুরছি!

চাকরি! চাকরি কি গাছের ফল যে আঁকসী দিয়ে পেড়ে নিবি! তা আছিস কোথায়?

রাস্তায় রাস্তায়ই ঘুরছি—

তা হতভাগা আমার ওখানে যাসনি কেন! চ, চ—

নকুড় মামার সঙ্গেই তার বেনেটোলার বাড়িতে গিয়ে উঠলো পার্থ।

নকুড় মামা একা লোক বিয়ে থা করেন নি। বাসায় লোকজনের মধ্যে একজন চাকর ও ঠাকুর।

ছোট একটা বাড়ির নিচের তলায় তিনখানা ঘর নিয়ে নকুড় মামা থাকেন।

যাত্রা দলের অভিনয় করলেও আয় নেহাৎ খারাপ করে না। তবে খুব বেশী শৌখিন প্রকৃতির ও খাইয়ে লোক বলে যত্র আয় তত্র ব্যয়।

নকুড় মামার ওখানেই আশ্রয় পেল পার্থ। কিন্তু মাস দুই চলে গেল, চাকরির আর কোন সুবিধাই হল না। সামনেই পুজো আসছে।

নকুড় মামার 'শ্রীদুর্গা অপেরা পার্টি'র নতুন বইয়ের মহলা চলছে পুরোদমে, দিবারাত্র বেশীর ভাগ সময়ই নকুড় মামা রিহার্শালের ব্যাপার নিয়ে ব্যস্ত থাকেন। কখন আসেন কখন যান কিছুই ঠিক থাকে না। পার্থর সঙ্গে বড় একটা দেখাও হয় না।

সেদিন সারাটা দ্বিপ্রহর চাকরির সন্ধানে ঘুরে ঘুরে পার্থ সবে এসে বিছানায় শুয়ে ক্লান্ত হয়ে চোখ বুজেছে, দরজার গোড়ায় নকুড় মামার স্বর শোনা গেল, পার্থ ঘরে আছিস নাকি?

হ্যাঁ মামা।

নকুড় মামা ঘরে এসে ঢুকলেন।

কিরে চাকরি টাকরির কোন সুবিধা হলো?

না।

তা এক কাজ কর না।

কি মামা?

তুইতো দেখি চমৎকার বেহালা বাজাস!

রাত্রে মধ্যে মধ্যে পার্থ বেহালা বাজাতো,—বোধহয় তাই শুনে থাকবেন নকুড় মামা।

পার্থ বলে নিম্নকণ্ঠে, সামান্য একটু আধটু বাজাই—

পার্ট-টার্ট করা অভ্যেস আছে?

পার্ট!

হ্যাঁ রে, অভিনয়!

স্কুলে দু-একবার রিসাইটেশন করেছি!

চেহারা আছে গলা আছে ওতেই হবে নে ওঠ দেখি—চল আমার সঙ্গে।

কোথায়?

এবারে আমরা স্বর্ণলতা অভিনয় করছি। যে ছোকরা নীলকমলের রোল করছিল কাল সে চাকরিতে জবাব দিয়ে চলে গিয়েছে। তুই যদি ঐ পার্টটা করে দিতে পারিস তো একটা হিল্লে হয়ে যাবে!

কিন্তু মামা—

কি হলো, যাত্রার দলে চাকরিতে বুঝি মন উঠছে না।

না তা নয়। কিন্তু আমি কি পারবো?

পারবি না মানে, আলবৎ পারবি। আমার ভাগ্নে না তুই! নে ওঠ—

একপ্রকার জোর করেই যেন ধরে নিয়ে গেলেন পার্থকে নকুড় মামা রহাশালে।

দলের ম্যানেজার শশীকান্ত পার্থর চেহারা ও গলা শুনে ভারি খুশী। সঙ্গে সঙ্গে চাকরি হয়ে গেল পার্থর।

সিজনে মাসে পঞ্চাশ টাকা ও অফ সিজনে ত্রিশ টাকা মাস মাস।

পদ্ম তিথি আজ্ঞা দিলে
আমি যাবো পদ্মবনে—

বেহালায় পার্থর হাতটিও ছিল মিষ্টি এবং গলাও ছিল সুরেলা।

পার্থর গান আর বাজনা সেই সঙ্গে অভিনয় দর্শকজন 'বাহবা' 'বাহবা' করে ওঠে। মাস পাঁচেক ধরে পার্থ শ্রীদুর্গা অপেরা পার্টির সঙ্গে কাটোয়া, মুর্শিদাবাদ, কৃষ্ণনগর, নবদ্বীপ, বহরমপুর, নানা জায়গায় অভিনয় করে একদিন আবার কলকাতায় ফিরে এলো।

কিন্তু ঐ জীবন ভাল লাগে না পার্থর। ইতিমধ্যে হাতেও কিছু জমে গিয়েছে। পার্থ আবার নতুন করে চাকরির সন্ধানে ফিরতে লাগলো।

এবং ঐ সময়ই যাত্রার দলের এক বাজিয়ে বন্ধুর সাহায্যে শহরে এক থিয়েটারে বেহালাবাদক হিসাবে যন্ত্র-সংগীতের দলে মাস মাস সত্তর টাকা মাইনেতে চাকরি পেয়ে গেল পার্থ।

এবং থিয়েটারে যন্ত্র-সংগীতের দলে চাকরি পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এত দিন পরে সত্যিকারের যেন মনপ্রাণ ঢেলে দেয় পার্থ তার সুরের সাধনায়।

নামকরা একজন বেহালাবাদকের কাছে গিয়ে সে অবসর সময়ে শিক্ষা নিতে থাকে।

বেহালা বাদক মিঃ রবিনসন, ক্রিশ্চান। যথেষ্ট বয়েস হয়েছে।

পার্থর হাতের কাজ ও তার নিষ্ঠা দেখে তাকে সাগ্রহে নিজের কাছে টেনে নিলেন, কিন্তু দুর্ভাগ্য—রবিনসন হঠাৎ মারা গেলেন, শিক্ষা বন্ধ হয়ে গেল পার্থর।

পার্থর ইচ্ছা আরো সে শিক্ষা নেয় কিন্তু উপযুক্ত শিক্ষকের সন্ধান পায় না।

ঐ সময়েই মামার আশ্রয় ছেড়ে চিৎপুরে গলির মধ্যে একটা মেসহোটেলে এসে আশ্রয় নেয় পার্থ।

সেইখানেই সুবোধের সঙ্গে তার একদিন আলাপ হয়।

ঐ সময় একদিন পার্থ শোনে পার্ক সার্কাসে নামকরা এক বৃদ্ধ বেহালাবাদক আছেন, ইহুদি।

একদিন তার সঙ্গে সন্ধ্যার পরে গিয়ে দেখা করলো পার্থ। কিন্তু তিনি একটি বৎসর শিক্ষা দেবার জন্য দুই হাজার টাকা চেয়ে বসলেন।

অনেক কাকুতি-মিনতি করায় শেষটায় হাজার টাকায় স্বীকৃত হলেন, পাঁচশ টাকা অগ্রিম দিতে হবে।

কিন্তু অত টাকা পার্থ এক সঙ্গে পাবে কোথায়?

যা রোজগার করে তা থেকে ত্রিশটি করে টাকা দেশে মাকে পাঠায়, বাকী টাকায় কোন মতে তার নিজের খরচ চালায়।

নকুড় মামার কাছে একদিন গেল পার্থ। কিন্তু যাত্রার দলের কাজটা ছেড়ে দেওয়ায় পার্থর উপরে সন্তুষ্ট ছিলেন না নকুড় মামা।

সেখানে কোন সুবিধা হলো না। টাকাটার যোগাড় যখন সম্ভব নয় তখন শিক্ষা নেওয়ার আশাও সুদূরপরাহত।

এমন সময় সুবোধ একদিন তাকে এসে বললে, একটা কাজ করে দিতে পারো পার্থবাবু!

কি কাজ?

কাজটা অবিশ্যি বিশেষ এমন কিছুই নয়! তবে সে জন্য কিছু তোমার প্রাপ্তিযোগ ঘটবে।

কাজটা কি শুনি?

বিশেষ কিছু নয়, একজনকে নিয়ে একটা বিয়ের অনুষ্ঠান বলতে পারো—মেকী বিয়ে করতে হবে!

মেকী বিয়ে, তার মানে!

বললাম তো একটা লোক-দেখানো এলেবেলে অনুষ্ঠান মাত্র।

ক্ষেপেছো, নিজেরই পেটের ভাত কখন জুটবে কখন জুটবে না, তার উপর একটা আবার বিয়ে।

আরে, বললাম তো এলেবেলে বিয়ে! স্রেফ একটা রাত্তিরেরই ব্যাপার। তারপর আর তোমার সঙ্গে কোন সম্পর্কই থাকবে না তার!

এমন হয় নাকি? কি যে সব আবোল-তাবোল বল সুবোধ।

শোন পার্থ, তারা শুধু বিয়ের নাম মাত্র একটা অনুষ্ঠানই চায় এবং সেজন্য একজন পাত্রের দরকার—সেই কাজটুকুই তোমাকে করে দিতে হবে।

সে তো তুমিও করে দিতে পারো।

না হে! আমি তাদের চেনা-জানার মধ্যে! আমার দ্বারা হবে না। তাছাড়া লোকটা আমাকে দেখতে পেলে হয়তো গোলমাল বাধাবে।

না ভাই ক্ষমা করো। ওসব আমার দ্বারা হবে না। শুনেই মনে হচ্ছে যেন কেমন গোলমাল ব্যাপার।

ভেবে দেখ, নগদ শ'তিনেক টাকা পেয়ে যেতে অথচ সত্যিই কোন ঝামেলার ব্যাপার ছিল না।

না ভাই!

কিন্তু শেষ পর্যন্ত মনে হয় পার্থর ক্ষতিটাই বা কি! নগদ শ' তিনেক টাকা পাওয়া যেতো, পরক্ষণেই আবার মনে হয়, কে জানে ব্যাপারটার মধ্যে কি সব গোলমাল আছে?

এলেবেলে বিয়ে আবার হয় নাকি?

শেষ পর্যন্ত হয়তো ঐ এলেবেলে বলে ফাঁকতালে একটা বৌ ঘাড়ে এসে চেপে বসবে। তখন একুল-ওকুল দুই কুলই যাবে!

সাধ করে কে গোলমালের মধ্যে মাথা গলাতে যায়।

কিন্তু কথাটা যতই ভাবে পার্থ সুবোধের প্রস্তাবের অন্য দিকটাও তার মনে লোভ যে জায়গায় না তাও নয়। আবার মনে হয় এমন খেলা খেলা বা মিথ্যে বিয়ে হয় নাকি, না কখনো হতে পারে ?

তবে আজব শহর এই কলকাতা। এখানে কি যে হয় আর কি যে না হয় কেউ বলতে পারে না !

সুবোধকে ব্যাপারটা ভাল করে জিজ্ঞাসা করা প্রয়োজন !

পরের দিনই পার্থ সুবোধকে শুধালো, আমাকে ব্যাপারটা একটু খুলে বুঝিয়ে দেবে সুবোধ।

সে তো সেদিনই তোমাকে বললাম, কোন ঝক্কি নেই এর মধ্যে। সত্যি সত্যিই কিছু আর বিয়ে নয়, বিয়ের একটা অনুষ্ঠান মাত্র ! একটা কুসংস্কার মাত্র !

কিন্তু এমন হয় নাকি !

হয়। যারা করাতে চাইছে তাদের মধ্যে হয়।

কি রকম ?

এ হচ্ছে এক শ্রেণীর স্ত্রীলোকদের ব্যাপার ! সব তোমাকে পরে বুঝিয়ে বলবো। তবে এটুকু জেনে রাখো তারা নিজেরাও যেমন এমনকি মেয়েটিও যেমন তোমাকে কোন দিনই তার স্বামী বলে স্বীকৃতি দেবে না, তেমনি আইনও কোন দিন তোমাকে দাবী মেনে নিতে বাধ্য করাতে পারবে না। বললাম তো কুসংস্কারজাত একটা অনুষ্ঠান।

বেশ, আমি রাজি আছি ! পাঁচশ টাকা আমার চাই !

বেশ আমি তাহলে পরে তোমাকে জানাবো, সুবোধ বললে।

দিন দুই পরে সুবোধ এসে বললে, তাই হবে, পাঁচশ টাকাই সে পাবে।

আমাকে কিছু টাকা অগ্রিম দিতে হবে।

তাই হবে। সুবোধ জবাব দেয়।

নির্দিষ্ট দিন রাত্রি নয়টা নাগাদ সুবোধ একটা ট্যাক্সীতে চাপিয়ে পার্থকে সরোজিনীর গৃহে নিয়ে চললো।

সারাটা পথ পার্থ এমনই অন্যমনস্ক ছিল ট্যাক্সী কোথা দিয়ে কোন পথ ধরে যাচ্ছে সেদিকে কোন নজরই দেয় না এবং অন্ধকারে ট্যাক্সীর থেকে নেমেও জায়গাটা চিনতে পারে না কারণ ঐ পল্লীতে ইতিপূর্বে কোন দিনই পার্থ আসেনি।

॥ ছয় ॥

সুবোধের সঙ্গে তারপর দীর্ঘ তিন মাস আর দেখা হয়নি পার্থর।

কিন্তু যে টাকার জন্যে পার্থ ঐ কাজ করলো সেই টাকাই যেন পার্থর কাছে আজ মিথ্যে হয়ে গেল। কোন কিছুই যেন আর ভাল লাগে না পার্থর।

থিয়েটারে যায় নিজের কাজটুকু হয়ে গেলেই আবার চলে আসে তারপর ক্ষীণ স্মৃতির অন্ধকার হাতড়ে হাতড়ে সারাটা কলকাতা শহর ঘুরে ঘুরে

বেড়ায় সেই খোঁজে।

তার মিথ্যে বিয়ে করা স্ত্রীর খোঁজে।

কানে আসে সেই কণ্ঠস্বর।

কি নাম তোমার ?

মিনতি ! ডাক নাম মিনু।

আবার কখনো কখনো কানে আসে সেই কথাগুলো ঃ

আপনি, আপনি—কি তাহলে আমাকে ত্যাগ করে আবার বিয়ে করবেন ?

না মিনু, তোমাকে দেখবার আগে আমার মনে যাই থাক না কেন, আজ থেকে তুমিই আমার স্ত্রী। জেনো আর কখনো দ্বিতীয় নারী আমার জীবনে আসবে না।

শেষ পর্যন্ত একদিন চাঁদনীতে অকস্মাৎ সুবোধের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল পার্থর।

এই যে সুবোধবাবু !

তারপর পার্থবাবু, কেমন আছেন ?

ভাল, এ কয়মাস আপনি ছিলেন কোথায় ?

জানেন তো এক টোব্যাকো কম্পানীর ভ্রাম্যমাণ সেলিং এজেন্ট আমি হঠাৎ আসাম চলে যেতে হয়েছিল—

ও তা চলুন না ঐ দোকানটায়, আপনার সঙ্গে আমার কিছু কথা ছিল।

বেশ তো চলুন।

দুজনে এসে একটা চায়ের দোকানে ঢুকলো এবং পার্থই দু'কাপ চায়ের অর্ডার দিল। চা পান করতে করতে একসময় পার্থ বলে, একটা কথা বলবো সুবোধবাবু, কিছু মনে করবেন না তো।

না, না—বলুন না।

সেই মেয়েটির নাম ধাম ঠিকানা আমি চাই।

কার বলুন তো। কোন্ মেয়েটির। একটু বিস্ময়ের সঙ্গেই যেন তাকায় সুবোধ পার্থর মুখের দিকে। ব্যাপারটা যেন সে সঙ্গে সঙ্গে হৃদয়ঙ্গম করে উঠতে পারে না।

ঐ যে মাস তিনেক আগে এক রাত্রে যার সঙ্গে আমায় নিয়ে গিয়ে বিয়ে দিয়েছিলেন।

এবার হো হো করে হেসে ওঠে সুবোধ।

পার্থ ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে থাকে সুবোধের মুখের দিকে, তারপর মৃদু কণ্ঠে বলে, হাসছেন যে ?

হাসবো না। সে সুন্দর মুখটি বুঝি আজও ভুলতে পারেন নি পার্থবাবু ! তা আপনার দোষ দেওয়া যায় না। ছুকরির চেহারাটা—

সুবোধবাবু ! চাপা কণ্ঠে গর্জে ওঠে পার্থ।

কি হলো ? Did you enjoy that night ! বলে অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে বাঁকাভাবে সুবোধ তাকালো পার্থের মুখের দিকে, না চেয়ে চেয়ে মুখপানে—

ছিঃ সুবোধবাবু—

আরে মশাই ব্যাপারটা এখনো তাহলে বুঝতে পারেন নি!

কি?

ও তো বারবণিতাদের একটা, কুসংস্কারজনিত অনুষ্ঠান মাত্র।

বারবণিতা!

হ্যাঁ!

তাহলে সেই মেয়েটি—সরোজিনীর বাবু রথীনবাবুর।

তা জানি না, তবে সরোজিনীর কাছেই শুনেছিলাম মেয়েটিকে নাকি ছোট বেলায় তারা প্রয়াগের মেলায় কুড়িয়ে পায়।

তবে, তবে তো সে বেশ্যার মেয়ে নয়।

নয়ই যে তাই বা কি করে বলা যায়।

কেন! এই তো বললেন তাকে প্রয়াগের মেলায় কুড়িয়ে পাওয়া গিয়েছিল।

হ্যাঁ তাই। তবে কি জাত কি গোত্র কার মেয়ে কিছুই তো জানা নেই, অজ্ঞাত অপরিচিত। কিন্তু তার খোঁজ আর কেন। এতদিনে হয়তো পাকাপোক্ত ভাবে সে দেহ-পসারিনী হয়ে উঠেছে।

না। মিনতি তা কখনো করতে পারে না।

আরে মশাই না পারলেই কি হয় নাকি। সরোজিনী আছে না রথীন-বাবু আছে না।

আপনি আমাকে তার ঠিকানাটা বলে দেন।

কেন যাবেন বুঝি সেখানে।

হ্যাঁ।

বেশ। কিন্তু বুঝতেই তো পারছেন জায়গাটা ভদ্রলোকের যাতায়াতের পক্ষে সুবিধার নয়।

তা হোক।

তবু যাবেন?

হ্যাঁ, যাবো।

মশাই, পাড়াটা সত্যিই ভাল না। তা ছাড়া সরোজিনীকে আমি জানি, হাতে ওর অনেক গুন্ডা আছে। হয়তো মারধোরও খেতে পারেন। কেন ভদ্রলোকের ছেলে ওসব ঝামেলার মধ্যে যাবেন মশাই।

ঠিকানাটা আপনি দিন সুরো বাবু।

যাবেনই তাহলে?

বললাম তো আপনাকে।

বেশ তবে ঠিক হয়ে থাকবেন, কাল সন্ধ্যার পর আমি পৌঁছে দেবো আপনাকে। ঠিকানা দিলেও আপনার মত লোকের পক্ষে সে জায়গা চিনে যাওয়া সম্ভব হবে না। আপনি সেই মেসেই আছেন তো?

হ্যাঁ!

যাবো'খন আমি সন্ধ্যায়।

সেই পাপ পুরীতে মাত্র দুটো রাত পার্থ গিয়েছিল।

সুবোধই তাকে সেখানে নিয়ে গিয়েছিল। এবং সেখানকারই একটি মেয়ে, লতার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিয়ে চলে এসেছিল।

লতার কাছেই পার্থ মিনতির ইতিহাসটা জানতে পারে।

প্রথমটায় লতা কিছুই বলতে চায়নি। তারপর কি জানি কেন পার্থর অনুরোধ সে ঠেলতে পারেনি।

আপনি আমার কাছ থেকে ব্যাপারটা জেনেছেন শুনতে বাড়িউলি মাসী আমাকে জ্যান্ত পুঁতে ফেলবে বাবু—

তোমার ভয় নেই। একথা কোন দিন কাউকে আমি বলবো না যে তোমার কাছ থেকেই সব আমি জেনেছি।

লতা ব্যাপারটা জানতো। তার মুখ থেকেই পার্থ মিনতির সত্যিকারের ইতিহাসটা জানতে পারে।

লতা বলেছিল, ও মেয়ের মুখের দিকে চেয়েই আমি বুঝেছিলাম বাবু, সে আমাদের দলের নয়। তাইতো অমন করে দোতলা থেকে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল।

তারপর আর কোন খবর তোমরা জান না লতা, না?

না। পুলিসের ভয় আছে না। কেঁচো খুঁড়তে হয়তো সাপ বেরুবে, এরা নিজে থেকে চুপ করে গিয়েছে।

আচ্ছা কোথায় সে যেতে পারে বলে মনে হয় লতা।

তা বলতে পারি না বাবু, তবে এটুকু হলফ করে বলতে পারি খারাপ রাস্তায় সে যায়নি।

তারপরও কি কম খুঁজেছে পার্থ মিনতিকে। কিন্তু তার কোন সন্ধানই আর পায়নি। সেই ইহুদী ওস্তাদের কাছে আর বেহালার শিক্ষা নেওয়াও পার্থর হয়নি।

সেই পাঁচশত টাকা প্রাণে ধরে সে খরচ করতে পারেনি।

সযতনে একটা খামের মধ্যে ভরে বাক্সের তলায় রেখে দিয়েছে। আরো তারপর কতদিন কেটে গিয়েছে, বেহালা বাজিয়ে এখন পার্থ ভালই রোজগার করে।

বাড়ি ভাড়া করে মাকেও নিয়ে এসেছে। কিন্তু জীবনের হঠাৎ আসা সেই আশ্চর্য রাতটির কথাও যেমন ভুলতে পারেনি তেমনি ভুলতে পারেনি সেই মেয়েটিকে, মিনতিকে। কেমন যেন মনে হয় আজো পার্থর, মিনতির সন্ধান সে আবার একদিন পাবেই!

মিনতি।

তার জন্য জীবনের বাকী কটা দিন যদি তাকে অপেক্ষা করতে হয়ও সে অপেক্ষা করবে। সে যে তাকে কথা দিয়েছিল, তার জীবনে সেই একমাত্র নারী। সেই তার স্ত্রী, সত্যিকারের সহধর্মিনী!

সে রাত্রের মন্ত্রের মধ্যে ফাঁকি থাক আর যাই থাক, সে রাত্রে সে যখন মিনতিকে কথা দিয়েছিল সমস্ত অন্তর দিয়ে সে কথা দিয়েছিল।

তার জীবনে দ্বিতীয় কোন নারীরই আর আবির্ভাব ঘটতে পারে না।

সেদিন কি একটা পর্ব উপলক্ষে ছুটি।

মৃন্ময়ী গিয়েছে গঙ্গাস্নানে। পার্থ একা একা ঘরের মধ্যে বসে বেহালায় একটা নতুন সুর সৃষ্টি করবার চেষ্টা করছে।

সিঁড়িতে খট্ খট্ জুতোর শব্দ শোনা গেল।

অনীতার ভাইয়ের কণ্ঠস্বর শোনা গেল, সোজা ওপরে চলে যান পার্থদা তার ঘরে বসে বাজাচ্ছে, ঐ শুনুন—

পরক্ষণেই পার্থ যেন ভূত দেখার মতই চমকে ওঠে।

খোলা দরজার সামনে দাঁড়িয়ে মিতা।

একি! আপনি—

হ্যাঁ, মহম্মদ তো আর পর্বতের কাছে যাবে না তাই পর্বতকেই মহম্মদের কাছে আসতে হলো। মৃদু হেসে কথাটা বলতে বলতে মিতা এসে ঘরে প্রবেশ করলো।

অতি সাধারণ বেশভূষা আজ পরিধানে মিতার।

সাধারণ কালো পাড় একটি তাঁতের শাড়ী, গায়ে তদ্রূপ একটি সাধারণ সাদা ব্লাউজ, মাথায় ঈষৎ গুণ্ঠন তোলা। চোখে মুখে কোথাও প্রসাধনের চিহ্নমাত্রও নেই। হাতে একগাছি করে সোনার কঙ্কণ। পায়ে সাধারণ চপ্পল।

পার্থ নির্বাক।

বসতেও বুঝি বলবেন না! সত্যি, একেই বলে বরাত। অন্য কোথাও গেলে এতক্ষণ হয়তো মিতা দেবীকে কোথায় বসাবে, কি তাকে নিয়ে করবে ভেবে অস্থির হয়ে উঠতো অথচ সেধে এলাম আপনার এখানে, আপনি এখন পর্যন্ত একবার বসতেও বললেন না।

আপনার মত ধনী, সর্বজনবন্দিতার খেয়াল হয়েছে এই গরীব নগণ্যের ঘরে এসেছেন কিন্তু কোন দুঃসাহসে আমি আপনাকে বসতে বলি বলুন তো!

তাই বুঝি!

কথাটা কি মিথ্যে আপনিই বলুন।

তাই বুঝি সসম্ভ্রমে এখনো আপনি বলে সম্বোধন করেন। কথাটা বলে আর অপেক্ষা না করে মিতা ঘরের মধ্যে যে ছোট টুলটি ছিল সেটার উপরেই বসে পড়ে!

আপনার বুঝি আজ শুটিং নেই?

শুটিং বুঝি রোজ থাকে। তাছাড়া বড় অভিনেত্রী আমরা। ডেট চাইলেই কি ডেট পাওয়া যায় নাকি! কিন্তু ওসব শুটিংয়ের গল্প করতে আপনার কাছে আসিনি!

তবে কি জন্য এসেছেন?

সাধারণ ঘরোয়া গল্প বলতে শুনতে। আপনার মা কোথায়?

মা!

হ্যাঁ, চলুন না তাঁর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেবেন।

মা তো বাড়িতে নেই, গঙ্গাস্নান করতে গিয়েছেন।

ও, তা অনীতা দেবী। তার সঙ্গেই না হয় একটু আলাপ করিয়ে দিন।

সেও মার সঙ্গে গিয়েছে।

তাহলে আর কি হবে উঠি! আচ্ছা চলি নমস্কার—

যেমন এসেছিল মিতা তেমনিই বের হয়ে গেল।

॥ সাত ॥

দিনের আলোয় এই প্রথম দেখলো মিতাকে পার্থ! এত কাছে এত স্পষ্ট এর আগে কখনো ওকে দেখবার সুযোগও হয়নি যেমন তেমনি আজকের মত এমন অকপটে চেয়েও বুঝি দেখেনি পার্থ মিতাকে।

আর আজকের মিতার মুখের দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে পার্থর যেন মনে হচ্ছিল মিতার মুখের মধ্যে কোথায় যেন একটা চেনা স্মৃতি জড়িয়ে আছে।

ঐ চোখ, ঐ নাক, ঐ ওষ্ঠ, ঐ চিবুক আর চিবুকের নিচে কালো তিলটি বাম দিকে, অস্পষ্ট একটা স্মৃতি যেন।

অন্যমনস্ক পার্থ যেন নিজের চিন্তার মধ্যেই তলিয়ে যায়। একটা হারানো সুর মনের মধ্যে গুণগুণিয়ে ফিরতে থাকে।

চমক ভাঙলো পার্থর অনীতার ডাকে, মা তখন থেকে খেতে ডাকছেন, খেতে যাবেন না।

কে! ও অনু—

মা ভাত নিয়ে বসে আছেন।

গঙ্গাস্নান করে কখন ফিরলে তোমরা?

সে তো অনেকক্ষণ!

অনীতা ঘর থেকে বের হয়ে গেল। অনীতার মুখখানি যেন কেমন শুকনো শুকনো মনে হলো।

আজকাল অনীতার সঙ্গে বড় একটা তার কথাবার্তা হয় না। অনীতা যেন তাকে এড়িয়ে এড়িয়েই চলে।

আহারে বসে আবার যেন পার্থ অন্যমনস্ক হয়ে যায়।

হঠাৎ মার কণ্ঠস্বরে পার্থর চমক ভাঙে।

ছানার ডালনাটা কেমন হয়েছে রে?

ভাল।

কে রেঁধেছে জানিস?

তুমি বুঝি?

না, অনু। সত্যি মেয়েটার এত গুণ! ও না থাকলে নিচের ওই বুড়ো ভদ্রলোকের যে কি অবস্থা হতো। তাও ওরা নিচের তলায় ছিল বলে এ রকম কেটে যাচ্ছিল, সামনের মাস থেকে যে কি করে কাটাবো তাই ভাবছি।

কেন! ওরা কি এবাড়ি থেকে চলে যাচ্ছে নাকি?

তাইতো শুনছি। বাইরের মফঃস্বলের স্কুলে নাকি অনু ভাল একটা

চাকরি পেয়েছে। সেখানেই কোয়ার্টার দেবে।

পার্থ আর কোন কথা বলে না। নিঃশব্দে আহার শেষ করে উঠে যায়।

অনুরা তাহলে এবাড়ি ছেড়ে চলে যাচ্ছে। অনেক দিন একত্রেই এই বাড়িতে ওরা ছিল। তাছাড়া অনুরা থাকার জন্য মার সম্পর্কে পার্থ অনেকটা বুঝি নিশ্চিন্তও ছিল।

হোটেলের কাজ সেরে ফিরতে অনেক রাত হয়, জানে বাড়িতে অনু আছে কোন চিন্তা নেই। ওরা চলে গেলে কে আসবে না আসবে, তাদের সঙ্গে কি রকম মিল হবে না হবে কে জানে।

বিকেলের দিকে কথার কথায় পার্থ মৃন্ময়ীকে বলে, কলকাতায় তো আরো কত স্কুল আছে মা, চেষ্টা করলে এখানেই তো ভাল চাকরি পাওয়া যেতে পারে। এখান থেকে যাবার দরকারই বা কি!

আমারও ইচ্ছা নয় পার্থ ওরা যায়। তাছাড়া মেয়েটার উপরে কি যে মায়া পড়ে গিয়েছে। তাই তো ভেবেছিলাম ওর সঙ্গে যদি তোর বিয়ে দিতে পারতাম।

এ তুমি কি বলছো মা!

কেন, আমাদের স্বজাত পালটি ঘর, তাছাড়া আমার তো মনে হয় অনুর মত হাজারে অমন একটি মেয়ে মেলে না। তা বাছা তুমি যে কি এক অসম্ভব ধনুকভাঙা পণ করে বসে আছো কোথাকার কে, জাত ধর্ম কুল কিছু জানা নেই—

তবু তো বলছি মা তোমাকে, মন্ত্র পড়ে যখন তাকে একবার স্ত্রী বলে স্বীকার করেছি, সেই আমার স্ত্রী।

মৃন্ময়ী আর কিছু বললেন না। ঘর থেকে বের হয়ে গেলেন।

ঐ দিনই রাত্রে ফিরবার পর অনীতা এসে দরজা খুলে দিয়ে যখন নিজের ঘরের দিকে চলে যাবার জন্য পা বাড়িয়েছে পার্থ তাকে ডাকলো, অনু!

ফিরে দাঁড়ায় অনীতা। বলে, আমাকে কিছু বলছিলেন?

হ্যাঁ। তুমি শুনলাম মফঃস্বলের কোন এক স্কুলে চাকরি নিয়ে চলে যাচ্ছো।

হ্যাঁ।

অনেক বেশী মাইনে বুঝি সেখানে?

খুব বেশী নয় তবে ফ্রি কোয়ার্টার দেবে।

নাই বা নিলে সে চাকরি অনু!

মৃদু হেসে অনীতা বলে, কিন্তু কেন বলুন তো!

মা তোমাকে কি রকম ভালবাসেন জানতো! মা একেবারে একা পড়ে যাবেন।

বাড়ি তো আর খালি থাকবে না নতুন কেউ না কেউ আসবেই—

তা হয়তো আসবে, তবু তোমাদের সঙ্গে এতদিনকার জানাশোনা ছিল।

তাদের সঙ্গেও আমার জানাশোনা হবে।

অনীতা কথাটা বলে আর দাঁড়ালো না, নিজের ঘরে ঢুকে গেল।

সিঁড়ির আলোতে পার্থর মনে হলো শেষের দিকে অনীতার চোখের কোল দুটো যেন চিকচিক করছিল। ব্যাপারটা ঠিক বুঝতে পারে না পার্থ।

সত্যিই কি অনীতার চোখে সে জল দেখেছিল। অন্যমনস্ক পার্থ সিঁড়ি ভেঙে উপরে উঠে যায়। অনীতার সঙ্গে অনেক দিনের পরিচয় একই বাড়িতে থাকার দরুন। এবং উভয়ের মধ্যে হৃদ্যতা যে একটা এতদিনে গড়ে ওঠেনি তাও নয়। কিন্তু তার বেশী তো কিছুই নয়। কোন দিন কোন দুর্বলতাই তো সে আজ পর্যন্ত অনুভব করেনি অনীতার প্রতি। তবে কি! তবে কি অনীতা তাকে মনে মনে ভালবেসেছে! পরক্ষণেই মনে হয়, না, না এসব পার্থ কি ভাবছে! অনীসার মত শান্ত মিতবাক মেয়ে, সে ভুল করেছে। অনীতা সম্পর্কে সে ভুল করেছে।

কিন্তু ভুলটা তার দিন দুই বাদে মা-ই ভেঙে দিলেন।

বিকালেব দিকে বেরোবে বলে প্রস্তুত হচ্ছে পার্থ, মৃন্ময়ী এসে ঘরে ঢুকলেন।

কিছু বলছিলে না?

বলছিলাম অনুকেই তুই বিয়ে কর বাবা!

মা!

হ্যাঁ, এতদিন বলি বলি করেও তোকে বলতে পারিনি। সত্যিই মেয়েটা যে তোকে ভালবাসে রে। অমন বৌ পাওয়া ভাগ্যের কথা। আমি বলছি এ বিয়েতে তুই সুখী হবি। আজ দুপুর বেলা তুই ঘরে ছিলি না! ওকে তোর ঘরটা গুছিয়ে দিতে বলেছিলাম, এসে দেখি তোর ঐ ফটোটার সামনে দাঁড়িয়ে অঝোর ঝারে কাঁদছে—

সে রাত্রেও আবার মিতা পার্থকে সেই গঙ্গার ধারে বটগাছটির তলায় ধরে নিয়ে এসেছিল।

শ্রাবণ রাত্রির আকাশে মেঘের লুকোচুরি চলেছে। বিকেলের দিকে এক পশলা বৃষ্টি হয়ে গিয়েছে। বাতাসে তারি আর্দ্রতার আভাস তখনো।

তখন থেকেই লক্ষ্যই করছি কি যেন আপনি ভাবছেন। কি ভাবছেন এত বলুন তো? মিতা শুধায়।

কি আর ভাববো!

একটা কথা জিজ্ঞাসা করবো, রাগ করবেন না তো!

রাগ করতে পারি এমন কথা জিজ্ঞাসাই বা করবেন কেন?

একটা গল্প শুনবেন! বলে মিতা।

গল্প!

হ্যাঁ, আমি নতুন যে বইটায় অভিনয় করবার জন্য কনট্রাকট্ করেছি সেই বইয়েরই গল্প! গল্পের নায়িকার চরিত্রটি আমার খুব পছন্দ হয়েছে, আপনাকে তাই শোনাতে চাই কেমন আপনার লাগে।

কিন্তু গল্পের আমি কি বুঝবো?

শুনুনই না আগে—বলে একটু হেসে মিতা বলতে শুরু করে: একটি

নয় বছরের মেয়েকে একটি ডাকসাইটে বারবনিতা কুড়িয়ে এনেছিল প্রয়াগের মেলা থেকে একসময়।

চকিতে পার্থ মিতার মুখের দিকে তাকায় চমকে!

মিতা বলে চলে: মেয়েটিকে সেই স্ত্রীলোকটি মানুষ করতে লাগলো মায়ের মত করে। কিন্তু তখনো সেই মেয়েটি বুঝতে পারেনি যে সেই স্ত্রীলোকটির মনে একটা কু'মতলব আছে।

কু'মতলব!

হ্যাঁ, তারই ব্যবসায় ঐ মেয়েটিকে সে নিযুক্ত করবে মনে মনে ভেবেছিল।

তারপর!

মেয়েটি ঘটনাচক্রে স্ত্রীলোকটির মতলব একদিন অন্তরাল থেকে শুনতে পায়। এবং শুনে সে যেন একেবারে কাঠ হয়ে যায় ভয়ে আতঙ্কে। কিন্তু স্ত্রীলোকটি ভীষণ ধূর্ত! মেয়েটির হাবভাব দেখে তার বোধহয় সন্দেহ হয় তাই সে একটা বড় রকমের চাল চালে। মেয়েটিকে বলে সে তার বিয়ে দেবে।

পার্থ সমস্ত ইন্দ্রিয় সজাগ করে যেন মিতার গল্প শুনতে থাকে।

মিতা বলে চলে।

মেয়েটা এমন বোকা যে সেই কথায় বিশ্বাস করে আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে ওঠে। এতদিন সে অনিশ্চিতের মধ্যে ভেসে ভেসে চলেছিল, এবার সে স্বামী পাবে, ঘর বাঁধতে পারবে। কিন্তু হায়! তখন তো সে জানতো না যে সুখের স্বপ্ন তার বাতাসেই মিলিয়ে যাবে। বলতে বলতে একটা দীর্ঘশ্বাস যেন বোধ করে মিতা।

অন্যমনস্ক হয়ে সামনের গঙ্গার দিকে তাকায়।

ভাসমান মেঘের ফাঁকে ফাঁকে চাঁদ উঁকি দিচ্ছে। জোয়ার এসেছে বুঝি, ঢেউগুলো এসে পাড়ের উপর ছলাৎ ছলাৎ শব্দে ভাঙছে।

তারপর বিয়ে হলো? সহসা একসময় প্রশ্ন করে পার্থ।

য়্যাঁ, বিয়ে! হ্যাঁ হলো বৈকি! টাকার লোভে একজন এলো তাকে বিয়ে করতে। কিন্তু বিয়ের পর বলেছিল আর তাকে সে ছেড়ে যাবে না। কিন্তু সারারাত তারা জেগে থাকবে বলেও কেউ জেগে থাকতে পারলো না। কি ঘুম যে পেয়েছিল—ভোরে ঘুম ভেঙে মেয়েটি দেখলো শূন্য শয্যায় সে একা শুয়ে।

এই পর্যন্ত শুনেই পার্থ যেন স্থানকাল সব ভুলে যায়। মিতার একখানি হাত চেপে ধরে ব্যাকুল কণ্ঠে বলে, এ গল্প তুমি কোথায়, কোথায় শুনেছো!

কেন বলতো!

বল, বল, কে বলেছে এ গল্প তোমাকে! তুমি—

কি হলো? এতো একটা বইয়ের গল্প।

কিন্তু ততক্ষণে পার্থ নিজেকে সামলে নিয়েছে। নিজের প্রগলভতায় নিজেই লজ্জিত হয়ে পড়েছে।

মিতার হাতখানি কিন্তু তখনো পার্থর হাতের মধ্যে ধরা।

অনেকক্ষণ তারপর দুজনার একজনও কোন কথা বলে না।

পার্থ !

বল।

কেমন লাগলো গল্পটা ?

ভাল, কিন্তু শেষটা তো বললে না ! তারপর মেয়েটির কি হলো ?

মেয়েটির ?

হ্যাঁ ! স্বামী সম্পর্কে তার কি ধারণা। সত্যিই কি সে ভেবেছিল স্বামী তার কথা রাখেনি ? সত্যিই তাকে ত্যাগ করে চলে গিয়েছিল।

তাতো জানি না।

জানো না।

না, সেই স্বামীর সঙ্গে তো তার আর দেখাই হয়নি !

তারপর ?

তারপর আর জানি না ! গল্পের ঐ পর্যন্তই আমি জানি।

কিছুক্ষণ তারপর আবার দুজনেই স্তব্ধ। কারো মুখে কোন কথা নেই।

পার্থই তারপর এক সময় বলে, রাত অনেক হলো উঠবে না।

হ্যাঁ, চলো !

গত কয়েকদিন থেকে যে সন্দেহটা অনুক্ষণ পার্থর মনের মধ্যে পীড়া দিচ্ছিল সেটা নিরসন হলো না।

মনের কথাটা বলি বলি করেও উত্থাপন করতে পারলো না।

বলতে পারলো না যেন কিছুতেই।

॥ আট ॥

দ্বিপ্রহরে সেদিন একাকিনী ঘরের মধ্যে বসে মৃন্ময়ী মহাভারত পড়ছিলেন। অনীতা স্কুলে গিয়েছে, পার্থও বাড়িতে নেই।

অনীতা ছোট ভাই ও একটি ছেলে সদরের সামনে খেলছিল।

মিতা এসে তাদের সামনে দাঁড়ালো।

অনীতার ভাই মিতু জিজ্ঞাসা করে, কাকে চান ?

পার্থবাবু বাড়িতে আছেন জানো ?

না, পার্থদা তো বাড়িতে নেই।

তোমার দিদি, অনীতা দেবী !

দিদি তো এখন স্কুলে।

পার্থবাবুর মা !

তিনি উপরে আছেন। যান না, উপরে সোজা চলে যান।

পূর্বে একদিন মিতা এ বাড়িতে এসেছে। এ বাড়ি তার চেনা। সোজা মিতা সিঁড়ি দিয়ে উপরে চলে গেল। প্রথম যে ঘরটা সেই ঘরেই বসেই মৃন্ময়ী মহাভারত পড়ছিলেন।

দরজার সামনে জুতোটা খুলে রেখে মিতা এসে ঘরে ঢুকলো।

পদশব্দে মুখ তুলে সামনে মিতাকে দেখে বিস্মিত হয়ে যান মৃন্ময়ী। বিস্ময় তাঁর আরো বেড়ে যায় যখন মিতা এসে তাঁর পায়ের ধুলো নিয়ে

প্রণাম করলো।

আহা, থাক, থাক,—বেঁচে থাকো মা। কিন্তু তোমাকে তো আমি চিনতে পারলাম না মা! কে মা তুমি?

আমি মিনতি। আপনিই বোধহয় পার্থবাবুর মা?

হ্যাঁ, পার্থর কাছে এসেছো বুঝি? কিন্তু সে যে কখন ফিরবে তারতো কিছু ঠিক নেই মা।

কথায় কথায় দুজনার মধ্যে দেখতে দেখতে আলাপ জমে ওঠে।

এক সময় মিতা বলে, আপনার ছেলের বৌকে দেখছি না মা, সে বুঝি বাড়িতে নেই?

ছেলের বৌ, সে কপাল কি করে এসেছি মা। কোন এক ডাইনীরা কবে নাকি ওর সঙ্গে কোন এক ডাইনীর বিয়ে দিয়েছিল, সেই ডাইনীর পথ চেয়েই আজো ও বসে আছে।

সে কি মা!

সে দুঃখের কথা বলো কেন মা! জানা নেই শোনা নেই, জাতধর্মো নেই, কার না কার মেয়ে। তুমিই বলতো মা, এমন বিচিত্তির কথা কখনো শুনেছো। পাঁচশ টাকা হাতে গুণে দিয়ে কার না কার সঙ্গে ধরে বিয়ে দিলে। ওকি আবার একটা বিয়ে নাকি!

তা আপনি ছেলেকে আবার বিয়ে করতে বললেও তো পারেন? মা।

তা কি বলিনি ভেবেছো। এই তো আমাদের নিচের তলায় আমাদের স্বজাত, পাল্টা ঘর অমন লক্ষ্মীর মত একটি মেয়ে আছে। মেয়েটাও কি কম ভালবাসে নাকি ওকে। তা কে কার কথা শোনে। মরুকগে যাক—কপালে অনেক দুঃখ আছে আমি তার কি করবো, নইলে এমন লক্ষ্মী কেউ পায়ে ঠেলে।

আমি আজ উঠি মা।

উঠবে? এসো—তা পার্থ এলে কি বলবো?

বলবেন, বলবেন—মিনতি এসেছিল।

গলি পথের মাঝামাঝি আসতেই সহসা অপরিচিত কণ্ঠের সম্বোধনে চমকে ওঠে মিতা।

শুনছেন!

আমাকে বলছেন! কথাটা বলে মুখ তুলে চাইতেই দেখে অনীতা তার সামনে দাঁড়িয়ে।

হ্যাঁ, আপনাকেই বলছি।

আপনি আমাকে চেনেন?

স্বনামধন্য অভিনেত্রী মিতা রায়কে চেনাটা কি এতই কষ্ট! তারপর একটু থেমে বলে, যদি কিছু মনে না করেন আপনার সঙ্গে আমার কিছু কথা ছিল।

বলুন।

কিন্তু এখানে রাস্তায় দাঁড়িয়ে ত সে কথা বলা চলে না, চলুন সামনের

পার্কটায় বসিগে।

বেশ ত, চলুন—

মিতার বেশ একটু কৌতুহলই হয়। কি বলতে চায় অনীতা তাকে!

দুজনে এসে সামনের পার্কে একটা বেঞ্চিতে পাশাপাশি বসে। কিন্তু চুপ করেই থাকে অনীতা।

মিতা বলে, কই কি বলবেন যে বলছিলেন অনীতা দেবী।

আপনি আমার নাম জানেন?

মৃদু হেসে মিতা জবাব দেয়, জানি বৈকি। কিন্তু কি বলবেন বলছিলেন!

পার্থবাবুর সব পরিচয় আপনি জানেন।

কেন বলুন তো!

না, তাই জিজ্ঞেস করছি!

তা কিছু কিছু জানি বৈকি।

তা যদি জানেন তো তাকে নিয়ে এ নিষ্ঠুর খেলা খেলছেন কেন?

নিষ্ঠুর খেলা খেলছি!

তা নয় তো কি! আপনাদের সবটাই তো খেলা, সবটাই তো অভিনয়।

আপনার বুঝি এই ধারণা অনীতা দেবী, যে পর্দায় আমরা অভিনয় করি বলে জীবনটাও আমাদের অভিনয়।

তাছাড়া কি! আজ খেয়াল হয়েছে ওকে নিয়ে খেলছেন, আবার দুদিন বাদ শখ যখন মিটে যাবে দূরে সরে যাবেন। প্রচুর পয়সা আছে, প্রচুর অবকাশ, প্রচুর শখ আছে আপনাদের, কিন্তু—

থামুন, থামুন—চেঁচিয়ে ওঠে সহসা মিতা।

না, কেন থামবো, এ নিষ্ঠুর খেলা আপনাকে বন্ধ করতে হবে!

আপনি হয়তো জানেন না যে ওর সঙ্গে আমার বিয়ের সব ঠিক হয়ে গিয়েছে। সহসা এবারে মিতা বলে।

না, কখনোই তা আপনি করতে পারবেন না।

কেন বলুন তো আপনার আদেশে না আপনার ভয়ে!

তার কোনটাই নয়।

তবে!

দেখুন মিতা দেবী, আমি বলছি এ পথ আপনাদের নয়। যে বাইরের জীবনের সঙ্গে আজ আপনি পরিচিত সে পরিচয় নিয়ে ঘর বাঁধতে যাওয়া আপনার বিড়ম্বনাই হবে। দু দিনেই হয়তো শখ মিটে যাবে। ঘর হয়ে উঠবে বাঁধন!

আপনি ভুল করছেন অনীতা দেবী! ভালবেসে স্বেচ্ছায় আমি ঘর বাঁধতে চলেছি!

ভালবেসে!

হ্যাঁ—

সত্যি বলছেন, পার্থবাবুকে আপনি ভালবাসবেন। এ আপনার

দু দণ্ডের খেয়াল বা চোখের নেশা নয়!

হ্যাঁ। সত্যিই তাকে আমি ভালবাসি।

কয়েকটা মুহূর্ত, এরপর অনীতা নির্বাক থাকে! তারপর মৃদু কণ্ঠে বলে, সত্যিই তাহলে আপনি তাকে বিয়ে করে ঘর বেঁধে সুখী হতে চান!

চাই!

তবে আমার গা ছুঁয়ে প্রতিজ্ঞা করুন চিরদিন এমনি করে তাকে ভালবাসবেন!

আজ যেমন তাকে ভালবাসি, চিরদিনই তেমনি বাসবো।

উঠে দাঁড়ালো অনীতা। মৃদু কণ্ঠে বললে, না জেনে রূঢ় ব্যবহার করেছি তার জন্য আমাকে ক্ষমা করবেন মিতা দেবী!

নিশ্চয়ই করবো। তবে আপনিও যাবার আগে একটি কথা জেনে যান, অভিনেত্রীও নারী, আপনাদের মত তারাও ভালবাসতে জানে, ভালবাসতে পারে।

অনীতা আর দাঁড়ালো না। ধীর পথে পার্ক থেকে বের হয়ে গেল।

মিতা কিন্তু তারপরও অনেকক্ষণ সেখান থেকে উঠতে পারে না।

সহসা একসময় তার দু চোখ জলে ঝাপসা হয়ে যায়। আপন মনেই সে বলে ওঠে, ভয় নেই অনু, তোমার এতবড় ভালবাসা মিথ্যে হবে না পার্থ তোমারই! তুমি তাকে পাবে, নিশ্চয়ই পাবে।

ইতিমধ্যে কখন একসময় সন্ধ্যার অন্ধকারে চারিদিক ঝাপসা হয়ে এসেছে, টেরও পায়নি মিতা।

করপোরেশনের লোক মই কাঁধে পার্কে বাতিগুলো একে একে জ্বালিয়ে দিচ্ছে।

পার্থ ঘরে এসে ঢুকতেই মা মৃন্ময়ী সামনে এসে দাঁড়ালেন।

হ্যাঁরে, মিনতি মেয়েটি কে রে পার্থ।

মিনতি!

হ্যাঁ, সে যে তোর খোঁজে আজ দুপুরে এসেছিল। আহা কি রূপ যেন সাক্ষাৎ জগদ্ধাত্রী!

চমকে ওঠে পার্থ মার শেষের কথায়। এবং বিদ্যুৎ চমকের মতই একটা সম্ভাবনা মনের মধ্যে উঁকি দিয়ে এবং মনের শেষ সংশয়টুকুর অবসান ঘটিয়ে তাকে পর মুহূর্তেই বিমূঢ় করে দেয়।

সত্যি বলছো মা মিনতি এসেছিল!

হ্যাঁ, কত কথা বললে, মা বলে ডাকলো।

মা বলে ডাকলো! আর, আর কোন কথা বলেনি মা!

কত কথাই তো বললে, সব কি আর মনে আছে!

আমি আসছি মা!

এসেই আবার কোথায় চললি?

পার্থ মার এ প্রশ্নের কোন জবাব না দিয়ে ঘর থেকে বের হয়ে গেল।

সিঁড়িতে অনীতার সঙ্গে দেখা হয়ে গেল।

পার্থবাবু!

কিন্তু যেন সে ডাক শুনেও শোনে না পার্থ। তর তর করে সিঁড়ি বেয়ে নিচে চলে যায়।

হতভম্ভ অনীতা পার্থর গমনপথের দিকে চেয়ে সিঁড়ির উপরই দাঁড়িয়ে থাকে।

॥ নয় ॥

ফিরে এলো মিতা তার বাড়িতে।

সত্যিই তো সে অভিনেত্রী। সে তো শুধু অভিনয়ই করে। তার ভালবাসাকে লোকে বিশ্বাস করবে কেন!

রুপালী পর্দার বুকে ক্ষণিক সে হাসি-কান্না ভালবাসার মতোই বুঝি তাদের হাসি-কান্না-ভালবাসাটাও শুধু মাত্র অভিনয়।

অভিনয়। অভিনয় বৈকি! তার চাওয়াটাও অভিনয়, পাওয়াটাও অভিনয়।

সমাজ বহির্ভূত, চিহ্নিত জীব তারা। অনীতা ঠিকই বলেছে।

হাজার হাজার লালসাদীপ্ত দৃষ্টির কলুষতায় শুধু দেহ কেন মনও কি তার কলুষিত হয়নি! হাস্যে লাস্যে কটাক্ষে শত শত জনচিত্তকে বিমোহিত করে আসেনি কি সে এই দীর্ঘ দিন ধরে।

তবে সাধারণ একজন বারনারীর সঙ্গে তার পার্থক্যটা কোথায়?

সত্যি! সত্যিই নেই তার অধিকার কোন গৃহস্থঘরে বধূ বেশে প্রবেশের। সমাজের কোলে, শুচিস্নিগ্ধ অন্তঃপুরে পা ফেলবার।

অনীতা পার্থকে ভালবাসে। পার্থকে নিশ্চয় সে সুখী করতে পারবে।

অনীতার এত বড় ভালবাসাকে কোন অধিকারে সে অস্বীকার করবে!

কিন্তু এই শহরেও সে আর থাকতে পারবে না।

একটা সুটকেশের মধ্যে তাড়াতাড়ি কিছু কাপড় গুছিয়ে নিয়ে কিছু টাকা সুটকেশের মধ্যে ভরে নিয়ে পার্থর নামে একখানা চিঠি লিখে রেখে কাঞ্চিকে ডাকলো মিতা, বলল, কাঞ্চি আমি বেরুচ্ছি।

কোথায় যাবি!

তা জানিনা! এই চিঠিটা পার্থবাবু এলে তাকে দিবি। অন্য কাউকে চিঠিটা দিস না কিন্তু।

না, কিন্তু তুই কবে ফিরবি!

জানিনা। আর এই নে চাবি! যতদিন না ফিরি সব দেখাশোনা করবি।

গ্যারেজ থেকে গাড়ি নিয়ে বের হয়ে পড়লো মিতা।

মিতা বের হয়ে যাবার ঘন্টাখানেক বাদেই পার্থ এসে হাজির হলো হন্তদন্ত হয়ে।

পার্থর সাড়া পেয়ে কাঞ্চি এসে সামনে দাঁড়ালো।

তোমার মাঈজিকে একবার ডেকে দেবে কাঞ্চি?

মা তো নেই বাবু—

নেই !

না, দাঁড়ান বাবু। মাঈজী আপনার নামে একটা চিঠি রেখে গেছেন।

কাণ্ডি চিঠিটা এনে দিল।

ছোট সংক্ষিপ্ত চিঠি !

পার্থ, চললাম, কোথায় যাচ্ছি জানি না ! একটা অনুরোধ, অনীতা সত্যিই তোমাকে ভালবাসে, তাকে বিবাহ করো। তোমার বিবাহের সংবাদ পেলে আবার ফিরবো, তার আগে নয়।

ইতি—মিনতি

পাথরের মত চিঠিটা হাতে দাঁড়িয়ে থাকে পার্থ !

কেন সে এত দেরি করলো !

বুঝতে পারার সঙ্গে সঙ্গে কেন সে মিনতির সামনে এসে দাঁড়ায়নি। কেন বলেনি, আজও তোমার জন্য আমি অপেক্ষা করছি মিনু, চল তুমি আমার ঘরে, তুমিই আমার গৃহলক্ষ্মী !

সারাটা রাত পার্থ কেবল সারা শহরটা ঘুরে ঘুরে বেড়াল। অনির্দিষ্ট ভাবে। কোথায় মিনতি কে জানে !

মৃন্ময়ী বলেন, কি হয়েছে তোর পার্থ !

কিছু হয়নি মা !

দিবারাত্র বাইরে বাইরে কোথায় থাকিস !

কেন বিরক্ত করছো মা, আমাকে একটু একা থাকতে দাও।

লক্ষ্মী বাবা আমার, কি হয়েছে তোর আমাকে বল।

কিছু হয়নি মা কিছু হয়নি।

দিনের মধ্যে অন্ততঃ দুবার যাবেই পার্থ মিতার বাড়িতে।

কাণ্ডি তোমার মাঈজী ফিরেছে !

নেহিতো বাবুজী !

যে সব বইতে মিতার কনট্রাক্ট ছিল অভিনয় করবার তার প্রডিউসাররা সব মাথায় হাত দিয়ে বসেছে মিতা রায়ের আকস্মিক অন্তর্ধানে।

তারাও চতুর্দিকে মিতার অনুসন্ধান করে ফিরছে।

কিন্তু কোথায় যে মিতা তার গাড়ি নিয়ে ডুব দিল। কোথায় যে আত্মগোপন করলো, কোন সন্ধানই নেই তার।

পার্থ হোটেলে আর যায় না। তাদের লোক প্রত্যহ এসে ঘুরে যায়।

মৃন্ময়ী ছেলের রকম-সকম দেখে যেন দিশেহারা হয়ে পড়েন।

এদিকে যত দিন যেতে থাকে মিতার উপর একটা প্রচণ্ড অভিমান পার্থর বুকের মধ্যে সঞ্চিত হয়ে গুমরাতে থাকে।

মিতা সব বুঝে, সব জেনেও তাকে কথা বলবার পর্যন্ত অবকাশটুকু দিলে না। এমনি করে তাকে কিছু না জানিয়ে দূরে চলে গেল।

বেশ। তবে তাই হোক, মিতা যদি তাকে ভুলতে পেরে থাকে সেই বা কেন মিতাকে ভুলতে পারবে না। মিতা যদি এমনি করে দূরে সরে যেতে পারে সেই বা কেন তার পিছনে পিছনে আর ছুটে বেড়াবে!

তার এই দীর্ঘ নয় বৎসরের প্রতীক্ষার কোন মূল্যই যদি মিতার কাছে না থাকে, সেও চায় না আর মিতাকে! সে অনীতাকেই বিয়ে করবে। অনীতা তাকে ভালবাসে, অনীতাকেই সে গ্রহণ করবে।

অভিনেত্রী কিনা, তাই তার এত বড় নিঃস্বার্থ ভালবাসাকে এমনি নিষ্ঠুর-ভাবে পায়ে দলে চলে গেল মিতা।

সেদিন সারাটা রাত পার্থ ঘরের মধ্যে পায়চারি করে ফিরতে লাগলো।

ওদিকে নিচের তলায় অনীতারা সব গোছগাছ করছে পরশু সকালেই তারা এ বাসা ছেড়ে চলে যাচ্ছে।

ভোরবেলা, সারাটা রাত্রি বিনিদ্র কাটিয়ে, রুক্ষ চুল শুষ্ক মুখ পার্থ গিয়ে তার মার ঘরে ঢুকলো, মা!

কি রে?

তোমার কথাই আমি রাখবো মা!

কি?

তোমার মনোনীতা পাত্রী অনীতাকেই আমি বিয়ে করবো।

আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে ওঠেন মৃন্ময়ী। বলেন, সত্যিই, সত্যি বলছিস পার্থ, সত্যি তুই অনুকে বিয়ে করবি।

হ্যাঁ মা।

দাঁড়া বাবা নিচে খবরটা দিয়ে আসি!

ছুটে গেলেন মৃন্ময়ী অবিনাশবাবুর ঘরে। একপাশে দাঁড়িয়ে বৃদ্ধ অবিনাশবাবু সব তদারক করছিলেন, অনীতা সব গোছগাছ করছিল।

অবিনাশবাবু!

কে! ও আপনি, আসুন—

ও সব বাঁধাছাঁদা এখন বন্ধ করুন। নাতনীর বিয়ের সব জোগাড় করুন।

ব্যাপারটা সম্যক উপলব্ধি না করতে পেরে ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে থাকেন অবিনাশ ঘোষাল মৃন্ময়ীর মুখের দিকে।

আমার মুখের দিকে অমন করে চেয়ে আছেন। আপনার নাতনীটিকে আমি পুত্রবধূ রূপে চাই—

সত্যি—সত্যি বলছেন?

মিথ্যা কেন বলবো? দেরি আমার সইবে না, এই মাসেরই প্রথম লগ্নে বিয়ে দিতে চাই আমি—

অনীতা সহসা ঐ সময় বাধা দেবার চেষ্টা করে, কিন্তু মাসীমা—

তুই আবার কথা কইতে আসিস কেন মুখপুড়ি! তুই থাম—

কিন্তু মাসীমা এ যে হবার নয়। পার্থবাবু যে—

কি হবার নয় আর কি হবার সেটা আজ তোর কাছ থেকে আমার জানতে

হবে! আমি চললাম অবিনাশবাবু ঠাকুরমশাইকে দিয়ে দিনক্ষণটা দেখিয়ে আসি।

মৃন্ময়ী বের হয়ে গেলেন।

পাঁচ দিন পরে প্রথম রাত্রিতে যে লগ্ন সেই লগ্নেই বিয়ে দেবেন মৃন্ময়ী একেবারে স্থির করে এলেন।

বিশ্বাস নেই তাঁর ছেলেকে। একবার যখন স্বীকার করেছে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ব্যাপারটা চুকিয়ে ফেলাই ভাল। বলা যায় না, ছেলের মতিগতির কথা। ভরসা করেন না তিনি আর ছেলেকে।

আসন্ন উৎসবের যেন সাড়া পড়ে গেল ছোট্ট বাড়িটায়।

কিন্তু অনীতা মনে শান্তি পায় না।

পার্থর সঙ্গে নিরালায় অন্ততঃ একবার তার দেখা হওয়ার প্রয়োজন। কিন্তু পার্থ যে বাড়িতে কখন আসে কখন যায় তাকে ধরাই যাচ্ছে না।

বিয়ের দুদিন আগে অনীতা জেগে বসে থাকে পার্থর প্রতীক্ষায়, যেমন করে হোক পার্থর সঙ্গে একবার দেখা করতেই হবে।

রাত বারোটায় পার্থ সে রাত্রে বাড়ি ফিরে এলো।

কান পেতে ছিল অনীতা। দরজা খুলে দিয়ে পার্থর সামনা সামনি দাঁড়াল অনীতা।

আপনার সঙ্গে আমার দু'টো কথা ছিল।

কি অনু!

এ আপনি কি করলেন!

কেন কি করলাম!

মিতা—

তুমি কতটুকু মিতা সম্পর্কে জেনেছো জানি না অনু, তবে একজ অভিনেত্রীকে আমি বিয়ে করবো শেষ পর্যন্ত একথাটা তুমি ভাবলেই বা কি করে?

এ আপনি কি বলছেন?

ঠিকই বলছি! আজ সব কথা তোমাকে আমি বলতে পারছি না, পরে সবই জানতে পারবে। তবে একটা কথা, মিতা সম্পর্কে জেনো তোমার কোন কিন্তুই থাকার প্রায়াজন নেই!

এখনো সময় আছে, এখনো ভেবে দেখুন—

ভেবেই এ বিয়েতে আমি স্বেচ্ছায় মত দিয়েছি অনু। তবে তোমার দিক থেকে যদি কোন দ্বিধা থাকে বল, এ বিয়ে আমি বন্ধ করে দেবো।

অনীতা কি জবাব দেবে ও কথার।

অশ্রুতে দু'টি চক্ষু তার ঝাপসা হয়ে যায় শুধু।

॥ দশ ॥

শেষ পর্যন্ত বিয়ের দিন এসে গেল। ছোট বাড়িতে বিয়ে হতে পারে না তাই অবিনাশবাবু গলির মোড়ে একটা বাড়ি কয়দিনের জন্য ভাড়া নিয়েছেন।

নাতনীর বিয়ে তাই আগের দিন থেকেই দরজায় সানাই বসিয়েছেন।

সানাইয়ের শব্দটা গলিপথকে মুখর করে তুলেছে।

রাত সাড়ে আটটায় লগ্ন। নিজের ঘরে সেজেগুজে পার্থ বসে আছে। সব যেন কেমন শূন্য ফাঁকা মনে হয় পার্থর। বারবার সেই দুদিনের পরিচিত বিশেষ একখানি মুখই মনে পড়ে তার। কিন্তু না, সে আর ভাববে না। কেন সে ভাববে? এমন সময় মৃন্ময়ী এসে ঘরে ঢুকলেন. কে একটি মেয়ে তোর সঙ্গে দেখা করতে এসেছে পার্থ!

মেয়ে! চমকে তাকায় পার্থ মায়ের মুখের দিকে।

হ্যাঁ, কাঞ্চি না কি তার নাম বললো।

কোথায় সে! ব্যগ্র হয়ে উঠে দাঁড়ায় পার্থ।

নিচে।

পার্থ ছুটে তক্ষুনি নিচে নেমে গেল।

একি কাঞ্চি তুই।

বাবুজী শিগ্‌গির চলুন একবার আমাদের বাড়িতে।

কেন, কি হলো?

মাঈজী আজ দুপুরে হঠাৎ ফিরে এসেছেন।

তার আমি কি করবো!

কিন্তু দুপুর বেলা এখানে ফিরেই সেই যে আপনার বিয়ের খবর শুনে মদ খেতে শুরু করেছেন—

কিন্তু আমার বিয়ের খবর পেল কি করে?

মাঈজি ফিরেছে দেখে আমিই এসেছিলাম আপনাকে দুপুরে এখানে খবর দিতে—তারপর আপনার আজ বিয়ে শুনে চলে যাই ফিরে।

কাঞ্চি?

হ্যাঁ, বাবুজি তারপর মাঈজি আপনার খবর শুধাতে তাকে সে কথা বলার পর থেকেই ঘরে ঢুকে মদ খেতে সে শুরু করেছে। বোতলের পর বোতল শেষ হয়ে যাচ্ছে। বাধা দিতে গিয়েছিলাম মেরে আমাকে ঘর থেকে বের করে ঘরের দরজা বন্ধ করে দিয়েছে। আপনি একটিবার চলুন বাবু, নইলে মাঈজি বাঁচবে না। দোহাই আপনার! পায়ে পড়ি।

কাঞ্চি হাউ মাউ করে কেঁদে ফেলে।

মুহূর্তকাল স্তব্ধ হয়ে পার্থ যেন কি ভাবে, তারপর বলে, চল –

মা পিছন থেকে ডাকল, কোথায় যাস পার্থ!

আসছি মা।

একটু পরেই যে বিয়ের লগ্ন! ওরা যে তোকে নিতে আসবে এখুনি।

বলো তাদের এখুনি ফিরবো।

কাঞ্চিকে সঙ্গে নিয়ে পার্থ বের হয়ে গেল। বড় রাস্তাতেই একটা ট্যাক্সি

পাওয়া গেল। কাঞ্চিকে সঙ্গে নিয়ে পার্থ সেই ট্যাক্সিতে উঠে বসে।

ঘরের দরজা বন্ধ।

সোফায় বসে মিতা গ্লাসের পর গ্লাস মদ পান করে চলেছে।

পায়ের সামনে গোটাচারেক খালি বোতল গড়াগড়ি যাচ্ছে। রক্তবর্ণ দুটি চক্ষু, মাথার চুল রুক্ষ পিঠময় ছড়িয়ে পড়েছে। শিথিল বাস।

সহসা বন্ধ দরজার গায়ে ধাক্কা ও পার্থর কণ্ঠস্বর শোনা গেল।

মিনু, দরজা খোল। মিনু লক্ষ্মীটি দরজা খোল, আমি পার্থ।

কিন্তু ঘরের ভিতর থেকে মিতা কোন সাড়া দেয় না। হাতের গ্লাসটার বাকী তরল পদার্থটুকু গলায় ঢেলে দিয়ে বোতলটা আবার তুলে নেয়।

ওদিকে দরজায় মুহুর্মুহু করাঘাত। দরজা খোল মিনু, মিনু—

কাঞ্চি কাঁদতে কাঁদতে বলে, দরজা ভেঙে ফেলুন বাবুজি! ও দরজা খুলবে না।

মিনু, মিনু—

সাড়া নেই তবু মিতার।

অনেক কষ্টে দরজা ভেঙেই শেষপর্যন্ত পার্থকে ঘরে ঢুকতে হলো।

মিনু—

না, না—তুমি, তুমি যাও—

মিনু লক্ষ্মীটি শোন, হাতটা ধরার চেষ্টা করে পার্থ মিতার।

মিতা হাত ছাড়িয়ে নিয়ে বোতলটা তুলে নেয় গলায় ঢালবার জন্য।

দুজনে ধস্তাধস্তি চলতে থাকে বোতলটা নিয়ে।

মিতা যেন একেবারে ক্ষেপে গিয়েছে।

বেরিয়ে যাও, বেরিয়ে যাও তুমি এখান থেকে, কেন, কেন এসেছে তুমি। গেট্ আউট—

মিনু—

নো, নো—গেট আউট—গেট আউট।

ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দেয় মিতা পার্থকে।

লজ্জা করছে না একজন অভিনেত্রীর বাড়িতে আসতে—এখনো বের হয়ে যাও বলছি, নইলে দারোয়ান ডেকে বের করে দেবো। মরেশ

সহসা পার্থ প্রচণ্ড এক চড় বসিয়ে দিল মিতার গালে!

চড়টা খাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই যেন দপ করে নিভে গেল মিতা সমস্ত মাতলামি। খবার তার থেমে গেল হঠাৎ।

তুমি, তুমি আমাকে মারলে!

ঝর ঝর করে দুচোখ বেয়ে জল পড়ে মিতার।

কোন জবাব দেয় না সে কথার পার্থ। কেবল কাঞ্চির দিকে চেয়ে বলে, এগুলো এঘর থেকে নিয়ে যা কাঞ্চি!

কাঞ্চি বোতলগুলো কুড়িয়ে নিয়ে ঘর থেকে বের হয়ে যায় নিঃশব্দে।

মিতা তখনো সোফার উপরে বসে দু'হাতে মুখ গুঁজে ফুলে ফুলে কাঁদছে।

পার্থ মিতার পাশেই সোফায় বসে পড়ে।

ক্রন্দনরতা অবনতমুখী মিতার মাথায় একখানি হাত রেখে ডাকে, মিনু—

না, না—আমি অভিনেত্রী। আমি অভিনেত্রী—

না, তুমি আমার স্ত্রী।

না, না—তুমি জান না, অনেক পাপ, অনেক ক্লেদ এই শরীরে আমার জমা হয়েছে। তোমার পাশে দাঁড়াবার কোন যোগ্যতাই যে আজ আর আমার নেই।

নিশ্চয়ই আছে। তোল, মুখ তোল। চাও আমার দিকে।

না, না—

মিনু—

মুখ তোলে মিতা। জলে ভেজা দুটি চক্ষু।

দোষ তো শুধু একা তোমারই নয় মিনু, আমারও যে আছে।

তোমার দোষ!

নিশ্চয়ই। সে রাতে যদি ঘুমিয়ে না পড়তাম—

তুমি, তুমি তাহলে আমাকে কোন দিন ঘৃণা করবে না!

কেন ঘৃণা করবো।

সত্যি বলছো?

সত্যি!

ওদিকে রাতের প্রহরের পর প্রহর গড়িয়ে চলে। এককোণে জ্বলে তখনো সোহাগ প্রদীপ।

সানাই বাজছে তখনো।

চিত্তির করা পিঁড়ির উপর বসে অনীতা। লাজবস্ত্রে ঢাকা মুখখানি।

সর্বাঙ্গে লাল বেনারসী, কপালে চন্দন-তিলক।

অনীতার দু চোখের পাতায় ঘুম নেমে আসছে।

কিন্তু কেমন করে সে ঘুমাবে। এ রাত কি ঘুমাবার।

এ রাত যে শুধুই জেগে থাকার।

নিশিবধূ

বিয়ের লগ্ন ছিল অনেক রাত্রে। শীতের রাত্রি।

হাড়কাঁপানো শীত পড়েছিল আবার সে রাত্রে শহরতলীতে।

নিমন্ত্রিত ও অভ্যাগতদের মধ্যে যারা এসেছিল তাদের মধ্যে অনেকেই তাই চলে গিয়েছিল।

দোতলার একটি ঘরে পরনে রক্তবাঙা জরির ফুলতোলা বেনারসী শাড়ী, গহনা ও মুকুট মাথায় নীতা চুপটি করে বসে ছিল।

বিবাহবেশে নীতাকে যেন রাজেন্দ্রাণীর মতই লাগছিল।

অনেক রাত হয়েছে--একা একা চুপটি করে বসে থাকতে থাকতে নীতার দু'চোখের পাতা বুঝি একটু ভারী হয়ে এসেছিল—মৃদু শব্দে তার ঘুমের ঝোঁকটা কেটে যায়। চোখ মেলে তাকায়।

রীতা এসে দরজার উপর দাঁড়িয়েছে কখন যেন।

রীতা—মৃদু কণ্ঠেডাকে নীতা বোনকে, আয়—কোথায় ছিলি রে এতক্ষণ?

রীতা তার বোন নীতার মুখের দিকে চেয়ে থাকে।

কি দেখছিস রে অমন করে? মৃদু হেসে প্রশ্ন করে নীতা।

হাসি হাসি মুখে রীতা বলে, ভারি সুন্দর দেখাচ্ছে তোকে!

লজ্জায় নীতার মুখটা বুঝি তার অজ্ঞাতেই একটু রাঙা হয়ে ওঠে।

ওখানে দাঁড়িয়ে রইলি কেন—আয় আমাব কাছে এসে বোস। নীতা বোনকে আবার ডাকে।

রীতা কিন্তু সে ডাকে কোন সাড়া দেয় না।

নীতার মনটা সত্যিই খারাপ হয়েছিল—বিয়ের পব কাল সমরেশ তাকে নিয়ে চলে যাবে রাঁচিতে তার কর্মস্থলে।

সেই রকমই ব্যবস্থা হয়েছে।

নীতার বাবা মণিশংকরও সম্মত হয়েছে।

নীতার ইচ্ছা ছিল বিয়ের পর আরো ক'টা দিন থেকে যায় কিন্তু সমরেশ কিছুতেই রাজী হয়নি।

সে বলেছে, বাঃ তোমাকে আমি বিয়ে করছি কি এখানে ফেলে রাখবার জন্যে!

বাঃ, আমিই কি তাই বলেছি নাকি—নীতা সলজ্জ কণ্ঠে জবাব দিয়েছে।

তবে কি?

আমি—আমি ভাবছি—

কি?

ভাবছি রীতার কথা।

রীতার কথা?

হ্যাঁ—জান তো আমরা যমজ বোন—সেই জন্মমুহূর্ত থেকে অজ্ঞান দুটি শিশু একত্রে এক শয্যায় পাশাপাশি গায়ে গায়ে মানুষ হয়েছি—আমি চলে গেলে ওর যে কি কষ্ট হবে।

হ্যাঁ—সেটা অবিশ্যি ঠিক, সমরেশ বলেছে, এই সময় ওরও একটা বিয়ে হয়ে গেলে ভালই হতো—

ছিঃ, ওকথা বলো না, ওর মনে যে কি হচ্ছে তা আমিই জানি।

কি হচ্ছে আবার ?

সকৌতুকে সমরেশ প্রশ্ন করে।

আমি চিরদিনই চঞ্চল ও হইচই করে কাটিয়েছি, ও স্থির ধীর গম্ভীর—কত কম কথা বলে, তাহলেও আর কেউ না জানুক আমরা জানি একমাত্র স্বভাবের ঐটুকু বাদ দিয়ে আমরা একের চাইতে অন্যে অভিন্ন। একের সঙ্গে অন্যের কি নিবিড় একটা যোগ রয়েছে। এক জায়গায় আমরা পৃথক দেহ হলেও সত্তায় এক, অনুভূতিতে এক।

সত্যি—নীতা মিথ্যা বলেনি।

যমজ বোন বলে ওরা যে কেবল দেখতেই একেবারে অবিকল একরকম তাই নয়—একই সময়ে দুজনার একই চিন্তা একই ভাবনা। একে ভয় পেলে অন্যে ভয় পায়। একের আনন্দে অন্যের আনন্দ। একের দুঃখে অন্যের দুঃখ। একের ঘৃণায় অন্যের ঘৃণা।

সমরেশ ওদের দুই যমজ বোনকে প্রায় এক বছর ধরে দেখেছিল কিন্তু অতটা জানতো না, জানতে পারেনি।

সামান্য সময়ের ব্যবধানে মণিশংকরের দুই কন্যা হয়েছিল।

যমজ কন্যা। নীতা আর রীতা।

বোধহয় আট-দশ মিনিটের ব্যবধান।

মা যত দিন বেঁচে ছিল ওদের মণিশংকরকে কিছু ভাবতে হয়নি—ওদের যখন দশ বছর বয়স সেই সময় ওদের মা মারা গেল—তারপর থেকে মণিশংকরকেই দেখতে হয়েছে।

একটি যেন অন্যটির ছায়া।

একমাত্র ওরা নিজেরা ছাড়া কে রীতা কে নীতা অনেকের পক্ষেই বোঝা দুঃসাধ্য ছিল।

এমনকি ওদের বাপ মণিশংকরও মধ্যে মধ্যে ভুল করতো।

মেয়েরা হেসে ফেলতো।

অন্য কোন দিক দিয়ে না হলেও স্বভাবের দিক দিয়ে ক্রমশঃ যেন ওদের মধ্যে একটা পার্থক্য দেখা দিয়েছিল বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে যাতে করে ওদের কিছুটা এক থেকে অন্যকে চেনা যেত।

নীতা একটু চঞ্চল প্রকৃতির হয়ে ওঠে কিন্তু রীতা ক্রমশঃ কেমন গম্ভীর হয়ে যায়।

তবু তাদের মধ্যে কোন দ্বিধা বা সংকোচ ছিল না।

ক্রমশঃ কৈশোর ছাড়িয়ে ওরা যখন যৌবনে পা দিয়েছে এমন সময় এলাহাবাদ থেকে মণিশংকরের বন্ধু যতীন্দ্রর ছেলে সমরেশ এলো কলকাতায় শিবপুর ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজে ইঞ্জিনীয়ারিং পড়তে।

মণিশংকরের সঙ্গে সমরেশ দেখা করতে এলো।

মণিশংকর সমরেশকে দেখে ভারি খুশী হলো—এবং মেয়েদের ডেকে সমরেশের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিল।

আমার দুই মেয়ে—নীতা আর রীতা।

দুজনার একরকম বেশ—একরকম চেহারা—সমরেশ কেমন বিহ্বল হয়ে চেয়ে থাকে।

ব্যাপারটা বুঝতে পেরে মণিশংকর হেসে বলে, ওরা যমজ বোন।

যমজ ?

হ্যাঁ—টুইন। অবিশ্যি অনেক সময় আমিও ভুল করে ফেলি কে নীতা—কে রীতা।

ঐ সূত্রপাত।

তারপর থেকেই মধ্যে মধ্যে সমরেশ আসতো মণিশংকরের ওখানে। এবং ক্রমশঃ নীতার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে ওঠে।

নীতাও সমরেশের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে ওঠে।

নীতার হাসিখুশি হইচই ভাবটাই সমরেশকে তার প্রতি বেশী আকৃষ্ট করে তোলে। মণিশংকরও ব্যাপারটা জানতে পারে।

ইঞ্জিনীয়ারিং পাস করবার পর একটা ভাল চাকরিও পেয়ে যায় সমরেশ এবং তারপরই সে মণিশংকরের কাছে নীতাকে বিবাহের প্রস্তাব জানায়।

মণিশংকর সানন্দেই স্বীকৃতি দেয়।

এর চাইতে আর ভাল পাত্র কি হতে পারে।

বিশেষ করে মণিশংকরের ব্যবসা তখন ক্রমশঃ মন্দার দিকে চলেছে : আর্থিক অবস্থাটাও ভাল না।

বিবাহের কথাটা পাকাপাকি হয়ে যাবার পরই একদিন সন্ধ্যায় নীতার ঘরে বসে দুজনার মধ্যে কথা হচ্ছিলো।

নীতা ও সমরেশ।

তাইত দুজনার সত্তা এক অনুভূতি এক আনন্দ ভয় ঘৃণা এক—শুনে সমরেশ সকৌতুকে বলে, তাহলে তো দেখছি সত্যি মুশকিলই হলো।

কেন ?

কারণ তোমরা তো একা কেউ সম্পূর্ণ নও—অর্ধেক তুমি অর্ধেক সে—দুজনকে নিয়ে এক—সম্পূর্ণ।

ঠিকই তো।

তাই তো বলছিলাম এক কাজ করা যাক না—

কি ?

দুজনকেই বিয়ে করে ফেলি আমি—ডাইনে বাঁয়ে দুজনকে বসিয়ে মন্ত্রপাঠ করে নেবো—অর্ধেক তো আর বৌ হতে পারে না—তাহলেই সব ল্যাঠা

চুকে যায়—কি বল, তোমার বাবাকে গিয়ে proposalটা দেবো নাকি ?

ইয়ারকি হচ্ছে, না ?

ইয়ারকি কেন—সত্যিই আমি সিরিয়াস নীতা—সিনসিয়ার।

ওরা জানতেও পারেনি সেদিন যে ওদের ঐ কথাবার্তার মধ্যে ওদের পশ্চাতে খোলা দরজার সামনে কখন রীতা নিঃশব্দে এসে দাঁড়িয়েছে।

সব কিছু শুনেছে।

সমরেশ তখনো বলে চলেছে, সত্যি নীতা—আমার বা তোমার পরস্পরের প্রতি ভালবাসাটাও তো পারফেক্ট হবে না রীতা যদি আমাদের মধ্যে থেকে বাদ পড়ে যায়।

আবার—অভিমানমিশ্রিত কণ্ঠে প্রতিবাদ জানায় নীতা।

আহা তুমিই ভেবে দেখো না কথাটা দোষের কি আমি বলেছি—দেখতে দুজনে এক—দুজনার মন ভাবনা চিন্তা পর্যন্ত এক—ইচ্ছা অনিচ্ছা সব কিছু একসূত্রে বাঁধা—দুজনায় একটি পরিপূর্ণ সত্তা—তখন আলাদা আলাদা ভাবে মন্ত্রপাঠ করে বিয়ে করবারও তো প্রয়োজন নেই। তোমাকে মন্ত্র পড়ে গ্রহণ করলেই তো তাকেও গ্রহণ করা হয়ে গেল—

আর ঠিক সেই মুহূর্তে সমবেশের কথা শেষ হতেই পশ্চাৎ থেকে ডাক শোনা যায়, দিদি—

আচমকা রীতার ডাকে নীতা চমকে ওঠে। সঙ্গে সঙ্গে ফিরে তাকায়।

কয়েকটা মুহূর্ত নীতার কণ্ঠ দিয়ে যেন কোন স্বরই বের হয় না।

নীতা বুঝতে পেরেছে তখন সব না হলেও ওদের অনেক কথাই রীতার কানে গিয়েছে।

সমরেশ কিন্তু ব্যাপারটা হালকা করে দেবার চেষ্টা করে।

বলে, এই যে রীতা—তোমার দিদিকে কি বলছিলাম জান—তোমরা দুজনে যখন অবিকল এক রকম দেখতে—চিন্তায় ভাবনায় পর্যন্ত—তখন ওকে যদি মন্ত্র পড়ে বিয়ে করি তাহলে তো তোমাকেও বিয়ে করা হয়ে গেল।

আঃ সমরেশ—থামবে তুমি। ঝাঁঝালো কণ্ঠে প্রতিবাদ জানায় নীতা।

রীতা কিন্তু তখন কেমন এক বিহ্বল দৃষ্টিতে চেয়ে আছে সমরেশের দিকে। থরথর করে তার ঠোঁট দুটো কাঁপছে।

কাঁপা কাঁপা গলায় রীতা বলে, চা হয়ে গিয়েছে—চা এঘরে দিয়ে যাবো না ওঘরে যাবে ?

তুই যা রীতা—আমরা আসছি।

রীতা আর কোন কথা বলে না—ঘর ছেড়ে চলে যায়।

ছিঃ ছিঃ, রীতা নিশ্চয়ই সব শুনেছে।

তা শুনেছে বোধহয়।

কি ভাবলো বল তো ! এমন নিষ্ঠুরের মত তুমি ব্যবহার করলে !

নিষ্ঠুর কেন—of co rse she will understand—it's nothing but a joke.

সমরেশের কাছে জোক হলেও সে কথাগুলো সেদিন রীতার কাছে যে আদৌ জোক ছিল না সেটা যেদিন সমরেশ পরবর্তীকালে একদিন বুঝতে

পেরেছিল সেদিন সত্যিই সে তাকে ক্ষমা করতে পারেনি।

নীতা আবার ডাকে তার বোনকে, আয় না—কাছে আয়।

রীতা এবারে ধীরে ধীরে এগিয়ে আসে।

জন্মাবধি দুজনে কোনদিন দু'রকম বেশভূষা করেনি—ওদের মা যতদিন বেঁচে ছিল ওদের এক রকম জামা এক রকম কাপড় পরিয়েছে—পরে মণিশংকরও বেশভূষায় ওদের কোনদিন এতটুকু পার্থক্য করেনি।

কিন্তু আজ সর্বপ্রথম যেন নীতার বিবাহের রাত্রে নজর পড়লো সে রীতার চাইতে অন্য রকম সেজেছে—তার পরনে দামী বেনারসী শাড়ী আর রীতার পরনে সামান্য একটা রঙিন তাঁতের শাড়ি। তার গায়ে গহনা—তার কপালে চন্দন কিন্তু রীতার গায়ে গহনা নেই—কপালে চন্দন নেই।

অথচ মণিশংকর নীতার বিয়ে হচ্ছে বলে কেবল তার জন্য নয় রীতার জন্যও সব এক প্রস্ত করে কিনেছে পাছে সে দুঃখ পায় মনে।

নীতা বলে, একি রে আজকের দিনে এই শাড়ীটা তুই পরে আছিস কেন? বাবা তো তোর জন্যেও বেনারসী শাড়ী গহনা কিনে এনেছে।

রীতা মৃদু কণ্ঠে বলে, কি হবে সে সব পরে।

কি হবে মানে! তাই বলে আজকের এই আনন্দের দিনে তুই এই সব পরে থাকবি—চল, আমি তোকে সাজিয়ে দেবো।

নীতা যেন সব কিছু ভুলে বোনের হাত ধরে উঠে দাঁড়ায়।

চিরদিনই যখনই কিছু কেনা হয়েছে বা তৈরি করা হয়েছে, তা সে মহার্ঘ বা যৎসামান্যই হোক না কেন, দুই প্রস্ত তৈরি হয়েছে বা কেনা হয়েছে।

মণিশংকর বা তার স্ত্রী বিজয়া কখনো ওদের এক থেকে অন্যকে পৃথক ভাবেনি। এক বৃন্তে যেন দুটি ফুল।

নীতার বিবাহ উপলক্ষে যা কিছু কেনাকাটা হয়েছে দুই প্রস্ত করেই হয়েছে।

নীতা রীতাকে নিয়ে এসে পাশের ঘরে ঢুকলো।

এতদিন এই ঘরেই দুই বোন থেকেছে—পাশাপাশি দুটি শয্যা—একই রকমের। দুটি একই ধরনের আলমারি পাশাপাশি রাখা দেওয়াল ঘেঁষে। দুটি আলমারির মধ্যে যা কিছু সব এক। দু'ধারে দুটি ড্রেসিং টেবিল। ড্রেসিং টেবিলের 'পরে সাজানো কসটিউমস্ সব এক।

নীতা রীতাকে নিয়ে ড্রেসিং টেবিলের সামনে টুলটার উপরে বসালো, বোস।

রীতা কোন কথা বলে না।

চিরদিনই সে একটু গম্ভীর—আজ যেন সে অসম্ভব গম্ভীর—চুপচাপ।

রীতাকে নীতা সাজাতে সাজাতে বলে, হ্যাঁরে আমার বিয়ে হচ্ছে তোর আনন্দ হচ্ছে না—হৈ হৈ করে তুই একটু আনন্দ না করলে, সাড়া না দিলে আমার কি ভাল লাগে?

রীতা কোন জবাব দেয় না।

সামনে বিরাট আরশির মসৃণ গায়ে নিজের প্রতিবিম্ব পড়েছে—সেই দিকে তাকিয়ে থাকে নিঃশব্দে।

বাইরে সানাই বাজছে।

রীতার পরিচিত সুর—ঐ সুরটি বড় প্রিয় রীতার চিরদিন।

রাগেশ্রী।

ঠিক যেমনটি করে নীতাকে সাজিয়েছে অন্য মেয়েরা নীতা ঠিক তেমনি করে বোন রীতাকে সাজিয়ে দেয়।

তারপর আরশির দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করে বোনকে বলে, দেখ তো।

আদর করে নীতা রীতার গালে গাল রাখে।

দুটি পদ্ম যেন একই বৃন্তে।

রীতা—এই রীতা—একটু হাস না ভাই।

রীতা মৃদু হাসে।

কি ভাবছিস বল তো? তখন থেকে একেবারে চুপচাপ—যেন পাথর। একটু কথা বলা না।

রীতা কথা বলবে কি তার দু'কান ভরে তখন একটি মিষ্টি সুরের মতই যেন সমরেশের সেদিনকার কথাগুলো গুনগুনিয়ে ফিরছে: তোমাকে যদি মন্ত্র পড়ে বিয়ে করি তাহলে তো ওকেও বিয়ে করা হয়ে গেল।

মেয়েদের কলরব শোনা গেল: ওমা, বিয়ের কনে কোথা গেল!

নীতা সাড়া দেয়, ছোড়দি আমরা এই ঘরে।

একদল নানাবয়সী মেয়ে—ওদেরই প্রতিবেশিনী—যারা মণিশংকরের বিশেষ অনুরোধে আজ ওদের বাড়িতে এসেছিল স্ত্রীআচার ও অন্যান্য অনুষ্ঠানগুলো করে দেবার জন্য—নীতার গলার সাড়া পেয়ে ঐ ঘরে সবাই এসে ঢোকে। ঢুকেই কিন্তু সবাই থমকে দাঁড়ায়।

দুই বোন একই বেশে পাশাপাশি দাঁড়িয়ে।

ওমা—কে নীতা—কে রীতা!

সত্যি ই বোঝা দুঃসাধ্য। ওদের বাপ মণিশংকরই এখনো মধ্যে মধ্যে ভুল করে ফেলে তা ওরা তো প্রতিবেশিনী।

বিশেষ করে নীতাও যখন রীতার মত গম্ভীর হয়ে চুপচাপ থাকতো তখনও ওদের দুজনার মধ্যে পার্থক্য করা দুঃসাধ্যই মনে হতো।

অন্যথায় নীতার হাসিখুশি ও হইচইয়ের ভিতর দিয়েই মণিশংকর এবং অন্যান্য সকলে দুজনকে একে অন্য থেকে পৃথক করতে বা ভাবতে পারতো।

কিন্তু দুজনই গম্ভীর হয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

পারুল মাসী পাশের বাড়ির বৌ।

সেই প্রথমে বলে, এ কি ব্যাপার রে?

আর একজন বলে, কে নীতা আর কে রীতা?

একজন ওদের মধ্যে বলে ওঠে নীতাকে রীতা।

অন্যজন প্রতিবাদ জানায়, না না, ও তো রীতা না নীতাই।

ওদের ঐ ভুল দেখে এতক্ষণে নীতা হেসে ফেলে, বলে, ধরতে পারছো না তো মাসী কার বিয়ে ?

আশ্চর্য, ওরা যে কেবল যমজ বোন বলে অবিকল একইরকম দেখতে তাই নয় ওদের গলার স্বরটাও অবিকল এক।

পারুল মাসী স্বীকার করে, না—সত্যিই গোলমাল হয়ে যাচ্ছে।

ওদিকে ঘরের বাইরে মণিশংকরের গলা শোনা যায়, পারুল অ পারুল—

এই যে কাকাবাবু আমরা এই ঘরে। পারুল সাড়া দেয়।

বিয়ের লগ্ন এসে গেছে—তোমরা স্ত্রী আচারটাচারগুলো এবারে তাড়াতাড়ি সেরে নাও।

কথা বলতে বলতে মণিশংকর ঘরের মধ্যে এসে ঢোকে।

সেও দুই মেয়েকে একই বেশে পাশাপাশি দেখে থমকে দাঁড়ায়।

সেও তার মেয়েদের কে রীতা কে নীতা ঐ মুহূর্তে চিনতে পারে না।

এতক্ষণে নীতাই সমস্যাটার সমাধান করে দেয়। বাপের মুখের দিকে চেয়ে বলে, রীতাটা জামা কাপড় না পড়ে পাগলীর মত সেজে ছিল তাই ওকে আমি নিজের হাতে সাজিয়ে দিয়েছি বাবা।

মণিশংকরের চোখে জল এসে যায়। বলে. বেশ করেছিস মা, বেশ করেছিস।

নীতা এগিয়ে এসে বাপকে প্রণাম করে। রীতাও বাপকে প্রণাম করে।

মণিশংকর দুই মেয়ের মাথায় হাত রেখে আশীর্বাদ করে।

মৃদু কণ্ঠে বলে, আজ যদি এই লগ্নে সমরেশের মত আর একটা ছেলে পেতাম—রীতাকে তার হাতে তুলে দিয়ে নিশ্চিন্ত হতাম। একসঙ্গে জন্মেছে—বড় হয়েছে—একসঙ্গে খেলেছে হেসেছে।

নীতার এক সখী চাপা গলায় ফিসফিস করে নীতাকে বলে, মেসোমশাইকে বলবো নাকি দুজনকেই একসঙ্গে সমরেশের হাতে তুলে দিতে ?

আঃ শিখা—কি হচ্ছে !

চাপা গলায় তর্জন করে সখীকে নীতা।

পারুল মাসীর দিকে ফিরে মণিশংকর বলে, পারুল, আর দেরি করো না—যাও সভা থেকে বরকে নিয়ে এসো—স্ত্রীআচার-টাচারগুলো সেরে ফেল।

বিবাহের আসর বসেছে।

মণিশংকরের এক দূরসম্পর্কীয় ভাই কন্যা সম্প্রদান করছে।

সালংকারা বধূবেশিনী নীতার পাশে বসে অনুরূপ সাজে সজ্জিতা রীতাও। নীতাই বোনকে বিবাহ সভায় নিয়ে এসেছে।

অবগুণ্ঠনবতী নীতাকে ধরে বসে থাকে রীতা নিঃশব্দে। সমরেশ মন্ত্র পাঠ করে আর মধ্যে মধ্যে স্মিতহাস্যে রীতার দিকেও তাকায়।

এবং যখনই রীতার দিকে তাকায় সমরেশ সে দেখে রীতা কেমন যেন তন্ময় মুগ্ধ দৃষ্টিতে তার দিকে অপলক চেয়ে আছে।

চোখের পাতা পড়ে না যেন রীতার।

বিবাহ তখনো শেষ হয়নি সহসা বাইরে আকাশ কালো হয়ে ঝড় ওঠে।

প্রচন্ড ঝড়। মেঘের ডাক ও বিদ্যুতের চকমকানি সঙ্গে সঙ্গে।

মাথার উপরে শামিয়ানা পতপত শব্দে উড়তে থাকে।

কটা দিন ধরে অতিরিক্ত খাটাখাটনি চলেছিল—মণিশংকরের শরীরটা ভাল যাচ্ছিলো না।

বিবাহ বসবার পর মণিশংকর একসময় ধীরে ধীরে বিবাহের আসর ছেড়ে ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়েছিল। মনটাও চিন্তিত বিষণ্ণ ছিল। ওরা যমজ হলেও একই বৃন্তে যেন দুটি ফুল। পাশাপাশি বড় হয়েছে—হেসেছে খেলেছে—এক থেকে কি অন্যকে পৃথক করে কোনদিনও ভাবতে পেরেছে মণিশংকর।

মনে হয়েছে দুটিকে নিয়েই যেন একটি। নীতা কাল চলে যাবে। রীতা একেবারে একা পড়ে যাবে। হয়তো বাঁচবেই না। মরে যাবে।

বাইরে তখন ঝড়ের সঙ্গে সঙ্গে অসময়ে ঝমঝম করে বৃষ্টি শুরু হয়েছে।

কোনমতে বিবাহের ব্যাপারটা চুকিয়ে সবাই ছাদ থেকে নেমে আসে। মণিশংকরের খোঁজ পড়ে।

রীতাই প্রথমে বলে, বাবা—বাবা কোথায় রে দিদি?

বাবা—

বাবাকে দেখছি না কেন?

সত্যিই তো মণিশংকর কোথায়!

রীতাই প্রথমে মণিশংকরের ঘরে গিয়ে ঢোকে এবং শয্যার দিকে চেয়ে চীৎকার করে ওঠে, বাবা—

রীতার চীৎকার শুনে সকলেই ঘরে ছুটে আসে।

মণিশংকর শয্যার উপর পড়ে আছে অজ্ঞান হয়ে।

উৎসব সকলের মাথায় উঠে যায়। মণিশংকরকে নিয়ে সকলে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। তাড়াতাড়ি ডাক্তার ডাকা হয়।

রীতা আর নীতা অসুস্থ বাপের শয্যার দুপাশে বসে থাকে। ডাক্তার রোগীকে পরীক্ষা করে বিষণ্ণভাবে ঘাড় নাড়লেন।

সমরেশ উৎকণ্ঠিতভাবে শুধায়, কি দেখলেন ডাক্তারবাবু?

স্ট্রোক বলেই মনে হচ্ছে।

ঘন্টাখানেক বাদে মণিশংকরের জ্ঞান ফিরে এলো বটে কিন্তু সে শেষবারের মতই।

রীতা আর নীতা বাপের মুখের উপর ঝুঁকে পড়ে।

ডাকে, বাবা—

সমর—সমর কোথায়?

সমরেশ সামনে এসে ঝুঁকে পড়ে, এই যে আমি।

বিয়ে হয়ে গিয়েছে?

হ্যাঁ।

রীতা—রীতার আর কেউ রইলো না সমর—ওকে তুমি—

আপনি ব্যস্ত হবেন না।

ব্যস্ত আমি হইনি। আমার সময় শেষ হয়ে এসেছে বুঝতে পারছি।

কথা বেশী বলবেন না এখন।

ডাক্তার নিষেধ করেছেন কথা বলো না বাবা, নীতা বলে।

সমর—মণিশংকর পুনরায় ধীরে ধীরে ক্ষীণ কণ্ঠে ডাকে।

বলুন।

রীতা—রীতাকে আমি তোমার হাতেই দিয়ে যাচ্ছি বাবা।

রীতার জন্যে আপনি ভাববেন না। আপনি চুপ করুন।

সমরেশ সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করে মণিশংকরকে।

ওর ভার তুমি—

আমি নিচ্ছি—আপনি কিছু ভাববেন না, সমরেশ বলে।

মণিশংকর চোখ বুজলো। রাত্রি পোহালো না। রাত পোহাবার আগেই মণিশংকরের প্রাণবায়ু বের হয়ে গেল। শেষ নিঃশ্বাস পড়লো।

উৎসবমুখরিত বাড়ির উপরে গভীর কালো শোকের ছায়া নেমে এলো।

পরের দিন সমরেশের নীতাকে নিয়ে রাঁচি যাবার কথা কিন্তু মণিশংকরের আকস্মিক মৃত্যুতে সব ওলট পালট হয়ে গেল।

নীতাকে নিয়ে যদি সে চলে যায় তো সদ্যপিতৃহারা শোকবিহ্বলা রীতাকে কে দেখবে এখানে। তাকে তো দেখবার কেউ নেই।

এক বুড়ি পিসি আর পুরানো ঝি আছে ওদের বাড়িতে অবিশ্যি কিন্তু একা তার উপরে নির্ভর করে রীতাকে সমরেশ কলকাতার বাড়িতে ফেলে রেখে যেতে পারে না।

মণিশংকরকে শেষ সময় সে কথা দিয়েছিল রীতাকে সে দেখবে—রীতার ভার সে নিল। অতএব সমরেশের আর রাঁচি ফেরা হলো না। সে একটা মাসখানেকের ছুটির দরখাস্ত পাঠিয়ে দিল।

মণিশংকরের ব্যবসারও একটা বিলি ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। রীতার একটা পাকাপাকি ব্যবস্থা।

নীতা বলে, তা কেন—রীতার যতদিন না বিয়ে হয় সে আমাদের কাছেই থাকবে।

কিন্তু—সমরেশ বোধহয় বাধা দেবার চেষ্টা করে।

নীতা বলে, বাঃ ওর আর আমরা ছাড়া এ দুনিয়ায় কে আছে বল তো! তুমি বরং ঐ রাঁচির চাকরি ছেড়ে দিয়ে এখানেই কলকাতায় একটা কিছু ব্যবস্থা করে নাও। আমরা একসঙ্গেই থাকবো।

সমরেশও সেইভাবেই চেষ্টা শুরু করে এবং কিছুদিনের মধ্যেই কলকাতায় একটা বিলাতী ফার্মে তার ভাল চাকরি জুটে যায়।

সমরেশ রাঁচির চাকরিতে ইস্তফা দিয়ে দেয়।

সমরেশেরও আপনার বলতে দুনিয়ায় আর কেউ ছিল না। পিতৃবিয়োগ তো তার ছোটবেলাতেই হয়েছিল—মা-ই মানুষ করেছে—এবং সে মাও ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজে অধ্যয়নের সময়ই মারা যান।

মৃত্যুর কিছুদিন আগে থাকতেই মণিশংকরের ব্যবসা মন্দার দিকে চলেছিল। কিছু কিছু ধার দেনাও হয়েছিল।

সমরেশ ধীরে ধীরে সব ধার দেনা শোধ করে দেয়।

সমরেশ সন্ধ্যায় সারা দিনের কাজকর্মের পর মধ্যে মধ্যে ক্লাব ও পার্টিতে যেতো এবং সে তার স্ত্রী নীতাকে সর্বত্র সঙ্গে করে নিয়ে যেতো।

নীতা চিরদিনই একটু অস্থির চঞ্চল প্রকৃতির--বেশভূষা—আড়ম্বর—হইচই করা তার চিরদিনের স্বভাব।

মণিশংকর যতদিন বেঁচে ছিল এবং যতদিন বিয়ে হয়নি ততদিন অতটা পারতো না কিন্তু এখন বিবাহের পর স্বামীর প্রশ্রয় ও স্বাধীনতা পেয়ে নীতা বেশীর ভাগ সময়ই হৈ হৈ করে কাটাতে লাগলো।

নানা ক্লাব ফাংশন সমিতি—এটা ওটা দশটা নিয়ে সর্বদা ব্যস্ত।

আর নীতা যত সংসার থেকে দূরে দূরে সরে যেতে থাকে রীতা যেন ততই সংসারকে নিবিড়ভাবে আঁকড়ে ধরতে থাকে।

সমরেশ খেটেখুটে আসে কিন্তু গৃহে ফিরে নীতার—স্ত্রীর দেখা পায় না –সামনে এসে দাঁড়ায় রীতা।

রীতাকে সমরেশ বিবাহের পর থেকেই ঠাট্টা করে বলতো—নাম্বার টু।

নীতা একদিন বলেছিল, ও আবার কি সম্বোধন ?

সমরেশ হাসতে হাসতে স্ত্রীকে জবাব দিয়েছে, বাঃ ও তো আমার নাম্বার টু-ই—তুমি নাম্বার ওয়ান—ও নাম্বার টু।

রীতা কিন্তু ঐ সম্বোধনে কখনো কোন প্রতিবাদ জানায়নি।

সেদিনও অমনি সন্ধ্যায় অফিস থেকে ফিরেছে সমরেশ—রীতা সাড়া পেয়ে সামনে এসে দাঁড়ালো।

সমরেশ জামা কাপড় ছাড়ছিল। রীতাকে দেখে সহাস্যে বলে, নাম্বার ওয়ান বুঝি নেই ?

রীতা মৃদু কণ্ঠে জবাব দেয়, দিদিদের ক্লাবে কি একটা চ্যারিটি ফাংশন আছে—তাই কখন কত রাত্রে ফিরবে তার ঠিক নেই। যাক ও তো নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার—চা আনি ?

নিশ্চয়ই—নিয়ে এসো। শোনো, আজ একটা ভাল খবর আছে।

কি ভাল খবর ?

আবে এসোই না—শুনবে।

একটু পরে চা পান করতে করতে কথা বলছিল সমরেশ, শোন নাম্বার টু—ইচ্ছা ছিল না তোমাকে পরের হাতে তুলে দিই কিন্তু স্বার্থপরতারও তো একটা সীমা আছে। একটি ভাল পাত্র পাওয়া গিয়েছে—সে তো তোমার ফটো দেখেই মজেছে।

রীতা কোন কথা বলে না। একটা উলের বুনুনি নিয়ে সামনের সোফায় বসে বুনছিল সে সেটাই বুনতে থাকে।

তাহলে কি বল, সামনের মাসেই একটা ভাল দিন দেখে ইতিকর্তব্যটা

সুসম্পন্ন করে দিই ? অবিশ্যি এ হতভাগ্যের বুকটা ফেটে যাবে কিন্তু কি আর তার করা যাবে।

রীতা পূর্ববৎ নীরব। নিঃশব্দে উল বুনে চলেছে।

পাত্রটিকে একবার দেখবে নাকি নাম্বার টু ?

না।

দেখবে না !

না।

ইচ্ছাও করে না দেখতে ?

না।

বল কি ! .

এবারে আর রীতা কোন জবাব দেয় না। চুপ করে থাকে।

কিন্তু নাম্বার টু—একবার দেখলে –

বিয়ে আমি করবো না।

বিয়ে করবে না !

না।

সোকি—কেন বল তো ?

সেটা নাইবা শুনলে। কথাটা বলে রীতা আর দাঁড়ালো না, ঘর ছেড়ে চলে গেল সোফা ছেড়ে উঠে।

সেদিনকার মত ব্যাপারটা ঐখানেই চাপা পড়ে গেলেও দু'দিন পরে আবার প্রাতরাশের টেবিলে সমরেশ স্ত্রীর সামনেই কথাটা তুললো।

রীতাও উপস্থিত ছিল টেবিলে।

সমরেশ বলে, তাহলে কি বলবো সুনীলকে ?

নীতা বলে, কি আবার বলবে—সে যদি রীতাকে দেখতে চায় আসুক একদিন—ও নিজেও দেখুক—তারপর একটা পাকাপাকি দিন স্থির করলেই হবে।

কবে তাহলে আসতে বলবো সুনীলকে ?

সমরেশ স্ত্রীর মুখের দিকে চেয়েই কথাটা বলে।

হঠাৎ রীতা দাঁড়িয়ে ওঠে ঐ সময়। বলে, বিয়ে আমি করবো না—এসব চেষ্টা তুমি করো না।

মানে—নীতা বোনের মুখের দিকে তাকিয়ে বলে ওঠে, বিয়ে করবি না মানেটা কি ?

মানে আবার কি—করবো না।

রীতা কথাটা বলে আর দাঁড়ালো না, ঘর থেকে নিষ্ক্রান্ত হয়ে গেল।

ব্যাপার কি বলত নীতা।

কিসের কি ব্যাপার ?

ওতো বিয়ে করবে না বলছে।

বলুক গে—বিয়ে করবে না একটা কথার কথা হলো নাকি।

কিন্তু—

তুমি ওর কথায় কান দিও না ত।

কান দেবো না।

না।

তারপর একটু থেমে বলে সুনীলকে একদিন চায়ের নিমন্ত্রণ করবার জন্য।

সুনীলের ফটো দেখেছিল ও তার পরিচয়ও সমরেশের কাছে আগেই শুনেছিল নীতা। চমৎকার ছেলেটি।

সমরেশের জানাশোনা। বিলাতফেরত ডাক্তার। বর্তমানে উদীয়মান সার্জনদের মধ্যে ইতিমধ্যেই বেশ নাম করেছে—আগ্রা শহরে প্র্যাকটিস করে।

সমরেশই তাকে পত্র দিয়ে কলকাতায় এনেছে এবং রীতার ছবি দেখে ও তাকে দূর থেকে দেখে পছন্দও করেছে।

লম্বা চওড়া সুশ্রী চেহারা।

সমরেশ সুনীলকে চায়ের নিমন্ত্রণ করে এলো পরের দিন বিকেলে স্ত্রীর কথা মত।

চায়ের টেবিলে কিন্তু বিশ্রী একটা ব্যাপার ঘটে গেল।

হঠাৎ একসময় রীতা বলে ওঠে, মিঃ চৌধুরী, আপনার বন্ধুর আপনাকে আজ এখানে আমন্ত্রণের উদ্দেশ্যটা যাই থাক একটা কথা কিন্তু প্রথম থেকেই আপনার জানা উচিত।

সুনীল তাকায় রীতার মুখের দিকে, কি বলুন তো?

যা উনি ভেবেছেন বা ভাবছেন তা হবে না—হবার নয়।

নীতা তাড়াতাড়ি বলে ওঠে, কি বলছিস তুই রীতা!

ঠিকই বলছি দিদি। আর সে কথাটা আগেই আমি স্পষ্ট করে জানিয়ে দিয়েছি ওকে।

সমরেশের দিকে তাকিয়েই কথাটা শেষ করে রীতা।

তার মানে—কি ওকে স্পষ্ট করে জানিয়ে দিয়েছিস?

সেটা ওকেই তুমি জিজ্ঞাসা করো না।

কথাটা বলে রীতা আর দাঁড়ালো না, ঘর থেকে শান্তপদে বের হয়ে গেল।

হঠাৎ যেন ঘরের মধ্যে একটা বিশ্রী স্তব্ধতা নেমে আসে।

কয়েকটা মুহূর্ত কেউ কোন কথা বলতে পারে না। বলেও না।

তারপর একসময় নীতাই স্বামীর দিকে তাকিয়ে সেই স্তব্ধতা ভেঙে প্রশ্ন করে, কি ব্যাপার বল তো?

সমরেশ যেন কেমন সংকুচিত বিব্রত বোধ করে নিজেকে সহসা, কোন জবাব দিতে পারে না।

বেচারী বন্ধু সুনীলের দিকে যেন তাকাতেও পারে না। নিজে গিয়ে বন্ধুকে সে চায়ের নিমন্ত্রণ করে নিয়ে এসেছে এবং নিমন্ত্রণের আসল উদ্দেশ্যটাও অজ্ঞাত নয় কারো। বাড়িতে ডেকে এনে ওকে অমন করে অপ্রস্তুত হতে হবে জানলে—নিশ্চয়ই সমরেশ এতখানি এগুত না। ছিঃ ছিঃ কি বিশ্রী একটা ব্যাপার হলো।

॥ দুই ॥

নীতাই পুনরায় প্রশ্ন করে, কি হলো কথা বলছো না যে ?

সমরেশ তাড়াতাড়ি ব্যাপারটাকে বুঝি লঘু করবার জন্য বলে ওঠে ও কিছু না—আরে সুনীল তুমি যে একেবারে হাত গুটিয়ে বসে রইলে। নাও শুরু কর।

কিন্তু সুনীলের দিক থেকে যেন কোন সাড়া পাওয়া যায় না। সে যেমন হাত গুটিয়ে বসে ছিল তেমনিই বসে থাকে।

কিন্তু ব্যাপারটা কি সত্যিই বল তো সমরেশ—উনি কি এই বিয়েতে সম্মত নন ?

না, না—সমরেশ সুনীলকে বোঝাবার চেষ্টা করে।

তুমিই বা কথাটা খুলে বলছো না কেন ? নীতাই আবার তাগিদ দেয়।

আরে তুমিও কি ক্ষেপে গেলে নাকি ! সমরেশ বলে, ছেলেমানুষি করে কি একটা কথা বলেছে না বলেছে—বিয়ে করবো না বললেই হলো নাকি।

এবারে সুনীলই কথা বলে, উনি বিয়ে করবেন না বলেছেন ?

হ্যাঁ—কিন্তু তাই হয় নাকি ! তাছাড়া অমন ত সবাই বলে থাকে—তাই বলে কি বিয়ে হয় না।

রীতা বলেছে বিয়ে করবে না ? নীতা প্রশ্ন করে।

হ্যাঁ—ঐ রকমই আর কি। মানে—

নীতা উঠে দাঁড়ায় চেয়ার ছেড়ে, বলে, তোমরা বোস আমি আসছি।

নীতা ঘর থেকে বের হয়ে গেল।

সোজা ঘর থেকে বের হয়ে রীতার ঘরে এসে ঢুকলো।

রীতা জানালার সামনে পিছন ফিরে বাইরের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে চুপটি করে দাঁড়িয়ে ছিল।

নীতা এসে ডাকে, রীতা—

রীতা বোনের ডাকে কোন সাড়া দেয় না।

নীতা আরো দু'পা এগিয়ে আসে, সমরকে তুই কি বলেছিস—বিয়ে করবি না ?

রীতা ফিরে তাকালো এবার দিদির দিকে।

বলেছিস তুই ?

হ্যাঁ।

বিয়ে করবি না তো সারাটা জীবন এইভাবে থাকবি নাকি ?

আমার জন্যে তোকে ভাবতে হবে না।

আমি ভাববো না তো কে ভাববে শুনি ! তুই কি মনে করিস চিরদিন এমনি করে আমাদের সংসারে থাকবি ?

কেন—তোদের কি কোন অসুবিধা হচ্ছে ?

আমাদের না হলেও একদিন দেখবি তোরই অসুবিধা হচ্ছে—তাছাড়া এ বাড়ি বাবা তোকেই দিয়ে গিয়েছেন—আমরাও কিছু চিরদিন তো এ বাড়িতে তোকে আগলে বসে থাকবো না —তখন তোকে কে দেখবে শুনি ?

কেন—চলেই বা যাবি কেন তোরা ? এ বাড়ি আমাকে বাবা দিয়ে গেলেও তোদের থাকবার অসুবিধাটা কি ?

অসুবিধার কথা থাক। তাছাড়া আমি রাজী হলেও সমরই বা রাজী হবে কেন চিরদিন এখানে থাকবে তোর বাড়িতে ? বাবা মরবার সময় তোর ভার আমাদের উপরই দিয়ে গিয়েছেন। সে দায়িত্ব আজো আমরা পালন করতে পারিনি বলেই না এখানো আমরা এখানে পড়ে আছি। তোর বিয়েথা হয়ে গেলেই—

বার বার কেন ঐ একই কথা তুই বলছিস দিদি, আমি তো স্পষ্টই বলে দিয়েছি বিয়ে আমি করবো না সবাইকেই যে বিয়ে করতে হবে তারই বা কি মানে আছে। আমার জন্যে তোদের কিছু ভাবতে হবে না —এক ধারে যেমন আমি পড়ে আছি তেমনি পড়ে থাকবো—তাছাড়া আরো আমি পড়বো। ভাবছি এম. এ. ক্লাসে ভর্তি হবো।

এম. এ. পড়তে চাস তুই পড়—কিন্তু তবু বিয়ে তোকে করতে হবে—এভাবে জীবন কাটানো চলে না। ভুলিস না তুই মেয়েমানুষ, তোর একটা অবলম্বনের দরকার—তাছাড়া তোর বিয়ের ব্যবস্থা আমরা যদি না করি আমাদেরই সকলে নিন্দা করবে—ওসব পাগলামি করিস না —সুনীলকে যদি তোর পছন্দ না হয়ে থাকে অন্য ছেলে আমরা দেখবো।

না।

কি না !

তোরা আমার বিয়ের চেষ্টা করিস না। বিয়ে আমি করবো না—এই আমার শেষ কথা।

কথাটা বলে রীতা ঘর ছেড়ে চলে যায়।

সোজা সে সিঁড়ি দিয়ে নেমে নীচের বাগানে চলে যায়।

ঘরের সংসারের কাজকর্মের ফাঁকে ফাঁকে যেটুকু সময় রীতা পেত ঐ বাগানের মধ্যেই কাটাতো।

বাগানের নির্জনতায় চুপচাপ বসে থাকতে রীতার ভাল লাগে।

কিছুদিনের মধ্যেই অতঃপর রীতা এম. এ. ক্লাসে ভর্তি হয়ে আবার পড়াশুনা শুরু করলো।

সেদিনকার মত ব্যাপারটা আপাততঃ ঐখানেই চাপা পড়ে গেল বটে, কিন্তু নীতার তাগিদে সমরেশ চুপ করে বা নিশ্চিন্ত থাকতে পারে না।

রীতার জন্য আবার পাত্রের সন্ধান সে করতে থাকে। পাত্র পাওয়াও গেল কিন্তু পূর্বের মতই রীতা বললো, আমি তো বলেই দিয়েছি বিয়ে আমি করবো না। কেন আপনারা মিথ্যে চেষ্টা করছেন বলুন তো সমরেশবাবু ?

সমরেশ বলে, পাগল—বিয়ে না করলে হয় নাকি !

রীতা মৃদু হাসে প্রত্যুত্তরে।

হাসছো যে ?

বিয়ে না করলে চলবে না কেন বলুন তো ?

না—বিয়ে না করলে কারো জীবন সম্পূর্ণ হয় না। হতে পারে না।

তাই বুঝি ?

হ্যাঁ।

ঐ সময় রীতা বলে, বিয়েতে আমার যে কেন আপত্তি সেটা আর কেউ না বুঝলেও আমি ভেবেছিলাম অন্তত আপনি বুঝবেন।

কি বলছো রীতা ?

ঠিকই বলছি। হিন্দুর মেয়ের একবারই বিয়ে হয়, দুবার হয় না।

সমরেশ রীতার কথাটা সম্পূর্ণ একটা কৌতুকের সঙ্গে গ্রহণ করে বলে, হবে না কেন—আজকাল তো দুবার তিনবারও কত মেয়ে বিয়ে করছে।

সে যারা করে করুক—আমার চিন্তারও বাইরে।

তা যেন হলো কিন্তু সে কথা তো তোমার বেলায় খাটে না নাম্বার টু। সে কথা আসছেই বা কি করে তোমার ব্যাপারে ?

কেন খাটবে না ?

কারণ তোমার বিয়েই হয়নি।

কে বললে বিয়ে হয়নি ?

বলো কি ! ডুবে ডুবে তাহলে তুমি এই কান্ড ঘটিয়ে বসে আছো নাম্বার টু—তা কবে ঘটলো ব্যাপারটা আর মহাশয় ব্যক্তিটিই বা কে ?

মৃদু হেসে রীতা বলে, কেন, আপনি তো চেনেন।

আমি চিনি—কি সর্বনাশ—কি বলছো তুমি নাম্বার টু !

মিথ্যা বলছি না। সত্যিই তাই।

কিন্তু ভাই নাম্বার টু—সাবধান, যা আমাকে বললে—বললে, তোমার দিদিকে কিন্তু বলো না—মানে ঠাট্টা করেও নয়—সে হয়তো ভাববে সত্যিই আমি জানি আর ঐ ব্যাপারে আমারও হাত আছে ! কথাগুলো বলে হাসতে থাকে সমরেশ।

না—দিদি কোনোদিনই জানবে না। ভয় নেই আপনার।

তা যেন হলো কিন্তু বলো না সত্যি সত্যি ব্যাপারটা কি ? বিয়েতে তোমার এত আপত্তি কেন ?

মৃদু হেসে রীতা বলে, জানতে খুব ইচ্ছা হচ্ছে বুঝি ?

তা হচ্ছে বইকি।

শুনুন সমরেশবাবু, বলবার আমার সত্যিই উপায় নেই কিন্তু তাহলেও কথা দিচ্ছি যদি কোনদিন কাউকে বলি তো একমাত্র সে আপনাকেই বলবো।

আজ বলা যায় না নাম্বার টু ?

বাধা আছে।

॥ তিন ॥

সত্যি কথা বলতে কি সেদিনও সমরেশ ভেবেছিল ব্যাপারটা আগাগোড়াই একটা কৌতুক ছাড়া কিছুই নয় বুঝি।

কিন্তু আরো কয়েকবার রীতার বিয়ে দেবার চেষ্টা করেও যখন সমরেশ ব্যর্থ হলো সে নিজেকে সত্যিই কেমন যেন বিব্রত বোধ করে। কারণ রীতা যে তাদের অগোচরে গোপনে একটা কিছু করবে বা করতে পারে সেটা যেমন সমরেশ বিশ্বাসই করতে পারে না তেমনি তার চিন্তারও বাইরে।

রীতা সে প্রকৃতির মেয়েই নয়।

নীতা ও রীতা যমজ বোন হলেও এবং তাদের ব্যবহারে ও স্বভাবে যতই মিল থাকুক না কেন নীতা ও রীতার মধ্যে যতটুকু তাদের বুঝেছে চরিত্রের মধ্যে কোথায় যেন উভয়ের বিশেষ একটা পার্থক্য আছে।

নীতা গোপনে বিয়ে করলেও করতে পারতো কিন্তু রীতার পক্ষে কোন মতেই তা সম্ভব নয়।

সে যাই হোক বিবাহের ব্যাপারটা রীতার চাপা পড়ে গেল বটে কিন্তু ক্রমশঃ নীতা যেন কেমন তার যমজ বোনের প্রতি বিরূপ হয়ে উঠতে লাগলো দিন দিন।

দুই বোনের মধ্যে প্রীতি ও ভালবাসার এতকাল যে একটা সহজ, সুন্দর ও নিবিড় আকর্ষণ ছিল তার মধ্যে যেন মনে হয় সমরেশের কোথায় একটা অদৃশ্য চিড় ধরতে শুরু করেছে ইদানীং।

নীতা যেন রীতার প্রতি কেমন একটু বিরক্ত—কেমন যেন ঠিক প্রসন্ন নয় আজকাল সমরেশের মনে হয়।

অথচ তার হেতুটা সে খুঁজে পায় না।

নীতার মধ্যে বিশেষ করে রীতার প্রতি তার ব্যবহারে পরিবর্তন একটা হলেও রীতার মধ্যে কিন্তু কোন পরিবর্তন নেই। সে পড়াশুনা করে—ঘরসংসার করে।

দিদি নীতা তার প্রতি যে দিন দিন অপ্রসন্ন হয়ে উঠছে তা যে সে বুঝতে পারে না তা নয় কিন্তু এটাই বুঝতে পারে না সে কারণটা কি ?

এতদিনের স্নেহের সম্পর্কে কেন চিড় ধরলো ?

রীতা চিরদিনই সংসার নিয়ে থাকতো—ইদানীং আরো যেন বেশী করে সংসারকে আঁকড়ে ধরে। পড়াশুনা ও ইউনিভারসিটি বাদে বাকী সময়টুকু তার সংসারের কাজকর্মেই কেটে যায়।

সমরেশের যা কিছু রীতাই দেখাশোনা করে।

দশ জোড়া চোখ মেলে যেন সে সর্বদা সমরেশকে ঘিরে রেখেছে। সমরেশকে ঘিরে সর্বক্ষণ যেন একটি মঙ্গলপ্রদীপশিখা স্নিগ্ধ আলোক বিতরণ করছে।

সমরেশও যে ব্যাপারটা বুঝতো না তা নয়—সে ব্যাপারটা যেন আরো বেশী করে ইদানীং অনুভব করছিল তার স্ত্রী নীতার জন্যই।

যে আকর্ষণ ও ভালবাসায় একদিন নীতার প্রতি তার সমস্ত মনটাকে কানায় কানায় ভরিয়ে তুলেছিল আজ সমরেশের মনে হয় সে আবেগ সে অনুভূতি যেন আর সে খুঁজে পায় না তার স্ত্রী নীতার মধ্যে।

কোথায় যেন একটা কিসের অভাব মনটাকে ক্ষণে ক্ষণে পীড়িত করে তুলতে থাকে সমরেশের।

নীতা যেন কেমন ক্রমশঃ তার কাছ থেকে দূরে সরে সরে যাচ্ছে।

আর সেইখানেই একটা অভিমানের বাষ্প যেন সমরেশের মনের মধ্যে পুঞ্জীভূত হয়ে উঠতে থাকে নিজের অজ্ঞাতেই।

চিরদিনই নীতার চরিত্রের মধ্যে একটা অস্থিরতা ও চাঞ্চল্য ছিল—ইদানীং যেন সেই অস্থিরতা ও চাঞ্চল্য উচ্ছৃংখলতায় পর্যবসিত হতে চলেছে।

কলেজে পড়ার সময় থেকেই পার্টি সমিতি ক্লাব—দিনরাত নীতা ঐসব নিয়েই ব্যস্ত থাকতো—এখন যেন আরো বেশী। বাড়িতে সে থাকেই না বলতে গেলে।

এক একদিন ফিরতে নীতার এত রাত হয়ে যায় যে সারাটা দিনের কর্মক্লান্ত সমরেশ ঘুমিয়ে পড়ে।

সমরেশ যখন শয্যা ত্যাগ করে কাজে বেরুবার জন্য প্রস্তুত হয় নীতা তখনো অধিক রাত্রে এসে শয়ন করার জন্য শয্যায় অঘোরে ঘুমুচ্ছে নাইটি গায়ে।

মনটা সমরেশের প্রথমটায় ক্ষোভ তারপর যেন কি এক বিতৃষ্ণায় ভরে উঠতো—সুন্দর সকালটা যেন বিষণ্ণ হয়ে উঠতো তার কাছে। অথচ একটু পরে স্নান সেরে জামা কাপড় পরে ডাইনিং টেবিলে এসে বসবার সঙ্গে সঙ্গেই মনটা আবার সামনে নীতাকে দেখে প্রসন্ন হয়ে উঠতো।

সদ্যস্নাতা নীতার স্নিগ্ধ শান্ত চেহারা সমস্ত মনের মধ্যে যেন একটা প্রসন্নতা জাগিয়ে তুলতো।

দুজনে দুজনকে মৃদু হাসি দিয়ে প্রভাতের প্রথম সম্ভাষণ যেন জানাতো।

দ্বিপ্রহরেও নীতাই অফিসে লাঞ্চ সাজিয়ে পাঠিয়ে দেবার ব্যবস্থা করে ইউনিভারসিটিতে পড়তে যেত। তারপর রাত্রে ফিরলে নীতাই ডিনার সাজিয়ে দিত টেবিলে।

কোনদিনই ঐসব সময় নীতা উপস্থিত থাকতো না।

প্রত্যেক পুরুষই গৃহে ও সংসারের মধ্যে বুঝি একটু আরাম একটু স্নেহের স্পর্শ চায়—মনের মধ্যে তার একটা আকাঙ্ক্ষা থাকে, একটা তৃষ্ণা থাকে এবং সেটা তার গৃহের আপনজন নারীকে ঘিরেই কিন্তু নীতার কাছ থেকে তার কিছুই না পেয়ে পেয়ে ক্রমশঃ সমরেশের মনটা যেন স্ত্রী নীতার প্রতি শীতল হয়ে আসছিল। নীতার কাছ থেকে দূরে দূরে সরে যাচ্ছিলো।

দুজনাই যেন ক্রমশঃ দুজনার কাছ থেকে দূরে দূরে সরে যাচ্ছিলো।

সমরেশ ব্যস্ত থাকে দিবারাত্র কাজ আর ব্যবসা নিয়ে আর নীতা সর্বদা তার ক্লাব সমিতি ও পার্টির হুজুক নিয়ে, তার পোশাক-আশাকের নিত্য নতুন ফ্যাসন—চুলের প্রসাধনের ফ্যাসন নিয়ে মত্ত থাকতো।

আর স্বামী স্ত্রী ঐ ফাঁকটাকে যেন রীতা তার উপস্থিতি—নিঃশব্দ প্রাণঢালা সেবা ও প্রীতি দিয়ে ভরিয়ে রাখবার চেষ্টা করতো।

অথচ নীতা সেটাও সহ্য করতে পারছিল না বলেই ক্রমশঃ তার বোনের প্রতি বিরক্ত হয়ে উঠছিল।

মধ্যে মধ্যে তাই হঠাৎ দুজনার মাঝখানে যেন একটা ধূমকেতুর মত এসে উপস্থিত হতো নীতা।

স্বামীকে বা রীতাকে স্পর্শ করে কিছু বলতো না বটে তবে চাকর-বাকরদের 'পরে রাগারাগি করে গালাগালি দিয়ে একটা নাটক সৃষ্টি করতো।

সমরেশ নিঃশব্দে উঠে যেতো -রীতাও একসময় সরে পড়তো এবং গিয়ে পড়ার টেবিলে বসতো।

সেদিনও সকালে প্রাতরাশের টেবিলে ঝড়ের মত উপস্থিত হয়ে নীতা চেঁচামেচি শুরু করতেই রীতা নিঃশব্দে ঘর থেকে বের হয়ে গেল।

এবং সমরেশও না খেয়ে অর্ধভুক্ত অবস্থাতেই টেবিল ছেড়ে উঠে এলো।

শয়নকক্ষে প্রবেশ করে সমরেশ জামা কাপড় পরছে নীতা এসে ঘরে ঢোকে, উঠে এলে যে ব্রেকফাস্ট না খেয়ে?

সমরেশ নীতার কথার কোন জবাব না দিয়ে আরশির সামনে দাঁড়িয়ে গলার টাইয়ের নট্‌টা ঠিক করতে থাকে।

খেয়ে এলো না কেন? জবাব দিচ্ছ না কেন?

খাবো কি—তুমি যা হঠাৎ শুরু করলে!

কেন তোমাদের তো আর কিছু বলিনি—বলেছি চাকর-বাকরদের—তবে ফোসকা পড়লো কেন?

দেখ নীতা, ব্যাপারটা কিন্তু ক্রমশঃই কুৎসিত হয়ে দাঁড়াচ্ছে।

বল কি। আমার অনুপস্থিতিতে প্রত্যহ এ বাড়িতে যা ঘটছে তার চাইতেও বেশী কুৎসিত কিছু পৃথিবীতে আছে নাকি?

সঙ্গে সঙ্গে ফিরে দাঁড়ায় সমরেশ। নীতার দিকে তাকায়।

নীতা তখনো থামেনি।

অনেকদিন ধরে যে সংশয় ও আক্রোশের আগুনটা মনের মধ্যে তার ধূমায়িত হচ্ছিলো সেটা বুঝি আর চেপে রাখতে পারে না নীতা।

দপ্‌ করে জ্বলে ওঠে। নীতা বলে, ছিঃ ছিঃ—তুমি যে এতখানি নির্লজ্জ হতে পারো সত্যিই আমার ধারণারও অতীত ছিল নীতা, সমরেশ বলে।

নির্লজ্জ আমি না তোমরা?

নীতা—

বাড়ির চাকরবাকররা পর্যন্ত আড়ালে হাসাহাসি শুরু করেছে—সেদিন বুঝতে পারিনি কিন্তু আজ বুঝতে পারছি কেন রীতার বিয়ের ব্যাপারে

আমার বার বার তাগিদ দেওয়া সত্বেও তোমার কোন গা কোনদিনই তেমন ছিল না। আমি বোকা তাই চোখ থাকতেও দেখতে পাইনি—বুঝেও বুঝিনি—কিন্তু আর না—শোন—স্পষ্ট করেই তোমাকে আমি জানিয়ে দিচ্ছি ওর এখানে আর থাকা চলবে না।

কি বলছো তুমি নীতা!

বিস্ময়ে যেন সমরেশ বোবা হয়ে গিয়েছে। স্ত্রীর কথার তাৎপর্যটা যেন সে ঠিক বুঝে উঠতে পারছে না।

নীতা পুনরায় বলে ওঠে, ঠিকই বলছি—ওর আর এ বাড়িতে থাকা হতে পারে না।

কিন্তু ভুলে যাচ্ছো তুমি একটা কথা— ও তোমার মায়ের পেটের বোন—তুমি আব আমি ছাড়া ওরা এ সংসারে আর কেউ নেই।

সে তো ওর ইচ্ছাকৃত ব্যাপার।

ইচ্ছাকৃত!

নয় তো কি—বিয়ে দেবার তো চেষ্টাই করা হয়েছে—কেন ও করেনি; ইচ্ছা করে যদি ও দুর্ভাগ্যকে ডেকে আনে তাব জন্য দায়ী আমি নিশ্চয়ই হবো না।

কিন্তু—

কোন কিন্তু আর নয়—তুমি না বলতে পারো আমিই ওকে জানিয়ে দেবো।

কিন্তু এ বাড়ি তোমার বা আমার নয়—তোমাদের বাবা ওকে লিখে দিয়ে গিয়েছেন।

ঠিক আছে, তার জন্যে ও যে টাকা চায় দিয়ে দাও—মোদ্দা কথা এ বাড়ি ছেড়ে ওকে চলে যেতে হবে নচেৎ আমরাই এ বাড়ি ছেড়ে চলে যাবো।

ওরা দুজনার একজনও জানতে পারেনি সেদিন সে মুহূর্তে ঘরের বাইবে বারান্দায় দাঁড়িয়ে রীতা এবং ওদের প্রতিটি কথা তার কানে যাচ্ছে।

একটু পরে ঘর থেকে ঝড়ের মত বের হয়ে এলো নীতা এবং বারান্দায় পা দিতেই রীতার সঙ্গে তার চোখাচোখি হয়ে যায়।

তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে সে নীতার দিকে একবার তাকায় তাবপর মুখ ঘুরিয়ে সোজা গিয়ে নিজের পড়ার ঘরে ঢোকে। কিন্তু সেদিন রীতার এক পাতাও পড়া হয় না। ইউনিভারসিটিতেও যায় না সে—খায়ও না।

ঐ দিনই—

রীতা বাগানের মধ্যে ঝাঁকড়া কামিনীগাছটার নীচে বসে ছিল পাথরের বেঞ্চটাব উপর।

নীতা বা সমরেশ কেউ বাড়িতে নেই।

সমরেশ সেই সকালে বের হয়ে গিয়েছে আর ফেরেনি। রীতার ক্লাস ছিল না সেদিন, ছুটি ছিল—দুপুরে রীতা সমরেশকে অফিসে ফোন করেছিল।

সমরেশ বলেছে দুপুরে সে ফিরবে না—ফিরতে তার রাত হবে।

আর নীতা বিকেল পর্যন্ত তার ঘরেই শুয়ে ছিল—বিকেলের দিকে সেজেগুজে বের হয়ে গিয়েছে—সেও যে কখন কত রাত্রে ফিরবে কে জানে। কয়দিন থেকে দু'বোনের মধ্যে কথাবার্তা পর্যন্ত বন্ধ।

বিকেল থেকেই আকাশে মেঘ করেছিল। হয়তো বৃষ্টি নামবে।

আজ রীতা বেশভূষাও করেনি।

নীতার সব কথাই আজ তার কানে গিয়েছে।

রীতাও মনে মনে ভাবছিল আর তার এ বাড়িতে থাকা ঠিক হবে না সত্যিই। চলেই বোধহয় যাওয়া তার সব দিক দিয়ে ভাল।

ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা হাওয়া বইছিল। অবশেষে একসময় বৃষ্টি নামলো।

রীতা কিন্তু ওঠে না—অন্ধকারে বৃষ্টির মধ্যেই চুপ করে বেঞ্চের উপর যেমন বসে ছিল তেমনি বসে থাকে চুপচাপ কেমন অলস—বিষণ্ণ।

কিন্তু বৃষ্টি ক্রমেই জোরে শুরু হয়। রীতাকে উঠতেই হলো। কিন্তু ঘরে এসে যখন পৌঁছলো ভিজে একেবারে সর্বাঙ্গ একশা হয়ে গিয়েছে।

সমস্ত বাড়িটা অদ্ভুত রকমের নিঝুম। আলোটা জ্বালালো ঘরের রীতা।

ঘরের দেওয়ালে টাঙানো প্রমাণ আরশির মসৃণ গাত্রে রীতার চেহারাটা প্রতিফলিত হলো উজ্জ্বল আলোয় মুহূর্তে তার চোখের দৃষ্টির সামনে।

আরশির গায়ে প্রতিফলিত নিজের চেহারাটার দিকে তাকালো রীতা।

পরনে সাধারণ একটা তাঁতের শাড়ি। মাথার রুক্ষ চুল জলে ভিজে সপসপ করছে। দু'হাতে মাত্র একগাছি করে সরু সোনার বালা। গলায় সরু একটা সোনার বিছেহার। আর দেহের কোথায়ও কোন অলংকার নেই।

নীতার বিয়ের রাত্রের পর থেকে একদিনও সে একটা ভাল শাড়ি পরেনি—একটা গহনা গায়ে দেয়নি।

কিন্তু বাবা তো তোকে সবই দিয়ে গিয়েছে।

শাড়ি গহনা আলমারি ভরতি সব কিছু তার রয়েছে। পর্যাপ্ত।

কোন কিছুরই অভাব নেই।

কেন—কেন সে তার কিছুই ব্যবহার করে না! নীতা তাকে কিছু না বললেও সমরেশ মধ্যে মধ্যে বলতো, নাম্বার টু, তুমি যৌবনে এমন করে যোগিনী সেজে থাক কেন বল তো?

রীতা জবাব দিয়েছে, ভাল লাগে না।

কিন্তু নীতার তো ভাল লাগে।

সকলের কি সব কিছু ভাল লাগে?

সমরেশ ঠাট্টা করে বলেছিল, ভাল লাগবে কি করে। যে বয়েসের যা। এই জন্যেই তো বিয়ে করতে বলি তোমায়। তা কি যে তোমার ধনুকভাঙ পণ। বিয়ে করবো না। সত্যি নাম্বার টু, আজো বুঝতে পারলাম না কেন এ মতি তোমার?

রীতা কোন জবাব দেয়নি।

বাইরে বেশ বৃষ্টি হচ্ছে। রাত বোধহয় প্রায় নয়টা।

রীতা এগিয়ে এসে জানালাটার সামনে দাঁড়ালো—জানালার কবাট দুটো খুলে দিল।

ঝরঝর বর্ষণ—এলোমেলো হাওয়া।

সামনের বাড়ির ছেলেটি অর্গান বাজিয়ে গান গাইছে :

ভীতক চীত ভুজগ হেরি যো ধনি
চমকি' চমকি' ঘন কাঁপ।
অব আন্ধিয়ারে আপনি তনু ছাপই',
কর দেই' ফণি-মণি ঝাঁপ॥

মাধব, কি কহব তুয়া অনুরাগ।
তুয়া অভিসারে অবশ নব নাগরী
জীবই বহুপণ-ভাগ॥

রীতার বুকের মধ্যে যেন কাঁপতে থাকে কি এক মধুর আবেশে।

রীতা যেন স্বপ্নের ঘোরে আচ্ছন্নের মত আলমারিটার সামনে এসে দাঁড়ায় একসময় নিজের অজ্ঞাতেই।

আলমারির দরজাটা খুলে থরে থরে সাজানো নানা রঙবেরঙের শাড়িগুলোর দিকে তাকিয়ে থাকে কি এক আবেশে যেন।

সমরেশের মনটা সত্যিই সেদিন ভাল ছিল না।

নীতার পরিবর্তন সে লক্ষ্য যে করেনি তা নয়—বুঝতে যে সে পারেনি রীতার প্রতি সর্বদাই ইদানীং কেমন যেন বিরক্ত তাও নয় কিন্তু শেষ পর্যন্ত যে নীতা এমন করে নির্লজ্জের মত কুৎসিতভাবে নিজের মনের সেই বিরক্তি প্রকাশ করতে পারে—বিশেষ করে নিজের মায়ের পেটের বোন সম্পর্কে এতবড় রূঢ় কথা উচ্চারণ করতে পারে সেটা বুঝি তার চিন্তারও অতীত ছিল।

শুধু তাই নয়, নীতার মনের ভয়াবহ রূপটা যেন তাকে একেবারে স্তম্ভিত করে দিয়েছিল। তাই সে কাজের ফাঁকে ফাঁকে সারাটা দিন ধরে ভেবেছে এরপর তিনজনে এক গৃহে নিত্য এই সন্দেহ ও সংশয়ের পীড়নের মধ্যে বাস করবে পাশাপাশি।

সন্দেহ বস্তুটা বড় সংঘাতিক—মারাত্মক।

বিষের মত রক্তে একবার প্রবেশ করলে দেহের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে।

আশ্চর্য, রীতাকে ঘিরে নীতার মনের মধ্যে যে এমন একটা বিশ্রী সন্দেহ দানা বেঁধে উঠতে পারে কোনদিন কথাটা যতই সে ভাবে ততই যেন নিজের কাছে সমরেশের লজ্জার অবধি থাকে না।

বাড়ি ফিরে আবার রীতার সামনে গিয়ে তাকে দাঁড়াতে হবে কথাটা যতই ভাবে ততই বুঝি সমরেশ নিজেকে বিপন্ন, বিব্রত বোধ করে।

সমরেশ অন্যান্য দিন কাজ শেষ হলে বাড়িতেই ফিরে যায় আজ কিন্তু ফিরলো না—খানিকটা এদিক ওদিক ঘুরলো তারপর গেল ক্লাবে।

সেখানে অনেক রাত পর্যন্ত কাটালো।

এবং অনেক দিন পরে সমরেশ কয়েক পেগ ড্রিংক করলো।

বেশ রাত করেই সে বাড়িতে ফিরলো সেদিন।

চুপিচুপি নিজের ঘরে ঢুকে গিয়ে আলোটা জ্বালালো।

নীতা এখনো ফেরেনি।

একবার মনে হলো সমরেশের এত রাত্রেও নীতা কেন ফেরেনি কিন্তু তা নিয়ে মাথা ঘামালো না সে।

জামা কাপড় ছেড়ে আলোটা নিভিয়ে শয্যায় গিয়ে আশ্রয় নিল।

নেশার ঘোরে ঘুম নেমে আসে দু'চোখের পাতায়।

হঠাৎ একসময় অন্ধকারেই শয্যার ঠিক পাশে শাড়ির মৃদু একটা খসখস শব্দে চুড়ির মৃদু রিনঝিন শব্দে ঘুমটা বুঝি ভেঙে যায়।

চোখ মেলে তাকাল সমরেশ।

জানালার কাছে মনে হলো সমরেশের আবছা আবছা কে যেন দাঁড়িয়ে আছে।

জিজ্ঞাসা করে, কে নীতা?

কিন্তু কোন সাড়া পায় না।

নীতা দাঁড়িয়ে কেন এখানে শোবে না?

সাড়া নেই তবু।

সমরেশ আবার ডাকে, নীতা—

ছায়ামূর্তি এবারে পায়ে পায়ে ওর শয্যার পাশটিতে এসে দাঁড়ায়।

শুয়ে শুয়েই হাত বাড়িয়ে নীতার একটা হাত চেপে ধরে সমরেশ, এসো—

সমরেশের আকর্ষণে ছায়ামূর্তি যেন তার বুকের উপর এসে পড়ে।

দু'হাত দিয়ে একেবারে বুকের কাছে টেনে নেয় তাকে সমরেশ।

বাইরে তখন আবার ঝমঝম শব্দে বৃষ্টি শুরু হয়েছে।

কোথায় বুঝি বজ্রবিদ্যুৎ কড়কড় করে ঝলসে ওঠে হঠাৎ আলোর ঝলকানীতে।

জানালার সার্সীর গায়ে একটা নীল আলো ঝাপটা দিয়ে যায়।

সমরেশ আরো নিবিড় করে স্ত্রীকে বুকের মধ্যে আঁকড়ে ধরে।

বাইরে বৃষ্টি পড়তে থাকে ঝমঝম শব্দে মুষলধারায়।

মুহূর্ত।

মুহূর্তের জন্য যেন সমরেশের হোশটা—ঐ বর্ষা রাত্রির সমস্ত আমেজটা কেটে গিয়েছিল—সমস্ত উত্তেজনা আবেগ প্রশমিত হয়ে গিয়েছিল।

আর ঠিক সেই সময় নীতাও শয্যা ছেড়ে সদ্য আলিঙ্গনচ্যুত হয়ে উঠে দাঁড়ায়।

সমরেশ নিজের অজ্ঞাতেই বুঝি হাত বাড়িয়ে সুইচটা টিপে দেয়—ঘরের মধ্যে সবুজ আলো জ্বলে ওঠে।

সেই সবুজ আলোর সামনে দাঁড়িয়ে বেনারসী শাড়ি পরা—সর্বাঙ্গে অলংকার—কে—নীতা ?

নীতা ?

কিন্তু ডাকতে গিয়েও সমরেশের গলার শব্দটা যেন গলার মধ্যেই হারিয়ে যায়।

ডাকতে পারে না সে—ডাকা আর হয় না।

নীতা তখন চলে যাচ্ছে দরজার দিকে।

তড়াক করে এক লাফে উঠে সমরেশ ঘরের উজ্জ্বল আলোটা জ্বালিয়ে দেয়—এখন আর ঝাপসা অস্পষ্ট নয়—স্পষ্ট।

অত্যন্ত স্পষ্ট—প্রখরভাবেই স্পষ্ট।

নীতা চিরদিন রাত্রে নাইটি পরে শয্যায় আসে—এমন করে বেশভূষা করে

সামনে এগিয়ে গিয়ে অস্ফুট চীৎকার করে ডাকে, নীতা—একি !

কিন্তু সমরেশের মুখের কথাটা শেষ হলো না।

ফিরে দাঁড়িয়েছে সে তখন।

প্রথমটায় একটু বিহ্বল হলেও সেটা কাটিয়ে উঠতে সমরেশের দেরী হয় না—একি—রীতা তু—তুমি !

হ্যাঁ—নীতা নয় রীতাই।

নীতাই একটু আগে তার শয্যাসঙ্গিনী ছিল অন্ধকারে—নিবিড় আলিঙ্গনে আবেগে কামনার মধ্যে ছিল আত্মসমর্পিতা।

সমরেশের যেন কণ্ঠ রোধ হয়ে গিয়েছে তখন।

অবিশ্বাস্য রকম বিস্ময়ে সে যেন বোবা—পাথর হয়ে গিয়েছে নীতার বদলে রীতাকে সামনে দেখে ঐ মুহূর্তে ঘরের মধ্যে।

বাইরে তখন আর বৃষ্টি পড়ছে না।

বৃষ্টি থেমে গিয়েছে।

রীতা—তু- তুমি ?

রীতা চেয়ে আছে সমরেশের দিকে।

তার দু চোখে জল—সে নীরব।

কেন, কেন তুমি—

সমরেশ—

বল, বল—এর মানে কি—কেন, কেন তুমি—ছিঃ ছিঃ ছিঃ।

আকণ্ঠ ঘৃণায় যেন সমরেশ রীতাকে একটা ধিক্কার দিয়ে ওঠে, তুমি এত নীচ—এত ছোট—এত কুৎসিত তুমি—এমনি করে—

অমন করে তুমি আমাকে বকো না সমরেশ—অমন করে ঘৃণার দৃষ্টিতে তাকিও না।

উঃ আমি ভাবতেই পারিনি তুমি—

জানি সমরেশ, জানি—তুমি যে আমাকে কোনদিন বুঝতে পারনি আমি তা জানি—কিন্তু তুমি বিশ্বাস করো আমার মনের মধ্যে কোন পাপ ছিল

না—কোন সংশয় কোন দ্বিধা ছিল না—নচেৎ—

থাম থাম—ছিঃ, তোমার মুখের দিকে তাকাতেও আমার ঘৃণা হচ্ছে।

না—অন্তত আজকের রাতটা তুমি আমাকে ঘৃণা করো না সমরেশ। এই প্রথম ও এই শেষ—আর আমার ছায়াও কোনদিন তুমি দেখতে পাবে না।

তারপর একটু থেমে আবার বলে, ভেবেছিলাম কেউ কোনদিন জানবে না—কিন্তু আজ যখন স্পষ্টই বুঝতে পারলাম দিদির কথায় এখানে থাকা আর আমার চলবে না তখন যাবার আগে বাকী জীবনটার জন্যে একটু—একটুখানি ভিক্ষা তোমার অজ্ঞাতেই তোমার কাছ থেকে নিয়ে নিঃশব্দে এ বাড়ি ছেড়ে চলে যাবো এ ঘরে এসেছিলাম তারপর যে কি হয়ে গেল—তুমি ডাকলে—বারবার ডাকতে লাগলে—আমার মনের সমস্ত শক্তি যেন হারিয়ে ফেললাম আমি—তারপর—তারপর তোমার আলিঙ্গন—তোমার সোহাগ আমাকে যেন সব কিছু ভুলিয়ে দিল মুহূর্তে—জানি তুমি আমাকে ক্ষমা করতে আজ কিছুতেই পারছো না—কিন্তু যদি পারো—কোনদিন যদি পারো তো জেনো রীতা অবিশ্বাসিনী নয় দ্বিচারিণীও নয়। মনে মনে এতকাল যাকে সে তার স্বামী বলে জেনেছে—

স্বামী!

হ্যাঁ, স্বামী। স্বামীকেই রীতা তার দেহটা অর্ঘ দিয়েছে।

কি বলছো তুমি রীতা!

সমরেশের যেন বিস্ময়ের অবধি নেই।

ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে থাকে রীতার মুখের দিকে সে।

রীতার দু' চোখের কোল বেয়ে অজস্র অশ্রু ঝরে পড়ছে।

প্রবাহমান অশ্রু ধারায় ঝাপসা চোখে সমরেশের দিকে তাকিয়ে রীতা বলতে থাকে—

একদিন তোমাকে আমি বলেছিলাম যদি কোনদিন কাউকে বলি যে কার সঙ্গে আমার বিবাহ হয়েছে তো তোমাকেই বলব। হ্যাঁ—দিদিকে যেদিন তুমি অগ্নি নারায়ণ শিলা সাক্ষী রেখে গ্রহণ করেছিলে সেদিন তার পাশে বসে আমিও যে তোমাকেই, দেবতাকে অগ্নিকে সাক্ষী রেখে মনে মনে স্বামী বলে গ্রহণ করেছিলাম।

রীতা!

হ্যাঁ—সমরেশ। নচেৎ এমনি করে কোন মেয়ে কি কোন পুরুষের কাছে ধরা দিতে পারে। তবু ভেবেছিলাম ওকথা কেউ জানবে না, কাউকে জানতে দেবো না কিন্তু মুহূর্তের দুর্বলতা আমাকে যেন—কিন্তু, থাক সে কথা—এ রাতটার কথা কেউ জানবে না—তুমিও মনে রেখ না সমরেশ। মুছে ফেলো এ রাতটার সমস্ত স্মৃতি, তোমার মন থেকে! তোমার ঘৃণা—আমার লজ্জা সে আমারই থাক। আমারই থাক।

রীতার প্রবহমান অশ্রুধারা তার গণ্ড ও চিবুক প্লাবিত করে দিচ্ছিল।

কথাগুলো বলে আর রীতা দাঁড়ালো না। নিঃশব্দে ঘরের দরজাটা খুলে

ঘর থেকে বের হয়ে গেল।

আর সমরেশ বোবা, পাথর হয়ে যেন অতঃপর যেমন ঘরের মধ্যে দাঁড়িয়ে ছিল তেমনি দাঁড়িয়ে রইলো।

খোলা দরজাপথে হুহু করে ঠাণ্ডা জোলো হাওয়া ঘরের মধ্যে এসে ঢুকেছে।

বাইরের দালানে ঘড়িতে ঢং ঢং করে রাত বারটার সময় সংকেত জানান দেয়।

কতক্ষণ—কতক্ষণ দাঁড়িয়ে ছিল প্রস্তরমূর্তিবৎ সমরেশ অমনি ঘরের মধ্যে তা সে নিজেও জানে না। খেয়ালও ছিল না তার।

হঠাৎ নীতার কণ্ঠস্বরে সে যেন সংবিৎ ফিরে পায়।

চমকে ওঠে।

নীতা বাড়িতে ফিরে কখন এসে দাঁড়িয়েছে খোলা দরজা-পথে ঘরের মধ্যে তা সে টেরও পায়নি।

উঃ কি বৃষ্টি রে বাবা—এমন আটকা পড়েছিলাম—কিন্তু কথাগুলো বলতে বলতে নীতা হঠাৎ যেন স্বামীর দিকে ভাল করে নজর পড়তে থেমে যায়।

বলে, কি ব্যাপার, এমন করে ভূতের মত দাঁড়িয়ে আছো?

নীতার কথার কোন জবাব দেয় না সমরেশ। কেমন যেন বিহ্বল বোবা দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে নীতার মুখের দিকে।

নীতার মনে হয় নিশ্চয়ই সমরেশ অসন্তুষ্ট হয়েছে।

নীতা তার অপরাধ স্খালনের জন্য অনুতপ্ত গলায় বলে, রাগ করছো সমরেশ?

সমরেশ কোন জবাব দেয় না—কেবল ওর মুখের দিকে তাকায়।

রুপুর স্বামী মিঃ মুখার্জী পৌঁছে দিয়ে গেলেন—রাস্তায় একহাঁটু জল—ওরা তো কিছুতেই আসতে দেবে না—বলে ফোন করে দিচ্ছি মিঃ চক্রবর্তীকে।

ঢং করে বাইরে দালানের ঘড়িতে রাত একটা বাজলো।

সমরেশ ধীরে ধীরে গিয়ে শয্যায় শুয়ে পড়লো।

একটু পরে জামা কাপড় বদলে নাইট ড্রেস পরে নীতা আলো নিভিয়ে শয্যায় এসে আশ্রয় নিল।

ঘুমিয়ে পড়লে নাকি? নীতা জিজ্ঞাসা করে।

সমরেশের দিক থেকে কোন সাড়া আসে না।

নীতা একটা হাত স্বামীর গায়ে রাখে।

সমরেশ।

আঃ বিরক্ত করো না নীতা, আমার বড্ড ঘুম পাচ্ছে। আমাকে ঘুমাতে দাও।

সমরেশ পাশ ফিরে একটু সরে শোয়।

সে রাত্রে সমরেশ একবারের জন্যও চোখ বুজতে পারে না।

বাড়ির পুরনো ঝি সুখদাই এসে সংবাদটা দিল প্রাতরাশের টেবিলে।

ছোড়দিকে কোথায়ও পাওয়া যাচ্ছে না বড়দি।

টোস্টে মাখন মাখাতে মাখাতে নীতা বলে, পাওয়া যাচ্ছে না মানে—এত সকালে আবার সে কোথায় যাবে? দেখগে বাগানে গিয়ে হয়তো বসে আছে—যেখানে সব সময় থাকে।

কোথায়ও নেই বড়দি—সব জায়গা খুঁজে দেখেছি।

দেখ সকালে কোথায়ও হয়তো বের হয়েছে, নীতা বলে।

মুখোমুখি একটা চেয়ারে বসে ছিল সমরেশ।

হাতে ঐদিনকার সংবাদপত্রটা। তার কানে সুখদার কথাগুলো যায়।

সমরেশ তাড়াতাড়ি উঠে পড়ে।

ওকি চা না খেয়ে উঠলে যে? নীতা স্বামীর দিকে তাকিয়ে বলে।

সমরেশ স্ত্রীর কথার কোন জবাব দেয় না, ফিরেও তাকায় না, ঘর থেকে বের হয়ে যায়।

গত রাত্রের রীতার সেই কথাগুলো মনে পড়ে যায়, তবে কি সত্যি সত্যিই রীতা চলে গেল নাকি!

সমবেশ গিয়ে রীতার ঘরে ঢোকে। দরজাটা খোলাই ছিল। ঘরের যেখানকার যা ঠিক তেমনই আছে। সেই আলমারি, সেই ড্রেসিং টেবিল।

ড্রেসিং টেবিলের 'পরে দুটো ফ্রেমে দুটো ফটো ছিল—একটা রীতার নিজেব অন্যটা নীতা ও সমরেশের বিযের আগে তোলা ফটো।

রীতার ফটোটা বা অন্য ফটোটা কোনটাই নেই।

পড়ার টেবিলে বইগুলো তেমনিই আছে।

এগিয়ে যায় সমরেশ টেবিলের সামনে—এবং সেই টেবিলের উপরেই বই চাপা দেওয়া একটা ভাঁজকরা কাগজ নজরে পড়ে ওর।

হাত বাড়িয়ে বইয়ের তলা থেকে ভাঁজকরা কাগজটা টেনে নেয় সমরেশ। কাগজের ভাঁজটা খোলে।

একটা চিঠি।

হ্যাঁ, তাকেই সম্বোধন করে লেখা।

সমরেশবাবু,

আমি চলে যাচ্ছি। আমায় তোমবা খুঁজো না। এবাড়ির সমস্ত স্বত্বও স্বেচ্ছায় ত্যাগ করে গেলাম।

ইতি—রীতা

ছোট সংক্ষিপ্ত চিঠি। মাত্র দু'লাইনেব চিঠি।

রীতা তাহলে সত্যি সত্যিই চলে গেল। এবাড়ি থেকে চলে গেল।

চিঠিটা হাতে করে অনেকক্ষণ নিস্পন্দ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো সমরেশ, তারপর একসময় নিজের ঘবে এসে ঢুকলো। ...

নীতা ড্রেসিং টেবিলের সামনে বসে চিরুনি দিয়ে চুল আঁচড়াচ্ছিল, সমরেশের পায়ের শব্দ পেয়ে চুল আঁচড়াতে আঁচড়াতেই বলে, রীতা নিশ্চয়ই

মায়ার ওখানে গিয়েছে—একটা ফোন করে দেখ না।

সেখানে সে যায়নি—মৃদু কণ্ঠে সমরেশ বলে।

যায়নি—তবে কোথায় গেল ?

ফিরে তাকালো সমরেশের দিকে নীতা।

সে বাড়ি ছেড়ে চলে গিয়েছে।

বাড়ি ছেড়ে চলে গিয়েছে ?

হ্যাঁ।

সে আবার কি ?

সমরেশ কোন কথা না বলে চিঠিটা স্ত্রীর দিকে এগিয়ে দিল।

হাত বাড়িয়ে চিঠিটা নেয় নীতা।

দু'লাইনের চিঠি পড়তে দু'মিনিটও লাগে না।

এ চিঠি তুমি কোথায় পেলে ? নীতা প্রশ্ন করে।

ওর পড়ার টেবিলে ছিল।

পড়ার টেবিলে!

হ্যাঁ।

আমি, আমি তো কিছু বুঝতে পাচ্ছি না। হঠাৎ—

সমরেশ কোন কথা না বলে স্ত্রীর মুখের দিকে তাকায়।

কাল কখন তুমি বাড়ি ফিরেছো ?

এগারটার কিছু পরে বোধহয়। সমরেশ মৃদু কণ্ঠে জবাব দেয়।

রীতার সঙ্গে কাল রাত্রে তোমার দেখা হয়নি ?

সমরেশ কোন জবাব দেয় না স্ত্রীর কথার। নিঃশব্দে ঘর থেকে বের হয়ে যাবার জন্য পা বাড়ায়।

কোথায় চললে ?

সমরেশ কোন জবাব না দিয়ে ঘর থেকে বের হয়ে গেল।

পাশের ঘরে ঢুকে গায়ে একটা জামা চড়িয়ে নেয়। সোজা তারপর নীচে নেমে যায়। ড্রাইভার রতনকে গাড়ি বের করতে বলে।

রতন তাড়াতাড়ি গাড়ি বের করে আনে। নিজেই গাড়িতে উঠে ড্রাইভিং সীটে বসে গাড়িতে স্টার্ট দেয় সমরেশ।

গেট দিয়ে গাড়ি নিয়ে বের হয়ে যায়।

রীতা তাহলে সত্যি সত্যিই চলে গেল। গাড়ি চালাতে চালাতে যত রীতার চলে যাওয়ার কথাটা ভাবে নিজের কাছে যেন নিজেকে অত্যন্ত অপরাধী মনে হতে থাকে সমরেশের।

গত রাত্রের সমস্ত ব্যাপারটা মনে মনে ভাববার চেষ্টা করে সমরেশ।

সত্যিই সে বুঝতে পারেনি।

নেশার ঘোরে শয্যায় শোওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দু'চোখে ঘুম জড়িয়ে এসেছিল, তারপর হঠাৎ এক সময় ঘুমটা ভেঙ্গে যায়—ভাঙ্গা হয়ত ঠিক নয় আধো জাগরণ আধো তন্দ্রা বুঝি সেটা তার—সেই সময় জানালার কাছে ছায়ার মত কাকে দেখতে পায়। স্বভাবতঃই ওর মনে হয়েছিল—কে আবার হবে অত

রাত্রে তার ঘরে—নীতাই—নীতা ভেবেই তাকে সে ডেকেছিল, কাছে টেনে নিয়েছিল তারপর সেই অবস্থাতেই আতপ্ত একটা কোমল দেহের স্পর্শ সে পেয়েছিল।

সুকোমল শয্যায় ঘুমের মধ্যে সেই কোমল উষ্ণ দেহের স্পর্শ আধো জাগরণ আধো ঘুমের মধ্যেই হয়তো তাকে জৈবিক আকর্ষণে নিজের অজ্ঞাতেই সচেতন করে তুলেছিল।

দু'হাতে সে জড়িয়ে ধরেছিল পার্শ্ববর্তিনী শয্যা-সঙ্গিনীকে।

অমন তো কত রাতেই পাশে শোওয়া নীতাকে সে নিবিড় আবেগে বুকের মধ্যে টেনে নিয়েছে অন্ধকারে।

কোন দ্বিধা কোন সন্দেহই মনের কোথায়ও জাগেনি।

কিন্তু তারপর যখন হঠাৎ পাশ থেকে রীতা উঠে পড়লো তক্ষুণি তার যেন কেমন বিস্ময় বোধ হয়।

নীতা তো কখনো ইতিপূর্বে অমন করে শয্যা ছেড়ে ওঠেনি।

তারপর চুড়ির রিনঝিম ও শাড়ির মৃদু খসখস শব্দ অন্ধকারে তাকে যেন আরো সচেতন করে তোলে মুহূর্তে।

আর সেই প্রথম মনের মধ্যে কোথায় যেন একটা বিস্ময় জাগে। বেড সুইচটা টিপে আলোটা জ্বালায়।

তাকায় অনুসন্ধানী দৃষ্টিতে। আর তখুনি যেন একটা ধাক্কা খায়।

শাড়ি পরে তো নীতা কখনও শয্যায় শোয় না—চিরকাল তার নাইটি পরে রাত্রে শয়ন করা অভ্যাস শয্যায়।

ধ্বক করে উঠেছিল বুকের মধ্যে সমরেশের।

তাই সঙ্গে সঙ্গে উঠে গিয়ে ঘরের বড় আলোটার সুইচটাও টিপে জ্বালিয়ে দিয়েছিল।

রীতা!

নীতা নয়—রীতা—

রীতা তখন ওর মুখের দিকে তাকিয়ে।

মুহূর্তে যেন ঘৃণায় বিরক্তিতে ও আক্রোশে সমরেশ একেবারে ফেটে পড়েছিল।

রাস্তায় বোধহয় একটা বড় রকমের গর্ত ছিল—গত রাত্রের বৃষ্টিতে গর্তের মধ্যে জল জমেছিল—গাড়িটা লাফিয়ে উঠে গর্তে পড়ে আর একরাশ কাদা জল ছিটকে যায়।

শহর ছাড়িয়ে কখন যেন চলে এসেছে সমরেশ।

কাঁচা-পাকা রাস্তা। ঝকঝকে রোদ উঠেছে। এ কোথায় এলো সমরেশ!

গাড়িটা থামালো সমরেশ।

সামনেই মাঠ—তার ওদিকে রেলের লাইন—একটা ট্রেন যাচ্ছে।

॥ চার ॥

চলন্ত গাড়ির মধ্যে একটা সেকেন্ড ক্লাস কামরায় জানালার ধারে বসে ছিল রীতা।

পাশেই ছোট চামড়ার সুটকেশটা। তাড়াহুড়ো করে যা সামান্য জামা কাপড় পেরেছে সুটকেশটায় ভরে এবং আলমারির মধ্যে যে শ'চারেক টাকা ছিল তাই নিয়ে সুটকেশটা হাতে বের পড়েছেল রীতা।

রাত তখন প্রায় সোয়া একটা হবে।

বৃষ্টি থেমে গিয়েছে বটে তবে একেবারে থামেনি। আকাশ মেঘে মেঘে তখনো কালো হয়ে আছে ও বিদ্যুৎ চমকে চমকে চলেছে সোনালী আলোর চকিত ঝিলিক হেনে।

ঝিরঝির করে বৃষ্টি পড়ছে তখনো। আর সেই সঙ্গে জোলো হাওয়া।

রাস্তায় জল জমে গিয়েছে। ছপছপ করে এগিয়ে চলে রীতা।

একটিবারের জন্যও পশ্চাতে ফিরে তাকায় না রীতা। এতকালের পরিচিত বাড়িটার সমস্ত প্রয়োজনই যেন তার অকস্মাৎ ফুরিয়ে গিয়েছে।

কিন্তু কোথায় যাবে এখন রীতা?

এ শহরে আর নয়—দূরে—অনেক দূরে।

ছিঃ ছিঃ কি লজ্জা! সমরেশ—সমরেশ তাকে শেষ পর্যন্ত ঘৃণা করলো—নীচ ইতর বললো।

তাই—তাই হোক সমরেশ—

তুমি ঘৃণাই আমাকে করো। তোমার ঘৃণাই আমার বুক ভরে রইলো। সত্যিই আমি লজ্জাহীনা—সত্যিই আমি লোভী।

এ কলঙ্ক আমার—আমারই থাক।

এই কলঙ্কের বোঝা নিয়েই তোমার কাছ থেকে আমি সরে গেলাম।

কিন্তু কোথায়?

হঠাৎ—হঠাৎই বুঝি মনে পড়ে চৈতীর কথা।

চৈতী তার কলেজ জীবনের বান্ধবী।

গরীবের ঘরের মেয়ে—আগ্রায় একটা স্কুলে চাকরি নিয়ে গিয়েছে বি. এ. পাস করবার পর।

হ্যাঁ—আগ্রায় গেলে কেমন হয়!

তাই হোক—আগ্রায় গিয়ে আপাততঃ চৈতীর ওখানেই ওঠা যাক তারপর একটা কাজ খুঁজে নিলেই হবে।

ট্রাম রাস্তায় পড়ে, একটা খালি রিক্সা ঠং ঠং করে ঘন্টি বাজাতে বাজাতে চলেছিল—পেয়ে গেল রীতা।

অন্য সময় হলে রিক্সাতে অত রাত্রে একা একা চাপতে হয়তো ভয়ই

করতো কিন্তু আজ আর করে না।

এই রিক্সা—রিক্সা—

রিক্সাওয়ালাটা একজন সোয়ারীকে পেঁাছে দিয়ে ডেরায় ফিরছিল, নারীকণ্ঠের ডাকে ঘুরে দাঁড়ায়।

এই, ভাড়া যাবি ?

নেহি।

চল না বাবা আমাকে একটু পেঁাছে দে না—যা চাস দেবো।

রাস্তার ইলেকট্রিকের আলো রিক্সাওয়ালাটার সর্বাঙ্গে চোখে মুখে এসে পড়েছে। জলে ভিজে একেবারে সপসপে হয়ে গিয়েছে বেচারী।

রীতার দিকে তাকালো রিক্সাওয়ালাটা।

কিধার যায়গা ?

হাওড়া স্টেশন।

তিন রুপেয়া দেনে হোগা।

তাই দেবো চল।

রিক্সায় উঠে বসল রীতা। সব রাস্তাতেই জল—ঠং ঠং করে ঘণ্টি বাজাতে বাজাতে রিক্সাওয়ালা রিক্সা টেনে নিয়ে চলে।

মাথায় ঘোমটা টেনে দিয়েছিল রীতা।

অনেকটা পথ হাওড়া স্টেশন—তাছাড়া সব রাস্তাতেই জল—আস্তে আস্তে সন্তর্পণে রিক্সাওয়ালা রিক্সাটা টেনে নিয়ে চলে।

প্রায় ভোর চারটে নাগাদ রীতা স্টেশনে এসে পৌঁছায়।

তিন টাকা নয় একটা পাঁচ টাকার নোটই রিক্সাওয়ালাকে দেয় রীতা।

সেলাম মাঈজী।

রিক্সাওয়ালা সেলাম দিয়ে চলে যায়।

খুব সামান্যই লোক অত ভোরে স্টেশনে—খোঁজ নিয়ে রীতা জানতে পারে বেলা দশটায় একটা এক্সপ্রেস ট্রেন আছে।

সেকেণ্ড ক্লাসের একটা টিকিট কেটে লেডিজ ওয়েটিং রুমে গিয়ে ঢোকে রীতা।

ট্রেনটা যতক্ষণ না ছাড়ে রীতা একগলা ঘোমটা টেনে এক ধারে বসে থাকে।

ট্রেনটা ছাড়বার পর যেন স্বস্তির নিঃশ্বাস নেয়।

পরের দিন দ্বিপ্রহরে ট্রেনটা আগ্রা ক্যাণ্টনমেণ্টে থামলে রীতা ট্রেন থেকে নেমে পড়ে।

আর ভয় নেই—অনেক দূরে পালিয়ে এসেছে সে।

এখানে আর চট করে কেউ তার সন্ধান পাবে না। এবারে সে নিশ্চিন্ত।

একটা টাঙ্গা ভাড়া করে ছিপিটোলার ঠিকানাটা বলে দেয় টাঙ্গাওয়ালাকে রীতা।

সেদিনটা ছিল রবিবার। স্কুল বন্ধ।

স্কুল কমপাউণ্ডের মধ্যেই শিক্ষয়িত্রীদের কোয়ার্টার্স।

গেটের সামনে টাঙ্গা থেকে নেমে ভাড়া মিটিয়ে দিল রীতা। দারোয়ান

এগিয়ে আসে, কিসকো মাঙ্গতে মাঈজী ?

চৈতী দিদিমণি হ্যায় ?

হাঁ—কোয়ার্টার্সমেই তো হ্যায়—যাইয়ে ভিতর যাইয়ে—স্কুলকা পিছে দিদিমণি লোককো কোয়ার্টার্স হ্যায়। তিন নাম্বার কোয়ার্টার্স।

সুটকেশটা হাতে এগিয়ে যায় রীতা।

মনের মধ্যে একটা প্রচণ্ড বিক্ষোভ তার উপরে প্রায় দু'দিনের ট্রেনের ধকল—মুখটা শুকিয়ে গিয়েছে—মাথার চুল রুক্ষ।

অত্যন্ত ক্লান্ত ও বিষণ্ণ লাগছিল যেন রীতাকে।

তিন নম্বর কোযার্টার্সের সামনে এসে রীতা ভাবে, চৈতী ?

সঙ্গে সঙ্গে সাড়া আসে মেয়েলী গলায ভিতর থেকে—কে ?

রীতা এগুতে যাচ্ছিলো কিন্তু তার আগেই চৈতী বের হয়ে আসে এবং সামনে ঐ বেশে ঐ ক্লান্ত চেহারাব বীতাকে সুটকেশ হাতে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে প্রথমটা বুঝি চিনতেই পারে না।

চেনা চেনা অথচ মনে পড়ে না।

কে ?

আমি—চিনতে পারছিস না—আমি রীতা।

রীতা—তাই বল—আরে কি আশ্চর্য ! আয় আয় ভিতরে আয়।

ছোট্ট ছিমছাম কোয়ার্টার্স—মাত্র দুখানা ছোট আকারের ঘব। পাশাপাশি।

বোস বোস—what a surprise—সত্যি উঃ আমি যেন ভাবতেই পারছি না রে—

তারপর একসময় প্রথম দর্শনের উচ্ছ্বাস ও আবেগটা হ্রস্ব হয়ে এলে বোধহয় ভাল করে রীতার চেহারার দিকে নজর পড়ে তার।

বলে, তা হ্যাঁবে—হঠাৎ এখানে তুই ?

কেন—আসতে নেই !

না তা কেন !

চৈতী জানতো সে যখন বি. এ. পাস করবার পর চাকরি নিয়ে আসে রীতাদের পূর্বের অবস্থা অনেক উন্নত হয়েছে।

সমরেশের—ওর ভগ্নীপতির প্রচেষ্টায় ব্যবসাটা সত্যি রীতিমত লাভবান হয়ে উঠেছে তখন। তাই বোধকরি রীতাকে ঐ বেশে অমন ভাবে মাত্র একটা সুটকেশ হাতে অপ্রত্যাশিত ভাবে আগ্রায় তার কোয়ার্টার্সে উপস্থিত হতে দেখে একটু বিস্ময়ই বোধ করে।

বেড়াতে নাকি ?

মনে কর তাই !

তোর দিদি জামাইবাবুর সংবাদ কি ?

ভাল। তারপর বলে, এসেছি যখন সব খবরই শুনবি—এখন এক কাপ চা খাওয়া না ভাই।

সত্যি—ছিঃ ছিঃ ভারি অন্যায় হয়ে গিয়েছে—তুই হাত মুখ ধুয়ে নে—

আমি চা করে আনছি।

চৈতী বের হয়ে যায় ঘর থেকে।

কটা দিন যেন একটা অবিচ্ছিন্ন একটানা আনন্দের মধ্যে দিয়েই কেটে যায় দুই বান্ধবীর।

কিন্তু রীতার মনে এতটুকু স্বস্তি ছিল না।

যাহোক একটা কাজ তাকে খুঁজে বের করতেই হবে।

জীবনটা তো কাটাতে হবে। এবং সেই কথাটাই একদিন শুয়ে পাশাপাশি রাত্রে রীতা তার বান্ধবীকে বলে।

চৈতী।

কি রে?

তোর তোদের স্কুলের সেক্রেটারি মিঃ চৌধুরীর সঙ্গে আলাপ আছে—তোদের স্কুলে আমার একটা চাকরি হয় না?

চৈতী হেসে ওঠে।

হেসে উঠলি যে?

তা হাসব না তো কি—তোর আবার দুঃখটা কি যে চাকরি করবি?

দুঃখের জন্যই বুঝি সবাই চাকরি করে?

তা নয়তো কি। বড়লোকের মেয়ে—টাকার অভাব নেই—রূপেরও অবধি নেই—আমি তো ভেবেছিলাম ইতিমধ্যে একটা বিয়েথা করে দিব্যি সংসার গুছিয়ে বসেছিস।

তাই বুঝি?

নয়তো কি। সত্যি বল তো এখনো বিয়ে হলো না কেন? দিদি আর তোর জামাইবাবু বুঝি একেবারে নিশ্চেষ্ট। কিন্তু তুই তো বরাবর বলতিস তোর জামাইবাবুর মত মানুষ হয় না।

সত্যিই হয় না। কিন্তু বিয়েটা চাইলেই হয় নাকি!

অন্যের কথা জানি না কিন্তু তোর তো হওয়া উচিত ছিল—কিন্তু ব্যাপারটা কি খোলসা করে বল তো!

কি খোলসা করে বলবো?

রাগারাগি করে বাড়ি ছেড়ে চলে এসেছিস নাকি?

না।

তবে?

বাড়ি ছেড়ে চলে এসেছি ঠিকই তবে রাগারাগি করে নয়।

বলিস কি—সত্যি?

সত্যি।

রাগারাগি না হলেও একটা হেতু নিশ্চয়ই আছে।

আছে হয়তো।

কি?

আজ নয়—একদিন বলবো। যা বললাম—একটা চাকরির যোগাড় করে

দিতে পারিস কি না তাই বল ?

তোকে নিয়ে গিয়ে মিঃ চৌধুরীর সঙ্গে দেখা করলে হয়তো একটা চাকরি এই স্কুলেই হয়ে যেতে পারে কারণ অ্যাসিস্ট্যাণ্ট হেডমিস্ট্রেসের পোস্টটা তো খালিই আছে আমাদের স্কুলে—কিন্তু—

কি ?

লোকটা কিন্তু তেমন সুবিধের নয় ভাই।

কেমন যেন একটু কিন্তু কিন্তু করে বলে চৈতী।

তা নাইবা হলো তাতে আমার কি ?

মৃদু হেসে বলে রীতা।

না রে—লোকটার স্ত্রীলোক সম্পর্কে একটা দুর্নাম আছে।

তাই বুঝি ?

হ্যাঁ।

তা হোক—চল কালই একবার তার সঙ্গে দেখা করবো।

কথাটা শুনে ভয় করছে না তোর ?

আদৌ না।

সত্যি বলছিস।

হ্যাঁ—তাছাড়া চাকরি করতে গেলে অত ভয় থাকলে কি চলে ?

বেশ। তবে আর কি।

চৈতীর কথা মিথ্যা হলো না।

মিঃ চৌধুরীর সঙ্গে দেখা করতেই এককথায় চাকরি হয়ে গেল রীতার।

কিন্তু রীতা দেখলো চৈতী মিথ্যা বলেনি। মিঃ চৌধুরী, প্রায়ই কারণে অকারণে রীতাকে তার গৃহে ডেকে পাঠাতে লাগলো।

লোকটার বয়স বেশী নয়—চল্লিশের মধ্যে। ধনী বাপের একমাত্র ছেলে এবং তারই বাপের চেষ্টায় স্কুলটা তৈরী হয়েছিল।

নানা ধরনের ব্যবসা আছে লোকটার আগ্রা শহরে।

বিবাহিত, চারিটি সন্তানের বাপ কিন্তু ঐ এক রোগ।

রীতা বুঝতে পারে এখানে বেশী দিন সে টিকতে পারবে না—চৌধুরীর তার প্রতি অতিরিক্ত মনোযোগ তাকে হয়তো এখানে টিকতে দেবে না।

রীতা তাই তলে তলে বিজ্ঞাপন দেখে দেখে চাকরির দরখাস্ত পাঠায়।

দেখতে দেখতে দুটো মাস কেটে গেল। কিন্তু ইতিমধ্যে আর একটা ব্যাপার রীতাকে যেন রীতিমত চিন্তিত করে তোলে।

আজকাল শরীরটা যেন ভাল যাচ্ছে না। ভিতরে ভিতরে কেমন যেন একটা দুর্বলতা—বমি বমি ভাব। মাথা ঘোরান—

ব্যাপারটা যে চৈতীরও নজরে পড়েনি তা নয়। কিন্তু মুখ ফুটে সে রীতাকে কোন প্রশ্ন হঠাৎ করতে পারে না।

রীতাও ভিতরে ভিতরে ছটফট করতে থাকে। নারী হয়ে রীতার ঐ ব্যাপারগুলো তার দেহের সে যে বুঝতে পারেনি তা নয়—বুঝতে পেরেছিল

এবং সঙ্গে সঙ্গেই সে আতংকিত হয়ে উঠেছিল। সত্যিই যদি তাই হয়—তার গর্ভে সন্তান সত্যি সত্যিই যদি এসে থাকে ত কেমন করে সে সেটা চাপা দিয়ে রাখবে। অন্যের দৃষ্টি থেকে সে নিজেকে কেমন করে রক্ষা করবে। কি করবে সত্যি রীতা ভেবে পায় না।

ঐ সময় ঠিক হঠাৎ যেন দুর্ঘটনাটা ঘটে গেল।

ক্লাস থেকে বেরুতে গিয়ে হঠাৎ দরজার চৌকাঠে পা স্লিপ করে মাথাটা হঠাৎ ঘুরে উঠলো—সামলাতে পারল না নিজেকে রীতা হঠাৎ সবকিছু অন্ধকার হয়ে গেল—সে পড়ে গেল।

পাশেই একজন টিচার ছিল সে রীতাকে পড়তে দেখে চেঁচিয়ে ওঠে এবং তার চীৎকারে আরো কয়েকজন টিচার ছুটে আসে। সকলে মিলে ধরাধরি করে রীতাকে টিচার্স রুমে নিয়ে যায় এবং ডাক্তারকে সঙ্গে সঙ্গে সংবাদ দেয়।

ডাক্তাব একজন অভিজ্ঞ লেডি ডাক্তার—মিস্ চামেরিয়া।

তিনি রীতাকে পরীক্ষা করে আপাততঃ একটা ইন্জেকশন দিয়ে কোয়ার্টার্সে পাঠাবার ব্যবস্থা করলেন। সঙ্গে সঙ্গে নিজেও চললেন।

কোষার্টার্সে এসে মিস্ চামেরিযা রীতাকে তার যে সন্দেহ হয়েছিল সে সম্পর্কে প্রশ্ন করতে লাগলেন। এবং বুঝলেন তার সন্দেহ মিথ্যা নয়।

রীতা তিন মাস অন্তঃসত্ত্বা। রীতাও কোন কথা অস্বীকার করে না।

মিস্ চামেরিয়া রীতার সিঁথিতে সিঁদুর না দেখতে পেয়েই প্রশ্নগুলো করেছিলেন।

কিন্তু রীতা যখন অকপটে সব কথা স্বীকার করে গেল তখন আবার প্রশ্ন করেন, আপনি কি ক্রিশ্চান ?

না। হিন্দু।

হিন্দু মেয়েরা ত বিয়ের পর মাথায় সিন্দুর পরে আপনার দেখছি না ত।

না। আমি সিন্দুর পরি না—তবে আমার বিয়ে হয়েছে।

ওঃ তা—আপনার স্বামী সংবাদটা জানেন নিশ্চয় ?

জানে।

তবে ত কোন কথাই নেই, স্কুলে দরখাস্ত করলে মেটারনিটি লিভও পেয়ে যাবেন।

রীতা কোন জবাব দেয় না।

মিস্ চামেরিয়া অতঃপর ঔষধপত্রের ব্যবস্থা ও বিশ্রামের নির্দেশ দিয়ে চলে গেলেন।

চৈতী আড়াল থেকে সবই শুনেছিল।

তাবও বিস্ময়ের যেন অবধি ছিল না। মিস্ চামেরিয়া চলে যাবার পর ধীরে ধীরে চৈতী ঘরে এসে ঢুকল। রীতা শয্যাব উপর আধা শোয়া আধা বসা অবস্থায ছিল। চৈতীকে ঘরে ঢুকতে দেখে ওর মুখের দিকে তাকাল। রীতা বুঝতে পেরেছিল আর কিছুই গোপন থাকবে না। সবাই এবারে জানবে, সেও আর গোপন করবে না মনে মনে স্থির করে রীতা।

রীতা—

আয় চৈতী—বোস।

এ কথা তুই আমাকে আগে জানাসনি কেন ?

নিজেও ঠিক বুঝিনি।

বোকা মেয়ে। চৈতী হাসে—তারপর শুধায়, তা সব থেকেও এ যোগিনী বেশ কেন রে। রাগারাগির পর্ব চলেছে বুঝি ?

রীতা নিঃশব্দে হাসে।

তা মহাশয় ব্যক্তিটি কে ? কোথায় নিবাস ?

বলতে পারবো না।

মানে ?

মানে স্বামীর নাম বা পরিচয় আমার পক্ষে দেওয়া সম্ভবপর নয় ভাই।

সে আবার কি !

বললাম তো—ওর বেশী কিছু জিজ্ঞাসা করিস না—করলেও বলতে পারবো না ভাই।

তাহলে—

কি তাহলে ?

সবাই জানে তুই কুমারী, তোর বিয়ে হয়নি—অথচ—একটু থেমে তারপর বলে, কথাটা জানাজানি হয়ে গেল বিশেষ করে ঐ চৌধুরী—

চৌধুরী জানবে কি করে ?

কি বলিস তুই রীতা ! একথা বেশী দিন কখনও চাপা থাকে ! হয়তো ডাঃ মিস্ চামেরিয়াই—কিন্তু আমি বুঝতে পারছি না রীতা স্বামী নাম বা পরিচয়টা জানাতে তোর আপত্তিই বা কেন ?

বললাম তো—আপত্তি আছে বলেই গোপন করেছি—নচেৎ ইচ্ছা করে কেউ স্বামীর নাম গোপন করে—কোন মেয়েমানুষ—

চৈতী আর কোন কথা বলে না বটে তবে নানা সন্দেহে তার মনটা পীড়িত হতে থাকে।

মনে হয় তার ঐ কারণেই হয়তো রীতা বাড়ি ছেড়ে চলে এসেছে, এখানে এসে চাকরি নিয়েছে।

ওর বোন বা ভগ্নিপতিও হয়তো ঐ কারণেই তিন মাস হলো ও এখানে এসেছে অথচ ওর কোন খোঁজখবর করলো না আজ পর্যন্ত।

চৈতীর মুখটা ভার হয়ে ওঠে।

অতঃপর চৈতী মুখে কিছু আর রীতাকে বলে না বটে তবে রীতাকে যেন এড়িয়ে এড়িয়ে চলতে শুরু করে।

রীতাও যে ব্যাপারটা বুঝতে পারে না তা নয় কিন্তু বুঝতে পেরেও সে চুপ করে থাকে।

এবং চৈতী যা ভেবেছিল শেষ পর্যন্ত তাই হলো।

রীতার ব্যাপারটা চাপা রইলো না।

স্কুলের টিচারদের মধ্যে কানাকানি ফিসফিস আলোচনা শুরু হয়ে গেল।

সবাই আড়ে আড়ে রীতার দিকে তাকায়। মুখ টিপে টিপে হাসে।

তাকে সবাই এড়িয়ে এড়িয়ে চলে।

শেষ পর্যন্ত সেক্রেটারি চৌধুরীর কানেও কথাটা উঠলো।

চৌধুরী রীতাকে ডেকে পাঠালো একদিন সন্ধ্যায়।

রীতা বুঝতে পারে আজ তাকে একটা শেষ মীমাংসার জন্য মুখোমুখি দাঁড়াতে হবে ঐ চৌধুরীর সঙ্গে।

ব্যাপারটা হয়তো রীতিমত কুৎসিতই হয়ে দাঁড়াবে।

রীতা স্থির করে চৌধুরীর সঙ্গে সে দেখা করবে না—স্কুলের চাকরিতে ইস্তফা দিয়ে সে চলে যাবে।

গভীর রাত্রে সবাই যখন ঘুমিয়ে পড়েছে রীতা যেমন একদিন মাস চারেক আগে যে সুটকেশটা হাতে ঐ স্কুলে এসে ঢুকেছিল তেমনি আজও সেই সুটকেশটা হাতেই সে চুপিচুপি কোয়ার্টার্স থেকে বের হয়ে রাস্তায় এসে দাঁড়ালো।

॥ পাঁচ ॥

আবার পথ।

সে রাত্রেও এমনি করেই তার চিরদিনের গৃহকোণ ছেড়ে উদ্দেশ্যহীন গন্তব্যহীন পথের উপর এসে দাঁড়িয়েছিল।

কিন্তু আজকের এই সংশয়ের বোঝাটা তার কাঁধের পরে সেদিন ছিল না।

সেদিন সে ছিল একা। কিন্তু আজ? আজ আর সে একা নয়।

তার দেহের কোটরে রয়েছে তারই সন্তান। যে সন্তান একান্ত তারই—যে সন্তানের কোন পিতৃপরিচয়ের দাবি নেই।

পিতৃপরিচয়, পৃথিবীতে ভূমিষ্ঠ হবার সঙ্গে সঙ্গে যে পরিচয়টুকুর প্রয়োজন, সে পিতৃপরিচয়ই নেই তার সন্তানের তবে কি—তবে কি তার গর্ভের সন্তানের পৃথিবীতে আসার কোন অধিকার নেই। কেন নেই! নিশ্চয়ই আছে। সে তার সন্তান—যে আসছে সে তার মায়ের সন্তান।

নাইবা থাকলো কোন পিতৃপরিচয়—তার কোন প্রয়োজন নেই। তার সন্তানের পিতৃপরিচয়ের কোন প্রয়োজন নেই।

সে মা—তার সন্তান। সেই পরিচয়ই থাকুক তার সন্তানের—তার সন্তান মায়ের সন্তান বলেই পরিচিত হবে।

পশ্চিমের শীতের রাত। প্রচণ্ড শীত পড়েছে—একটা র‍্যাপার গায়ে সুটকেশটা হাতে মধ্যরাত্রির নির্জন পথ ধরে হেঁটে চলে রীতা।

কোন দিকে চলেছে—কোথায় চলেছে কিছুই জানে না সে।

আগ্রা শহরে আসা অবধি এক দিনের জন্যও গত চার মাসে সে বোর্ডিং কোয়ার্টার্স থেকে বাইরে বের হয়নি। বাইরে পা দেয়নি।

আগ্রা শহরের কিছুই তার জানা নেই। রাস্তাঘাট কিছুই সে চেনে না

জানে না। কোথায় যে কোন রাস্তা গিয়েছে তাও সে জানে না।

গত এক মাস ধরে মনের উপর দিয়ে যে ঝড় বহে গিয়েছে তাতে সত্যিই ক্লান্ত ও দুর্বল হয়ে পড়েছিল রীতা—তার উপরে আগ্রার প্রচন্ড শীত, কোন মতে ধীরে ধীরে সুটকেশটা হাতে এগুচ্ছিল রীতা।

একটা টাঙ্গা পর্যন্ত চোখে পড়ে না।

একটা টাঙ্গা পেলে অন্ততঃ স্টেশন পর্যন্ত যাওয়া যেত।

হঠাৎ একটা মোটরের জোরালো হেডলাইটের আলো ওর সর্বাঙ্গে এসে পড়লো। বিপরীত দিক থেকে একটা গাড়ি আসছে।

চোখ ধাঁধিয়ে গিয়েছিল মুহূর্তের জন্য বুঝি রীতার।

তাড়াতাড়ি সরে দাঁড়াতে গিয়ে হঠাৎ অসতর্কভাবে হোঁচট খায়—মাথাটা ঘুরে ওঠে—মুহূর্তের জন্য চোখের সামনে সব কেমন ঝাপসা হয়ে যায়।

তারপর ওর আর মনে নেই।

জ্ঞান যখন হলো দেখে একটি আতপ্ত উষ্ণ কক্ষের মধ্যে উষ্ণ নরম শয্যায় আগাগোড়া দামী কম্বলে ঢাকা রীতা শুয়ে আছে।

চোখ মেলে তাকাতেই একটি পুরুষের দরদভরা কণ্ঠস্বর ওর কানে এলো, এখন কেমন বোধ করছেন রীতা দেবী?

নিজের নামটা শুনে যেন নিজেব অজ্ঞাতেই চমকে ওঠে রীতা। সঙ্গে সঙ্গে উঠে বসে।

কে?

এদিক ওদিক তাকায়—এবং তাকাতেই বাঁদিকে শয্যাপার্শ্বে দণ্ডায়মান যুবকটির প্রতি তার নজর পড়ে।

দীর্ঘদেহী এক যুবক—গায়ে গরম ড্রেসিং গাউন—ওরই দিকে জিজ্ঞাসু-দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে তখনো।

পাশেই একটা টেবিলের 'পরে কাপে গরম কফি ছিল—কফির কাপটা হাতে তুলে যুবক বলে, এই গরম কফিটা খেয়ে নিলে you would feel much better.

আপনি?

রীতার যেন মনে হয় ঐ যুবককে কবে কোথায় সে দেখেছে।

মুখটা যেন চেনা চেনা।

যুবক দাঁড়িয়ে কফির কাপটা হাতে ওর দিকে চেয়ে মৃদু মৃদু হাসতে হাসতে বলে, মনে হচ্ছে চেনা চেনা, তাই না?

হ্যাঁ, কিন্তু—

মনে করতে পারছেন না তো—ঠিক আছে মনে পড়বেখন। আগে এই কফিটা খেয়ে নিন তো—you require some stimulant.

কি জানি কেন রীতা আর আপত্তি করে না। মানুষটার গলার স্বরে কোথায় যেন একটা আশ্বাস, সান্ত্বনা ও নির্ভর আছে।

কফির কাপটা হাতে নিয়ে রীতা ধীরে ধীরে চুমুক দিতে থাকে। এক

সময় কাপটা নিঃশেষিত হলে যুবক হাত বাড়িয়ে কাপটা নিয়ে বলে, এবার শুয়ে পড়ুন—রাত অনেক—প্রায় শেষ হতে চলেছে—একটু ঘুমিয়ে নিন—কাল সকালে সব কথাবার্তা হবে—আলোটা নিভিয়ে দিই, কেমন ?

মাথার কাছেই বেড ল্যাম্পটা জ্বলছিল, যুবক সেটা সুইচ টিপে নিভিয়ে দিল, সাড়া পাওয়া গেল চটিজুতোর।

রীতা বুঝতে পারলো যুবক ঘর থেকে বের হয়ে গেল।

রীতা আবার শয্যায় গা ঢেলে দেয়।

গায়ের কম্বলটা টেনে নেয়। এবং একটু পরেই ঘুমিয়ে পড়ে।

পরের দিন একটু বেলা করেই ঘুম ভাঙে।

ঘরের কাচের সার্সির ভিতর দিয়ে বোদ এসে ঘরে প্রবেশ করেছে। প্রথমটায় কিছুই মনে পড়ে না তারপর একটু একটু করে গত রাত্রের সব কথা মনে পড়ে। মাঝরাত্রে স্কুলের কোয়ার্টার্স থেকে বের হয়ে এসেছে—রাস্তায় মাথা ঘুরে পড়ে গিয়েছিল।

এই যে ঘুম ভেঙেছে দেখছি।

রীতা চেয়ে দেখে কালকের সেই যুবক ঘরে এসে ঢুকেছে।

এখন বেশ সুস্থ বোধ করছেন তো ?

হ্যাঁ।

আপনি বোধহয় এখনো আমাকে চিনতে পারেননি কিন্তু কাল রাত্রে আপনাকে রাস্তায় জ্ঞান হারিয়ে পড়ে থাকতে দেখেই আমি কিন্তু ঠিক চিনতে পেরেছিলাম আপনাকে রীতা দেবী। কিন্তু কি ব্যাপার বলুন তো, ঐ ঠাণ্ডায় অত রাত্রে সামান্য একটা র‍্যাপার মাত্র গায়ে, হেঁটে হেঁটে কোথায় চলেছিলেন একটা সুটকেশ হাতে ঝুলিয়ে ?

রীতা চুপ করে থাকে, কোন জবাব দেয় না।

আগ্রা শহরে কত দিন এসেছেন ? আবার প্রশ্ন করে যুবক।

আপনি !

আমার পরিচয়টা জানতে চাইছেন, তাই না ? অবিশ্যি বছর দেড়েক আগেকার কথা হবে, সামান্য সময়ের জন্যই আমাদের দেখা হয়েছিল আপনাদের কলকাতার বাড়িতেই।

রীতা তবুও মনে করতে পারে না। সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে যুবকের মুখের দিকে।

যুবকটি মিটিমিটি হাসছে।

আপনার জামাইবাবু সমরেশ আমার অনেকদিনের বন্ধু—তারই আমন্ত্রণে আপনার পাণিপ্রার্থী হয়ে একদা আপনার গৃহে গিয়েছিলাম—আর আপনি সোজা আমার মুখের 'পরেই না করে দিয়ে ঘর থেকে বের হয়ে গিয়েছিলেন।

মনে পড়েছে—হ্যাঁ এতক্ষণে মনে পড়েছে রীতার মানুষটাকে।

আমার নাম সুনীল চৌধুরী।

ডক্টর সুনীল চৌধুরী। মনে পড়েছে ?

হ্যাঁ—মৃদু কণ্ঠে জবাব দেয় রীতা।

চোখটা নামায়।

দেখুন মিস্ ব্যানার্জী, আমার বাড়িতে কিন্তু কোন স্ত্রীলোক নেই। আমি আর আমার গোটা দুই চাকর ও একটা ড্রাইভার—যোগ্য আতিথ্য হয়তো করতে পারবো না। আপনাকেই একটু কষ্ট করে উঠে দেখে শুনে হাত মুখ ধুয়ে নিতে হবে। ঘরের সঙ্গে অ্যাটাচ্‌ড্ বাথরুম আছে। হাত মুখ ধুয়ে নিন, কিষেণকে বলি চা দিতে।

সুনীল ঘর থেকে বের হয়ে গেল।

ঘণ্টাখানের বাদে ব্রেকফাস্ট টেবিলে বসেই প্রাতরাশের পর দুজনার কথাবার্তা হচ্ছিলো।

সুনীল বলছিল, দেখুন মিস্ ব্যানার্জী—মিস্ ব্যানার্জী বলেই আপনাকে আমি সম্বোধন করছি কারণ এখনো যখন আপনার অন্য কোন পরিচয় থাকলেও আমার জানা নেই, জানতে পারিনি—মনে কিছু করবেন না—let us be frank with each other.

রীতা সুনীলের মুখের দিকে তাকালো।

কাল রাত্রে আপনাকে বাড়িতে আনবার পর অজ্ঞান অবস্থায় একজন ডাক্তার হিসাবেই আপনাকে আমার পরীক্ষা করতে হয়েছিল।

রীতা মাথাটা নীচু করে। একটা সন্দেহ মনের মধ্যে উঁকিঝুঁকি দিতে থাকে।

বলছিলাম আপনি আপনার বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে নিশ্চয়ই অজ্ঞাত নন?

মৃদু কণ্ঠে রীতা জবাব দেয়, জানি।

জানেন তো নিশ্চয়ই। কিন্তু—

আমাকে অনুগ্রহ করে আর কিছু জিজ্ঞাসা করবেন না ডক্টর চৌধুরী।

সুনীল মুহূর্তকাল চুপ করে থাকে তারপর মৃদু হেসে বলে, ঠিক আছে—let us drop the topics—কিন্তু নিজের শরীরের অবস্থাটা জেনে শুনেও অমন করে অত রাত্রে ঠাণ্ডায় হাঁটতে হাঁটতে কোথায় চলেছিলেন জয়পুর রোড ধরে—সেটাও কি বলতে আপত্তি আছে?

জয়পুর!

হ্যাঁ—ঐ রাস্তা ধরেই বরাবর হাঁটতে হাঁটতে জয়পুর পৌঁছানো যায়।

আমি ভেবেছিলাম স্টেশন—

ওটা তো স্টেশনের রাস্তা নয়। ভুল পথে হাঁটছিলেন। সে যাক ভাগ্যে ঐ সময় আমি গাড়িতে কল্ সেরে ফিরছিলাম নচেৎ কি হতো! No—you shouldn't have taken that risk—no, no—আপনার দেহের এই বর্তমান অবস্থায় সারাটা রাত যদি ঐ প্রচণ্ড ঠাণ্ডায় পড়ে থাকতেন তো—

মৃদু হেসে রীতা বলে, কি আর হতো মরে যেতাম হয়তো।

হ্যাঁ, কিন্তু মরতে কি আপনি সত্যিই চান?

রীতা চুপ করে থাকে এবারে।

সুনীল বলতে থাকে, আমার তো মনে হয় মরতে আপনার আপাতত এতটুকু ইচ্ছাও নেই—কিন্তু যাক সে কথা, এখানে আগ্রায় কবে থেকে কতদিন আছেন ?

তা চার মাস হবে।

ও, কিন্তু সমরেশ—

সমরেশ।

না, তাদের ওখান থেকে আমি চলে এসেছি।

চলে এসেছেন! কেন ?

ঐ যতটুকু বললাম তার বেশী আর বলবো না।

বলবেন না ? সুনীল আবার মৃদু হেসে বলে, বেশ—বলবেন না—কিন্তু এখানে চার মাস কোথায় ছিলেন ?

একটা স্কুলে চাকরি করছিলাম এই আগ্রা শহরেই।

চাকরি !

হ্যাঁ।

চাকরিটা এখনো আছে ?

না—ছেড়ে দিয়ে এসেছি।

বুঝলাম। তাহলে চাকরি ছেড়েই পথে নেমেছিলেন ?

রীতা চুপ করে থাকে।

তা বেশ করেছেন। গৃহও ছেড়েছেন চাকরিও ছেড়ে এলেন—একটা কথা বলি যদি কিছু মনে না করেন।

রীতা তাকালো সুনীলের মুখের দিকে।

বলছিলাম কি গৃহত্যাগের কারণটা আপনার আমি জানি না আর জানাতেও চাই না কিন্তু সমরেশের সঙ্গে কি—মানে জানেন তো সে আমার বন্ধু—টেলিফোনে একটু কথাবার্তা বলতে পারি ?

না।

এটাই কি আপনার শেষ কথা ?

হ্যাঁ।

সুনীল অতঃপর কিছুক্ষণ চুপ করে থাকে। একটা সিগ্রেট ধরায়—ঘরের মধ্যে পায়চারি করে। তারপর বলে, কিন্তু আপনাকে তো আমি একজন ডাক্তার হিসাবে এই অবস্থায় ছেড়েও দিতে পারি না মিস্ ব্যানার্জী।

না, না—আজই আমি চলে যেতে চাই, তাড়াতাড়ি রীতা বলে ওঠে।

চলে যেতে চান তো বুঝলাম কিন্তু কোথায় ?

কেন, যাবার আমার জায়গা নেই নাকি ?

থাকবে না কেন।

তবে ?

কিন্তু যাওয়ার জায়গা থাকলেও তো আপনি সর্বত্র যাবেন না।

রীতা চুপ করে থাকে।

তাছাড়া এখন আপনার বিশ্রাম, পুষ্টিকর খাদ্য ও নিয়মিত প্রিনেটাল মেডিক্যাল একজামিনেশন একান্ত প্রয়োজন। স্ত্রীলোকের এ সময়টা একটা বিশেষ সময়—আপনি কোন আত্মীয়স্বজনের কাছে না যেতে চান না গেলেন, যদি আপত্তি না থাকে তো এখানেই থাকুন না।

এখানে!

হ্যাঁ—আমার এখানে। ভয় নেই—বিশ্বাস আমাকে করতে পারেন যদিও আমি একা এবং একজন ব্যাচিলার পুরুষ।

রীতা লজ্জায় মাথা নীচু করে কোন জবাব দেয় না।

কি থাকবেন? তাহলে কিন্তু আপাতত আপনার বর্তমান সমস্যাটা মিটে যায়।

কিন্তু—

কি? বলুন—থামলেন কেন?

রীতা কোন জবাব দেয় না, চুপ করে থাকে।

সুনীল বলে, কি ভাবছেন?

কিন্তু আপনিই বা পরস্বপর একটি মেয়ের জন্য এতবড় বোঝা ঘাড়ে নিতে যাবেন কেন?

বোঝা!

নয়তো কি? এক অপরিচিতা কুমারী মেয়ে মা হতে চলেছে।

ওঃ এই কথা। কিন্তু বোঝার কথা যদি বলেন তো বলবো আমার কাছে আপনি কোনদিন কোন বোঝা হতেই পারেন না—আর সামাজিক সমস্যা বা কলঙ্কের সম্পর্কে কোনদিন কোন মাথাব্যথাই আমার নেই।

কেন, থাকাটাই তো স্বাভাবিক, সমাজে বাস করতে গেলে দশজনকে নিয়ে—

আর দশজনকে স্বাভাবিকটা হয়তো আমার পক্ষে স্বাভাবিক নয়।

কিন্তু আমি একজন অজানা নিঃসম্পর্কীয়া মেয়ে আপনার এখানে থাকবো—লোকেরা হয়তো—

নানা কথা বলবে—তা বলুন—ওটা তো লোকের স্বভাব—আপনার যদি কোন দ্বিধা না থাকে তো জানবেন আমার কোন দ্বিধাই নেই।

কিন্তু আপনার আত্মীয়রা?

আত্মীয় বলতে দুনিয়ায় আমার একজনই আছে—আমার মা। মা তার ছেলেকে ভালভাবেই চেনে—এবং জানে তার ছেলে এমন কোন অন্যায়ই করতে পারে না যাতে করে তার মাথা হেঁট হতে পারে। কিন্তু তাহলেও হয়তো আপনার মনে হতে পারে আমার নিজের দিকটা—সে সম্পর্কে আপনাকে এইটুকুই বলতে পারি আপনার কাছে যে প্রস্তাব আমি করেছি সেটার মধ্যে একজনের প্রতি আর একজনের সহানুভূতি ছাড়া আর কিছুই নেই। বিশ্বাস করতে পারেন।

রীতা তথাপি চুপ করে থাকে।

কি যেন ভাবছে মনে হয় রীতা—অন্যমনস্ক।

সুনীল বলে, বুঝতে পারছি আপনার সংশয়টুকু কিছুতেই আপনি কাটিয়ে উঠতে পারছেন না—সত্যিই ত সমরেশের বন্ধু হতে পারি আমি কিন্তু আমার সঙ্গে আপনার ত কোনই পরিচয় নেই—সেদিক দিয়ে আপনার মনে দ্বিধা হওয়া খুবই স্বাভাবিক—কিন্তু আপনি বিশ্বাস করুন যা বললাম তা এতটুকু বাড়িয়ে বলিনি বা অত্যুক্তি নয়—তাছাড়া আজই এখান থেকে না চলে গিয়ে দুটো দিন থেকে দেখুনই না আমার এখানে—এ বাড়ি থেকে যাবার দরজাটা তো আমি বন্ধ করে রাখছি না, খোলা তো রইলোই—প্রয়োজন যদি হয়ই তো চলে যাবেন, কথা দিচ্ছি সেদিন বাধা দেবো না—পথ আটকেও দাঁড়াবো না।

আমি আদৌ সে কথা ভাবিনি ডাঃ চৌধুরী—আমি কেবল ভাবছি আমার জন্য কেন আপনি বিব্রত হবেন।

কিছু না—কিছু না।

এরপর আর রীতা সত্যিই কোন প্রতিবাদ জানাতে পারে না।

তাছাড়া বর্তমানে তার যা দেহের অবস্থা—এ অবস্থায় তেমন কোন একটি নির্ভরযোগ্য আশ্রয় না পেলে সেও তো স্বস্তি পাবে না। নিশ্চিন্ত হতে পারবে না। আর যাবে যে—যাবেই বা কোথায় সে ?

কোথায় তার আজ আর এমন আপনজন আছে যে আজকে তাকে এমন সহানুভূতির সঙ্গে বিচার করে আশ্রয় দেবে ?

রীতা থেকেই গেল।

সুনীল পরে বলেছিল, রীতা দেবী, আমার সংসারটা একান্তই পুরুষের সংসার। নারীর কল্যাণহস্তবর্জিত লক্ষ্মীছাড়ার সংসার। এখানে সব কিছু অগোছালো—সব বিশৃঙ্খল—আপনি নিজে সব বুঝে দেখে নেবেন। দয়াল আমার দীর্ঘদিনের লোক—ওকে আমি জ্ঞান হওয়া অবধি জানি—আমাকে ও কোলেপিঠে করে মানুষ করেছে, যখন যা প্রয়োজন ওকে বলবেন।

তা সত্ত্বেও একটা মাঝবয়সী দাই রেখে দিয়েছিল পরদিন থেকেই সুনীল রীতাকে সর্বদা দেখাশোনা করবার জন্য।

সুরতিয়া।

সুনীল আগ্রা শহরের একজন অতিব্যস্ত ডাক্তার।

বেশীর ভাগ সময়ই সে হয় হাসপাতাল না হয় রোগী নিয়ে থাকে।

এক বাড়িতে থাকলেও রীতা দেখলো সুনীলের সঙ্গে তার বড় একটা দেখাই হয় না।

এতকাল দয়ালই সব করতো সুনীলের এখন রীতা এবাড়িতে আসায় সংসারের একটু একটু করে অনেক কিছু নিজের হাতে তুলে নেয়।

দু'দিনের মধ্যেই সুনীলের অগোছালো লক্ষ্মীহীন সংসারে যেন একটা লক্ষ্মীর স্পর্শ লাগে। এবং দেখা গেল এতকাল যে গৃহের প্রতি সুনীলের কোন আকর্ষণ ছিল না একমাত্র সারাটা দিনের কর্মক্লান্তির পর কিছুক্ষণ বিশ্রাম নেওয়া ছাড়া আজ যেন রীতা এখানে আসবার পর থেকে ওসেই

গৃহই তাকে আকর্ষণ করে।

দয়ালের হাতের রান্না খেয়ে খেয়ে সুনীলের যে খাদ্যের প্রতিও একটা কেমন উদাস বৈরাগ্য এসে গিয়েছিল আজ রীতার নিত্য নতুন নতুন নানা ধরনের খাদ্যতালিকা মনে তার লোভের সঞ্চার করে।

নিয়মিত সময়ে গরম গরম রসনাপরিতৃপ্তিকর খাদ্য—পরিপাটি পরিচ্ছন্ন ঘর ও শয্যা—যখনকার যেটি প্রয়োজন হাতের কাছটিতে।

সুনীল একদিন হাসতে হাসতে বলে, এটা কিন্তু খুব অন্যায় হচ্ছে মিস্ ব্যানার্জী।

অন্যায়!

রীতা সুনীলের মুখের দিকে সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকায়।

অন্যায় নয়—এই যে বদ অভ্যাসগুলো করিয়ে দিচ্ছেন এর পর কি এ গৃহ ত্যাগ করা ছাড়া আর দ্বিতীয় কোন পথ থাকবে এই হতভাগ্যের?

কেন—গৃহত্যাগ করতে যাবেন কেন?

উপায় কি বলুন, চিরদিন কিন্তু আপনি এই অগোছালো মানুষটার ভার বহে বেড়াবেন না—আর আমিই বা সে কামনা করবো কোন্ দুঃসাহসে! একদিন চলে যাবেনই যখন।

সে কথা আজই ভাবতে বসবেন কেন?

মৃদু হেসে বলে রীতা।

দেখুন, আমি হচ্ছি অত্যন্ত practical লোক—যা ভাবতে হবেই যা ঘটবেই তাকে না ভেবে—তার অবশ্যম্ভাবী ঘটাটাকে যে থামিয়ে রাখা যায় না সেটাকে মেনে নেওয়ার মত দুঃসাহস বা সৎসাহস যাই বলুন আমার আছে।

একটা কথা বলবো?

হাজারবার সহস্রবার বলুন।

এ সমস্যার মীমাংসাটা তো আপনার হাতের মুঠোর মধ্যেই ছিল।

তা হয়তো ছিল—বিশেষ করে বাংলাদেশে আর যাই থাক বিয়ের পাত্রী খুঁজে পাওয়া যায় না এখনো সে রকম স্ত্রী-স্বাধীনতা বা স্বেচ্ছাচারিতা নিশ্চয় আসেনি।

তবে?

তবে কেন বিয়ে করিনি, তাই না?

হ্যাঁ।

বিশ্বাস করবেন।

কেন করবো না।

যদি বলি লজ্জায়।

লজ্জায়!

তাই—আপনিই বলুন না দেখতে আমি কি একটা হ্যাক্ কুচ্ছিত এবং একেবারেই অপদার্থ।

না না—কে বললে?

আর রোগ বালাইও শত্রুর মুখে ছাই দিয়ে শরীরে কোথায়ও আমার কিছু

নেই—তারপর এদেশ ওদেশ ঘুরে পড়াশুনা করে মোটামুটি শিক্ষালাভও করেছি—আর অর্থের কথা যদি বলেন, পৈতৃক সম্পত্তি নেই বটে তবে রোজগার খুব খারাপ করিনা হয়তো এদেশের একজন মধ্যবিত্ত শিক্ষিত সুস্থ যুবকের পক্ষে—তা সত্তেও যদি কোন পাত্রী মুখের উপরে স্পষ্ট করে বলে দেয়—

কি ?

বলে দেয় বিয়ে করবো না—তার পরও কোন্ লজ্জায় সে ঐ কথাটা আর মুখে আনবে বলতে পারেন।

প্রথমটায় রীতা বুঝতে পারেনি কিন্তু পরমুহূর্তেই কথার তাৎপর্যটা বুঝতে পারার সঙ্গে সঙ্গে চোখ মুখ তার রাঙা হয়ে ওঠে।

কি জবাব দেবে প্রথমটায় সত্যিই বুঝি বুঝতে পারে না—কিন্তু পরক্ষণেই জোর করে মনের সেই দ্বিধা ও সংকোচটা কাটিয়ে ওঠে। বলে, কোন মেয়ে যদি আপনাকে কিছু বলেই থাকে মিঃ চৌধুরী—তো সব মেয়েদের আপনার প্রতি সেটাই শেষ কথাটি নয় কারণ বাংলাদেশে একমাত্র সেই তো একটিমাত্র মেয়ে নয়।

বলেন কি তার পরও আবার নির্লজ্জতা প্রকাশ করবো!

হাসতে হাসতে বলে ওঠে সুনীল ওর মুখের দিকে চেয়ে।

বাঃ নির্লজ্জতার কি আছে এতে ?

কথাটা বলে রীতা সুনীলের মুখের দিকে তাকাল।

আছে বৈকি—ওটা যে একজন পুরুষের পক্ষে কত বড় লজ্জা—একজন যুবকের প্রতি কতবড় একটা উপেক্ষা সেটা তো আপনি মেয়ে হয়ে বুঝতে পারবেন না রীতা দেবী।

রীতা সুনীলের ঐ কথার জবাবে হঠাৎ যেন কোন কথা বলতে পারে না। কয়েকটা মুহূর্ত চুপ করে থাকে। তারপর সুনীলের মুখের দিকে তাকিয়ে বলে—কিন্তু যদি কেউ 'নাই' করে থাকে তার সেই 'নাই'টা আপনার প্রতি একটা উপেক্ষাই বা ধরছেন কেন ?

তবে।

স্মিতভাবে কথাটা বলে সুনীল তাকিয়ে থাকে রীতার মুখের দিকে।

তার দিক থেকে অন্য কোন কারণও তো থাকতে পারে।

অন্য কারণ!

হ্যাঁ, কিন্তু যাক সে কথা, একটা অনুরোধ করবো ?

কি ?

আমাকে আপনি 'আপনি' করে সম্বোধন করতে পারবেন না আর।

তবে ?

তুমি বলে ডাকবেন আর নাম ধরে ডাকবেন আমাকে।

হেতু একটা কিছু আছে নিশ্চয়ই।

হ্যাঁ আছে বৈকি।

কি ?

এখানে যখন আমাকে থাকতেই হবে তখন আমাদের পরস্পরের মধ্যে সম্পর্কটা যাতে সহজ স্বভাবিক থাকে, যাতেকারো লজ্জায় না পড়তে হয় কোন দিক দিয়েই সেটাই ত আমাদের দেখা উচিত।

রীতার কথাটা শেষ হয় না হঠাৎ সুনীলের নজরে পড়ে রীতার সিঁথিটা, সেখানে লাল সিন্দুরের চিহ্ন এবং যেটা এ কয়দিন তার চোখে পড়েনি একবারও।

সুনীল সেইদিকে ইঙ্গিত করে বলে ওঠে, মাথার সিঁথির ঐ ব্যাপারটাও কি সেই জন্যেই রীতা দেবী?

রীতার মুখটা আবার লাল হয়ে ওঠে।

সে মুখটা নীচু করে বলে, না, না, ছিঃ—

তবে, হঠাৎ অমন করে স্পষ্ট করে সিন্দুর কপালে ও সিঁথিতে দিলে কেন?

সুনীলবাবু, এ সংসারে বেশীর ভাগ মানুষের মন এত নোংরা এবং এত সংকীর্ণ যে ভয় হয় পাছে- -

কি?

আমার জন্য শেষ পর্যন্ত আপনার গায়ে না কালির দাগ লাগে, তা ছাড়া—

তা ছাড়া কি রীতা?

মেয়েরা যে মেয়েদের কত বড় শত্রু, আপনি হয়ত জানেন না।

সত্যি রীতা, কত সামান্য উপায়েই না আমরা একজনকে ঠকাতে পারি। ভাল করেছো, খুব ভাল করেছো, জান এমনিই হয়, যেখানে যত বেশী চোখ ধাঁধানি সেখানেই বুঝি তত বেশী ফাঁকি।

॥ ছয় ॥

সিঁথির ঐ সিন্দুর সম্পর্কে রীতার একটা ইতিহাস আছে।

দিদির বিবাহের পরদিনই সে যখন মাথায় ও কপালে সিন্দুর পরেছিল অর্থাৎ সমরেশই পরিয়ে দিয়েছিল এবং দিদির সিঁথির ও কপালের সেই সিন্দুর রীতাকে যেন সেই মুহূর্ত থেকেই কেমন সম্মোহিত করে। বার বার তারপর সে আশীতে নিজের মুখ দেখেছে আর মনে মনে নিজের সঙ্গে নিজে যুদ্ধ করেছে। সবশেষে একদিন রীতা তার দিদির কসমেটিকসময়ের ভিতর থেকে একটা সিন্দুর ভর্তি রূপার সিন্দুর কৌটো চুরি করে নিজের কাছে লুকিয়ে রেখে দিয়েছিল।

তারপরও কতদিন মনে মনে প্রচন্ড একটা লোভের সঙ্গে যুদ্ধ করেছে।

ঐ সিন্দুর সিঁথিতে ও কপালে এঁকে দিতে লোভ হয়েছে কিন্তু পারেনি।

বাড়ি ছেড়ে চলে আসবার সময় সিন্দুর ভর্তি সিন্দুরকৌটোটা সঙ্গে করে নিয়ে এসেছিল রীতা।

স্কুল বোর্ডিংয়ের কোয়ার্টার্স ছেড়ে পথে নামবার আগে তার বারংবার মনে হয়েছিল সেদিন গৃহ ছেড়ে আসবার পরই ট্রেনের মধ্যেই যদি সিন্দুর চিহ্নটা কপালে ও সিঁথিতে এঁকে দিত এবং সেদিন বান্ধবী চৈতীর প্রশ্নে যদি বলতো,

এক গরীব ছেলেকে সে স্বেচ্ছায় ভালবেসে বিবাহ করেছে বলে তাকে ঘর ছেড়ে চলে আসতে হয়েছে তবে তো আজকের এই কুৎসিৎ সমস্যাটা দেখা দিত না।

এমনি করে কুৎসার ঢেউ তার চারিদিকে ফেনিয়ে ফেনিয়ে উঠতো না।

ঐ একটিমাত্র সিন্দুর চিহ্নেই তো সমস্ত আলোচনার পথ, সমস্ত নিন্দা ও গ্লানির পথটা রুদ্ধ থেকে যেত। কেন তা সে করলো না।

আর মিথ্যাও তো নয়, বিবাহ তো তার হয়েই গিয়েছে সেদিন রাত্রে।

সমরেশের কথা সে জানে না কিন্তু সে তো মনে মনে অগ্নি নারায়ণ শিলা সাক্ষী রেখে সমরেশকেই স্বামী বলে গ্রহণ করেছিল সেদিন সেই মুহূর্তেই এবং তার মনের সেই স্বীকৃতি সে তো মিথ্যা নয়, মিথ্যাও কোনদিন হবে না।

সেও ঐ মুহূর্তেই মনে মনে আপনাকে সমরেশের হাতেই তুলে দিয়েছিল। সমর্পিতা হয়েছিল।

একটা মাত্র সিন্দুর চিহ্নই কি সব কিছু? সেটাই কেবল সত্য একমাত্র।

তার মন মিথ্যা। তার সমর্পণ মিথ্যা।

আজ আবার সুনীলের গৃহে এসে সেই কথাটাই নতুন করেন মনে পড়ে বুঝি রীতার।

সুনীল দেবতা। তার মনে হয়তো কোন পাপের স্পর্শ কোনদিন লাগবে না, কিন্তু সে তো একা নয়, আরো দশজন তো এখানে আসা যাওয়া করে, তাদের মনে যদি সংশয় জাগে, তাদের মনে যদি সন্দেহ জাগে।

না, আর ভুল করবে না রীতা।

রীতা তাই এখানে আসবার দিন দুই পরেই—সুনীল অবিশ্যি লক্ষ্য করেনি, সিঁথি ও কপালে সিন্দুর লাগিয়ে মনে মনে বার বার বলেছিল, অপরাধ নিও না, সির্বান্তঃকরণে জানি তুমিই আমার স্বামী, এ দেহ মন সব তোমারই তাই তোমাকে মনে মনে ভেবেই এ সিন্দুর সিঁথিতে দিলাম তোমারই সন্তানের কল্যাণে।

চোখের কোল দুটো রীতার জলে ঝাপসা হয়ে গিয়েছিল।

সুনীল তার রোগী, হাসপাতাল, চেম্বার নিয়েই সর্বদা ব্যস্ত. বাড়িতে আসার সময়ই পায় না বলতে গেলে সারা দিনে একপ্রকার।

রীতা অভিযোগ করে, সময়মতো নাইবার খাবার সময়টুকুও কি আপনার হয় না?

সুনীল মৃদু মৃদু হাসে।

রীতা কিন্তু থামে না, বলে, আমি এখানে আছি বলেই কি–

না না, কি যে বলো তুমি রীতা। আচ্ছা বলতো ও কথাটা তোমার মনে হলো কেন?

দয়ালদা কিন্তু বলে আগে আগে প্রায়ই দুপুরবেলা একবার আপনি খেতে আসতেন।

দয়ালের কথা বিশ্বাস করো না রীতা, ও আমার মায়ের পোস্টটা নিয়েছে আচ্ছা একটা কথা জিজ্ঞাসা করবো?

কি ?

আপনার মা কি বরাবরই কাশীতেই আছেন ?

না, বছরখানেক হলো রাগ করে কাশীবাসিনী হয়েছেন।

রাগ করে !

হ্যাঁ, রাগ কেন জান ? বিয়ে করছি না বলে।

তা মিথ্যা তো তিনি রাগ করেননি। কি যে এক মনের মধ্যে আবোল-তাবোল ব্যাপার গড়ে রেখেছেন আপনি।

কোনটা ঠিক আর কোনটা বেঠিক যদি এত সহজেই বিচার মীমাংসা কবা যেত রীতা, কিন্তু ওসব কথা যাক, আজ খাদ্যের মেনুতে কি তোমার নতুন আইটেম বল শুনি।

আজ খুব ভাল একটা নিরামিষ তরকারি করেছি, মোচার ঘণ্ট।

সত্যি !

হ্যাঁ, চলুন হাত মুখ ধুয়ে টেবিলে বসবেন।

হ্যাঁ, হ্যাঁ তুমি রেডি হও আমি আসছি।

সুনীল বাথরুমে গিয়ে প্রবেশ কবে।

এদিকে যত মাস এগিয়ে আসতে থাকে রীতার দেহেব ক্লান্তি যেন বাড়তে থাকে।

সুনীল একটা সর্বক্ষণের দাই নিযুক্ত করে।

রীতা বলে, ওকে আবার কেন ?

না না, এসময় একজনের দরকার। একজন মার বয়েসী মেয়েমানুষ পাশে থাকা সর্বক্ষণ প্রয়োজন।

রীতার চোখে জল এসে যায়।

তারপর একদিন মধ্যরাত্রে ব্যথা উঠলো।

সুনীল তার বন্ধু প্রখ্যাত গাইনোকলজিস্ট ডাঃ শর্মাকে কল দিয়ে নিয়ে এলো। এবং পরের দিন সিজিরিয়ান করে রীতার একটি ছেলে হলো।

সুনীল মহা খুশী। আনন্দে কি যে করবে বুঝে উঠতে পারে না।

বলে, কি নাম রাখছো তোমার ছেলের বল রীতা ?

আপনিই বলুন না কি নাম রাখবো ওর, আপনার দেওয়া পরিচয়েই ওই পৃথিবীতে পরিচয় হোক।

তবেই তো মুশকিলে ফেললে দেখছি !

কেন ? মুশকিল কেন ?

নয়, আমি মানুষটা একেবারে নীরস নিরেট, দুনিয়াতে কোন খবর রাখি না একমাত্র ছুরি ফরসেপ্স ছাড়া।

আশীর্বাদ করুন আমার ছেলেও যেন আপনার মতই হয়।

আমার মত ! বল কি, না না, ও কামনা তুমি করো না রীতা, তোমার ছেলে হয়তো সম্ভবতঃ একজন বাগ্মী বা সাহিত্যিক হবে, বা ব্যারিস্টার।

না, আশীর্বাদ করুন আপনার মতই যেন ও হয়, আপনার মত চরিত্র যেন ও পায়।

না না, তুমি জান না রীতা, অতি সাধারণ অতি তুচ্ছ আমি।

সেই তুচ্ছতাই যেন ও পায়, আপনার মত সাধারণই যদি ও হতে পারে তো জানব সার্থক ওকে আমার জন্ম দেওয়া।

আর একদিন সুনীল রীতার ছেলেকে আদর করছে যখন রীতাই প্রশ্ন করে, কই ওর একটা নামকরণ করলেন না ?

হ্যাঁ ভেবেছি একটা নাম, হাসতে হাসতে সুনীল বলে।

সত্যি ! কি নাম ?

বলত কি নাম ভেবেছি।

কেমন করে বলবো।

পারলে নাত ?

না, আপনি বলুন।

রাহুল।

খুব ভাল নাম।

কিন্তু নামটাতেই তো কেবল হবে না একটা পদবীও যে ওর ঐ সঙ্গে প্রয়োজন। মায়ের ছেলে হতে পারে কিন্তু ছেলের পরিচয় যে বাপের নামেই হয়।

রীতা মৃদু কণ্ঠে বলে, রাহুল চক্রবর্তী।

চক্রবর্তী !

হ্যাঁ—ওর বেশী কিছু জিজ্ঞাসা করতে পাববেন না।

করবো না। কিন্তু—চিরদিনই কি তোমার ছেলের কাছ থেকে তার বাপের নামটা গোপন কবে রাখতে পারবে রীতা ?

পারবো না—আর তা রাখবোও না ভেবেছি। যেদিন তার প্রয়োজন হবে ওকে নিশ্চয়ই জানাবো।

রাহুল বড় হতে লাগলো।

ক্রমে সে হামা দিতে শিখলো—হাঁটতে শিখলো—মুখে কথাও ফুটলো।

রাহুল সুনীলকে মামা বলে ডাকে হঠাৎ একদিন।

সুনীল রীতাকে বলে, হঠাৎ এই নতুন সম্পর্ক কেন ?

বাঃ আপনার চাইতে এ পৃথিবীতে আর ওর আপনজন কে আছে—আপনাকে মামা বলে ডাকবার চাইতে বড় সৌভাগ্য আর ওর কি জীবনে হতে পারে ?

কিন্তু এমন তো কথা ছিল না রীতা !

কি কথা ?

এমনি করে নিষ্ঠুরেব মত তুমি আমার হাত পা বেঁধে দেবে !

রীতা মাথাটা নীচু করে।

সুনীলও বুঝি বিব্রত বোধ করে নিজেকে। কথাটা যেন হঠাৎ তার মুখ থেকে বের হয়ে গিয়েছে।

প্রসঙ্গটা ঘুরাবার জন্য রাহুলকে বুকে তুলে নিয়ে তাড়াতাড়ি সুনীল বলে ওঠে, চল রাহুলবাবু, একটু ঘুরে আসা যাক।

রাহুলকে নিয়ে সুনীল ঘর থেকে বের হয়ে যায়।

রীতার বুকটা কাঁপিয়ে একটা বড় রকমের নিঃশ্বাস পড়ে।

ইদানীং যেন সত্যিই ভয় করছিল রীতার।

সুনীলের ঋণ সে শোধ করবে কি দিয়ে?

তাকে কেন্দ্র করে সুনীলকে যে সব চাইতে বড় ঝড়ের ঝাপ্টাটা সামলাতে হয়েছে সেটা তার মার সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক ত্যাগ।

মা ছেলেকে তাঁর একপ্রকার ত্যাগই করেছেন।

তার গৃহে রীতার অবস্থানের ব্যাপারটা লোক পরম্পরায় শুনে সুনীলের মা সুচরিতা দেবী ক্ষমার চোখে দেখতে পারেননি।

আর সেই ব্যাপারকে কেন্দ্র করেই মা ও ছেলের মধ্যে চির-বিচ্ছেদ ঘটে গিয়েছে।

রীতা সেদিন বলেছিল, আমি চলে যাই সুনীলবাবু।

চলে যাবে কেন?

সত্যিই তো মাও আপনার মিথ্যে কিছু বলেনি। একটা নিঃসম্পর্কীয় পরিচয়হীন মা ও ছেলেব এতবড় বোঝাটা কেনই বা আপনি বইবেন।

সে প্রশ্নের মীমাংসা তো অনেক আগেই হয়ে গিয়েছে রীতা—নতুন করে তবে আবার সে প্রসঙ্গ কেন?

না না—এ আমি ভাবতেই পারছি না—আমার জন্যে আপনাদের মা ও ছেলের মধ্যে চিরবিচ্ছেদ ঘটে যাবে।

মা যদি অবুঝ হন?

অবুঝ নন সুনীলবাবু, এটাই যে স্বাভাবিক।

স্বাভাবিক!

নয়—ভেবে দেখুন, ত—কে আমি, কি সম্পর্ক আমার সঙ্গে আপনার? পর হতেও পর।

হয়ত তাই তবু—

কি?

কি জান রীতা, মাকে ছাড়তে হবে ভেবে যদি আজ তোমাকে আমি ঘর থেকে বের করে দিই তাহলে আর যারই ক্ষমা পাই না কেন সমস্ত ভালমন্দ পাপ পুণ্যের যিনি বিচারকর্তা তাঁর ক্ষমা কোনদিনই পাবো না হয়তো।

কিন্তু—

না রীতা, যা আমি সর্বান্তঃকরণে জানি অন্যায় নয় পাপ নয় তাকেই যদি আমাকে স্বীকৃতি দিতে হতো, তাহলে তো নিজেকে আমি কোনদিনই ক্ষমা করতে পারতাম না, নিজের কাছে নিজেই আমি ছোট হয়ে যেতাম, সে লজ্জা সে অপমান আমার তো সইতো না।

রীতা অতঃপর আর কোন কথা বলতে পারেনি সেদিন।

রীতা নিরুদ্দিষ্টা হবার পর দিন থেকে মাস সপ্তাহ করে অনেকগুলো দিন কেটে গিয়েছে, দীর্ঘ প্রায় সাড়ে আটটা বৎসর।

সমরেশ অনেক খোঁজ করেছিল রীতার।

কাগজে কাগজেও বহু বিজ্ঞাপন দিয়েছে কিন্তু রীতার কোন সংবাদই আর পায়নি।

রীতা যেন চিরকালের জন্যই হারিয়ে গেল।

ক্রমে নীতা রীতার কথা তার যমজ বোনটির কথা ভুলেই যায়।

নীতা ভুললেও রীতার কথাটা ভুলতে পারেনি সমরেশ।

আজো তার মনটা যখন বিরাট একটা দিগন্তপ্রসারী শূন্যতা ও বিষণ্ণতার মধ্যে আকুলিবিকুলি করতে থাকে, নিজেকে বড় অসহায় বড় একা মনে হয় তখন মনে পড়ে হঠাৎ যেন স্ত্রীর মুখের পাশাপাশিই অবিকল অমনি আর একখানি মুখ। যে মুখখানির সঙ্গে তার স্ত্রীর মুখের এতটুকু কোন পার্থক্য নেই।

শুধু মুখখানি কেন দেহ - দেহের প্রতিটি রেখা প্রতিটি ভঙ্গি সব এক, এমনটি কণ্ঠস্বরটি পর্যন্ত হুবহু এক।

চরম ধিক্কার আর কটূক্তি করে যাকে সে একদিন তার শোবার ঘর থেকে তাড়িয়ে দিয়েছিল।

শূন্যতা আর বিষণ্ণতা যেন তাকে আরো বেশী করে ঘিরে ধরে যখন অনেক রাত্রে স্ত্রী নীতা টলটলায়মান অবস্থায় ঘরে ফিরে আসে।

মাতাল হয়ে নীতা ফিরে আসে।

আকণ্ঠ মদ্যপান করে তখন আর সে সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারছে না।

একটা দীর্ণ হাহাকার যেন মনের মধ্যে মাথা খুঁটে খুঁটে মরতে থাকে কি এক দুঃসহ যন্ত্রণায়।

অবিকল দুজনে একরকম দেখতে যমজ বোন হলেও এবং দুজনার মধ্যে সর্বব্যাপারে একটা অবিচ্ছেদ্য মিল থাকলেও চলায় বলায় আচরণে কণ্ঠস্বরে প্রকৃতিতে একজায়গায় দুজনার মধ্যে অবিশ্বাস্য রকমের বিচিত্র একটা গরমিল ছিল কিন্তু।

এবং ঐ গরমিলটা প্রকৃতিতে ওদের ক্রমশঃ প্রকাশ পেতে থাকে যত ওদের বয়স বাড়তে থাকে, স্পষ্ট হয়ে ওঠে ওদের যৌবনকালে।

একজন শান্ত ধীর, একজন চঞ্চল উচ্ছল।

রীতা শান্ত ধীর মিতবাক আর নীতা—অস্থির চঞ্চল ও প্রগলভা।

নীতার চরিত্রের সেই চঞ্চলতা ও উচ্ছলতাই ক্রমশঃ একদিন একটু একটু করে তাকে স্বামী সমরেশের প্রশ্রয় পেয়ে পেয়ে বাধাহীন উচ্ছৃঙ্খলতার মধ্যে বুঝি টেনে নিয়ে গিয়েছিল।

চিরদিনের উদার প্রকৃতির মিশুকে আমুদে সমরেশ স্ত্রীকেও নিজের মত করে গড়ে তুলতে চেয়েছিল, তাই সে নীতার ক্লাব পার্টি ও সমিতিতে বাধা

দেয়নি। কিন্তু উচ্ছৃংখলতার সীমাটা যেদিন নীতার ছাড়িয়ে যাবার উপক্রম হলো সেদিন আর সমরেশের সাধ্য ছিল না তাকে ঘরের শান্ত পরিবেশে ফিরিয়ে আনা।

সাধ্য ছিল না তার আর নীতাকে সংযত করা।

তবু চেষ্টা করেছে সমরেশ। ফিরাবার চেষ্টা করেছে নীতার বহির্মুখী উচ্ছৃংখল মনকে, কিন্তু ব্যর্থ হয়েছে।

কিন্তু তাহলেও সেদিন নীতা মদ্যপান শুরু করেনি উচ্ছৃংখলতার শেষ ধাপে গিয়ে পেঁছায়নি।

এদিকে বিবাহের পর তিন তিনটে বছর পার হয়ে গেল নীতার কোন সন্তানাদি হলো না।

নীতা মা হলো না।

এতবড় বাড়িটা শিশুর কলহাসিতে ভরে উঠলো না।

স্বামী-স্ত্রী দুজনার মনের মধ্যেই একটা চাপা কামনা গুমরে মরতে লাগল।

ইতিমধ্যে শ্বশুরের গৃহ ভাড়া দেবার ব্যবস্থা কবে লেক অঞ্চলে নিজের বাড়ি করে সমরেশ উঠে এসেছিল।

অনেক করে প্ল্যান করে মনের মত একটি গৃহ তৈরি কবেছিল। সামনে ও পিছনে খানিকটা খোলা জমি, পশ্চাতে সুন্দব একটি ফুলের বাগান।

দোতলা বাড়ি।

শ্বশুরের বাড়ি তিনি রীতাকেই দিয়ে গিয়েছিলেন, তার ভাড়া রীতার নামেই ব্যাংকে জমা হচ্ছিল এবং সেই সঙ্গে ব্যবসাবও অর্ধেক লভ্যাংশ।

কারণ ব্যবসাটা ওদের বাপ মণিশংকরেরই ছিল, পরে সমরেশ ব্যবসাটাকে আরো বাড়িয়ে তুলেছিল মাত্র।

সমরেশের নতুন বাড়িটা দোতলা হলেও খান দশেক ঘর উপরে নীচে।

পুরানো চাকর দাসীদের মধ্যে একমাত্র প্রৌঢ়া সুখদা ছাড়া আর সবাই নতুন এ বাড়িতে নিযুক্ত হয়েছিল। দুজন ভৃত্য, ঠাকুর ও দাবোয়ান।

সমরেশ সকালবেলা ন'টা সোয়া ন'টার মধ্যে অফিসে চলে যায়, বিকেল চারটে পর্যন্ত নীতা গৃহেই থাকে কিন্তু অস্বাভাবিক একটা শূন্যতা যেন তাকে গিলতে আসে।

নীতা যেন এক এক দিন হাঁপিয়ে ওঠে—এবং এক এক দিন দুপুরেই সে বের হয়ে যায়, ফেরে একেবারে সেই রাত্রে।

একদিন সমরেশই কথায় কথায় বলে, এখন দেখছি এতবড একটা বাড়ি না করলেই বোধহয় ভালো হতো নীতা।

প্রাতরাশ টেবিলে বসে দুজনে মুখোমুখি চা পান করছিল।

নীতা বলে, কেন, কি ক্ষতিটা হয়েছে!

ক্ষতি নয়—

তবে?

সমরেশ বলে, আমি তো সারাটা দিন থাকিই না, তুমিও তো শুনি

আজকাল প্রায়ই দুপুরে বের হয়ে গিয়ে সেই রাত্রে ফেরো।

তা কি করবো। একটা কথা বলবার পর্যন্ত লোক নেই, এই শূন্য পুরীতে মানুষ থাকতে পারে?

তা তো সত্যিই—

তুমিও তো আগে দুপুরে লাঞ্চ খেতে আসতে এখন আর তাও আসো না।

নীতা অভিযোগ জানায়।

সমরেশ জবাব দেয় না, কি যেন ভাবছে মনে হয়।

একসময় বলে সমরেশ, আচ্ছা নীতা—

কি?

আমাদের বিয়ে তো তিন বছর হয়ে গেল।

তা তো হলোই, তিনটে ম্যারেজ অ্যানিভারসারি সেলিব্রেট অবজার্ভ করলাম।

বলছিলাম কি চল না একবার ডাঃ সেনের কাছে।

ডাঃ সেন।

হ্যাঁ, গাইনোকলজিস্ট ডাঃ সেন।

নীতা মুখটা নামায়, কথাটা যে তার মনে হয়নি এতদিন তাও নয়, বরং ইদানীং কিছুদিন ধরে ঐ কথাটাই তার মনের মধ্যে কেবলই যেন ঘোরাফেরা করছিল।

মনের মধ্যে কোথায় বুঝি একটা সুপ্ত সন্তানতৃষ্ণা কিছুদিন থেকেই যেন তাকে পীড়া দিচ্ছিল।

নারীদেহের কোষে কোষে যে চিরন্তন মাতৃত্বের তৃষ্ণা সকল কিছু ছাপিয়ে যেন ইদানীং মধ্যে মধ্যে তাকে সেই তৃষ্ণাটা আনমনা করে তুলেছিল।

সমরেশ বলে, ভাবছি একা তোমাকেই নয় আমাকেও দেখাবো।

নীতা মৃদু কণ্ঠে জবাব দেয়, বেশ তো চল।

যে কথাটা এতদিন মনের মধ্যে তাকে নিরন্তর অংকুশের মত বিঁধছিল অথচ মুখ ফুটে যেটা সে স্বামীর কাছে কিছুতেই প্রকাশ করতে পারছিল না, সমরেশের প্রস্তাবে আজ সেই ইচ্ছাটাই যখন প্রকাশ পেল নীতা যেন হাঁপ ছেড়ে বাঁচে।

॥ সাত ॥

সবশেষে একদিন গেল ওরা। সমরেশ ও নীতা।

ডাক্তার সমরেশকে পরীক্ষা করে বললেন, সে সম্পূর্ণ সুস্থ, সন্তানের পিতা হবার সমস্ত ক্ষমতাই তার দেহে বর্তমান।

কিন্তু—

নীতা, নীতার দিক থেকে সে সম্ভাবনাই নাকি নেই।

ডাঃ সেন বললেন, আলাদা ঘরে একা সমরেশকে ডেকে পৃথকভাবে, "আই অ্যাম এক্সট্রিমলি সরি মিঃ চক্রবর্তী, আপনার স্ত্রীর মা হবার সম্ভাবনা

একেবারেই নেই, ইনফ্যানটাইল ইডটেরাস—

চিকিৎসা করলেও না ?

সম্ভবতঃ নয়।

তবু চিকিৎসা করুন ডাঃ সেন।

তারপর একবছর ধরে অনেক চিকিৎসাই হলো নীতার কিন্তু কোন আশার আলোই দেখা গেল না।

নীতার কাছে সমরেশ ডাক্তারের কথাটা গোপন করলেও নীতা কিন্তু ব্যাপারটা সন্দেহ করেছিল, তাই সে গোপনে সমরেশের অজ্ঞাতে আর একজন নামকরা স্ত্রীরোগবিশেষজ্ঞের কাছে গিয়ে বললে, আপনি আমায় পরীক্ষা করে বলে দিন মা আমি হতে পারবো কি না।

ডাক্তার পরীক্ষা করে বললেন, আশা খুব কম তবে চিকিৎসা—

চিকিৎসা গত এক বছর ধরে ডাঃ সেনের কাছে করিয়েছি, সব কাগজপত্রই আমার কাছে আছে, এই দেখুন সব, বলুন এ ছাড়াও আর কোন চিকিৎসা আছে কি না ?

ডাক্তার কাগজপত্র ও রিপোর্ট পরীক্ষা করে বললেন, সবই তো চেষ্টা করা হয়েছে দেখছি।

তাহলে কোন আশাই নেই ?

নীতা ডাক্তারের মুখের দিকে চেয়ে জিজ্ঞাসা করে।

ডাক্তার চুপ করে থাকেন। বিব্রত বোধ করেন।

হুঁ বুঝলাম।

মিসেস চক্রবর্তী—

ডাক্তার কি বলতে যায় কিন্তু নীতা তাকে বাধা দিয়ে বলে, থাক ডাক্তারবাবু বুঝেছি জীবনে কোন দিনই আমি মা হতে পারব না।

ডাঃ আর কি বলবেন, চুপ করে থাকেন।

আশ্চর্য, ডাক্তারবাবু, একজন স্ত্রীলোক মা না হতে চাইলে আপনাদের চিকিৎসাবিজ্ঞানে তার ব্যবস্থা আছে কিন্তু যে মা হতে পারছে না মা হতে তাকে আপনারা কোনভাবেই সাহায্য করতে পারেন না।

নীতা ডাক্তারের চেম্বার থেকে বের হয়ে গেল।

শেষ আশার ক্ষীণতম আলোটুকুও মন থেকে নির্বাপিত হয়ে গেল।

সে মা হতে পারবে না কোনদিন।

কোনদিন তার কোল জুড়ে একটা সন্তান আসবে না।

জীবনে তার কোনদিন মাতৃত্বের ফুলটি ফুটবে না। তার দেহের গর্ভকোষ কোন জীবনের প্রাণস্পন্দনে রোমাঞ্চিত হবে না।

সে ব্যর্থ। ব্যর্থ এক নারী, বন্ধ্যা এক নারী।

বুকটা যেন একেবারে খালি হয়ে গিয়েছে। শূন্য হয়ে গিয়েছে।

বাড়িতে আর গেল না নীতা, এক বান্ধবীর গৃহে ড্রাইভারকে গাড়ি চালাতে বললো।

চন্দ্রিমা।

একদা ওর কলেজের বন্ধু ছিল, শেষ দেখা হয়েছিল বছর পাঁচেক আগে সেকেণ্ড ইয়ারে পড়তে পড়তে, তারপর আর দেখা হয়নি।

তবে মধ্যে মধ্যে চন্দ্রিমা ওকে ফোন করতো।

দমদমায় থাকে, স্বামী গান অ্যাণ্ড শেল ফ্যাকট্রিতে কাজ করে, ফ্যাকট্রি কোয়ার্টার্সে থাকে যশোর রোডের উপর।

চন্দ্রিমা ফোন করলেই ওকে বলতো আয় না একদিন।

কিন্তু নীতা যায়নি আজ পর্যন্ত।

হঠাৎ কি খেয়াল হলো, তখন সন্ধ্যার অন্ধকার চারিদিকে ঘনিয়ে আসছে, ড্রাইভারকে বললো চন্দ্রিমার বাড়িতেই যেতে।

চন্দ্রিমার স্বামী বিনয়ের কোয়ার্টার্স খুঁজে পেতে দেরি হলো না।

বিনয় বাড়িতে নেই, অফিসের কি একটা কাজে দিল্লীতে গিয়েছে।

দোতলায় চারখানি ঘর নিয়ে সাজানগোছান কোয়ার্টার্স। গরীবের মেয়ে ছিল চন্দ্রিমা কিন্তু দেখতে ভারি সুন্দর ছিল, সৌন্দর্যের সার্টিফিকেটেই বিয়ে হয়ে গিয়েছিল একদিন ভাল পাত্রের সঙ্গে।

নীতা যখন ওর বাড়িতে গিয়ে পৌঁছালো চন্দ্রিমা তখন তার তিন বছরের দুরন্ত ছেলেটিকে নিয়ে হিমশিম খাচ্ছিল।

অসম্ভব দুরন্ত। ছেলে তো নয় যেন ননীতে গড়া একটি পুতুল। নাদুসনুদুস চেহারা, মাথাভর্তি কোঁকড়া কোঁকড়া চুল।

চন্দ্রিমাও নীতাকে দেখে ভারি খুশী।

আয়, আয়, কি ভাগ্যি, বড়লোকের গিন্নীর তাহলে মনে পড়লো গরীব বান্ধবীকে এতদিনে?

চন্দ্রিমা ওর সঙ্গে কথা বলবে কি।

ছেলে কি তার এক মুহূর্ত স্থির থাকতে দেয়, এই এটা নিচ্ছে ওটা নিচ্ছে, এটা ভাঙছে ওটা ভাঙছে।

দেখছিস ভাই কি গুণ্ডা হয়েছে, ঠিক বাপের মত, না আছে ঘুম না আছে কিছু, জীবন আমার একেবারে দুর্বিষহ করে তুললো, আর পারি না বাবা।

মুখে চন্দ্রিমা কথাগুলো বলে বটে কিন্তু সুখে আনন্দে সে যেন ডগমগ করে।

একসময় চন্দ্রিমা শুধায়, হ্যাঁরে তোর কটি?

নীতা মৃদু হাসে।

হয়নি বোধহয়, বেশ আছিস, এ যা ঝামেলা।

নীতা কিন্তু বেশীক্ষণ টিকতে পারে না সেখানে। বুকের মধ্যে কোথায় যেন একটা যন্ত্রণা কেবলই তাকে মোচড় দিতে থাকে।

উঠে পড়ে যাবার জন্য নীতা।

বলে, চলি ভাই আজ, রাত হলো।

চন্দ্রিমা বলে, একি রে এখুনি তো এলি, এরই মধ্যে চলে যাবি ? বোস না আর একটু।

না ভাই রাত হয়েছে চলি।

নীতা আর বসলো না।

সেখান থেকে গেল আর এক বান্ধবীর বাড়ি, সেখানেও তার দুটি সন্তান। বাড়ি ঘর দোর যেন ভরিয়ে রেখেছে।

নীতার মনে হয় কেবলই সত্যিই তো এ না হলে ঘর কি সংসারই বা কি ?

সেখানেও টিকতে পারলো না নীতা।

উঠে পড়ে।

চললি ?

হ্যাঁ।

বাড়ি যাবি ?

না, ক্লাবে যাবো।

তোরা সত্যি আছিস ভাল—দিব্যি ঝাড়া হাত্ পা, আর আমরা, একদণ্ড যদি কোথায়ও বেরুবার উপায় থাকে। ক্লাবটমাবের কথা তো কবেই ভুলে গিয়েছি।

বান্ধবী নীতাকে গাড়িতে তুলে দিয়ে গেল।

রাত তখন সোয়া নয়টা প্রায়—ক্লাবঘর গমগম করছে নানাবয়সী মেয়ে পুরুষে।

ব্যারিস্টার সমীর রায়ের বৌ সুজাতা—ড্রিংক করছিল এক পাশে বসে, নীতা গিয়ে সুজাতার পাশে একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসলো।

কিরে, আজ যে এত দেরী ?

তুই কতক্ষণ ?

তা ঘণ্টা দুই হবে।

নীতা হাসতে হাসতে প্রশ্ন করে।

তখন থেকেই বুঝি চালাচ্ছিস ?

না বেশী নয়—এইটা সেকেণ্ড পেগ।

আহা সত্যি করে বলত সুজাতা, কি আনন্দ পাস এগুলো খেয়ে ?

না খেলে বোঝা যায় না এর মর্ম ! খেয়ে দেখ একদিন বুঝবি তখন ! It's elixir of life.

তাই বুঝি ?

হ্যাঁ, খেয়ে দেখ।

নীতা চুপ করে থাকে।

একড়া শূন্য হাহাকারে বুকটা তার মোচড় দিয়ে দিয়ে উঠছে। চন্দ্রিমা আর বীণার কথাই ভাবছিল বুঝি নীতা তখন।

মনে হচ্ছিলো বোধহয় বাড়িটা শূন্য বলেই সমরেশ বাড়িতে আসতে চায় না। তারও হয়তো বাড়িতে একটা মুহূর্ত ভাল লাগে না।

আনি তোর জন্যে এক পেগ, কি বলিস ?

না, না।

প্রতিবাদ জানায় নীতা।

না কেন, ভয় পাচ্ছিস !

ভয় নয়—

তবে ?

তুই তো জানিস ভাই সমরেশ পছন্দ করে না এসব।

কি রকম ব্যাকডেটেড রে ভদ্রলোক।

তা কি হবে বল ?

কি হবে মানে ! বিয়ে হয়েছে বলে জীবনটাকে enjoy করবারও অধিকার নেই নাকি তোর ? দেখ জীবনটা শুধু স্বামী পুত্র আর হাজার ঝামেলা নিয়েই নয়, lifeয়ের ভিতরেও enjoyment আছে তবে খুঁজে নিতে হয়।

তাই বুঝি ?

হ্যাঁ, তা ছাড়া সে জানবেই বা কি করে।

জানতে পারবে।

সে ব্যবস্থা আমি করবো।

কি ব্যবস্থা ?

দেখনা, বলে দেবো পরে কি করতে হবে।

কথাটা বলেই ওয়েটারকে ডেকে দুটো পেগ দিতে বললো সুজাতা।

সেই রাত্রেই প্রথম নীতার হাতেখড়ি হলো।

আঃ বেশ তো !

মনটা একেবারে ভাবনাশূন্য চিন্তাশূন্য হালকা হয়ে যায়। মাথাটা কেমন শূন্য শূন্য, ঝিমঝিম করছে।

সে রাত্রে গৃহে ফিরলো যখন নীতা তখন সে টলছে।

সমরেশ তখনো ফেরেনি। সে কলকাতায় ছিল না, ব্যবসা সংক্রান্ত কি একটা কাজেই আসানসোল গিয়েছিল।

অন্যান্য দিন এসে শয্যায় শুলেও ঘুম আসতে চাইতো না কিন্তু আজ নীতা শয্যায় শোওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ঘুমের মধ্যে তলিয়ে গেল।

তার পরের ইতিহাস তো নীতার ধাপে ধাপে এগিয়ে যাওয়া কেবল।

এবং ধরা পড়ে গেল যেদিন প্রথম সমরেশের কাছে এতটুকু লজ্জাও আর কোথায়ও বুঝি সেদিন তার মধ্যে আর অবশিষ্ট ছিল না।

সমরেশ স্তম্ভিত, নির্বাক হয়ে গিয়েছিল যেন।

নীতা !

কি ! কি বলছো ?

নীতা টলছে তখন। দাঁড়াতে পারছে না ভাল করে।

নীতা, তুমি ড্রিংক করেছো !

হ্যাঁ করেছি, কেন করবো না বলতে পারো।

সমরেশ ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে থাকে নেশায় রক্তিম মুখ ও এলোমেলো চুল স্ত্রীর দিকে।

নীতা—

হ্যাঁ, হ্যাঁ, ড্রিংক করেছি এবং আরো করবো, বুঝলে?

তারপরই হঠাৎ যেন ভেঙ্গে পড়ে, বলে, কেন করবো না বলতে পারো কি তুমি আমাকে দিয়েছ, কি পেয়েছি আমি তোমার কাছে?

কিছুই পাওনি তুমি আমার কাছ থেকে! এতবড় কথাটা তুমি বলতে পারলে নীতা।

কেন বলবো না, একশবার হাজারবার বলবো! You have deprived me, you have cheated me.

তোমাকে deprive করেছি, cheat করেছি!

হ্যাঁ হ্যাঁ, করেছো। করনি, করনি তুমি, মনে মনে আর একজনকে ভালবেসে আমার সঙ্গে অভিনয় করে গিয়েছ—

আমি অন্যকে ভালবেসেছি!

বাসনি? বুকে হাত দিয়ে বলত, তোমার সমস্ত বুক জুড়ে রীতা আছে কিনা।

ছিঃ নীতা, এ তুমি কি বলছো!

একটুও মিথ্যা নয়, সব সত্য, আর তাই, তাইত আমি হাঁপিয়ে উঠেছি।

হাউহাউ করে নীতা কেঁদে ওঠে।

সমরেশ কোনমতে তাকে অতঃপর ধরে নিয়ে গিয়ে শয্যায় শুইয়ে দেয়।

মদের নেশায় নীতা শয্যায় শুয়ে অঘোরে ঘুমাচ্ছে।

তলিয়ে গিয়েছে ঘুমের মধ্যে।

সমরেশের চোখে ঘুম আসে না।

জানালার কাছে দাঁড়িয়ে বাইরের শূন্য অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে থাকে সমরেশ।

এ আজ কি বললো নীতা!

তার সমস্ত বুকটা জুড়ে রয়েছে রীতা।

সত্যি—

সত্যিই কি রীতা রয়েছে তার সমস্ত বুক জুড়ে।

রীতা—

সত্যিই ত, রীতাকে কি সে ভুলতে পেরেছে।

পারেনি ত।

আবার এও তার মনে হয়, সত্যিই তো কি পেয়েছে নীতা তার কাছ থেকে। নারীর সর্বাপেক্ষা যে কামনার বস্তু সেই সন্তান তো তার একটিও হয়নি। সে গৌরবের তো সে আশীর্বাদ পায়নি।

কিন্তু সে তো তার দোষ নয়। সমরেশের দায়িত্ব সেখানে কতটুকু।

নীতার নিজের দেহেই ত সন্তানধারণের কোন সম্ভাবনা নেই। বিধাতাই যে তাকে নারীজন্ম দিয়েও মায়ের আশীর্বাদ থেকে বঞ্চিত করেছেন।

নীতা উচ্ছৃঙ্খল, সর্বদা বাইরে বাইরে ঘুরে ঘুরে বেড়ায়। এতবড় বাড়িটার মধ্যে নীতা একেবারে একা।

সে তার কাজ ব্যবসা নিয়ে সর্বক্ষণই ব্যস্ত। কতটুকু তার সঙ্গ পায়।

আগে তবু রীতা ছিল, সে নিরুদ্দিষ্টা হবার পর থেকে তো নীতা একেবারেই একা।

বাড়িতে যদি মন না টেকেই, বাইরে বাইরেই সে কাটায় তাহলেও তো তাকে দোষ দেওয়া যায় না।

তার নিজেরও তো কখনো মনে হয়নি কথাটা।

বহুদিন পরে যেন আজ আবার রীতার কথাটা মনে পড়ে সমরেশের নতুন করে।

সত্যিই তো, রীতা কোথায় গেল। আজও সে বেঁচে আছে কি?

সেদিন রাত্রে অমন রূঢ় ভাষায় কথাগুলো তাকে না বললেও হতো।

সবটাই কি রীতার দোষ ছিল, তার কি কোন দোষই ছিল না!

সে কেন রীতাকে স্পর্শ করেও জানতে পারলো না?

নীতার পরিচিত স্পর্শের সঙ্গে কি রীতার দেহের স্পর্শের সত্যিই কোন পার্থক্য ছিল না? নিশ্চয়ই ছিল। তবে সে জানতে পারলো না কেন?

কিন্তু আজও সমরেশ বুঝে উঠতে পারে না রীতার সে রাত্রের ঐ ধরনের ব্যবহারের সত্যিকারের কারণটা কি, কেন সে অমনি করে নিজেকে তার কাছে সমর্পণ করেছিল।

একজন নারী হয়ে অমন করে নারীর সমস্ত লজ্জাকে বিসর্জন দিয়েছিল, দিতে পেরেছিল কেমন করে।

তাছাড়া আজ যেন মনে হচ্ছে রীতার ঠিক যেভাবে খোঁজ করা উচিত ছিল তেমনি করে বুঝি ঠিক রীতার সন্ধান সে করেনি কোনদিনই।

মনের মধ্যে যে লজ্জা ও সংকোচবোধটা ছিল সেটাই হয়তো রীতাকে খুঁজে বের করবার ব্যাপারে একটা সত্যিকারের প্রতিবন্ধক হয়েছিল বরাবর।

রীতাকে যদি আবার সত্যই খুঁজে পাওয়া যায়, আবার যদি দুজনকে মুখোমুখি দাঁড়াতে হয় তবে রীতার কথা বাদ দিলেও সে নিজেই কি অসংকোচে রীতার সামনে গিয়ে পূর্বের মত দাঁড়াতে পারবে!

পারবে কি সে আগের মত সহজ সম্পর্কে কুণ্ঠাহীনভাবে 'নাম্বার টু' বলে রীতাকে সম্বোধন করতে।

সে রাত্রির সেই ভয়ংকর স্মৃতিটা কি দুজনার মাঝখানে এসে একটা দুর্ভেদ্য প্রাচীরের সৃষ্টি করবে না!

তারপর নীতা, তার স্ত্রী।

সে কোন কথা না জানলেও তাদের স্বামী স্ত্রীর মধ্যে রীতার সঙ্গে যা ঘটে গিয়েছিল সেটা একটা প্রশ্ন তুলে অনুক্ষণ তাকে কি পীড়ন করবে না!

অদৃশ্য একটা কাঁটার মত খচখচ করে কি বিঁধবে না!

আর সেই কারণেই কি সে রীতার খোঁজার ব্যাপারটা একটা কোনমতে দায়িত্ব সারা গোছেব করে শেষ পর্যন্ত ক্ষান্ত হয়নি! হাত গুটিয়ে নেয়নি।

অবিশ্যি নীতা তার স্ত্রীও রীতার খোঁজ করার ব্যাপারে তাকে বিশেষ তেমন উৎসাহ দেয়নি, এবং রীতার নিরুদ্দেশের ব্যাপারটা সম্পূর্ণ তারই ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়ে আত্মীয়স্বজনের কাছে মুখটা রক্ষা করেছিল।

বলেছিল কাউকে কিছু না বলে হঠাৎ সে নিরুদ্দেশ হয়ে গিয়েছে।

আত্মীয়ের দল মুখ টিপে হেসেছিল আড়ালে।

তারপর একদিন লেক অঞ্চলে নতুন বাড়ি করে যখন ওরা উঠে এলো রীতার স্মৃতিটুকুও যেন ওদের জীবন থেকে মুছে গেল।

রীতা নামে যে নীতার এক যমজ বোন ছিল একদিন সে কথাটাও যেন আর কারো মনে রইলো না।

অনেক কথাই আজ সমরেশের মনে হয়।

বিশেষ করে যে কথাটা মনে হয়, এমনি করে চলতে পারে না। এমনি করে নীতা দিনের পর দিন তার চোখের সামনে দিযে এক অনিবার্য পরিণতির দিকে এগিয়ে যাবে, সেটা যেমন দুঃখের তেমনি লজ্জারও কথা। না, নীতাকে এমনি করে সে অনিবার্য ধ্বংসের মুখে ছেড়ে দিতে পারে না।

নীতাকে আজ ফিরিয়ে আনার দায়িত্ব তাবই। কিন্তু কি করবে সে। সত্যিই ত ব্যবসা আর তার উন্নতি নিয়েই সে দিন রাত মত্ত হয়ে আছে। নীতার দিকে সত্যিই সে তেমন কবে তাকায়নি। মনঃস্থির করে সমবেশ। এবং সমরেশ তার পরদিন থেকেই তার প্রাত্যহিক ডিউটির রুটিন বদলে ফেললো। সকালবেলা বের হলেও নিয়মিত দ্বিপ্রহরে ঘণ্টা দেড়েকের জন্য বাড়িতে আসা, যত কাজই থাক সন্ধ্যার ভিতর অফিস থেকে গৃহে প্রত্যাবর্তন, স্ত্রীকে নিয়ে সিনেমা থিয়েটার, ক্লাবে যাওযা শুরু করল। কিন্তু তথাপি সমরেশ যেন লক্ষ্য কবে নীতার মধ্যে কোন প্রাণের সাড়া নেই।

সে স্বামীর সঙ্গে ঘুরছে গল্প করছে হাসছে—সবই করছে কিন্তু তবু যেন কোথায় দুজনের মধ্যে একটা বিরাট দূরত্বের ব্যবধান থেকে যায।

দুটো দেহ কাছাকাছি পাশাপাশি, তবু ওরা পরস্পব পরস্পর থেকে যেন দূরে কত দূরে।

আরো একটা ব্যাপার লক্ষ্য কবল সমবেশ, নীতা আজকাল আর ড্রিংক করে না বটে কিন্তু রাত্রি সাড়ে সাতটা আটটার পর থেকেই নীতা কেমন যেন ছটফট করতে থাকে।

বিশেষ করে যেদিন ওরা হয়ত বাড়িতে থাকে সেদিন বারে বারে উঠে যায় আসছি বলে।

কোথায় গিয়েছিলে? সমরেশ শুধায়।

একটা পান খেয়ে এলাম, নীতা জবাব দেয়। সত্যিই নীতা তখন পান চিবোচ্ছে।

সমরেশের একবারও মনে হয় না নীতা আগে কদাচিৎ কখনো পান খেতো কিন্তু এখন সন্ধ্যা হলেই বারে বারে গিয়ে পান খেয়ে আসে।

কিন্তু একদিন পান খাওয়ার রহস্যটা ধরা পড়ে গেল, বেশী দিন নীতা নিজেকে স্বামীর কাছ থেকে গোপন রাখতে পারলো না।

একদিন অমনি গল্প করতে করতে নীতা উঠে যেতেই সমরেশ তাকে অনুসরণ করে অলক্ষ্যে।

শোবার ঘরে ঢুকে নীতা দরজাটা ভেজিয়ে দেয়।

ভেজান দরজার ফাঁক দিয়ে সমরেশের নজরে সবই পড়ে, ড্রয়ার থেকে একটা বোতল বের করে ঢকঢক করে নির্জলা অনেকটা হুইস্কি নীতা গলায় ঢেলে দিল!

সহসা দরজাটা ঠেলে খুলে সমরেশ ঘরে এসে ঢোকে, নীতা—

কে, ও তুমি—

নীতা তখন পানের ডিবে থেকে পান একটা তুলে নিয়ে মুখে দিচ্ছে।

থমকে দাঁড়ায় নীতা।

সমরেশ বুঝতে পেরেছিল যে নেশা নীতা দীর্ঘদিন ধরে অভ্যাস করেছে এক কথাতেই সেটাকে বর্জন করানো যাবে না।

সমরেশকে ধৈর্য ধরতে হবে। একটু একটু করে বুঝিয়ে ওকে মদ্যপানটা ছাড়াতে হবে।

সমরেশ বলে, লুকিয়ে খাওয়ার তো প্রয়োজন নেই।

কি?

যা একটু আগে তুমি লুকিয়ে গলায় ঢাললে, রোজ ঢালো। আমার সামনে বসেই খেও, আমি কিছু মনে করবো না, কিন্তু অত খেয়ো না একটু কমাও, ও এমনি জিনিস, ক্রমে বেড়েই চলে।

না না, আমি ছেড়ে দেবো, নিশ্চয়ই ছেড়ে দেবো, আমাকে একটু সময় দাও।

আমি জানি তুমি ছেড়ে দেবে—

সমরেশ বুঝি কথাটা নীতাকে নিজের মনকে সান্ত্বনা দেওয়ার সুরেই বলে।

কিন্তু কেবল মদ্যপানই তো নয়—দীর্ঘ দিন ধরে ক্লাবে পার্টিতে সন্ধ্যা থেকে মধ্যরাত্রি পর্যন্ত এতদিন ধরে যে উচ্ছৃংখল জীবন যাপন করে এসেছে নীতা, সেই উত্তেজনাটা সে ভুলতে পারবে কেন, পারে না।

ভূতগ্রস্তের মত যেন সন্ধ্যা হলেই সেই দিকে তাকে টানতে থাকে।

নীতা গোপনতার আশ্রয় নিতে শুরু করে অতঃপর। সমরেশকে ফাঁকি দিতে শুরু করে।

সমরেশ হয়তো অফিস থেকে তাড়াতাড়ি ফিরে এসেছে, মনে মনে স্ত্রীকে নিয়ে সিনেমা বা থিয়েটারে, কোথায়ও যাবে বলে স্থির করে এসেছে, বলে নীতা বেডি হয়ে নাও বেরুব।

নীতা বলে, আজ ত বেরুতে পারব না তোমার সঙ্গে।

কেন!

আমার এক বান্ধবীর বাড়িতে যে নিমন্ত্রণ।

নিমন্ত্রণ !

হ্যাঁ, লক্ষ্মীটি, না গেলে সে অসন্তুষ্ট হবে।

কখন ফিরবে ?

বেশী রাত করব না।

নীতা সেজেগুজে বের হয়ে যায়।

তারপর ফেরে গভীর রাত্রে।

এমনি করে আজ এ বান্ধবী কাল অন্য বান্ধবীর বাড়িতে নিমন্ত্রণ বলে সন্ধ্যায় বের হয়ে গভীর রাত্রে ফিরতে শুরু করলো প্রায় প্রত্যহই নীতা।

সমরেশের মনে ক্রমশঃ সন্দেহ উঁকিঝুঁকি দিতে থাকে।

সমরেশ একদিন হঠাৎ গিয়ে একটা ক্লাবে রাত এগারটায় হাজির হয়, যা ভেবেছিল সে ঠিক তাই, একটি সুট পরিহিত যুবকের সঙ্গে আকণ্ঠ মদ্যপান করে বাজনার তালে তালে তাব বক্ষলগ্না হয়ে বলডান্স করছে নীতা।

সমরেশ এক পাশে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করতে থাকে।

ক্রমশঃ যেন নেশায় বেসামাল হয়ে পড়ছে নীতা।

একটু একটু করে ক্লাবের ভিড়ও তখন কমতে শুরু করেছে।

সমরেশ এগিযে গিয়ে নীতার হাত ধরে, মিসেস্ চক্রবর্তী ?

উঁ।

বাড়ি ফিরবেন না ?

বাড়ি ?

হুঁ।

কি হবে বাড়ি গিয়ে, কি আছে সেখানে, কিন্তু শৈবাল—শৈবাল কোথায় গেল ?

গাড়িতে অপেক্ষা করছে, চলুন।

গাড়িতে ?

হুঁ।

সমরেশ নীতাকে ধবে নিযে গিয়ে গাড়িতে তুলে গাড়িতে স্টার্ট দেয়।

আশ্চর্য, বাড়ির সিঁড়িতে পা দিয়েই কিন্তু নীতার নেশা যেন ছুটে যায়।

এতক্ষণ যে সমরেশ তার সঙ্গে সঙ্গে আছে, ক্লাব থেকে গাড়িতে করে সমরেশ তাকে বাড়িতে নিয়ে এসেছে নেশার ঘোবে জানতেও পারেনি নীতা।

সিঁড়িতে পা দিয়েই যেন জানতে পাবলো।

তুমি !

চল, উপবে চল।

না, আমি যাবো না। ক্লাবে ফিবে যাবো আবাব।

চল, উপরে চল, শান্ত গলায় সমবেশ বলে।

হঠাৎ যেন নীতা ঘুরে দাঁড়ায়, তুমি—তুমি আমাকে ক্লাব থেকে নিয়ে এসেছ ?

হ্যাঁ, চল উপরে।

কি জানি কেন, নীতা আর প্রতিবাদ জানায় না।

কোনমতে টলতে টলতে উপরে নিজের ঘরে এসে ঢুকে একটা সোফার উপর বসে পড়ে।

আবাব বসলে কেন, অনেক বাত হযেছে, চল জামা কাপড় বদলে শোবে চল।

না।

শোবে না?

না, না, কেন তুমি ক্লাবে গিযেছিলে, কেন আমাকে নিয়ে এলে?

সমবেশ কোন জবাব দেয না।

জামা কাপড় বদলাবার জন্য অ্যাল্টি-বুমে গিয়ে ঢোকে। এবং একটু পরে ড্রেসিং গাউনটা গায়ে জড়াতে জড়াতে ঘরে ফিবে এসে দেখে নীতা টলতে টলতে উঠে গিয়ে কাবার্ড থেকে মদেব বোতলটা বের কবে গ্লাসে ঢালছে।

সামনে এসে দাঁড়ালো সমবেশ এবং স্ত্রীব হাত থেকে শিশিটা ছিনিয়ে নেবাব চেষ্টা কবতে কবতে বলে, না—you had enough—আর ড্রিংক করতে পারবে না তুমি।

খাবে—give back—বোতলটা দাও।

না।

Wi at do you mean—দেবে না তুমি?

না।

দাও বলছি ভাল চাও তো।

না।

দেবে না, তুমি দেবে না—

বলতে বলতে হঠাৎ যেন একটা অন্ধ আক্রোশে নীতা স্বামীব উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে—আঁচড়ে কামড়ে সমরেশকে বিব্রত করে তোলে।

হিস্টিরিক রোগিণীর মত চেঁচাতে থাকে, দেবে না, তুমি দেবে না?

সমরেশ হঠাৎ নীতার গালে ঠাস করে একটা চড় বসিযে দেয়।

চড়টা খেয়েই যেন হঠাৎ মুহূর্তের জন্য থমকে যায় নীতা। তারপরই রুদ্ধকণ্ঠে তীক্ষ্ণ চীৎকার করে ওঠে, You ব্রুট্। তুমি, তুমি আমাকে মারলে!

মেরেছি বেশ করেছি, প্রয়োজন হলে আরো মারবো।

মারবে—তুমি আমাকে মারবে?

হ্যাঁ মাববো। লজ্জা করে না একজন ভদ্র গৃহস্থ ঘরের বৌ হয়ে একটা বাজারের মেয়েমানুষের মত ক্লাবে গিয়ে রোজ আকণ্ঠ মদ গিলে পরপুরুষের গলা ধরে নাচতে সারাটা রাত ধরে।

Shut up! বাজাবের মেযেমানুষ আমি, না? আর তুমি কি, স্ত্রীর অবর্তমানে তার ছোট বোনকে নিয়ে গোপন প্রেমের খেলা খেলতে যার এতটুকু লজ্জা বোধ হয় না।

নীতা—

হ্যাঁ হ্যাঁ, ভাবো আমি একেবারে বোকা, তাই না? রীতা চলে গিয়েছে, নিরুদ্দেশ হয়ে গিয়েছে, তাই না? তুমি, তুমিই তাকে কোথায় লুকিয়ে রেখেছো। সব, সব জানি আমি। মুখ বুজে আছি কাউকে কিছু বলিনি।

বিস্ময়ে আকস্মিকতায় সমরেশ যেন একেবারে বোবা হয়ে গিয়েছে।

তুমি আবার ভদ্রতার বড়াই করে, সংযমের বড়াই করো, নীতা আর থামে না, কণ্ঠ হতে তিক্ততম বিষ উদ্গিরণ করে চলে, হোটলোক, নীচ, ইতর, চরিত্রহীন।

সমরেশ আর স্ত্রীর সামনে দাঁড়াতে পারে না।

সে ধীরে ধীরে ঘর থেকে বের হয়ে যায়। আর নীতা তখন শয্যার উপর উপুড় হয়ে পড়ে ফুলে ফুলে কাঁদতে থাকে।

সমরেশ পাশের ঘরে এসে ঢুকলো।

নীতার মনটা এত ছোট কোনদিন হয়ে যেতে পারে, সে যে এতখানি নীচে কোনদিন নামতে পারে এ বুঝি সত্যিই সমরেশের চিন্তারও অতীত ছিল।

বাকী রাতটুকু সমরেশ ঘরের মধ্যে চুপচাপ একটা সোফার 'পরে বসে থাকে। আর সেই রাত্রির পর থেকেই সমরেশ যেন ক্রমশঃ নীতার কাছ থেকে দূরে সরে যায়। পৃথক ঘরে শয়নের ব্যবস্থা করে।

দুজনার মধ্যে কথাবার্তাও একপ্রকার বন্ধ হয়ে যায়।

ফলে যেটুকু দ্বিধা ও লজ্জার অবশিষ্ট ছিল তাও যেন আর থাকে না।

নীতা যেন আরো উচ্ছৃংখল হয়ে উঠতে থাকে ক্রমশঃ।

প্রত্যহ রাত্রে আকণ্ঠ মদ্যপান করে টলতে টলতে গৃহে ফেরে।

সমরেশও সেই সকালে বাড়ি থেকে বের হয়ে যায় এবং অনেক রাত্রে বাড়ি ফিরে নিজের ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দেয়।

দীর্ঘ দিনের পুরাতন দাসী সুখদা প্রথম প্রথম সমরেশ ও নীতার ব্যাপারটা দু'দিনের মান অভিমান ভেবেছিল কিন্তু যখন সে দেখতে লাগলো প্রত্যহ নীতা আকণ্ঠ মদ্যপান করে মধ্যরাত্রে ফিরতে লাগলো, সমরেশও এক মুহূর্তের জন্য বাড়ি থাকে না, দুজনে একঘরে শোয় না, কেউ কারো সঙ্গে কথা বলে না তখন সে একদিন নীতার সামনে এসে দাঁড়ালো।

বড়দিমণি?

নীতা বেরুবার জন্য ড্রেসিং টেবিলের সামনে বসে প্রসাধন করছিল—

লিপস্টিকটা ঠোঁটের উপর বোলাতে বোলাতে সাড়া দেয়, কি রে?

একটা কথা ত আর না বলে পারছি না।

নীতা মুখ ঘোরাল। কি!

অনেক দিন এ বাড়িতে আছি অনেক নুন খেয়েছি তোমাদের তাই এসব দেখতে দেখতে যেন আমার দম বন্ধ হয়ে আসছে।

তার মানে!

তোমরা এসব কি শুরু করেছো বল তো!

কেন, কি হলো আবার?

না না, এসব ভাল না।

কি, ভাল না কি? সুখদার মুখের দিকে তাকালো নীতা।

নিন্দার যে কান পাতা যাচ্ছে না। পুরুষের দোষ কেউ দেখে না কিন্তু এই যে তুমি মেয়ে হয়ে রোজ রাত্রে একগলা মদ গিলে বাড়ি ফিরছো—

সুখদার কথা শেষ হলো না হঠাৎ চীৎকার করে ডেকে ওঠে, সুখদা, তুই ঝি, ঝির মতই থাকবি। না পারবি তো চলে যা।

এইভাবে যদি চলতে থাকে চলে যেতেই হবে। আর একা আমি কেন সবাই চলে যাবে।

যা যা, সবাই চলে যা। ভাত ছড়ালে আবার কাকের অভাব নাকি।

তা তো নিশ্চয়ই বড়দিমণি, বড়লোক তোমরা, টাকা আছে তোমাদের কিন্তু এর পরে দেখো রাস্তায় বেরুলে তোমার গায়ে সবাই থুতু দেবে।

যা যা, বেরো, বেরো বলছি আমার সামনে থেকে, উচ্চকণ্ঠে চীৎকার করে ওঠে নীতা।

আর ঠিক সেই মুহূর্তে দরজার বাইরে শৈবাল সেনের গলা শোনা যায়।

মিসেস্ চক্রবর্তী?

কে, শৈবাল, এসো এসো।

শৈবাল এসে ঘরে ঢুকলো।

সুখদা সেদিন রীতিমত ক্ষেপে গিয়েছিল, সে অগ্নিদৃষ্টিতে শৈবালের দিকে তাকিয়ে বলে, তুমি কেমন ভদ্রঘরের ছেলে বাপু, গৃহস্থের একটা বৌকে—

নীতা যেন অকস্মাৎ হিতাহিতজ্ঞান হারায়, সে সুখদার গালে প্রচণ্ড একটা চড় বসিয়ে দিয়ে বলে ওঠে, যত বড় মুখ নয় তত বড় কথা, বেরো, বেরো এই মুহূর্তে আমার বাড়ি থেকে।

নীতা যে শেষ পর্যন্ত তাকে মারতে পারে সুখদা বুঝি সত্যিই স্বপ্নেও ভাবেনি।

দুই বোনের বয়স যখন আট কি নয়, ওদের মা মারা গেল তারই কিছুদিন আগে ঐ বাড়িতে চাকরি নিয়ে এসেছিল সুখদা।

তার পর থেকে দুটি বোনকে নিজের সন্তানের মতই দেখেছে।

সুখদা ঘর থেকে বের হয়ে গেল।

শৈবাল বলে, Impertinent! কে এই মেয়েমানুষটা?

ঝি, নীতা বলে।

কি আস্পর্ধা, you must sack her immediately নীতা।

তাই করবো, কালই ওকে মাইনে দিয়ে বিদায় করে দেবো।

একটু পরে নীতা সেজেগুজে শৈবালের গাড়িতে করে বের হয়ে গেল।

সেই রাত্রেই সমরেশ গৃহে ফিরলে সুখদা তার সামনে এসে দাঁড়ালো।

দাদাবাবু ?

কি সুখদা।

আমি কাল চলে যাচ্ছি দাদাবাবু।

চলে যাবে, কেন ?

না, এ বাড়িতে আমি আর একটা মুহূর্তও টিকতে পারছি না।

সমরেশ কোন কথা বলে না, চুপ করে থাকে।

কিন্তু দাদাবাবু এভাবে চলো না, চোখে কি দেখতে পাও না দিন দিন বড়দিমণি কোন্ অধঃপাতে নেমে যাচ্ছে। হাজার হোক তোমার বিয়ে করা বৌ না সে, লোকে যে তোমারই দোষ দেবে।

তা আমি কি করবো ?

কি করবে মানে, ওকে তোমাকেই ফেরাতে হবে, ছিঃ ছিঃ বাড়ির বৌ মাঝরাতে রোজ মাতাল হয়ে বাড়ি ফিরছে।

আমি আর ওর মধ্যে নেই সুখদা ! যা খুশি ওর করুক !

যা খুশি ওর করুক। কি বলছো তুমি দাদাবাবু, তুমি না তার সোয়ামী, সে না তোমার স্ত্রী। আর কিছু না পারো জোর করে ঘরে বন্ধ করে রাখ।

তা তুমিও তো ওকে বলতে পারো।

বলেছিলাম।

তা কি বললে।

মেরে ঘর থেকে বের করে দিয়েছে।

তোমাকে মেরেছে, নীতা !

হ্যাঁ, ওর কি আর মাথার ঠিক আছে। কথাগুলো বলে সুখদা কাঁদতে থাকে। বলে, দুটি বোন যখন আট বছরের এ বাড়িতে এসেছিলাম। কিন্তু আর না, এসব আর চোখে দেখতে পারছি না। কালই আমি চলে যাবো।

সুখদা ঘর থেকে বের হয়ে গেল।

সমরেশের মনে হয় সুখদা হয়তো মিথ্যা বলেনি। সত্যিই হয়তো তার সব ছেড়ে দিয়ে এমনি করে আলগা হয়ে থাকা উচিত হয়নি।

নীতা তার বিবাহিতা স্ত্রী। সমরেশ যতই কথাটা ভাবে ততই যেন নিজেকে নিজের কাছে অপরাধী মনে হতে থাকে।

মনে হয় নীতার আজকের এই অবস্থার জন্য সেও দায়ী।

তার অবহেলা—তার অভিমান অনেকটা দায়ী।

পরের দিন সত্যিই সুখদা চলে গেল।

ঘুম ভাঙার পর নীতা সুখদা সুখদা করে ডাকছিল, নতুন ঝি নেত্য সামনে এসে দাঁড়ালো।

ডাকছিলে দিদিমণি ?

হ্যাঁ, কিন্তু তুই কেন, সুখদা কোথায় ?

সে চলে গিয়েছে।

চলে গিয়েছে, কোথায় ?

তা তো জানি না, শুনলাম সে চাকরি ছেড়ে দিয়ে চলে গিয়েছে।

চাকরি ছেড়ে চলে গিয়েছে, কে, কে তাকে যেতে দিল ?

তা তো জানি না, তবে সে চলে গেল।

নিমকহারাম, সব নিমকহারাম, নীতা চেঁচাতে থাকে।

আর সেই দিন দ্বিপ্রহরে চিঠিটা এলো অপ্রত্যাশিত। এবং চিঠিটা পেয়ে পড়বার পর আগাগোড়া বার বার দুবার নীতা হঠাৎ যেন কেমন স্তব্ধ হয়ে গেল। সেদিন সন্ধ্যায় সে দীর্ঘকাল পরে এই প্রথম বাড়ি থেকে বেরুলো না।

দিদিমণি—

একি—এ কার চিঠি। তাড়াতাড়ি উল্টে পাল্টি দেখে—হ্যাঁ রীতা, রীতারই চিঠি। রীতার নামই লেখা আছে চিঠির শেষে স্পষ্ট। ভুল করবার কোন কারণ সেই।

রীতা, রীতা তাহলে আজো বেঁচে আছে। কিন্তু কোথা থেকে চিঠি লিখেছে, আগ্রা।

রীতা তাহলে এতদিন আগ্রাতেই ছিল।

দিদিমণি, এই নামেই আজ তোমাকে সম্বোধন করলাম। জানি তুমি ও জামাইবাবু খুব অবাক হয়ে যাবে দীর্ঘ প্রায় ছয় বছর পরে এই চিঠিটা পেয়ে আমার। সেদিন রাত্রে চলে এসেছিলাম কোনদিনই আর তোমাদের সামনে এসে দাঁড়াবো না মনে মনে প্রতিজ্ঞা করে, সে প্রতিজ্ঞা আমি রেখেছি, তবে হয়তো বলবে এ চিঠিই বা কেন, এ চিঠিও কোনদিনই হয়তো লিখতাম না, কিন্তু না লিখে পারলাম না কারণ আজ তোমরা ছাড়া আমার ছেলে খোকন—রাহুলের তো এ দুনিয়ায় সত্যিকারের আপনার জন আর কেউ থাকলো না।

নিশ্চয়ই আমার মত অভিশাপ তোমাদের সংসার থেকে চলে আসবার পর সংসারে তোমাদের শান্তি এসেছে। তোমরা নিশ্চিন্ত হয়েছো।

তোমরা নিশ্চয়ই সুখে আছো।

হয়তো এতদিনে, এই দীর্ঘ প্রায় ছয় বছরে তোমাদের দু'একটি সন্তানও হয়েছে। আমার সন্তানটিকে যদি তোমরা গ্রহণ করে তাদের মধ্যে একটু স্থান দিয়ে তাকে বাঁচতে দাও, সে চিরকৃতজ্ঞ তো থাকবেই, তার অভাগিনী মাও পরলোকে বসে নিশ্চিন্ত হতে পারবে।

হ্যাঁ, এ চিঠি যখন তোমাদেব হাতে পৌঁছাবে তখন আর রীতা নামের কেউ এ পৃথিবীতে থাকবে না।

রীতা থাকল বা গেল এ পৃথিবীতে তাতে কার কি।

যাক সে কথা। রীতার জন্যে এ পৃথিবীতে কেই বা আর দু'ফোঁটা চোখের জল ফেলবে! সে সৌভাগ্য তো সে এ জীবনে করে আসেনি। জন্মলগ্নেই সে অভিশাপ নিয়ে এসেছে।

যাক, রীতার কিথাও তোমাদের বলতে বসিনি, ভিক্ষা চাইতে এসেছে রীতা তার অভাগা সন্তানটির জন্যে।

রাহুল আমার সন্তান কিন্তু তাহলেও রাহুলের কথাটা তোমাদের কাছে অকপটে বলতে হবে বৈকি।

একটি নারীর মা হওয়ার ইতিহাস তো তার একার দ্বারাই রচিত হয় না, হতে পারে না।

সেখানে যে আর একজনের কথাও আছে। একটি পুরুষের কথা, মায়ের সন্তান যার ঔরসজাত।

আর সেই আমার স্বামী, রাহুলের জনক। কিন্তু দুর্ভাগ্য আমার তাকে এনে তোমাদের সামনে দাঁড় করাবার উপায় আমার নেই।

বিবাহের পর একটি—মাত্র একটি রাত্রির জন্যই স্বামীকে আমার আমি পেয়েছিলাম, একটি নিশিরাত্রের বধূ আমি, ভোরও হলো না রাত্রি, স্বামী আমার ত্যাগ করে চলে গেল চিরদিনের মত ন্যাগালের বাইরে।

আমার সঙ্গে তার সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করে।

স্বামীর সঙ্গে আমার জীবনের প্রথম ও শেষ রাত্রি। আর এও জানি এ জীবনে আর কোন দিন তার সঙ্গে আমার দেখা হওয়ার কোন আশা নেই। হবেও না।

দুঃখ আমার সেজন্য যতই থাক না কেন ভাগ্যবিধাতার কাছে কোনদিন সেজন্য আমি কোন নালিশ জানাইনি আজ পর্যন্ত, জানাবও না যদিও আজ বার বার মনে হচ্ছে রাহুলের জন্মদাতা পিতা (যদিও সে জানে না সেই রাত্রেই রাহুল আমার গর্ভে এসেছিল) এমনি করে মুখ ফিরিয়ে না চলে যেতো তোমাদের কাছে হয়তো রাহুলের মার ভিক্ষার ঝুলি নিয়ে এসে আজ এমনি করে মাথা নীচু করে দাঁড়াতে হতো না।

তবু রাহুলের জন্মের মধ্যে যে কোন পাপ নেই একমাত্র তার মা বললেই তো হবে না, (যদিও একমাত্র মা-ই জানে কে তার গর্ভের সন্তানের জনক) অনেক সাক্ষীসাবুদের যে প্রয়োজন।

অনেক নেই তবে একজনকে রেখে গেলাম, যার হাতে রাহুলকে রেখে গেলাম তার কাছেই জানতে পারবে রাহুলের মা দ্বিচারিণী নয়, কায়মনো-বাক্যে সে চিরদিন তার স্বামীকেই জেনেছে যে স্বামী তার সন্তান রাহুলের জনক।

আর কিছু লিখবার নেই।

একদা তুমি আমি অবিভাজ্য ছিলাম, এক মন এক চিন্তা, পৃথক দুটি দেহ হলেও দুটি পৃথক মন নয়, একটিই মন, সেই দাবীতেই এই ভিক্ষাটুকু আমার সন্তানের জন্যে চিরবিদায়ের আগে রেখে গেলাম এই পত্র মারফত।

ইতি—তোমাদের রীতা।

কেবল নীতাই নয় ঠিক ঐ দিনই দ্বিপ্রহরের ডাকে অফিসের ঠিকানায় সমরেশও একটি পত্র পেলো।

অফিস সংক্রান্ত অনেক চিঠিপত্রের সঙ্গে ঐ পত্রটিও ছিল।

তাই চিঠিটা খুলে হঠাৎ বাংলা লেখা দেখে একটু অবাক হলেও চিঠির গোড়াতে সম্ভাষণটি দেখে সত্যিই সে যেন হঠাৎ কেমন স্তব্ধ হয়ে যায়।

কি এক বোবা বিস্ময়ে যেন চিঠির সম্ভাষণটির দিকে অনেকক্ষণ তাকিয়ে থাকে নিঃশব্দে, পাথর হয়ে।

শিথিল মনের পাতায় যেন অনেকদিন আগেকার একটা মুখ ভেসে ওঠে।

তাড়াতাড়ি তাই বুঝি সন্দেহ নিরসনের জন্য পত্রের নীচে স্বাক্ষরিত নামটির দিকে তাকায়।

হ্যাঁ, ভুল নয়। ভুল হয়নি তার।

পত্রপ্রেরিকা আর কেউ নয়। রীতাই।

রীতা লিখেছে।

স্বামী আমার -

রাগ করো না আজ আর, শেষবারের মত তোমাকে স্বামী বলে সম্বোধন করছি বলে। সে রাত্রে আমি সবই তোমাকে বলেছিলাম অকপটে। কোন কিছুই গোপন করিনি।

ভেবেছিলাম জীবনে আর কোন দিন নির্লজ্জের মত তোমার সামনে এসে দাঁড়াবো না। কিন্তু সে প্রতিজ্ঞা আমি রাখতে পারলাম না কারণ সে রাত্রেই রাহুল—আমার সন্তান আমার গর্ভে আসে।

প্রথম যেদিন জানতে পারলাম রাহুল আমার গর্ভে এসেছে সেদিন সত্যিই আনন্দের আমার সীমা ছিল না। কারণ এই কথাটাই সর্বপ্রথম আমার মনে হয়েছিল তুমি আমায় ত্যাগ করলেও, তোমাকে না পেলেও তোমার সন্তানকে তো গর্ভে ধরেছি।

তোমার সন্তানের জননী হয়েছি।

সীতাকে রামচন্দ্র গর্ভে যখন তার লব কুশ বর্জন করেছিলেন, এবং সীতার সেদিন একমাত্র সান্ত্বনা ছিল স্বামী তাকে বর্জন করলেও তিনি তার দেহের রক্তে রক্তে ছড়িয়ে আছেন।

আমারও সান্ত্বনা তাই ছিল।

ভাগ্যবিধাতাকে বারংবার ধন্যবাদ জানিয়েছি আর বলেছি, বিধাতা, আমার কোন দুঃখ নেই, কোন দুঃখ নেই।

কিন্তু সে সান্ত্বনাটুকু আমার আজ ভেঙে গিয়েছে রাহুলের ভবিষ্যৎ ভেবে।

পৃথিবীতে এসে সে তার পিতৃপরিচয় পাবে না, তা কেন হবে! তার তো কোন অপরাধ নেই।

তুমি আমাকে বর্জন করো কিন্তু তোমার সন্তানকে কেন তুমি বর্জন করবে! সে যত বড় হয়েছে ঐ কথাটাই অনুক্ষণ ভেবেছি আর মনে হয়েছে নিশ্চয়ই তুমি তোমার সন্তানকে গ্রহণ করবে। তাই আজ এই পত্র তোমাকে দিচ্ছি।

এ পত্র যখন তোমার হাতে পৌঁছাবে তখন রাহুলের পাশে তার মা আর থাকবে না।

এখানে এসে তুমি তোমার সন্তানকে নিয়ে যেও।

তাকে তার সত্যকার আশ্রয়ে সত্যিকারের পরিচয়ে প্রতিষ্ঠিত করো : এই চিঠির ঠিকানায় এলেই তুমি রাহুলকে পাবে।

রাহুলও জানে তুমিই তার বাপ।

তুমি আসবে—মন বলছে আমার আসবে তুমি। রাহুল নিরাশ্রয় হবে না।

প্রণাম নিও। তোমার পরিত্যক্তা স্ত্রী—রীতা।

বার বার চারবার চিঠিটা আগাগোড়া পড়লো সমরেশ।

আর যতবারই পড়ে চিঠিটা মনের মধ্যে যেন একটি ছোট্ট শিশুর কচি মুখ ভেসে ওঠে। যে তারই রক্তের স্বাক্ষর বহন করে এ পৃথিবীতে এসেছে। যে তার কেবল পরিচয় নয়, উত্তর পুরুষের স্বীকৃতি। তার বংশের ধারাকে বহন করে চলেছে। তাকে সে অস্বীকার আজ করবে কেমন করে। কোন যুক্তিতে—রাহুল, রাহুল শুধু রাহুলই নয়, এই পৃথিবীর অসংখ্য শিশুর মধ্যে একটি নয়—সমরেশের মনে হয়, রাহুল তার সন্তান—তারই ঔরসজাত সন্তান।

আজ কেন জানি রীতাকে সে ঘৃণা করতে পারছে না।

কোন রাগ বা বিতৃষ্ণাও মনের মাঝে তার কোথাও এতটুকু দেখা দেয় না।

আশ্চর্য! সত্যিই আশ্চর্য! কেন এমনটা হলো কে জানে!

যত সমরেশ রাহুলের কথা চিন্তা করে ততই যেন অবচেতন মনের কোণায় কি এক অজ্ঞাত দুর্নিবার আকর্ষণে রাহুল কেবলই তাকে টানতে থাকে।

মনের মধ্যে অদ্ভুত একটা তৃষ্ণা আকুলি-বিকুলি করতে থাকে।

কে জানে এ সেই তৃষ্ণা কি না যা প্রত্যেক পুরুষই তার সৃষ্টির মধ্যে দিয়ে অনুভব করে।

যে তৃষ্ণা প্রত্যেক পুরুষকেই জগতে প্রতিষ্ঠিত করতে চায় তার নিজের সৃষ্টির মধ্যে দিয়ে।

ভাবতে ভাবতেই কথাটা এক সময় মনে হয় রাহুল, কেমন হয়েছে রাহুল দেখতে?

তার মতই কি?

না রীতার মত?

সত্যি কি অদ্ভুত যোগাযোগ! কি বিস্ময়কর ঘটনা!

চিঠিটা হাতে করে বসে থাকে সমরেশ অনেকক্ষণ।

কাজকর্ম সব ভুলে যায়।

কেবল একটি পাঁচ বছরের শিশু তার চোখের সামনে নানা আকারে ফুটে উঠতে থাকে।

সে যাবে, নিশ্চয়ই যাবে। নিশ্চয়ই গিয়ে রাহুলকে নিয়ে আসবে। কিন্তু পরক্ষণেই যে চিন্তাটা মনের মধ্যে এসে উঁকি দেয়—

কেমন করে তা সম্ভব!

কি বলবে সে রীতাকে।

কেমন করে সে কোন্ পরিচয়ে গিয়ে রাহুলকে নীতার সামনে এনে দাঁড় করাবে ?

সে যখন প্রশ্ন করবে, কে এ ? কোথা থেকে আনলে একে ?

কি বলবে তখন সমরেশ নীতাকে ? কি জবাব দেবে তাকে ?

বেলা চারটের সময় ক্লার্ক একগোছা কাগজ নিয়ে এলো সই করাবার জন্য।

কি এগুলো ?

এগুলো সই করে দিতে হবে স্যার।

রেখে যান।

ক্লার্ক চলে গেল।

একে একে অফিসের সবাই চলে গেল, সমরেশ তার ঘরেই বসে থাকে।

ক্রমে সন্ধ্যা হয়।

রাত্রি আটটা। বেয়ারা এসে সামনে দাঁড়ালো।

কি রে ?

বাড়ি যাবেন না হুজুর ?

বাড়ি, হ্যাঁ।

হঠাৎ নজরে পড়ে দেওয়াল ঘড়িতে রাত আটটা।

সমরেশ তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়ালো।

চিঠিটা অফিসের ডেস্কে বন্ধ করে রেখে অফিসঘর থেকে বের হয়ে এলো !

॥ আট ॥

রাত সাড়ে আটটা নাগাদ সমরেশ গৃহে ফিরে এলো।

সিঁড়ি দিয়ে দোতলায় উঠতেই নজরে পড়ে নীতার ঘরের দরজা খোলা, আলো এসে পড়েছে ঘর থেকে বারান্দায় দরজার বাইরে।

কি ব্যাপার ? নীতা কি আজ বের হয়নি নাকি !

নীতা রাত্রে ক্লাবে যায়নি গত কয়েক বছর তো এমনটা কখনো ঘটেনি কোন রাত্রে।

তবে কি নীতা অসুস্থ !

সুখদা নেই। চলে গিয়েছে।

ঘরে ঢুকতেই ভৃত্য রামচরণ এসে সামনে দাঁড়ালো, চা দেবো হুজুর ?

চা !

হ্যাঁ।

নিয়ে এসো।

রামচরণ বের হয়ে যাচ্ছিলো সমরেশ তাকে ডাকে, রামচরণ ?

হুজুর ?

রামচরণ ফিরে দাঁড়াল।

মেমসাহেব কি আজ বের হননি ?

না তো !

কি করছেন মেমসাহেব ?

সোফায় বসে আছেন।

সুখদা হলে হয়তো জিজ্ঞাসা করা যেত কেন মেমসাহেব বের হয়নি, কোন রকম অসুখ-বিসুখ করেছে কি না।

কিন্তু রামচরণকে সে কথা জিজ্ঞাসা করা যায় না।

রামচরণ তার জবাবও দিতে পারবে না।

এ বাড়িতে একমাত্র সুখদা ছাড়া আর সব দাস দাসীই নীতাকে যমের মত ভয় করে, না ডাকলে সামনে যাবারও সাহস নেই কারো।

মেমসাহেব চা খেয়েছেন ?

সমরেশ আবার জিজ্ঞাসা করে।

না।

ও, আচ্ছা তুই যা।

রামচরণ চলে গেল।

আরো ঘণ্টাখানেক পরে সমরেশ তখনো অফিসের জামা কাপড় ছাড়েনি, চা পান করে জানালার সামনে দাঁড়িয়ে একটা সিগ্রেট ধরিয়ে জানালার বাইরে অন্ধকারের দিকে অন্যমনে তাকিয়ে মধ্যে মধ্যে সিগ্রেটটায় টান দিচ্ছিলো।

ঘরের মধ্যে পদশব্দ পাওয়া গেল।

কে, রামচরণ ?

কিন্তু ফিরে তাকাতেই বিস্ময়ের যেন অবধি থাকে না সমরেশের।

রামচরণ নয়, নীতা, তার স্ত্রী।

নীতা।

নীতা এসে ঘরের মধ্যে দাঁড়িয়েছে।

দীর্ঘ দুই মাস পরে নীতা স্বেচ্ছায় তার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু একি নীতার চেহারা, একি বেশ! চুল বাঁধেনি, কোনরকমের প্রসাধন পর্যন্ত করেনি।

এমন কি শাড়িটা পর্যন্ত বদলায়নি। সাধারণ একটা শাড়ি পরনে।

কয়েকটা মুহূর্ত নিঃশব্দে পরস্পর পরস্পরের দিকে নির্নিমেষে চেয়ে থাকে নীতা ও সমরেশ।

স্বামী স্ত্রী।

কথা বলে প্রথমে সমরেশই, এসো নীতা।

নীতা সমরেশের আরো কাছে এগিয়ে এলো।

কিছু বলবে ?

না।

সমরেশ কিছুক্ষণ অতঃপর চুপ করে থাকে তারপর আবার প্রশ্ন করে।

শরীর খারাপ নাকি ?

না।

বের হওনি যে !

নীতা সমরেশের সে কথার জবাব না দিয়ে দুপুরের ডাকে পাওয়া রীতার চিঠিটা নিঃশব্দে এগিয়ে দেয়।

কি এটা ?

চিঠি।

কার ?

রীতার।

রীতার চিঠি! ধক করে ওঠে সমরেশের বুকটার মধ্যে হঠাৎ। সর্বনাশ!

তবে কি রীতা নীতাকেও সব চিঠিতে জানিয়েছে নাকি!

সমরেশ হাত বাড়িয়ে যে স্ত্রীর হাত থেকে চিঠিটা নেবে তাও পারে না।

সে যেন পাথর হয়ে গিয়েছে।

নাও, ধরো, পড়ে দেখো।

নীতা চিঠিটা স্বামীর দিকে এগিয়ে ধরে আবার বলে।

গলা শুকিয়ে তখন কাঠ হয়ে গিয়েছে সমরেশের।

শব্দ যেন গলা দিয়ে বেরুতেই চায় না।

কোনমতে একটা ঢোক গিলে শুকনো গলায় জিজ্ঞাসা করে, রীতার চিঠি!

হ্যাঁ।

কি লিখেছে ?

পড়ে দ্যাখো।

অবশ হাতে যেন চিঠিটা নেয় সমরেশ স্ত্রীর হাত থেকে।

চিঠিটা ধরেই দাঁড়িয়ে থাকে কিছুক্ষণ।

কি হলো পড়ো।

আলোর সামনে চিঠিটা তুলে ধরে সমরেশ।

পড়বে আর কি নতুন করে। সে তো জানেই কি লিখেছে রীতা তার বোনকে।

তবু পড়ে। এবং পড়তে পড়তে যেন একটা হাঁপ ছেড়ে বাঁচে, আঃ রীতা তাকে বাঁচিয়েছে!

তার সম্পর্কে কোন কথাই লেখেনি নীতার চিঠিতে।

লিখলে কি নীতা বিশ্বাস করতো তাকে।

একে তো চিরদিন তাকে সন্দেহই করে এসেছে মনে মনে, রীতা সত্যি কথাটা লিখলে ভাবতো তার সন্দেহই সত্যি, মিথ্যে নয়, কিন্তু রীতা কৌশলে তাকে বাঁচিয়েছে।

নচেৎ এমনটা হয় নাকি!

আর সেটা বিশ্বাসযোগ্যই নাকি। কেউ বিশ্বাস করে না করতে পারে।

স্পষ্টই বলতো হয়তো, ঐ জন্যই রীতা অমন করে নিরুদ্দিষ্টা হয়ে গিয়েছিল লজ্জায় অপমানে ঘৃণায়।

কিন্তু না, রীতা কোন কথাই সেরাত্রের চিঠির মধ্যে কোথাও নীতাকে লেখেনি।

অসীম একটা কৃতজ্ঞতায় যেন সমরেশের বুকটা ভরে ওঠে রীতার প্রতি।

হঠাৎ নীতার প্রশ্নে চমকে ওঠে সমরেশ।

তোমার কি মনে হয়?

কি, কিসের কি মনে হয়?

রীতা, রীতা বোধহয় আর নেই।

নেই!

তাছাড়া কি, চিঠি পড়েই তো বোঝা যায় সে আত্মহত্যা করেছে।

আত্মহত্যা!

তাই, নিশ্চয়ই তাই। কিন্তু কি বোকা, একটিবার সব কথা আমাদের জানাতে এতদিন কি হয়েছিল। আমরা কি তাকে ভুল বুঝতাম না ফেলে দিতাম, তাড়িয়ে দিতাম। আচ্ছা—

কি?

সমরেশ সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে স্ত্রীর মুখের দিকে তাকালো।

ঐ ডাঃ সুনীল চৌধুরী আগ্রার তোমার সেই বন্ধু না, যার সঙ্গে তুমি রীতার একবার বিয়ের চেষ্টা করেছিলে?

মনে হচ্ছে সেই।

তারপরই দুজনে কিছুক্ষণ চুপচাপ। কারো মুখে কোন কথা নেই।

অথচ দুজনার মনের মধ্যেই তখন ঐ একটা প্রশ্নই আবর্তিত হচ্ছিলো কেবল।

সে প্রশ্নটা হচ্ছে রীতার সন্তান রাহুল।

দুজনাই হয়তো চাইছিলো মনে মনে ওই আগে প্রশ্নটা তুলুক। এতদিন পরে নিরুদ্দিষ্টা রীতার সংবাদটাও নয়, সুনীলের ওখানে এতদিন গিয়ে রীতার থাকার ব্যাপারটাও নয়, প্রশ্নটা রীতার সন্তান রাহুলকে ঘিরে।

নীতাই প্রথমে যেন কিছুটা ইতস্ততঃ করে কথাটা তোলে, দ্যাখো, একটা কথা বলছিলাম।

কি?

ব্যাপারটার সত্যিই একটা খোঁজ নেওয়া দরকার।

নেওয়াই বোধহয় উচিত।

সমরেশের কণ্ঠস্বরে কোথায় যেন একটা ইতস্ততঃর ভাব। মনটা তখনো তার সম্পূর্ণ সংশয়-মুক্ত হতে পারছে না।

সুনীলকে রীতা কি বলেছে? তার সম্পর্কে কতটুকু বলেছে? সুনীল ব্যাপারটার কতটুকু জানে? সেটুকুও জানা আবশ্যক।

কথাটাই বার বার মনের মধ্যে আসা যাওয়া করতে থাকে সমরেশের।

সেখানে গিয়ে সুনীলের সামনে দাঁড়ালে কোন্ প্রশ্নটার সম্মুখীন হয়ে দাঁড়াতে হবে তাকে?

কিন্তু আবার এও মনে হয় রীতা হয়তো কিছুই বলেনি সুনীলকে রাহুলের জন্মদাতা সম্পর্কে নচেৎ সে কি অন্ততঃ তার বোনের চিঠির মধ্যে স্পষ্ট করে কিছু লিখতো না!

নীতা আবার বলে, বলছিলাম কি তুমি বরং কালই চলে যাও আগ্রায়।

চলে যাবো ?

হ্যাঁ, যদি সত্যিই হয় ব্যাপারটা। ছেলেটাকে আর দেখবে কে ? পৃথিবীতে একমাত্র আপনারজন বলে যে মাকে ও জানতো সেও আর পাশে রইলো না। সুনীলবাবু কে, কি সম্পর্ক তার সঙ্গে রাহুলের ? সুনীলবাবু ঐ দায়িত্ব নিজের কাঁধে নিতেই বা যাবেন কেন ?

তাহলে কালই যাই আগ্রায়।

হ্যাঁ যাও, আর তেমন যদি বোঝ ছেলেটাকে নিয়েই এসো সঙ্গে করে। আমরা ছাড়া তো আজ ছেলেটার সত্যিই কেউ নেই।

সে রাত্রে দীর্ঘ দুইমাস পরে স্বামী স্ত্রীর মধ্যে এতদিন যে বিচ্ছেদের পর্বটা চলেছিল সেটা ঐ রীতার চিঠিকে কেন্দ্র করেই যেন কোথা দিয়ে কেমন করে অতি অনায়াসেই মিটে গেল। বহুদিন পরে স্বামী স্ত্রী যেন পরস্পর পরস্পরের কাছাকাছি আবার এলো।

কিন্তু তারা কেউই বুঝতে পারলো না বিচ্ছেদের সেতুটা অতিক্রম করে আজ যে আবার তারা কাছাকাছি আসতে পেরেছে সে রীতার সংবাদের জন্য নয়, সেটা হচ্ছে রীতার সন্তান রাহুলের জন্য।

ভিতরে ভিতরে উভয়কেই যে সন্তানতৃষ্ণাটা পীড়ন করেছে এতকাল ধরে, যার কোন উপায়ই স্বামী স্ত্রী কেউ কিছু খুঁজে পায়নি, রাহুলের সংবাদটা সেই তৃষ্ণাতেই অমৃতবারি সিঞ্চন করেছে যেন কখন।

সারাটা রাত নীতা ঘুমাতে পারে না।

সে যেন স্বপ্ন দেখে জেগে জেগেই রাহুল এসেছে, এই অন্ধকার অভিশপ্ত বাড়িটা নতুন করে যেন জেগে উঠেছে।

আর সমরেশ—

ব্যাপারটা যে এমনি করে এত সহজে মীমাংসিত হয়ে যাবে এ তো সে স্বপ্নেও ভাবতে পারেনি, এবং তাই যখন হলো সমস্ত বুকটা যেন কেবলই আকুল হয়ে উঠতে লাগলো একটিবার রাহুলকে দেখবার জন্য।

সে তো কেবল রীতারই সন্তান নয় সে যে তারও সন্তান।

সে তার বাপ, জনক।

সেই জন্ম দিয়েছে রাহুলকে !

সে আজ বাপ, সন্তানের বাপ। বিধাতা আজ তাকে পিতৃত্বের অধিকার দিয়েছেন।

সত্যিই আশ্চর্য হয়ে যায় সমরেশ কথাটা ভাবতে গিয়ে, সন্তানের পিতৃত্বের তৃষ্ণাটা কেমন করে এতকাল বুকের মধ্যে তার সুপ্ত হয়ে ছিল।

আর সেই সঙ্গে সঙ্গে রীতার প্রতি একটা অদ্ভুত মমতা যেন তার সমস্ত মনকে দ্রবীভূত আচ্ছন্ন করে ফেলে।

মিথ্যা লেখেনি রীতা। সত্যিই রীতার আর উপায় ছিল না।

রাহুল যত দিন সপ্তাহ মাস বৎসর একে একে অতিক্রম করে চলেছে

নীতার মনের মধ্যে একটা প্রশ্ন যেন ক্রমশঃই একটা জগদ্দল পাথরের মত চেপে বসেছে তত।

সুনীল সেদিন কথা প্রসঙ্গে কথাটা বললেও মিথ্যা বলেনি।

রাহুলকে একদিন আজ হোক কাল হোক তার পিতৃপরিচয়েব প্রয়োজন হবেই এ সংসারে থাকতে হলে।

হয়তো সে-ই একদিন তার মার সামনে এসে দাঁড়িয়ে তার পিতৃপরিচয়টা দাবি করবে।

সেদিন তো চুপ করে থাকলে চলবে না।

তার পিতৃপরিচয়ের প্রয়োজন নেই, সে তার মায়েবই সন্তান সে কথাটা বললেই ত চলবে না।

রাহুলই হয়তো সন্তুষ্ট হবে না।

সে হয়তো বলবে, না, স্পষ্ট করে বল কে আমার বাবা। কার ছেলে আমি।

শুধু কি তাই, তারই বা কি অধিকার আছে রাহুলকে তার সত্যকারের পিতৃপরিচয় থেকে বঞ্চিত করতে। তার জন্মের মধ্যে যদি কোন ত্রুটি থেকেই থাকে সে তো রাহুলের নয়, তার।

সমরেশের কাছ থেকে পালিয়ে এলেও তার নিজের গর্ভজাত সন্তানের কাছ থেকে পালাতে পারবে না আজ। পালাবার মত পথ পাবে না আজ।

কথাগুলো কিছুকাল ধরে ভাবতে ভাবতেই তার মনের মধ্যে একটা অদ্ভুত সংকল্প জাগে।

কলকাতা থেকে আসবার সময় নীতা ও সমরেশের বিয়ের যে ফটোটা সঙ্গে করে এনেছিল সেই ফটোটাই একদিন পাঁচ বছরের ছেলের সামনে এক নির্জন দ্বিপ্রহরে বের করে তুলে ধরলো।

বাপী।

মামণি।

বলতো ইনি কে?

কে মামণি।

তুমি বল।

জানি না।

আমার বাবা?

হ্যাঁ, তোমার বাবা।

আর এটা।

বল তো কে?

তুমি, মা।

নীতা প্রথমটা ভেবেছিল সত্য কথাটাই বলবে কিন্তু পরক্ষণেই যেন কি ভেবে বলে, হ্যাঁ, তোমার মা।

আর সত্যিই তো নীতাকে মা বলার মধ্যে মিথ্যাই বা কি আছে, তারা দুই বোন যে কেবল যমজ ও অবিকল একই রকম দেখতে তাই নয় একই মার

গর্ভে জাত একই পিতার সন্তান। অবিভাজ্য, এক জীবনকোষ থেকেই তাদের জন্ম, তাছাড়া মাসী তো মা-ই।

ফটোটা দেখে ক্রমশঃ শিশুমনের মধ্যে একটা ছাপ পড়ে যায়।

তার বাপ তার মনের মধ্যে একটা স্পষ্ট স্বচ্ছ আকৃতি নিয়ে গড়ে ওঠে।

রাহুলকে কিন্তু রীতা সাবধান করে দেয়, তোমার বাবার ফটোটার কথা কিন্তু কাউকে কখনো বলো না বাপী।

কেন মামণি ?

বাঃ তাহলে যে তোমার বাবা তোমার 'পরে রাগ করবেন।

রাগ করবেন !

হ্যাঁ খুব রাগ করবেন। বলবে না তো কাউকে ?

না, বলবো না কাউকে।

শিশুমনের কৌতূহল।

একদিন মাকে শুধায়, বাবা কোথায় মামণি ?

অনেক দূরে।

কোথায় ?

সে অনেক দূর।

আমি বাবাকে দেখবো মামণি।

দেখবে বৈকি সোনা। নিশ্চয়ই দেখবে।

কবে দেখবো ?

আর একটু বড় হও তারপর দেখবে।

বড় হলে বাবার কাছে তুমি আমাকে নিয়ে যাবে বুঝি ?

হ্যাঁ, নিয়ে যাবো।

কবে বড় হবো মামণি আমি ?

এইতো দেখতে দেখতে বড় হয়ে যাবে।

দেখতে দেখতে বড় হয়ে যাবো, না ?

হ্যাঁ, দেখতে দেখতে বড় হয়ে যাবে। মস্ত বড় হয়ে যাবে।

তখন তো তাহলে আমিই নিজে বাবার কাছে চলে যাবো।

হ্যাঁ যেও।

তোমাকে সঙ্গে নিয়ে চলে যাবো বাবার কাছে।

কেন, তুমি একা একা যেতে পারবে না ?

কেন পারবো না, পারবো, তবে তুমিও সঙ্গে যাবে।

সুনীল এসব কথা কিছুই জানতে পারে না। মা ও ছেলের মধ্যে এত কথা কিছুই সে জানতে পারে না।

সুনীল একদিন বলে, রাহুলকে এবারে স্কুলে ভর্তি করতে হবে রীতা।

বেশ তো, তুমি যা ভাল বুঝবে কর।

মৃদ কণ্ঠে রীতা জবাব দেয়।

শহরের সবাই ইতিমধ্যে জেনেছিল রীতা তার কাছেই এসে আছে।

অনন্যোপায় হয়ে আজ সে তার কাছেই এসে আছে।

রাহুলের মামা সে। রাহুলও তো তাকে মামা বলেই ডাকে।

সুনীল রাহুলকে নিয়ে কে. জি.তে ভর্তি করে দিয়ে এলো, মিশনারীদের স্কুল।

কিন্তু রীতার মনের চিন্তাটা যায় না।

রাহলের পিতৃপরিচয়ের ব্যাপারটা তার মনের মধ্যে সর্বক্ষণই যেন চিন্তার জাল বুনে চলে। মীমাংসা একটা যেন ও কিছুতেই খুঁজে পায় না।

অবশেষে একদিন মনে হয় আর দেরি করা উচিত হবে না, সমরেশকে কথাটা জানানো এবারে সত্যিই প্রয়োজন।

কিন্তু কেমন করে কি করে জানাবে সে কথাটা সমরেশকে?

তাছাড়া সমরেশ যদি অস্বীকার করে।

যদি বলে, স্বীকার করি না আমি ওকে।

তখনিই মনে হয় রীতার সুনীলের পরামর্শের প্রয়োজন। এতকাল সুনীলের কাছে সে সব কিছু গোপন করে এসেছে কিন্তু আর নয়।

এবারে তাকে তার সব কথা বলা প্রয়োজন। রাহুলের ভবিষ্যতের চিন্তাতেই প্রয়োজন।

সুনীলের সেদিন একটা ইমার্জেন্সী অপারেশন ছিল।

অপারেশন শেষ করে বাড়ি ফিরতে ফিরতে সুনীলের সেদিন একটু রাতই হয়ে যায়।

বাড়ি ফিরে দেখে রীতা তখনো জেগে আছে।

রীতাই দরজাটা খুলে দেয়।

দয়ালকে আর ঘুম থেকে তোলে না।

কি ব্যাপার, তুমি কেন? দয়াল কোথায়?

বুড়ো মানুষ ঘুমাচ্ছে।

রীতা সুনীলের পিছনে পিছনেই তার ঘরে এসে ঢোকে।

খাবার গরম করি?

না, এত রাত্রে আর কিছু খাবো না।

কিছুই খাবে না?

এক কাপ কফি যদি পার তো দাও।

রীতা ঘর থেকে বের হয়ে যায় এবং একটু পরে ধূমায়িত এক কাপ কফি হাতে ঘরে এসে ঢোকে।

সুনীল তখন জামা কাপড় ছেড়ে ড্রেসিং গাউনটা গায়ে জড়িয়ে একটা সোফায় বসে সবে একটা সিগ্রেট ধরিয়েছে।

কফির কাপটা সামনের টেবিলের 'পরে রেখে মুখোমুখি বসে রীতা।

তোমার আর বসতে হবে না রীতা। যাও শুয়ে পড়গে। অনেক রাত হয়েছে।

রীতা কিন্তু যায় না ঘর থেকে, দাঁড়িয়েই থাকে।

সুনীল শুধায়। কিছু বলবে?

সুনীল—

বল।

রীতা একটু ইতঃস্তত করে বলে, একটা কথা বলবো বলে কয়েক দিন ধরেই ভাবছি তোমায়।

কি কথা?

রাহুলের কথা।

রাহুলের কথা, কিছু হয়েছে নাকি তার? শরীর-টরীর খারাপ হয়নি ত?

না না, সে সব কিছু নয়।

তবে?

বলছিলাম ওর পিতৃপরিচয়টা—

সুনীল রীতার মুখের দিকে সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকায়।

তুমি সেদিন ঠিকই বলেছিলে, আজ ও ছোট আছে কিন্তু প্রশ্নটা তো একদিন দেখা দেবেই, আজ হোক কাল হোক।

তা তো দেবেই।

তাছাড়া আমার কথাটাও তোমাকে এতদিন বলিনি।

রীতা!

সে কথাটাও তোমার জানা দরকার।

কিন্তু—

জানি তুমি জানতে চাওনি, জানতে চাইবেও না কোন দিনই হয়ত। কিন্তু আমার নিজেরও তো একটা উচিত অনুচিত বোধ আছে, তাছাড়া রাহুলকে আজ প্রতিষ্ঠিত করতে গেলে সেই কথাটাই যে আজ তোমাকে আমার সবার আগে জানাতে হবে।

কিন্তু সে কথা বলতে তোমার যদি কষ্ট হয়।

কষ্ট, না, আর কষ্ট হলেও অন্তত তোমার কাছে আমার বলতে কষ্ট হবে না। শোন, তাহলেও আমি মুখে সব তোমাকে বলতে পারবো না।

রীতা।

এই চিঠিতে সব আমি লিখে রেখেছি, তুমি পড়ো, পড়লেই সব জানতে পারবে, বলতে বলতে খামে ভরা একটা চিঠি, যেটা সে অনেক চিন্তার পর কয়দিন ধরে অনেকবার অনেক কাটাকুটি করে লিখেছিল সেটা সুনীলের সামনে ব্লাউজের ভিতর থেকে বের করে টেবিলটার উপরে নামিয়ে রাখলো।

সুনীল ফ্যাল-ফ্যাল করে চেয়ে থাকে সামনের চিঠিটার দিকে।

ওই চিঠিটা পড়লেই আমার সব কথা রাহুলের বাপের কথা তুমি জানতে পারবে। হয়তো সব সত্যি কথা জানবার পর তুমি আমাকে ঘৃণাই করবে কারণ আমাকে বিচার করা সত্যই শক্ত, মানুষের সহজ বিচারবুদ্ধি ও শক্তি দিয়ে তাছাড়া আমি তো জানি সকলের যা চিরাচরিত পথ সেই পথ ধরে আমি চলিনি।

কথাগুলো বলে রীতা আর দাঁড়ালো না।

ধীর পদে ঘর হতে নিষ্ক্রান্ত হয়ে গেল।

আর সুনীল তেমনিই বসে রইলো সোফার ওপরে যেমনি বসেছিল আগের মতই স্থাণুর মত।

হাত বাড়িয়ে চিঠিটা তুলে নেবার সাহসও যেন তার নেই। হাতটা যেন অবশ।

বাইরে শীতের রাত। নিঃশব্দ নিঝুম।

তারপর একসময় যে কি করে সুনীল চিঠিটা টেবিলের ওপর থেকে তুলে নিয়েছিল তা সে নিজেই জানে না। বুঝতেও হয়তো পারেনি।

চিঠিটা তারপর আগাগোড়া পড়ছে। একবার নয় দুবার।

তারপর বহুক্ষণ চিঠিটা হাতে করেই বসে থাকে। এ শুধু আশ্চর্য নয়, বিচিত্র। এমনটাও সম্ভব!

কখন ভোর হয়ে গিয়েছে সুনীল খেয়ালও করেনি। শুতেও যায়নি, সোফার উপরেই বাকী রাতটুকু বসে বসে কেটে গিয়েছে কখন একসময় যেন তার।

মৃদু পদশব্দে মুখ তুলে তাকালো। সামনে চায়ের কাপ হাতে রীতা।

কখন যে রীতা চায়ের কাপ হাতে ঘরে এসে ঢুকে সামনে ওর দাঁড়িয়েছে জানতেও পারেনি।

রীতা একটু ইতস্ততঃ করে তারপর চায়ের কাপটা সুনীলের সামনে নিঃশব্দে নামিয়ে রেখে ঘর থেকে বের হয়ে যাবার জন্য পা বাড়াতেই পশ্চাৎ থেকে সুনীলের গলা শোনা যায়।

সুনীল ডাকে, রীতা?

রীতা ফিরে দাঁড়ালো।

বোস রীতা, বোস দাঁড়িয়ে রইলে কেন বোস।

রীতা সামনের সোফাটায় মুখোমুখি বসলো ওর।

তোমার চিঠিটা আমি পড়েছি, তোমার কাজের বিচার করবো না আমি আর সে দুঃসাহসও আমার নেই কিন্তু একটা কথা যা আমার এখন মনে হচ্ছে এতদিন সমরেশকে সব কথা না জানিয়ে যে ভুল তুমি করেছো সে ভুলের জের টানা বোধহয় আর, তোমার কথা বলছি না, রাহুলের দিক দিয়েই বোধহয় মঙ্গলের হবে না আর উচিতও হবে না।

সেই জন্যেই তো তোমাকে আমি সব জানিয়েছি। আমি কিছুই ভেবে পাচ্ছি না।

রীতা মৃদু কণ্ঠে বললে।

একটা কথা যদি বলি কিছু মনে করবে নাত রীতা?

সুনীল কথাটা বলে তাকাল রীতার মুখের দিকে।

কি?

আমার মনে হয় সমরেশকে তুমি একটা চিঠি লেখ সব জানিয়ে।

চিঠি।

হ্যাঁ।

কিন্তু সে যদি—

তোমার সন্তানকে না স্বীকার করতে চায়, হয়তো তাই হবে তাহলেও তোমার কর্তব্য রাহুলের মা হিসাবে যা সেটাই বা তুমি করবে না কেন। অবিশ্যি আমিও লিখতে পারতাম কিন্তু তাতে করে ব্যাপারটা হয়তো আরো জটিল হয়ে উঠতে পারে। তাই বলছিলাম তোমারই তাকে চিঠি দেওয়া ভাল, তোমাদের দুজনের এই জটিলতায় তৃতীয় ব্যক্তির মাথা না গলানোই ভাল।

তুমি যখন বলছো তাই লিখবো কিন্তু—

শোন, বাড়ির ঠিকানায় নয় তার অফিসের ঠিকানায় চিঠিটা দাও, আর—

আর কি ?

না, কিছু না। তুমি চিঠিটা তো দাও তারপর, যদি তেমন বুঝি না হয় আমিই—

রীতা আর কোন কথা বলে না।

তারও দিন তিনেক পরে অনেক ভেবে অনেক মুসাবিদা অনেক কাটাকুটি করে সমরেশকে রীতা চিঠিটা লেখে।

এবং চিঠিটা লিখতে লিখতেই একটা অদ্ভুত সংকল্প তার মনের মধ্যে জেগে ওঠে। সঙ্গে সঙ্গে সে তার ভবিষ্যতের কর্মপন্থাও স্থির করে ফেলে মনে মনে।

আর সেই অনুযায়ীই নীতাকেও আলাদা একটা চিঠি দেয়।

রাহুল, রাহুলের মঙ্গলের জন্য, তার পিতৃত্বের জন্য সে সব কিছুই করতে প্রস্তুত করে নেয় নিজেকে মনে মনে। চিঠিটা ডাকে পাঠানোও হয়।

দিন তিনেক বাদেই সেদিন রাত্রে ঘরের টেলিফোনটা ক্রিং ক্রিং করে বেজে উঠলো।

সুনীল বাড়িতেই ছিল। তাড়াতাড়ি উঠে গিয়ে ফোনটা ধরে।

ট্রাংক কল, কলকাতা থেকে ট্রাংক কল।

কে. ডক্টর সুনীল চৌধুরী ?

হ্যাঁ।

আমি সমরেশ, সমরেশ চক্রবর্তী, রাহুল তোমার ওখানে আছে, তাই না ?

হ্যাঁ।

আমি কালকের ট্রেনেই যাচ্ছি তোমার ওখানে।

তুমি আসছো ?

হ্যাঁ।

সমরেশও আর কোন কথা বলে না, সুনীলও আর কোন প্রশ্ন করে না।

সুনীল ফোনটা নামিয়ে রাখে।

কয়েকটা মুহূর্ত কি ভাবে তারপর ঘর থেকে বের হয়ে রীতার ঘরের বন্ধ

দরজার সামনে গিয়ে দাঁড়িয়ে ডাকে, রীতা রীতা—

কে ? ঘরের ভিতর থেকে রীতার সাড়া আসে।

আমি, আমি সুনীল।

রীতা তাড়াতাড়ি বের হয়ে আসে দরজা খুলে।

কি হয়েছে সুনীল !

এসো আমার ঘরে, কথা আছে।

দুজনে সুনীলের শোবার ঘরে এসে ঢোকে।

সুনীল বলে, বোস।

কি হয়েছে সুনীল ? রীতার কণ্ঠস্বরে উৎকণ্ঠা প্রকাশ পায়।

একটু আগে সমরেশ কলকাতা থেকে ফোন করেছিল।

ফোন !

হ্যাঁ, ট্রাংক কল করেছিল। সে কাল রওনা হচ্ছে। আর, রাহুল এখানে আছে কিনা জিজ্ঞাসা করলো।

সত্যি !

হ্যাঁ, আমার কি মনে হচ্ছে জান।

কি ?

তোমার চিঠিটা ও যুক্তি ও সহানুভূতি দিয়েই পড়েছে, তোমার ভয়টা মিথ্যেই ভয়।

কি করে বুঝলে ?

ওর গলার স্বর কথা বলার ভঙ্গি—তাছাড়া ওর মনের মধ্যে যদি অন্য কিছু থাকতোই ও নিশ্চয়ই রাহুলের সংবাদও নিত না এবং এখানে আসতোও না।

তারপর একটু থেমে সুনীল আবার বলে, সমরেশ আমার দীর্ঘদিনের বন্ধু, ওকে আমি যতটুকু চিনি বা জেনেছি ও রাহুলকে ঘৃণা করবে না, ভালবেসেই নেবে। তাছাড়া ও যখন আসছেই আমার মনে হয়—

কি ?

তোমার বোনের সঙ্গে নিশ্চয়ই এ সম্পর্কেও একটা পরামর্শও করেছে।

রীতা বলে না যে সে নীতাকেও পৃথক করে একটা চিঠি দিয়েছিল রাহুলকে গ্রহণ করবার অনুরোধ জানিয়ে।

যাক সত্যিই এবার ত তুমি নিশ্চিন্ত হলে রীতা, সুনীল আবার বলে।

আগে সে এসে রাহুলকে তার সন্তান বলে গ্রহণ করুক !

রীতা মৃদু কণ্ঠে বলে।

করবে, করবে, কোন বাপ তার সন্তানকে কি অস্বীকার করতে পারে ! কিন্তু একটা কথা কি ভাবছি জান রীতা।

কি ?

সমরেশ তো তার ছেলেকে গ্রহণ করবে কিন্তু রাহুল যতই ছোট হোক পাঁচ বছর তো বয়েস হয়েছেই, যে বাপকে চোখে দেখা দূরে থাক, যার নাম পর্যন্ত জানে না, কোন পরিচয়ই নেই সেই বাপকে সে কেমনভাবে গ্রহণ করবে।

সে তার বাপকে ভাল করেই চেনে সুনীল।

চেনে, কি বলছো তুমি রীতা! সুনীলের যেন বিস্ময়ের অবধি থাকে না।

হ্যাঁ চেনে, তার নাম পর্যন্ত জানে, ওর নামের পদবীই তো তাই, রাহুল চক্রবর্তী, তোমাকে বলেছিলাম।

আশ্চর্য—আমি ঠিক কিন্তু বুঝতে পারিনি সেদিন কথাগুলো তোমার রীতা।

আমিই তাকে চিনিয়ে দিয়েছি, কেবল আমি তার বাপের কথা কখনো কারো কাছে বলতে নিষেধ করে দিয়েছিলাম বলেই সে এখনো কাউকে কিছু বলেনি। তুমি তো জান ও আমাকে কতখানি ভালবাসে, আমার কথা কিভাবে শোনে।

হ্যাঁ তা জানি। যাক তবে তো কোন গোলমালই নেই।

সেদিন আর সুনীল হাসপাতালে গেল না।

রাহুলেরও স্কুল ছুটি ছিল, তাকে তার ঘরে ডেকে পাঠালো এক সময়।

রাহুলবাবু?

মামু।

জান কে আসছে পরশু? শুনেছো?

না তো—কে আসছে মামু?

তোমাব বাবা।

বাবা! সত্যি, আনন্দে উচ্ছ্বসিত চিৎকার করে ওঠে রাহুল।

হ্যাঁ, কিন্তু তোমার বাবাকে তুমি চিনতে পারবে তো?

হুঁ, আমি তো চিনি তাকে—তার ফটোটা কতবার দেখেছি—বাবাকে নিশ্চয়ই আমি চিনতে পারবো, দেখেই চিনতে পারবো, কথাগুলো বলে আর দাঁড়ায় না রাহুল, আনন্দে ছুটতে ছুটতে ঘর থেকে বের হয়ে যায়, মা—মামণি?

রীতা রান্নাঘরে ঠাকুরকে রান্না বুঝিয়ে দিচ্ছিলো, রাহুল ছুটে এসে মাকে তার জড়িয়ে ধরে, সত্যি—সত্যি মামণি?

কি বাপী?

আমার বাবা আসছেন?

হ্যাঁ।

ওঃ কি মজা, কি মজা! বাবা আসছেন, আমার বাবা আসছেন, বাবাকে আমি খুব ভালবাসব, খুব—খুব।

সুনীলের ডাক শোনা যায়, রাহুলবাবু?

মামা ডাকছেন তোমাকে যাও।

রীতা বলে।

রাহুল ছুটে আসে সুনীলেব কাছে।

বলে, আচ্ছা মামু, বাবা আমাকে খুব ভালবাসবেন, তাই না?

নিশ্চয়ই, ভালবাসবেন বৈকি।

আমিও, আমিও তাঁকে খুব ভালবাসব।

শোন, এখন চটপট জামা কাপড় পরে রেডি হয়ে নাও তো—মার্কেটে যাবো একবার আমরা।

মার্কেটে—

হ্যাঁ, যাও জলদি, রেডি হয়ে নাও।

রাহুল ছুটে ঘর থেকে বের হয়ে গেল।

রাহুলকে নিয়ে সুনীল গাড়িতে করে বের হয়ে গেল এবং ঘণ্টা দুই বাদে একরাশ প্যাকেট নিয়ে ঘরে এসে ঢুকলো।

রীতা শুধায়, কি ব্যাপার, এসব কি ?

কিছু না, রাহুলবাবুর কিছু জামা কাপড় আর কিছু খেলনা।

এত !

বাঃ মামু মামাবাড়ি থেকে চলে যাচ্ছে, আবার কবে দেখা হবে না হবে, কথাটা সুনীল শেষ করতে পারে না, গলাটা কেমন তার বুজে আসে।

অন্য দিকে মুখটা ফেরায়।

রীতারও চোখে জল এসে যায়।

সুনীল নিজেকে কতকটা সামলে নিয়ে বলে, রাহুলবাবু তার বাবার কাছে যাচ্ছে এ যে কত বড় আনন্দের কথা সে কি আমি বুঝিনা, সে তার বাবাকে পাবে—পিতৃপরিচয় পাবে।

রাহুল তখন ঘরের মধ্যে ছিল না, প্যাকেটগুলো নিয়ে তার ঘরের মধ্যে গিয়ে ঢুকেছে।

উঃ কত জিনিস—কত কি কিনে দিয়েছে মামু তাকে।

তোমরা চলে যাবে রীতা—বাড়িটা আমার খালি হয়ে যাবে। সত্যিই আশ্চর্য, বিচিত্র মানুষের মন। এতদিন সর্বান্তঃকরণে কামনা করেছি রাহুল তার পিতৃপরিচয় পিতৃস্বীকৃতি পাক—আজ সেই শুভদিন এসেছে অথচ আমার ঘর শূন্য হয়ে যাচ্ছে বলে মনটা বিষণ্ণ ভারাক্রান্ত হয়ে উঠেছে।

সুনীল ?

রীতার ডাকে সুনীল ফিরে তাকায়।

আমরা তো চলে যাচ্ছি, এবারে তুমি তোমার মাকে তো অনায়াসেই এখানে নিয়ে আসতে পার।

না রীতা।

কেন ?

আমি জানি মা একদিন তার নিজের ভুল বুঝতে পারবে, সেদিন আমাকে যেতে হবে না মা নিজেই চলে আসবে।

কিন্তু—

না রীতা। যখন আমি মনে মনে সুনিশ্চিত জানি তোমাকে এখানে আশ্রয় দিয়ে আমি কোন অন্যায়ই করিনি তখন সেই তোমরা যাবার পরই যদি তাকে আনতে ছুটে যাই তাহলে যে অন্যায় অবিচার মা আমার ওপরে করেছে সেটাকেই যে স্বীকার করে নেওয়া হলো।

রীতা আর কোন কথা বলে না। চুপ করে থাকে।

রীতা তো ইতিমধ্যেই তার শেষ কর্তব্য স্থির করে ফেলেছিল।

বুকটা তার ভেঙে যাচ্ছিলো কিন্তু উপায় নেই।

রাহুলের মঙ্গলের জন্য তার স্বামীর মঙ্গলের জন্য এবং সর্বশেষ মঙ্গলের জন্য যে পথটি নেবে বলে মনে মনে স্থির করে ফেলেছিল রীতা সে পথ ছাড়া আর কোন দ্বিতীয় পথ নেই আজ তার সামনে।

রাহুলকে চিরজন্মের মত ছেড়ে আজ তাকে চলে যেতেই হবে।

আর তারই ইঙ্গিত সে বোনের ও স্বামীর চিঠির মধ্যে পূর্ব হতে মন স্থির করে নিয়েই দিয়েছিল।

সমরেশ যে আসছে সে জানে, রীতা আর বেঁচে নেই জেনেই তার সন্তানকে সে গ্রহণ করতে আসছে। নচেৎ সে নিশ্চয়ই আসতো না।

কাল সকালেই সমরেশ আগ্রায় এসে পৌঁছাচ্ছে—তার আগেই তাকে এ বাড়ির ত্রিসীমানা থেকে নিঃশব্দে সরে যেতে হবে।

দূরে—অনেক দূরে।

শুধু যাবার আগে দেখে যেতে চায় রাহুল তার বাপের আশ্রয় পেল।

আর কিছু না, আর কিছু কামনাই তার এ পৃথিবীতে নেই।

কিন্তু সুনীলকে সব কথা জানিয়ে যেতে হবে।

মুখে বললে সে যেতে দেবে না কিছুতেই, চিঠিই একটা লিখে রেখে যাবে।

রাহুলের রাত্রের খাওয়া শেষ হলে তাকে নিয়ে এসে ঘরে ঢুকল রীতা।

শুধু শুলেই হবে না—রাহুল ঘুমাবে না।

রাহুল শোবার পর রীতা তার শিয়রের ধারটিতে বসে তার মাথার চুলগুলো আঙুল দিয়ে বিলি করতে করতে সেই ঘুমপাড়ানী গানটা শুনতে শুনতে রাহুল ঘুমিয়ে পড়বে। সেই ছোটবেলা থেকে ঐ অভ্যাস রাহুলের।

রাহুল এসে নাইট ড্রেস পরে শয্যায় শুয়ে পড়ে, রীতা ওর গায়ে লেপটা টেনে দেয়।

বাপী।

মামণি।

একটা কথা তোমাকে বলবো।

কি মামণি?

আমি কিন্তু তোমার আগেই কলকাতায় চলে যাবো।

আমার আগেই, কেন মামণি?

আমার একটু কাজ আছে যে বাবা।

কি কাজ মামণি?

সে আছে। তুমি কিন্তু শান্ত হয়ে তোমার বাবার সঙ্গে কলকাতায় চলে যাবে। তার কথা শুনবে, দুষ্টুমি করবে না, তাকে বিরক্ত করবে না, আর আমার জন্য একটুও কান্নাকাটি করবে না। বল আমি যা যা বললাম তুমি

করবে—আমার কথার অবাধ্য হবে না ?

তোমার জন্যে যে আমার বড্ড কষ্ট হবে মামণি।

কষ্ট কি, কলকাতায় গিয়েই তো তুমি আমাকে দেখতে পাবে। নাও এবারে ঘুমাও, রাত হয়ে গিয়েছে।

সেই গানটা গাও মামণি।

গুন-গুন করে গানটি শুরু করে রীতা।

একটু পরেই ঘুমিয়ে পড়ে রাহুল।

ঘুমন্ত ছেলের মাথায় পরম স্নেহে একটি চুম্বন এঁকে দিয়ে মনে মনে বলে রীতা, তোর জন্যই আজ তোকে তোর মা চিরদিনের মত ছেড়ে যাচ্ছে বাবা। যদি কোন দিন সত্য কথাটা তোর কাছে প্রকাশ হয়ে যায় সেদিন বুঝবি তোর মঙ্গলের জন্যেই আজ তোর মা তোর কাছ থেকে দূরে চলে গিয়েছিল।

রীতা উঠে এসে চিঠির কাগজ ও কলমটা নিয়ে বসলো।

তার কর্তব্য সুনীলকে একটা পত্রে সব জানিয়ে যাওয়া।

সুনীল,

তোমার পর্বতপ্রমাণ ঋণের বোঝা নিয়েই আজ আমি বিদায় নিলাম, কারণ সে ঋণ শোধ করবো সে সাধ্য বা দুঃসাহস কোনটাই আমাব নেই। রাহুলকে তোমার কাছেই রেখে গেলাম। তার বাপের হাতে তুলে দেবার পরও যেন সে তার মামুকে না হারায় এইটুকুই তোমার কাছে আমার শেষ প্রার্থনা রইলো।

একটা কথা তোমায় আমি বলিনি, কেবলমাত্র সমরেশকেই নয় আমার বোন নীতাকেও আলাদা একটা চিঠি বাড়ির ঠিকানায় দিয়ে সব কথা জানিয়েছি এবং দুজনকেই আমি চিঠিতে জানিয়েছি রাহুলের কাছ থেকে আমি বহুদূরে চলে গিয়েছি। আর আমার ছায়াও তারা দেখবে না।

সমরেশ রাহুলকে যেন তার সন্তান বলে গ্রহণ করে।

হয়তো তুমি বলতে পার আর কোথাও আমার স্থান না থাকলেও তোমার কাছে তো আমার স্থান ছিল, ছিল বৈকি, নিশ্চয়ই ছিল, তবু কেন চলে গেলাম, তাই না ?

কেন চলে গেলাম তুমি নিশ্চয়ই একদিন বুঝতে পারবে।

রীতা চিরদিনের মত হারিয়ে গেল বলে দুঃখ করো না সুনীল। জেনো এ ছাড়া তার আর সামনে আজ দ্বিতীয় কোন পথই ছিল না।

রাহুলকে বলেছি সে কলকাতায় গিয়ে আবার তার মাকে পাবে। সমরেশকে সেই কথাটা বুঝিয়ে বলো।

নীতা আমার যমজ বোন, দুজনের গলার স্বরও এক, শিশু রাহুলের কাছে নীতা অনায়াসেই রীতা হয়ে যেতে পারবে।

তার মা হয়ে যেতে পারবে।

মাতৃহারা একটি শিশুকে যেন তারা সে সান্ত্বনাটুকু দেয়।

আর একটি অনুরোধ। সমরেশ যেন জানতে পারে চিঠিটা লেখার সঙ্গে

সঙ্গেই আগ্রা ছেড়ে আমি চলে গিয়েছি।

রীতার মৃত্যু হয়েছে। রীতা বলে আর কেউ নেই পৃথিবীতে।

ইতি—রীতা।

চিঠিটা লিখে ভাঁজ করে সুনীলের নাম উপরে লিখে তার ঘরের টেবিলের উপরে রেখে দিল রীতা একটা পেপার ওয়েট চাপা দিয়ে।

বাইরে শীতের রাত ঝিমঝিম করছে।

রাত বোধহয় একটা হলো।

আজ আর কোন কিছুই প্রয়োজন নেই। একবস্ত্রেই সে বের হয়ে যাবে।

সেদিন একটা সমস্যা ছিল, আজ তো আর কোন সমস্যাই নেই।

সব সমস্যার শেষ।

কিন্তু সত্যি কি আশ্চর্য ভাগ্য তার, কোথায়ও তার স্থান হলো না।

যে ঘরেই সে পা রেখেছে সে ঘর থেকেই শূন্য হাতে এক মধ্যরাত্রে বের হয়ে তাকে পথে পা ফেলতে হয়েছে।

রাহুল ঘুমাচ্ছে। আহা।

শালটা গায়ে জড়িয়ে নিঃশব্দে ঘর থেকে বের হয়ে এলো রীতা।

নির্জন রাস্তা—শীতের মধ্যরাত্রি।

হাঁটতে শুরু করে রীতা স্টেশনের দিকে।

আর ঠিক সেই সময় একটা দিল্লীগামী ট্রেনের ফার্স্ট ক্লাস কম্পার্টমেন্টে নিদ্রাহীন সমরেশ জানলার সামনে বসে অন্ধকারে তাকিয়ে ছিল।

রাহুলের কথাই সে ভাবছিল।

রাহুল—তার ঔরসজাত সন্তান রাহুল।

রীতা তার চিঠিতে লিখেছে, রাহুল তার বাবাকে চেনে। রাহুলের কাছে তার কোন পরিচয় দিতে হবে না।

সন্তান তার বাপকে চেনে কিন্তু বাপ চেনে না তার সন্তানকে।

আশ্চর্য! কত সহজেই না সে রাহুলকে তার সন্তান বলে মনে মনে মেনে নিয়েছে—গ্রহণ করেছে। এবং রাহুলকে নিজের সন্তান বলে মেনে নেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে রাহুলকে একটিবার চোখের দেখা দেখবার জন্য মনটা তার অস্থির হয়ে উঠেছে।

নীতা জানে স্বামীপরিত্যক্তা তার যমজ বোন রীতার সন্তান রাহুল, হয়তো একদিন যে অন্যায় অবিচার করেছিল নীতা তার বোনের প্রতি তারই প্রায়শ্চিত্ত আজ করতে চায় রাহুলকে গ্রহণ করে নিজের বুকে স্থান দিয়ে।

তাই সেই বেশী উৎসাহী হয়ে তাড়াতাড়ি সমরেশকে আগ্রা পাঠিয়ে দিয়েছে। রাহুলকে সে আনতে চলেছে এবং রাহুল তাদের সংসারে তাদেরই সন্তান পরিচয়ে মানুষ হবে স্থান পাবে অথচ নীতা কোনদিন জানতে পারবে না সমরেশেরই ঔরসজাত সন্তান রাহুল।

সে তার জন্মের অধিকারেই তাদের গৃহে আশ্রয় পেল।

রাহুল তার নিজের দাবীতেই সুপ্রতিষ্ঠিত হলো।

তার নিজের সন্তান না হলে কি সমরেশই এমনি করে ছুটে যেতো আগ্রায় রাহুলকে নিয়ে আসবার জন্য। এরই নাম বোধহয় আপন সন্তানের প্রতি মমতা।

রাহুল ঘুম ভেঙে মাকে না দেখতে পেয়ে যখন সমস্ত ঘরে ঘরে খুঁজে বেড়াচ্ছে, মা মা করে ডাকছে, সুনীলের কানে গেল সে ডাক।

ঘর থেকে বেরুতে যাবে রাহুল এসে সুনীলের সামনে দাঁড়ালো, মামু।

কি বাবা।

মামণি কখন চলে গেল কলকাতায় ?

মামণি কলকাতায় গিয়েছে কে বললে তোমাকে ?

কেন কাল রাত্রেই তো মামণি আমাকে বলেছিল আগে সে কলকাতায় চলে যাবে।

সুনীল চমকে ওঠে কথাটা শুনে।

মামণি তোমার ঘরে নেই ?

না তো—কোথায়ও নেই !

চল তো দেখি।

সুনীল ওর ঘরে এসে ঢোকে রাহুলকে সঙ্গে নিয়ে এবং ঘরে ঢুকে এদিক ওদিক তাকাতেই টেবিলের ওপরে ভাঁজকরা চিঠিটা তার চোখে পড়ে।

একনিঃশ্বাসে রীতার চিঠিটা সুনীল পড়ে ফেলে।

রীতা চলে গিয়েছে। আশ্চর্য !

এ কথাটা একবারও তার মনে হয়নি এ কয় দিন। এ সম্ভাবনাটা একটিবারও মনের মধ্যে তার উঁকি দেয়নি।

রীতা যে চলে যেতে পারে কেন তার মনে হলো না একবারও কথাটা।

চিঠিটা হাতে করে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে সুনীল।

কার চিঠি মামু ?

চমকে ওঠে সুনীল।

বলে, তোমার মামণির।

মামণির ?

হ্যাঁ, মামণি কলকাতায় চলে গিয়েছে।

কথাটা শুনলো রাহুল কিন্তু কোন কথা বললো না।

আমার বাবা কখন আসবে মামু ?

আজই আসবে।

আমার বাবাকে আনতে স্টেশনে যাবো না মামু ?

যাবোই তো।

বেলা তখন আটটা সাড়ে আটটা হবে।

সুনীল আজ আর হাসপাতালে বের হবে না স্থির করেছিল, রীতার কথাই ভাবছিল সুনীল।

রীতা যে চলে যেতে পারে এ কথাটা একবারও তার মনে হলো না কেন!

চলে যাওয়াটাই তো তার স্বাভাবিক ছিল।

তাছাড়া আর যাই করুক রীতা সমরেশের মুখোমুখি হওয়াটা নিশ্চয়ই সর্বতোভাবে এড়িয়ে যাবে সে কথাটাই বা কেন সুনীলের মনে হলো না একটিবার!

হঠাৎ টেলিফোনটা বেজে উঠলো।

ডাঃ চৌধুরী।

কথা বলছি।

আমি থানা থেকে বলছি থানার ও. সি.—একটিবার যদি এখুনি আপনি থানায় আসেন তো বড় ভাল হয়।

হঠাৎ ধ্বক করে ওঠে সুনীলের বুকের ভিতরটা। উদ্বিগ্ন কণ্ঠে শুধায়, কি ব্যাপার?

আপনি আসুন না।

সুনীল তখুনি গাড়ি নিয়ে বের হয়ে যায়।

থানা অফিসার সুনীলের অপরিচিত নয়।

অফিসরুমে ঢুকে সুনীল প্রশ্ন করে, কি ব্যাপার?

বসুন, একটু প্রয়োজন আছে ডক্টর।

সুনীল বসে।

তারপরই থানা অফিসার একজন সিপাহীকে কি একটা চোখের নির্দেশ দিতেই সে পাশের কামরা থেকে একটা সুটকেশ নিয়ে এলো।

দেখুন তো সুটকেশটা চিনতে পারেন?

হ্যাঁ, নিশ্চয়ই, কিন্তু এটা আপনি পেলেন কোথায়?

আজ ভোররাত্রের দিকে আগ্রা স্টেশনের আধ মাইলটাক দূরে একটি মহিলা অ্যাক্সিডেন্টে কাটা পড়েছেন।

মহিলা!

হ্যাঁ—তাঁর পাশেই লাইনের ধারে ঐ সুটকেশটা পড়ে ছিল। সম্ভবত তাঁর হাতেই সুটকেশটা ছিল এবং অ্যাক্সিডেন্টটা হবার পর দূরে ছিটকে পড়ে যায়। ঐ সুটকেশটার মধ্যে আপনার ও একটি ছোট ছেলের ফটো দেখে আপনাকে চিনতে পেরে খবর দিয়েছি, বলতে বলতে অফিসার একটা ফ্রেমে বাঁধানো ফটো বের করে রাখলো ড্রয়ার থেকে।

তার ও রাহুলের ফটো।

ফটোটা এবারেই রাহুলের জন্মদিনে সে স্টুডিও থেকে তুলে এনে তার ঘরে বাঁধিয়ে রেখেছিল।

সুনীল অতঃপর কয়েকটা মুহূর্ত কোন কথা বলতে পারে না।

তারপর একসময় ধীরে ধীরে শুধায়, মৃতদেহটা কোথায়?

চলুন, একটি ২৪।২৫ বছরের মেয়ে, কিন্তু সমস্ত মাথাটা মুখটা থেতলে যাওয়ায় চেনা কষ্ট।

আমি—আমি একটিবার দেখবো চলুন।

হ্যাঁ—চলুন পাশের ঘরেই আছে আর সেই জন্যই তো আপনাকে ডেকেছি, if you could identify her.

চিনবার সত্যিই উপায় ছিল না।

পাশের ঘরে স্ট্রেচারের ওপরে শায়িত দেহের উপর থেকে কাপড়টা সরাবার পর কেমন যেন বোবা দৃষ্টিতে সেই দিকে চেয়ে থাকে সুনীল।

রীতা।

সেই তার কালো গরম শালটাই গায়ে জড়ানো ছিল—রক্তাক্ত ছিন্নভিন্ন।

আর মুখ ও বুকের কাছটা থেতলে একেবারে যেন একটা মাংসপিণ্ডে পরিণত হয়েছে।

সুনীল আর দাঁড়াতে পারে না। মাথাটা যেন কেমন ঘুরে ওঠে।

সে তাড়াতাড়ি ঘর থেকে বের হয়ে আসে।

চিনতে পারলেন? থানা অফিসার জিজ্ঞাসা করে।

না, না—

চিনতে পারলেন না?

না, না, চিনবো কি করে, চিনবার কি কোন উপায় আছে।

সঙ্গে সঙ্গেই বলতে গেলে সুনীল থানা থেকে বের হয়ে এলো।

রীতা—রীতা শেষ পর্যন্ত এমনি করে সুইসাইড করলো!

উঃ এ কথাটা তার একটিবারও আগে মনে হয়নি কেন! রীতার মনের মধ্যে যে এমনি একটা সংকল্প দানা বেঁধে উঠতে পারে—এমনি একটা ভয়ংকর পরিণতির দিকে সে এগিয়ে যেতে পারে কেন কথাটা একবারও তার মনে হলো না!

কিন্তু এ তুমি কেন করলে রীতা—কেন?

এমনি করে সব কিছুর উপর সমাপ্তির রেখা কেন তুমি টেনে দিলে?

থানা থেকে বাড়ি পর্যন্ত যে কিভাবে গাড়ি চালিয়ে এসেছে সুনীল সেই একমাত্র জানে।

সুনীলের ফিরতে দেরি দেখে রাহুল ছটফট করছিল।

সুনীলকে গেট দিয়ে গাড়ি নিয়ে ঢুকতে দেখেই রাহুল ছুটে আসে, কোথায় গিয়েছিলে মামু?

সুনীল দু'হাত বাড়িয়ে রাহুলকে বুকের মধ্যে টেনে নেয়।

চোখের কোণ দুটি বুঝি ঝাপসা হয়ে আসে।

বাবাকে আনতে স্টেশনে যাবে না মামু?

নিশ্চয়ই যাবো।

কখন আর যাবে?

এখনও একঘণ্টা দেরি আছে গাড়ি আসতে।

এক ঘণ্টা?

হ্যাঁ।

তা থাক চলো আমরা যাই।

বেশ চলো, কিন্তু এই পোশাকে তুমি বাবাকে আনতে যাবে নাকি?

তবে কোন্ পোশাক পরবো ?

কেন—এবার জন্মদিনে যে সুটটা আমি তোমাকে দিয়েছি।

সে তো মামণি আলমারিতে কোথায় রেখে গিয়েছে।

চলো বের করে নেবো।

আলমারির চাবি টেবিলের ওপরেই ছিল, আলমারি খুলে একটু খুঁজতেই পোশাকটা পাওয়া গেল।

সুনীলই পোশাক পরিয়ে দিল রাহুলকে।

হ্যাঁ, এবার আমরা রেডি, চলো।

সুনীল রাহুলকে নিয়ে এসে বাইরে গাড়িতে উঠে স্টার্ট দেয়।

গাড়ি স্টেশনের দিকে ছুটে চলে।

স্টেশন প্ল্যাটফরমেই বাপ ও ছেলের প্রথম সাক্ষাৎ হলো।

সুনীল সমরেশের সন্ধানে এদিক ওদিক তাকাচ্ছিল হঠাৎ রাহুলই বলে ওঠে, মামু—ঐ তো আমার বাবা।

আশ্চর্য! ঠিক চিনতে পেরেছে রাহুল তার বাবাকে।

সমরেশ একটা সুটকেশ হাতে এগিয়ে আসছিল, সুনীল ওর দিকে এগিয়ে যায়।

সমরেশ।

সুনীলের ডাক শুনে সমরেশ তাকায় ওর দিকে।

সমরেশের ইতিমধ্যে সুনীলের সঙ্গে তার পার্শ্বে দণ্ডায়মান রাহুলের প্রতি নজর পড়েছে। একদৃষ্টে চেয়েছিল সে রাহুলের দিকে।

সুনীল বলে, ওকে তুমি প্রণাম করলে না রাহুল ?

রাহুল নীচু হয়ে সমরেশকে প্রণাম করতে যেতেই দু'হাত বাড়িয়ে সমরেশ রাহুলকে বুকের উপর তুলে নেয়।

অনাস্বাদিত এক আনন্দে মমরেশের বুকটা যেন ভরে যায়। চোখ দুটো তার জলে ভরে ওঠে। সন্তান, তার সন্তান, তারই রক্ত।

তোমার নাম রাহুল ?

হ্যাঁ, আর তুমি তো আমার বাবা ?

হ্যাঁ বাবা, আমি তোমার বাবা, কিন্তু তুমি আমাকে চিনলে কি করে বল তো মানিক!

মামণি যে চিনিয়ে দিয়েছিল ফটো দেখে।

ফটো দেখে!

হ্যাঁ।

সমরেশ বুঝতে পারে না কোন্ ফটো—সমরেশের কোন্ ফটো রীতার কাছে ছিল।

চল সমরেশ।

সুনীল ঐ সময় তাগিদ দেয়।

চল।

সকলে এসে সুনীলের গাড়িতে উঠে বসে।

গাড়িতে বসে নানা প্রশ্নে সমরেশকে অস্থির করে তোলে রাহুল।

এতদিন তুমি আসনি কেন বাবা ?

তুমি তো আমাকে আসতে লেখনি রাহুল।

সমরেশ ছেলেকে বলে।

বাঃ আমি কি তোমার ঠিকানা জানতাম !

তোমার মামণিকে বলোনি কেন ?

মামণি যে—

কি ?

রাহুল হঠাৎ চুপ করে যায়, মনে পড়ে যায় মাকে সে কি কথা দিয়েছে।

ছেলের সঙ্গে কথা বললেও সমরেশের মনের মধ্যে অন্য একটা চিন্তা ঘুরপাক খাচ্ছিলো তখন।

রীতা যে সুনীলের ওখানে নেই তা সে বুঝতে পেরেছিল তার চিঠি থেকেই।

জানতো আগ্রায় রীতার সঙ্গে তার দেখা হবে না।

তবু তার কি হলো, সে বেঁচে আছে কি না এবং থাকলে কোথায় সে, কথাটা জানবার জন্য মনটা তার আকুলি-বিকুলি করছিল।

কিন্তু কথাটা বন্ধুকে জিজ্ঞাসাও করতে পারছিল না।

একটা সংকোচ যেন তাকে বাকবোধ করে রেখেছিল।

আর সুনীলও ভাবছিল ঐ সময় সমরেশ রীতার কথা জিজ্ঞাসা করবেই, এবং জিজ্ঞাসা করলে সে তাকে কি জবাব দেবে !

দ্বিপ্রহরে আহারাদির পর দুই বন্ধুতে মুখোমুখি দুটো সোফায় বসে।

আজই আমি রাহুলকে নিয়ে রাত্রের গাড়িতে ফিরে যাবো সুনীল।

এক সময় সমরেশ বলে সুনীলকে।

বেশ তো, তোমার ছেলে তুমি নিয়ে যাবে বৈকি।

হঠাৎ যেন সুনীলের মুখে 'তোমার ছেলে' কথাটা শুনে সমরেশ চমকে ওঠে। তবে কি সুনীল সব সত্য কথা জানে !

নিশ্চয়ই জানে। রীতা নিশ্চয়ই বলেছে।

সুনীল ?

বল।

রীতা অনেকদিন তোমার এখানে ছিল, তাই না ?

হ্যাঁ, রাহুল যখন তার গর্ভে মাস ছয়েক হবে সেই সময় একদিন রাত্রে তাকে রাস্তার মধ্যে অজ্ঞান অবস্থায় দেখে এখানে নিয়ে আসি তুলে—তারপর থেকে এই কয় বছর তো এখানেই ছিল সে।

তার আগে রীতা কোথায় ছিল জানো ?

এখানকারই একটা স্কুলে, ঠিক মনে নেই, সেই রকমই যেন বলেছিল কিছু মনে পড়ে, সুনীল কথাটা আর শেষ করে না, হঠাৎ বুঝি মনে পড়ে যায়

তার রীতার পত্রে তার শেষ অনুরোধটুকু, তাছাড়া আজ আর সে-সব কিছুর প্রয়োজনই বা কি। সবই তো শেষ হয়ে গিয়েছে চিরদিনের মত।

সুনীল।

একসময় আবার ডাকে সমরেশ।

বল।

রীতার খবর জানো কিছু?

জানি।

কোথায়? সমরেশ প্রশ্ন করে।

সুনীল একটু থেমে বন্ধুর মুখের দিকে তাকিয়ে বলে, সে যেখানে গিয়েছে সেখান থেকে আর সে ফিরবে না কোনদিনই।

সুনীল!

কাল শেষ রাত্রে কোন এক সময় ট্রেনের তলায় সে সুইসাইড করেছে।

সেকি, তুমি—

কাল রাত্রেই সে এ বাড়ি ছেড়ে চলে গিয়েছিল আমরা যখন ঘুমিয়ে।

সুনীলের মুখের দিকে তাকিয়ে সমরেশ আর কোন প্রশ্নই করতে পারে না।

রীতার মৃত্যু সংবাদটা যেন সমরেশকে অকস্মাৎ কেমন তাকে পাথরে পরিণত করে।

অনেকক্ষণ তার মুখ দিয়ে শব্দই বের হয় না।

।। নয় ।।

সেই রাত্রেই সমরেশ রাহুলকে নিয়ে কলকাতায় চলে গেল। ওদের ট্রেনে তুলে দেবার পর সুনীল তার বন্ধুকে মাত্র একটি কথাই বলেছিল, তোমায় কাছে আমার একটু অনুরোধ রইলো সমরেশ, রাহুলকে নিয়ে যদি তোমার বিন্দুমাত্রও বিপর্যয়ের সম্মুখীন হতে হয় তো আমাকে জানাবে কথা দাও!

না না সুনীল, সেরকম কিছু—

হ্যাঁ, জেনো রাহুলের মামা এখানে রইলো। তার জন্যে তার মামার ঘরের দরজা চিরদিনই খোলা আছে।

মামু, আমি তাহলে যাই। সুনীল রাহুলের মাথায় হাত দিয়ে বলে।

তুমি যাবে না কলকাতায় মামু?

যাবো বইকি?

ট্রেন ছেড়ে দিল একসময়, সুনীল ফিরে এলো যেন একটা বিরাট শূন্যতা নিয়ে।

ট্রেনের মধ্যে সারাটা পথ রাহুল একটি বারের জন্যও চোখ বোজেনি!

কেবল বলেছে, আমার তো ঘুম পাচ্ছে না বাবা!

সমরেশ কি করবে অতঃপর বুঝে পায় না। সেও রাত্রির উপর চুপচাপ জেগে বসে থাকে।

কলকাতার বাড়িতে পেঁছেই প্রথম প্রশ্ন করে সমরেশকে রাহুল, আমার মামণি কোথায় ?

আছে চল, ভিতরে তোমার মামণি আছে।

নীতাও বিচিত্র একটা কৌতূহল নিয়ে রাহুলের অপেক্ষা করছিল।

সে তাড়াতাড়ি এগিয়ে আসে সিঁড়ির মাথায় ওদের সাড়া পেয়ে।

সিঁড়ির উপরে নীতাকে দেখে সোল্লাসে ছুটে যায় তার দিকে রাহুল, মা, মামণি।

ফুলের মত সুন্দর একটি শিশুকে দেখে নীতা মুহূর্তের জন্যই যেন সব কিছু ভুলে তার দিকে হাত বাড়িয়ে দেয়।

রাহুলকে বুকে তুলে নেয়।

মামণি—

এমন মিষ্টি ডাক নীতা তো ইতিপূর্বে কখনো শোনেনি।

সে বলে, হ্যাঁ বাবা, মামণি।

হঠাৎ ঐ সময় রাহুলের সমস্ত উৎসাহ কেমন যেন নির্বাপিত হয়ে যায়, সে যেন কেমন নিজেকে হঠাৎ গুটিয়ে নেয়।

নীতার মুখের দিকে সে চেয়ে আছে তখন।

সমরেশ দূরে চুপচাপ দাঁড়িয়ে একপাশে।

নীতা শুধায়, কি দেখছো ?

তুমি মামণি।

হ্যাঁ।

তুমি আগে চলে এসেছো, কখন এলে মামণি ?

সমরেশ তাড়াতাড়ি বলে ওঠে, হ্যাঁ তোমার মামণি তো কালই এখানে এসে গিয়েছে রাহুল।

রাহুল তখনো নীতার দিকে কেমন যেন বিস্ময়ভরা এক দৃষ্টিতে চেয়ে রয়েছে।

সে ঠিক যে ভাবে নীতাকে দেখতে পেয়েই ছুটে এসেছিল তার কাছে সেই আগ্রহটা যেন হঠাৎ কেমন একটু থিতিয়ে গিয়েছে।

নীতা আর সমরেশ পরস্পর পরস্পরের দিকে তাকায়।

দুজনেই ঠিক অতঃপর কি করবে বুঝে উঠতে পারে না যেন। দুজনার মধ্যেই একটু ইতস্ততঃ।

নীতা হাত বাড়ায় রাহুলকে নেবার জন্য, এসো রাহুল।

রাহুল নীতার ডাক শুনেও এগিয়ে যায় না।

মামণি তাকে রাহুল বলে তো ডাকতো না কখনো, বাপী বলেই ডেকেছে বরাবর।

তাছাড়া তার মামণি তো এমন রঙিন চকচকে শাড়ি পরেনি কখনো।

এমন করেও শাড়ি পরেনি। গায়েও এত গহনা ছিল না তার মামণির, আর কপালে সেই লাল গোল বড় সিন্দুরের টিপটা কোথায় গেল ! যে টিপটা প্রত্যহ স্নানের পর ভোরবেলা ড্রেসিং টেবিলের সামনে বসে মামণি তার

কপালে এঁকে নিত, সিঁথিতে সিঁদুর। কিছু নেই।

ঠিক মামণিই মনে হচ্ছে তবু তার শিশুমন যেন সন্তুষ্ট হতে পারে না।

খুঁত-খুঁত করছে তার মনটা।

কি দেখছো রাহুল অমন করে আমার দিকে? এবার নীতাই প্রশ্ন করে।

মামণি!

কি রাহুল?

এত সুন্দর শাড়ি, এত গয়না কোথায় তুমি পেলে মামণি?

নীতা হেসে ফেলে। বলে, সব তো বাক্সে ছিল বাবা।

কোন বাক্সটায়, তোমার সেই সুটকেশটায় বুঝি?

হ্যাঁ, এসো।

রাহুলের হাতটি ধরে নীতা। কিন্তু কোলে তুলে নেবার ইচ্ছা হলেও কোলে নেয় না নীতা রাহুলকে।

রাহুলের সে আর এক বিস্ময়।

এতক্ষণ পরে তার মামণির সঙ্গে দেখা হলো তবু মামণি তাকে একটিবার কোলে তুলে নিয়ে চুমো খেল না।

চুমো খেয়ে চোখ বুজে বললো না, এবারে বাপী তার মাকে চুমো দেবে।

চল, তোমার জন্য কি সুন্দর করে সাজিয়েছি একটা ঘর দেখবে চল।

রাহুলের হাত ধরে নীতা তাকে একটা ঘরে নিয়ে যায়।

সত্যিই দু'দিনে ঘরটাকে নীতা রাহুল আসবে বলে সুন্দর করে সাজিয়েছিল।

ছোট একটি খাট, একটা আলমারিতে নানা পুতুল, ছোট একটা পড়ার টেবিল একটা চেয়ার।

তুমি এই ঘরে থাকবে রাহুল!

এই ঘরে!

হ্যাঁ।

আর তুমি! তুমি আমার ঘরে থাকবে না?

আমি তো পাশের ঘরেই থাকবো।

কেন মামণি?

কেন, তুমি একা থাকতে পারবে না, ভয় করবে?

না, না, ভয় করবে কেন?

সমরেশ অফিসে চলে যায়।

নীতা রাহুলকে নিয়ে স্নান করায় খাওয়ায়, একটা অনাস্বাদিত আনন্দে বুকটা যেন ভরে ওঠে নীতার।

রাহুলের মুখে মামণি ডাকটি যেন মধুঢালা। সুধাবর্ষণ করে, বার বার শুনতে ইচ্ছা যায়।

কিন্তু রাহুল যেন কেমন চুপচাপ হয়ে গিয়েছে। গম্ভীর।

নীতা রেডিও, রেডিওগ্রাম বাজায়, কিন্তু রাহুল যেন অন্যমনস্ক।

তার মনটা যেন কি এক সন্দেহের দোলায় পীড়িত হচ্ছে।

মামণি তাকে একটিবার আদর করলো না কেন, একটিবারও বাপী বলে ডাকছে না কেন এখনো ?

শুধু কি সন্দেহ, শিশুমনে অভিমানও একটা যেন উথলে ওঠে।

বুক ফেটে কান্নাও আসে। দুটো রাত মাত্র, মামণি এতখানি বদলে গেল তারই মধ্যে !

কিন্তু গন্ডগোল বাধলো রাত্রে। খাওয়াদাওয়ার পর নীতা রাহুলকে শয্যায় শুইয়ে দিয়ে বললো, এবার চুপটি করে ঘুমাও, কেমন ?

রাহুল কোন কথা বললো না।

নীতা আলোটা নেভাতে যাচ্ছিলো কিন্তু রাহুল বলে ওঠে, না না, আলো নিভিও না মামণি।

আলো জ্বলবে ?

আমি বুঝি কখনো রাত্রে অন্ধকারে ঘুমিয়েছি, এতক্ষণের অভিমানটা আর বুঝি রোধ করা যায় না, চোখের কোল বেয়ে রাহুলের দুফোঁটা জল গড়িয়ে পড়ে।

নীতা বলে, থাক তবে আলো, এবার শুয়ে পড়।

নীতা দরজা টেনে দিয়ে চলে গেল।

রাহুল কাঁদতে শুরু করে, তার মামণি বদলে গেছে, একেবারে বদলে গেছে, মামণি নিশ্চয়ই তাকে আর এতটুকুও ভালবাসে না। কিন্তু কেন, কেন, কেন।

মামণি কি ভুলে গেল মামণি না গান গাইলে সে ঘুমাতে পারে না ? তার চোখে ঘুম আসে না।

ঠিক আছে সে কিছু বলবে না তো, যা খুশি মামণি করুক !

ওদিকে নীতা ঘরে ফিরে আসতেই সমরেশ শুধায়, কি হলো রাহুল ঘুমিয়েছে ?

বোধহয় এতক্ষণ ঘুমিয়ে পড়েছে। যাই বল রীতার ছেলেটি কিন্তু বড় শান্ত, তাই না ?

হ্যাঁ।

আচ্ছা সুনীলবাবুর কাছে ওর বাপের কথা কিছু জানতে পারলে ?

হ্যাঁ।

হঠাৎ যেন সমরেশ কথাটা শুনে চমকে ওঠে।

বলছিলাম কিছু জানতে পারলে ওর বাপের কথা ?

না, সুনীল কিছু জানে না।

সত্যিই আশ্চর্য ব্যাপার, বিয়ের রাত্রেই চলে গেল রীতার স্বামী রীতাকে ছেড়ে, কি এমন হতে পারে যে কারণে—

হয়তো এমন কিছু ঘটেছিল যে কারণে ওদের স্বামী স্ত্রীর প্রথম রাতেই ছাড়াছাড়ি হয়ে গিয়েছে। দেখে এসো তো রাহুল ঘুমালো কিনা।

প্রসঙ্গটা এড়াবার জন্যই বোধহয় সমরেশ কথাটা তুললো। নীতা বের

হয়ে যায় ঘর থেকে।

রাহুলের ঘরের মধ্যে পা দিয়েই কিন্তু নীতা থমকে দাঁড়ায়।

রাহুল শয্যার উপর বসে হাউমাউ করে কাঁদছে।

ওকি রাহুল, কি হলো কাঁদছো কেন, ভয় করছে বুঝি ?

রাহুল কোন জবাব দেয় না।

ঠিক আছে শুয়ে পড় তুমি। তোমার যতক্ষণ না ঘুম আসে আমি যাবো না।

রাহুলকে নীতা শুইয়ে দেয়। রাহুল তবুও ঘুমায় না।

কই ঘুমাও।

তুমি গান না গাইলে আমি ঘুমিয়েছি কখনো! রাহুল অভিমানসংকুচিত কণ্ঠে বলে ওঠে।

গান, ও আচ্ছা দাঁড়াও, আমি রেডিওগ্রাম বাজাচ্ছি।

না না, সে গান নয়।

তবে কি, কোন্ গান ?

সেই গানটা গাও।

কোন্ গানটা ?

সেই যে, ঘুমের পাখীরা আয় আয় এই ঘরে নিশিরাতে মেলে ডানা—

নীতা সত্যিই এবার মুশকিলে পড়ে।

প্রথমতঃ সে গানই জানে না গাইতে।

গান গাইতে পারতো তার বোন রীতা। চমৎকার গানের গলা ছিল তার।

কিন্তু এখন কি করবে নীতা, কি বলবে রাহুলকে!

গাও না মামণি গানটা ?

নীতা একেবারে নীরব।

তুমি একটুও আর আমাকে ভালবাস না, একদম বদলে গিয়েছো, কেন, কি করেছি আমি! তুমি যেমন যেমন বলছো ঠিক তেমনিই ত করেছি আমি। লক্ষ্মী হয়ে থেকেছি। বাবার সঙ্গে চলে এসেছি, একটুও কাঁদিনি, তবু তুমি একবারও আমাকে আদর করলে না! বাপী বলে ডাকলে না!

নীতা সত্যিই নিজেকে যেন কেমন বিব্রত বোধ করে।

সেই সঙ্গে মেজাজটাও তার একটু যে বিগড়ে যায় না তাও নয়।

একটু বিরক্ত হয়েই যেন সে পাশের ঘরে চলে আসে।

সমরেশ একটা সোফায় বসে সিগ্রেট টানছিল। রীতার শোচনীয় মৃত্যুসংবাদটা সে এখনো নীতাকে দেয়নি।

নীতা জানে রীতা কোথায় চলে গিয়েছে।

আসলে নীতার কাছে কিভাবে রীতার প্রসঙ্গটা উত্থাপন করবে তাই সমরেশ ট্রেনে আসতে আসতে সারাটা পথ ভেবেছে, এখনো ভাবছিল।

স্ত্রীকে ঘরে ঢুকতে দেখে শুধায়, কি হলো, ঘুমিয়েছে ?

না, নীতা একটা সোফার ওপরে ক্লান্তভাবে বসে পড়ে।

কি করছে ?

কাঁদছে, কিন্তু ওর কথাগুলো আমি ঠিক বুঝতে পারছি না। আচ্ছা ও কি আমাকেই ওর মা ভাবছে নাকি ?

সেটাই তো স্বাভাবিক নীতা।

কিন্তু—

তোমরা দু' বোনে অবিকল একরকম দেখতে। তাহলেও ওর মনের মধ্যে কোথাও একটু সন্দেহ দেখা দিয়েছে। সেই সন্দেহটুকু ওর মন থেকে তোমাকেই আজ মুছে দিতে হবে নীতা, ওর সত্যিকারের মা-ই তোমাকে হতে হবে। তারপর একটু থেমে বলে, একটা কথা তোমাকে এখনো আমি বলিনি নীতা !

কি ?

রীতা আত্মহত্যা করেছে।

সেকি !

হ্যাঁ।

কে বলেছে, ডাঃ চৌধুরী ?

হ্যাঁ, আমি যেদিন গিয়ে আগ্রায় পেঁছাই সেইদিনই ভোরে ট্রেন লাইনের 'পরে রীতার মৃতদেহ পাওয়া যায়।

সমরেশ সংক্ষেপে রীতার মৃত্যু সম্পর্কে যা সুনীলের কাছে শুনেছিল সব বলে।

নীতা স্তব্ধ হয়ে বসে থাকে।

শোন নীতা, ওর মা ওকে বলে গিয়েছিল এখানে সে চলে আসবে ওর আগেই, রাহুল সেটাই বিশ্বাস করেছে। আমিও ওকে তাই বুঝিয়েছি।

কিন্তু তা, তা কি কবে সম্ভব ?

কেন সম্ভব নয় নীতা ! আমাদের তো কোন সন্তান নেই, আর হবেও না, রীতার সন্তানকে কি আমরা আমাদের সন্তান বলে নিতে পারি না ! তুমি ওর মা, আমি ওর বাপ।

কিন্তু সমরেশ ব্যাপাবটা যত সহজ ভেবেছিল কার্যক্ষেত্রে কিন্তু তা হয় না। পরদিন সকাল থেকে রাহুল যেন রীতিমত বিদ্রোহী হয়ে ওঠে।

সে কারো কথা শুনবে না।

অসংখ্য আবদারে সে নীতা ও সমরেশের ব্যতিব্যস্ত করে তোলে।

সে এখানে থাকবে না একদিনও, মামুর কাছে সে ফিরে যাবে আগ্রায়।

নীতা ক্লান্ত হয়ে পড়ে, মনে মনে বিরক্ত হয়ে ওঠে।

মনে হয় তার কেবলই যেন এ কি বিশ্রী ঝামেলার মধ্যে সে পড়ল।

এতটুকু একটা বাচ্চা অথচ কি বিশ্রী জেদী।

দিনের বেলাটা তবু একরকম কাটে কিন্তু রাত্রে কিছুতেই ঘুমাবে না রাহুল।

তাকে ঘুমপাড়ানী গান গেয়ে তবে ঘুম পাড়াতে হবে।

নীতা হাল ছেড়ে দিয়ে ঘর ছেড়ে চলে যায়।

সমরেশ এসে ঘরে ঢোকে।

গুম হয়ে বসে আছে অতটুকু ছেলে শয্যার উপরে।

এবারে ঘুমাও বাপী, সমরেশ বলে।

সমরেশ আদর করে ছেলেকে বুকে টেনে নেয়।

সমরেশের মুখের দিকে চেয়ে থাকে রাহুল।

আমি রেকর্ডে গান দিচ্ছি তুমি ঘুমাও কেমন—।

ঐদিন দুপুরে অনেকগুলো ঘুমপাড়ানী গানের রেকর্ড কিনে এনেছিল দোকান থেকে সমরেশ, রেডিওগ্রামে সেই রেকর্ড দেয় কিন্তু রাহুল শোয় না।

কই এবারে শুয়ে পড়।

ও গান বিচ্ছিরি, ও গান ভাল না।

বেশ অন্য একটা রেকর্ড বাজাচ্ছি।

সমরেশ রেকর্ডটা পাল্টে দেয় কিন্তু রাহুল চিৎকার করে ওঠে, না, না, ও গান আমি চাই না, ও গান চাই না।

কেন এ গানটা তো ভাল।

না, না—

বলতে বলতে হঠাৎ উঠে গিয়ে থাবা দিয়ে রেকর্ডটা থামিয়ে দেয়।

একটা যান্ত্রিক শব্দ করে রেকর্ডটা চিড় খেয়ে থেমে যায়।

হঠাৎ সমরেশের মেজাজ বিগড়ে যায়, ঠাস করে রাহুলের গালে একটা চড় বসিয়ে দেয়, অসভ্য ছেলে।

থমকে যায় যেন রাহুল আকস্মিক চড়টা খেয়ে।

জীবনে এই প্রথম সে বাবার কাছে মার খেল। ব্যথার চাইতেও জ্বালাটা তাই বুঝি বেশি লাগে রাহুলের।

রাহুল কাঁদে না এক ফোঁটা চোখের জলও ফেলে না।

কঠিন কণ্ঠে সমরেশ বলে, যাও, শুয়ে পড় গিয়ে—go to your bed.

রাহুল পায়ে পায়ে গিয়ে শয্যার উপর শুয়ে পড়ে বালিশের মধ্যে মুখটা গুঁজে দেয়।

সমরেশ আলোটা নিভিয়ে ঘর থেকে বের হয়ে যায়।

পাশের ঘরে এসে ঢুকতেই নীতা প্রশ্ন করে, কি হলো ?

নীতা তার ছেলেটাকে মানুষ করেনি, একটা বাঁদর করে গড়ে তুলেছে।

বিরক্ত ভরা কণ্ঠে সমরেশ বলে সোফাটার ওপরে বসতে বসতে।

এ এক ঝামেলা হলো দেখছি, ভেবেছিলাম কোথায় আমাদের ছেলেপিলে নেই, হবেও না কোনদিন, ওকেই সন্তানের মত মানুষ করে তুলবো কিন্তু এখন দেখছি একটা আগাছা তুলে এনে টবে পুতলেই ফুল ফোটে না। যেমন মা তেমনি হয়তো বাপটাও, নচেৎ অমনি করে বৌ ছেড়ে নিরুদ্দেশ হয়।

আঃ নীতা থামবে তুমি, সমরেশ বিরক্ত কণ্ঠে স্ত্রীকে বাধা দেয় হঠাৎ। কথাটা বলে সমরেশ আর দাঁড়ায় না, ঘর থেকে বের হয়ে যায়।

কিন্তু আশ্চর্য—

পরের দিন থেকে রাহুল হঠাৎ আবার আগের মতই শান্ত হয়ে গেল।

একেবারে চুপচাপ। কিন্তু ওরা ভাল করে খোঁজ নিলে জানতে পারতো সারাটা রাত রাহুল ঘুমায় না।

ঘরের মধ্যে আলো জ্বলে আর রাহুল শয্যায় ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদে আর বার বার বলতে থাকে আপনমনে, মা, আমি আর দুষ্টুমি করবো না, তুমি আবার আগের মত হয়ে যাও।

সমরেশ তার অফিস আর কাজ নিয়ে ব্যস্ত থাকে।

রাহুলের কথাটা যেন ভুলেই যায়।

আর নীতা—

যে জীবনের সঙ্গে দীর্ঘকাল ধরে অভ্যস্ত হয়ে উঠেছে সে ক্লাব ও পার্টির হুইচই তাকে যেন সর্বক্ষণ কি এক অদৃশ্য টানে কেবলই টানতে থাকে আবার।

তাছাড়া যে উগ্র নেশায় সে অভ্যস্ত সে নেশাটার আকর্ষণও তাকে সন্ধ্যার পর থেকেই যেন আচ্ছন্ন করে ফেলতে থাকে।

কি এক দুর্নিবার আকর্ষণে সে অস্থির হয়ে উঠতে থাকে।

অবশেষে সেদিন যখন সন্ধ্যার পরে শৈবাল এসে আবার হাজির হয় হঠাৎ নীতার সমস্ত সংযম যেন বন্যার জলে কুটোর মত ভেসে যায়।

সেজেগুজে নীতা বাড়ি থেকে বের হয়ে পড়ে শৈবালের সঙ্গে আবার অনেক দিন পরে।

নিজের ঘরের জানালাটার সামনে দাঁড়িয়ে ছিল রাহুল চুপটি করে, নীতাকে সেজেগুজে শৈবালের গাড়িতে উঠে বের হয়ে যেতে দেখে ইচ্ছা হয় সে চিৎকার করে মামণি বলে ডাকে কিন্তু কেন যেন গলা দিয়ে তার কোন স্বরই বের হয় না।

নীতা গাড়িতে উঠে নিজেই ড্রাইভ করে বের হয়ে যায়।

রাত্রে সমরেশ ফিরে শুনলো নীতা গৃহে নেই, সে বের হয়ে গিয়েছে।

সমরেশ সংবাদটা শুনে গুম হয়ে যায়।

এ কয়দিন নীতা বাড়ি থেকে বের হয়নি।

সমরেশ ভেবেছিল হয়তো নীতার মধ্যে পরিবর্তন এসেছে।

দাসীকে জিজ্ঞাসা করে, কখন বের হলো মেমসাহেব?

দাসী বলে, সন্ধ্যার পরে কে এক সাহেব এলো, মেমসাহেব সেজেগুজে তার সঙ্গে তার গাড়িতে চেপে বের হয়ে গেল।

হঠাৎ যেন দপ করে আগুন জ্বলে ওঠে সমরেশের মাথার মধ্যে।

বুঝতে তার দেরী হয় না এ সেই ব্যারিস্টার শৈবাল সেনই এসে নীতাকে নিয়ে গিয়েছে।

দাসী জিজ্ঞাসা করে, ডিনার দিতে বলবো?

না, রাহুল খেয়েছে?

হ্যাঁ।

সমরেশ আর কোন কথা বলে না।

নতুন কাজে এসে লেগেছে মাত্র কিছু দিন ঐ বাড়িতে ঐ দাসী সুবালা, সে ঐ বাড়ির সাহেব মেমের মেজাজ এখনো ভাল করে বুঝতেই পারেনি।

তাই বোধ করি সাহেবের নির্দেশের অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে ছিল তখনো, সমরেশ হঠাৎ সুবালার দিকে তাকিয়ে বলে, যাও এখান থেকে।

সুবালা ঘর থেকে বের হয়ে যায়।

শুধু যে একটা আক্রোশ নীতার প্রতি তাই নয়, একটা অপমানের জ্বালা ও নিজের কাছে নিজের পরাজয়ের একটা গ্লানিও যেন ঐ আক্রোশের সঙ্গে মিশে সমরেশের এতদিনকার সমস্ত সংযমকে ভেঙে একেবারে চুরমার করে দিতে থাকে।

শৈবাল।

আবার সেই শৈবাল এসেছিল! তার মানেই আবার সেই ক্লাব, আবার সেই আকণ্ঠ মদ্যপান, তারপর নেশায় উন্মত্ত একদল উচ্ছৃংখল স্ত্রী পুরুষ।

না, এ সব কিছুর সমাপ্তি তাকে যেভাবেই হোক করতেই হবে।

॥ দশ ॥

সমরেশ ঘর থেকে বের হয়ে এলো। মাথার মধ্যে তখন তার আগুন জ্বলছে। তরতর করে সিঁড়ি বেয়ে নেমে এলো নীচে। গাড়িটা তখনো পোর্টিকোতেই পার্ক করা ছিল। গাড়িতে উঠে সমরেশ স্টার্ট দিল। ঝড়ের বেগে যেন গাড়ি ড্রাইভ করে গেট দিয়ে বের হয়ে গেল সমরেশ।

রাত তখন দশটা বাজে প্রায়।

শীতের রাত, শহরের রাস্তা নির্জন হয়ে এসেছে একটু একটু করে।

ক্লাবে এসে গাড়ি থামিয়ে ক্লাবের ভিতরে গেল।

এক শ্রেণীর তথাকথিত অভিজাত শ্রেণীর নর-নারী ক্লাবে যাদের নিত্য যাতায়াত তাদের ভিড়ে হলঘরটা তখনো গমগম করছিল।

সমরেশ যে এখানে একেবারে অপরিচিত তা নয়, এখানে সে মধ্যে মধ্যে এসেছে এবং বিশেষ করে স্ত্রীর দৌলতে ও তার সমাজে অর্থ ও প্রতিষ্ঠার জন্য।

কিন্তু কখনো ভাল লাগেনি জায়গাটা, বিশেষ করে তার পরিবেশ ও যে মানুষগুলো এসে ভিড় করে তাদের, মনে হয় এই কি আধুনিকতা, এই কি আজকের সমাজের মেয়ে পুরুষের চেহারা।

আধুনিকতার নামে কি জঘন্য বেশভূষা! কোন শালীনতারও যেন ধার ধারে না এরা। বিচিত্র এদের রুচিবোধ।

পরিচিত দু'একজনের সঙ্গে দেখা হয়, তারা কুশল প্রশ্ন করে, হ্যালো, চক্রবর্তী যে, it's an age—

কি ব্যাপার পথ ভুলে নাকি? কেউ মন্তব্য করে।

কিন্তু নীতা কই, কোথায় শৈবাল সেন?

ঘুরে ঘুরে ওদের না দেখতে পেয়ে অবশেষে সমরেশ একজনকে জিজ্ঞাসা করে, মিসেস বটব্যাল, মিসেস চক্রবর্তীকে দেখেছেন?

কে নীতা ?

হ্যাঁ।

সে তো কিছুক্ষণ আগে শৈবালের সঙ্গে বের হয়ে গেল, poor girl, আজ এত বেশী ড্রিংক করেছিল যে দাঁড়াতে পারছিল না।

খিলখিল করে হেসে ওঠে মিসেস বটব্যাল নেশার ঘোরে তরল কণ্ঠে।

সমরেশ আর দাঁড়ায় না, হলঘর থেকে বের হয়ে যায়। তাহলে এতক্ষণে নিশ্চয়ই গৃহেই ফিরে গিয়েছে।

গাড়ি নিয়ে আবার ঝড়ের বেগে চালিয়ে গৃহে ফিরে এলো সমরেশ।

পোর্টিকোর সামনেই ড্রাইভারের সঙ্গে দেখা।

তাকেই জিজ্ঞাসা করে, মেমসাহেব ফিরেছে ?

নেহি তো সাব।

গাড়ি থেকে নেমে উঠে গেল সমরেশ উপরে দোতলায় সিঁড়ি দিয়ে। ঘরের মধ্যে এসে ঢোকে।

নীতা তাহলে এখনো গৃহে ফেরেনি।

ঢং ঢং করে রাত এগারটা বাজলো।

দেওয়াল ঘড়িটার দিকে একবার তাকালো সমরেশ তারপর ঘরের মধ্যে পায়চারি করতে থাকে। পিঞ্জরাবদ্ধ একটা পশুর মত ঘরের মধ্যে পায়চারি করতে থাকে সমরেশ যেন।

ক্রমে সোয়া এগার, সাড়ে এগারটা বেজে যায়।

শীতের রাত বাইরে ঝিমঝিম করছে, অদ্ভুত একটা স্তব্ধতা, হিম-কঠিন।

শৈবাল, শৈবাল কোথায় থাকে যেন, ক্যামাক স্ট্রীটে।

একটা অসহ্য যন্ত্রণায় যেন মাথাটা ছিঁড়ে যাচ্ছে।

প্রচণ্ড শীতেও যেন সমরেশের সারাটা কপাল জুড়ে বিন্দু বিন্দু ঘাম জমে ওঠে।

সমরেশ আবার ঘর থেকে বের হয়ে এলো।

সমস্ত বাড়িটা একেবারে স্তব্ধ।

সিঁড়ির আলোটা কেবল জ্বলছে। সিঁড়ি দিয়ে নেমে এলো সমরেশ।

বের হবার পর সদর দরজাটা এবারে উত্তেজনায় ইয়েল লকটা টেনে দিয়ে বন্ধ করবার কথাটা যেন মনেও পড়ে না সমরেশের।

সোজা গাড়ির মধ্যে এসে উঠলো।

দরজাটা খোলাই রইলো, মাথার মধ্যে সমরেশের যেন অসহ্য একটা যন্ত্রণার পীড়ন চলেছে।

গাড়িতে স্টার্ট দিল। বের হয়ে গেল গাড়ি নিয়ে গেট দিয়ে।

আপাদমস্তক একটা কালো গরম চাদর মুড়ি দিয়ে সুটকেশটা হাতে বের হয়ে এলো সুনীলের বাড়ি থেকে সে রাত্রে রীতা।

স্টেশনের পথ সে চেনে। সেই দিকেই হন-হন করে হেঁটে চলে।

কাল সকালেই সমরেশ এসে আগ্রায় পৌঁছাবে।

সে শুধু যদি জানতে পারত সত্যি সত্যিই সমরেশ রাহুলকে গ্রহণ করলো কি না। তাহলেই সে নিশ্চিন্ত হতে পারত।

তার বেশী সে কিছু চায় না।

তার পর যা ত সে মনে মনে ইতিপূর্বেই স্থির করে রেখেছে।

স্টেশনে পেঁাছে প্ল্যাটফরমে ঢুকে শেষ প্রান্তে গিয়ে হাতের সুটকেশটা নামিয়ে রেখে একটা বেঞ্চের উপর উপবেশন করলো।

ঘুম থেকে উঠে রাহুল তাকে খুঁজবে কিন্তু তাকে সে বুঝিয়ে দিয়ে এসেছে তার আগেই সে কলকাতায় চলে যাবে। সেইখানেই তার সঙ্গে আবার দেখা হবে।

নীতার কাছে একবার গিয়ে পেঁাছাতে পারলে আর তার ভয় নেই।

নীতা অবিকল তারই মতই দেখতে, এমনকি তাদের কণ্ঠস্বরটাও হুবহু এক। রাহুল তাকে সহজেই হয়তো তার মামণি বলে মেনে নেবে।

তার মনের মধ্যে কোন সন্দেহ উঁকি দেবে না।

আর নীতা।

নীতা কি রাহুলকে একটু স্নেহ করবে না। একটু ভালবাসবে না!

নিশ্চয়ই রাহুলকে সে স্নেহ করবে ভালও বাসবে নচেৎ সমরেশ কিছুতেই তাকে নিতে আগ্রা আসতো না চিঠি পেয়েই।

তার উপরে নীতার যত আক্রোশই থাক রাহুলকে সে অবহেলা করবে না নিশ্চয়ই।

ইচ্ছা ছিল রীতাব ভোরের গাড়িতেই চলে যাবে কিন্তু পারলো না।

সমরেশ রাহুলকে কেমন কবে গ্রহণ কবে সেটুকু সে জানতে চায়।

স্টেশনের লেডিজ ওয়েটিং রুমেব মধ্যে ঢুকে রীতা একটা বেঞ্চের উপরে বসলো সুটকেশটা পাশে রেখে।

কলকাতার ট্রেন আসবার সময় হলো পরের দিন বেলা এগারটায়।

আরো দু'একটি মহিলা যাত্রী ওয়েটিং রুমের মধ্যে ছিল।

যে বেঞ্চে এসে রীতা বসলো তার উপরে বসে ছিল অল্পবয়সী একটি তরুণী।

রীতা চুপচাপ বসে আছে।

পার্শ্বে উপবিষ্টা তরুণীটি অনেকক্ষণ ধবে লক্ষ্য করছিল, একসময় একটু পাশ ঘেঁষে বসে প্রশ্ন করে, বহিনজী, কতদূর যাবে তুমি?

রীতা ফিরে তাকাল প্রশ্নকারিণীর মুখের দিকে।

তরুণী পুনরায় প্রশ্ন করে, দিল্লী যাবে বুঝি?

না।

তবে?

রীতার তো কিছুই ঠিক ছিল না কোথায় যাবে, তখনো সে ভেবে স্থিরই করতে পারেনি কিছু কোথায় যাবে।

কলকাতা?

তরুণী প্রশ্ন করে আবার।

হ্যাঁ—

রীতা মৃদু কণ্ঠে জবাব দেয়।

তোমার সঙ্গে আর কাউকে দেখছি না। তুমি একাই যাচ্ছো বুঝি?

রীতা মাথা নেড়ে জবাব দেয়।

কথা বলতে আদৌ তার ভাল লাগছিল না। কিন্তু তরুণী থেকে থেকে এটা ওটা প্রশ্ন করে।

একসময় তরুণী উঠে দাঁড়ায়।

বলে, আমার বিস্তারাটা রইলো বহিনজী দেখবে একটু, আমি একটু বাইরে থেকে আসছি।

রীতা নিঃশব্দে ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানায়।

তরুণী উঠে চলে যায়।

কিছুক্ষণ বাদে দুটো ভাঁড়ে চা নিয়ে এসে ঢোকে।

নিজে একটা ভাঁড় রেখে অন্য ভাঁড়টা রীতার দিকে এগিয়ে দেয়, লো বহিন চা পিও।

না না, আমি চা খাবো না।

কিউ, পিও না বহিনজী, পি লো না।

রীতা অনিচ্ছাসত্ত্বেও তরুণীর হাত থেকে চায়ের ভাঁড়টা নেয়।

বেশ গরম চা।

অনেকটা পথ হেঁটে এসে রীতার পিপাসা পেয়েছিল, রীতা চায়ের ভাঁড়ে চুমুক দেয় এবং একটু একটু করেই সবটুকু খেয়ে নেয়।

তারপর কখন একসময় যে রীতার দু'চোখের পাতা ঘুমে ভারী হয়ে এসেছে সেটা ও যেন বুঝতেই পারেনি।

ক্লান্ত দু'চোখের পাতায় ঘুম নেমে এসেছে।

কটা রাত্রি ঘুমায়নি, রীতা বসে বসেই ঘুমিয়ে পড়ে।

কতক্ষণ যে ঘুমিয়েছিল ওর মনে নেই, এবং ঘুমটা বেশ গভীরই হয়েছিল।

কেমন একটা শীত শীত বোধ হওয়ায় একসময় ঘুমটা ভেঙে গেল রীতার। প্রথমটায় ভাল করে বুঝতে পারেনি।

শীত শীত করায় গায়ের চাদরটা ঘুম ঘুম চোখেই টানতে গিয়ে দেখে গায়ে চাদরটা নেই। চাদরটা হাতের কাছে পাচ্ছে না।

আশ্চর্য! গায়ের চাদরটা কোথায় গেল?

ঘুমটা ততক্ষণে একেবারেই চোখ থেকে মুছে গিয়েছে। গায়ে তার চাদর নেই, এদিক ওদিক তাকিয়ে দেখে কি আশ্চর্য সুটকেশটাও যে নেই—

সুটকেশটা, গায়ের চাদরটা গেল কোথায়। এদিক ওদিক তাকায় ব্যাকুল দৃষ্টিতে রীতা।

দেখতে পায় না তার দুটো জিনিসের একটাও।

ঠিক ঐ সময় যেন হঠাৎ মনে পড়ে কাল রাত্রের সেই তরুণীর কথা যে আদর করে বহিনজী বলে ডেকে ভাঁড়ে করে চা এনে খাইয়েছিল তাকে।

সন্ত্রস্ত হয়ে উঠে দাঁড়ায় রীতা। তিনজন যাত্রিণী তখনো ঘুমাচ্ছে, রাত প্রায় শেষ হয়ে এলো।

কিন্তু কাল রাত্রের তরুণীটি নেই।

টাকা, টাকার ছোট থলিটা আছে তো! হ্যাঁ সেটা সে ব্লাউজের মধ্যে রেখে দিয়েছিল গুঁজে, আর সেটা।

যাক, একেবারে হাতটা খালি হয়ে যায়নি। তাহলে কি করতো সে।

ভোর তখনো হয়নি, বাইরে একটা গোলমাল।

কিসেব গোলমাল, মাথায় ঘোমটা টেনে রীতা বাইরে এলো, কয়েকজন পুলিশ ও স্টেশন মাস্টার ছোটাছুটি করছে, কে একজন নাকি ট্রেনে কাটা পড়েছে।

কে আবার কাটা পড়লো কে জানে।

যাক গে। রীতা আবাব ওয়েটিংরুমের মধ্যে ফিরে এসে বসল।

ঠিক সময়ই কলকাতাব ট্রেন আসছে শোনা গেল।

দূব থেকে নজবে পড়লো সুনীল এসেছে স্টেশনে রাহুলকে সঙ্গে করে।

তাড়াতাড়ি ভিড়ের মধ্যে নিজেকে সরিয়ে নিল রীতা। আড়াল করে ফেললো নিজেকে।

ট্রেন এলো, দূর থেকে রীতা একসময় দেখতে পেল রাহুলের হাত ধরে সমবেশ চলেছে, পাশে পাশে চলেছে সুনীল।

যাক, সমরেশ তাহলে সত্যি সত্যিই রাহুলকে গ্রহণ করেছে। সমরেশের প্রতি গভীর কৃতজ্ঞতায রীতার সমস্ত অন্তর যেন আপ্লুত হয়ে যায়।

আর তার কোন দুর্ভাবনা নেই। এখন শুধু একবার সে জানতে চায় নীতা তার রাহুলকে অমনি করে গ্রহণ করলো কি না।

সন্ধ্যারাত্রের গাড়িটাই ধরবে রীতা মনে মনে স্থিব কবে।

স্টেশন থেকে সে কোথায়ও গেল না। ইতিমধ্যে সে বুঝতে পেরেছিল যে চায়ের সঙ্গে নিশ্চয়ই কোন ঘুমের ওষুধ দিয়ে তাকে ঘুম পাড়িয়ে তার চাদর ও সুটকেশটি নিয়ে সবে পড়েছিল সেই ট্রেনে কাটা পড়েছে।

রীতা শুনতে পেল একদল লোক আছে যারা অমনি করে রাহাজানী করে বেড়ায়।

স্টেশনেই প্ল্যাটফরমের বেঞ্চের উপর বসে রইলো। কত ট্রেন এলো গেলো। কত যাত্রী ওঠানামা করলো। সারাটা দিন বসে রইলো রীতা।

একসময় দিন ফুরিয়ে গিয়ে সন্ধ্যার অন্ধকার নেমে এলো। থার্ড ক্লাসের একটা টিকিট কেটে ট্রেন আসতেই লেডিজ কম্পার্টমেণ্টে উঠে বসলো রীতা।

জানালার ধাবে বসে আছে।

অন্যমনস্কভাবে প্ল্যাটফরমের ভিড়ের দিকে চেয়ে আছে হঠাৎ নজরে পড়লো রাহুল, সমরেশ ও সুনীল স্টেশনে ঢুকেছে।

কি আশ্চর্য! তবে কি সমরেশ আজই ফিরে যাচ্ছে নাকি। হ্যাঁ তাই তো, ওদের পিছনে কুলির মাথায় দু'তিনটে সুটকেশ, তার মধ্যে রাহুলের

নাম লেখা সুটকেশটাও আছে।

আশ্চর্য! তাহলে তো এই ট্রেনেই ওরা যাচ্ছে।

রীতার অনুমান যে মিথ্যা নয় একটু পরেই ও বুঝতে পারে। ফার্স্ট ক্লাসে গিয়ে ওরা উঠলো ঐ ট্রেনেই।

সুনীল প্ল্যাটফর্মের উপর দাঁড়িয়ে থাকে।

ঘণ্টা পড়ে, গার্ডের হুইসল, সবুজ আলো জ্বলে ওঠে গার্ডের হাতে, ক্যালকাটা মেল ছাড়লো।

ট্রেনটা এগিয়ে চলেছে। সুনীল প্ল্যাটফর্মের উপর দাঁড়িয়ে আছে। সুনীলের পাশ দিয়েই একসময় রীতার লেডিজ থার্ড ক্লাস কম্পার্টমেণ্টটা পার হয়ে গেল ধীরে ধীরে।

মুখটা সরিয়ে নিয়েছিল কাছাকাছি আসতেই রীতা। যদিও রীতা জানতো রীতা যে ঐ ট্রেনেই চলেছে বা থাকতে পারে সেটা সুনীলের কল্পনারও বাইরে। স্বপ্নাতীত তার কাছে ব্যাপারটা।

ক্রমে গাড়ি স্পীড নেয়। আগ্রা স্টেশনটা ও তার আলোর মালা ক্রমশঃ অন্ধকারে ঝাপসা হয়ে দৃষ্টির সামনে থেকে হারিয়ে যায়।

চোখের জলে রীতার দু'চোখের দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে যায়।

দীর্ঘদিনের স্মৃতিবিজড়িত আগ্রা শহর।

অনেক ব্যথা, অনেক বেদনা, অনেক লজ্জা ও তার সব কিছুর সঙ্গে মিশানো রাহুলকে কেন্দ্র করে নতুন এক আনন্দের, অমৃতের স্বাদ এই কয় বছরে এই আগ্রা শহরেই তার জীবনের ভাণ্ডারে অক্ষয় হয়ে রইলো।

কয়েক বছর আগে যেদিন এক প্রত্যুষে এই আগ্রা শহরে এসে সে ট্রেন থেকে নেমেছিল সেদিন আর আজ যখন সে চিরদিনের মত আগ্রা শহর ছেড়ে চলে যাচ্ছে দুটো দিনের মধ্যে কত তফাত।

সেদিন ছিল তার সামনে অনিশ্চয়তায় ভরা এক প্রভাত আর শেষ যবনিকা নামবার আগে এক ঘনায়মান সন্ধ্যার অন্ধকার। সন্ধ্যা, তারপরই রাত্রি।

সেই রাত্রির অন্ধকারেই আজ চিরদিনের মত হারিয়ে গেল রীতা।

আর রীতাকে কেউ কোনদিন খুঁজে পাবে না। তাছাড়া সবাই তো জেনেছে রীতা ট্রেনে কাটা পড়েছে। কারণ সে দেখেছিল মৃতদেহটা যখন নিয়ে আসে স্টেশনে সঙ্গে তার সুটকেশটাও ছিল।

রীতা আজ মৃত। সে আজ সত্যিই নিশ্চিন্ত।

রাত বাড়তে থাকে, রাত্রির অন্ধকারে শীতের ঘন কুয়াশার মধ্যে দিয়ে একটানা একটা যান্ত্রিক শব্দের ঢেউ তুলে তুলে বিরাট লৌহদানবটা ছুটে চলে।

রীতার কামরার মধ্যে আরও দশ বার জন যাত্রী ছিল, রীতার সমপর্যায়ের কেউই না, সবাই অন্যান্য জাতি।

পাঞ্জাবী, মারাঠী, বিহারী, নানা বয়সের স্ত্রীলোক।

সবাই ট্রেনের ঝাঁকুনিতে ঘুমিয়ে পড়েছে একে একে।

গায়ে চাদর ও কম্বল মুড়িশুড়ি দিয়ে আরামে ঘুমাচ্ছে। কেবল রীতার চোখেই ঘুম নেই।

এলো মেলো কত চিন্তাই রীতার মনের মধ্যে এসে জট পাকায়।

রাহুল কি ঘুমাচ্ছে এখন ?

কে জানে !

ঘুমপাড়ানী গান গেয়ে মাথার চুলগুলো বিলি না করে দিলে তো সে কোনদিন ঘুমাতেই পারতো না।

এমন দুষ্টু ছেলে, প্যাটিপ্যাটি করে চেয়ে থাকবে।

কতদিন এমন হয়েছে ঘরের কাজকর্ম সারতে সারতে হয়তো রাত হয়ে গিয়েছে রীতার, এসে দেখে ঠিক জেগে আছে দুষ্টু ছেলেটা।

একি বাপী, এখনো ঘুমাওনি ?

বাঃ কি করে ঘুমাবো ?

কেন, চোখ বুজে ঘুমাবে !

চোখ বুজলেই বুঝি ঘুম হয় ?

তবে কি করলে ঘুম হয় ?

গান না গাইলে বুঝি ঘুম আসে কারো ?

ওরে দুষ্টু ছেলে তাই এখনো জেগে আছো !

রীতা ছেলের শিয়রের ধারে এসে বসেছে, মাথার চুলে হাত বুলতে বুলতে গান ধরেছে, দেখতে দেখতে রাহুল ঘুমিয়ে পড়েছে।

আজ কি রাহুল ঘুমোতে পেরেছে ? চোখের পাতায় কি ওর ঘুম এসেছে ?

না বার্থের উপর শুয়ে চেয়ে আছে ঠায় ?

সমরেশ তো জানে না।

কেমন করে জানবে সে তার বাপীর গান না শুনলে ঘুম আসে না ?

একই ট্রেনে আর এক কম্পার্টমেণ্টে চলেছে সমরেশ আর রাহুল।

ট্রেনটা ধীরে ধীরে এসে একটা বড় জংশন স্টেশনে থামলো। আলোয় আলোয় একেবারে প্ল্যাটফর্মটা ঝলমল করছে।

শীতের মধ্যরাত, যাত্রী বড় একটা নেই।

তাছাড়া মেল ট্রেন, দূর পাল্লার ট্রেন, মধ্যরাত্রে যাত্রী বড় একটা ওঠা-নামা করে না এসব গাড়ি থেকে।

কি করছে রাহুল, জেগে আছে কি ?

দেখে আসবে নাকি রীতা গাড়ি থেকে একবার নেমে ফার্স্ট ক্লাসের কাঁচের সার্সিপথে একটিবার উঁকি দিয়ে ?

কিন্তু নামতে সাহস হয় না রীতার, গাড়ি যদি ছেড়ে দেয়, তাছাড়া সত্যিই যদি রাহুল জেগে থাকে, তাকে দেখে ফেলে।

না না, থাক। ট্রেন আবার ছেড়ে দিল। আবার অন্ধকার।

হাওড়া স্টেশনে এসে ট্রেনটা নির্দিষ্ট সময়ে পরের দিন থামলো।

সব যাত্রী নেমে গেল একে একে—ক্রমশঃ ভিড় পাতলা হলো অনেকটা।

রীতা এবারে ধীরে ধীরে এগিয়ে চললো মেইন গেটের দিকে।

কলকাতা। কিন্তু কোথায় যাবে রীতা?

কোন পরিচিতের বাড়িতে গিয়ে ওঠা হবে না তার। সুনীলের আশ্রয় ছেড়ে গভীর রাত্রে সেদিন যে মুহূর্তে সে বাইরে পা ফেলেছে সেই মুহূর্ত থেকেই তো রীতার সমস্ত অস্তিত্ব সে নিজের হাতেই মুছে দিয়ে এসেছে নিজে। কি করবে উপায় ত ছিল না।

তার জীবনের সমস্ত জটিলতার শেষ মীমাংসা করতে হলে আর তার সামনে তো কোন পথই সেদিন খোলা ছিল না।

কিন্তু একটিবার সে জেনে যাবে না রাহুল, তার বাপীকে নীতা ও সমরেশ সত্যি সত্যিই সন্তান বলে গ্রহণ করেছে কিনা। সে তার নিজের মাকে হারালেও আর এক মাকে পেয়েছে কিনা জেনে যাবে না একটিবার ব্যাপারটা।

স্টেশন থেকে বের হয়ে রীতা একটা ট্যাক্সি নিল।

সঙ্গে কেউ নেই, একা সে।

সাধারণ একটা তাঁতের চওড়া কালো পাড় শাড়ি তার পরনে, কপালে ও সিঁথিতে এঁয়োতির চিহ্ন। মাথার স্বল্প গুণ্ঠনের ফাঁক দিয়ে কয়েকগাছি রুক্ষ চূর্ণকুন্তল বিষণ্ণ ললাটের উপর এসে পড়েছে। দু'হাতে এক গাছি করে সরু সোনার তারের বালা।

ট্যাক্সি ড্রাইভার জিজ্ঞাসা করে, কিধার যায়েগা মাঈজী?

কোই হোটেলমে চল।

পাঞ্জাবী ট্যাক্সি ড্রাইভার একবার রীতার দিকে ফিরে তাকালো, তারপর আপনমনেই কি যেন ভেবে নিয়ে ট্যাক্সি ছেড়ে দিল।

চিত্তরঞ্জন অ্যাভিনুর উপরে মাঝারি অথচ ভদ্র একটা হোটেলের সামনে এসে ট্যাক্সি দাঁড় করালো ড্রাইভার।

রীতা ট্যাক্সি ড্রাইভারকে ভাড়া মিটিয়ে দিয়ে মাথার ঘোমটা আর একটু টেনে দিয়ে এগিয়ে গেল হোটেলে নীচের তলার অফিস কাউণ্টারের কাছে।

এখানে একটা সিংগ্‌ল্‌-সীটেড রুম পাওয়া যাবে?

রীতা কাউণ্টারে ভদ্রলোককে জিজ্ঞাসা করে।

হোটেলের ম্যানেজার আপ্যায়িতের হাসি হেসে বলে, কেন পাওয়া যাবে না, দোতলায় হলে চলবে?

চলবে।

দু' সপ্তাহের অগ্রিম ভাড়া দিয়ে সিমপ নিয়ে একজন হোটেল বয়ের সঙ্গে উপরে চলে গেল রীতা।

হোটেলটা একেবারে বড় রাস্তার উপরে।

খাওয়া ও থাকার ব্যবস্থা ভালই, পরিচ্ছন্ন, ছিমছাম।

ঘরের মধ্যে ঢুকে ভিতর থেকে দরজাটা বন্ধ করে দিল রীতা।

এই ভাল হলো, কেউ তাকে এখানে চেনে না, চিনবার সম্ভাবনাও নেই।

সে এখানে নিশ্চিন্ত।

এতক্ষণে হয়তো রাহুলকে নিয়ে সমরেশ গৃহে পেঁাছে গিয়েছে।

নীতা তারই মত অবিকল দেখতে।

নীতা যদি একটু স্নেহ একটু ভালবাসা দেয় রাহুল নীতাকেই তার সত্যিকারের মা বলে মেনে নেবে কোন ভুল নেই।

হঠাৎ যেন একটা কথা মনে হয় রীতার। হঠাৎ যেন সে একটা ধাক্কা খায়।

কিন্তু নীতার সন্তানরা—

কটি সন্তান আছে নীতার?

রাহুলকে সে শিখিয়ে দিয়েছে সমরেশই তার বাপ, রাহুল হয়তো তাকে বাবা বলেই ডাকছে, নীতা তার বোন ব্যাপারটা কিভাবে গ্রহণ করবে সেটাই কেবল ভাবনা রীতার।

হয়তো কিছু মনে করবে না, কারণ সে তো জানে রাহুল মাতৃহারা আজ, আর তার বাপ থেকেও নেই।

সমস্ত দিন রীতা কোথায়ও বের হলো না। সন্ধ্যার পর বের হলো।

লেক অঞ্চলে নীতাদের নতুন বাড়ির কথা জানতো না রীতা, এবং সে জানতো না যে তার চিঠি পুরাতন বাড়ি থেকে রি-ডাইরেকটেড হয়ে নতুন বাড়িতে গিয়ে পেঁাছেছিল।

পুরানো পরিচিত বাড়িটার সামনে এসে দাঁড়াতেই সে চমকে উঠলো।

ঘরে ঘরে আলো জ্বলছে।

হৈ হল্লা, গান বাজনার আওয়াজ শোনা যাচ্ছে।

রাস্তার উপর আট দশটা গাড়ি দাঁড়িয়ে।

কেমন যেন হকচকিয়ে যায় রীতা।

বাইরে দারোয়ান দাঁড়িয়ে, পাঞ্জাবী শিখ, রাইফেলধারী।

রীতার ঐ সামান্য বেশভূষা দেখে সেই প্রশ্ন করে, কেয়া মাংগতে হে?

এ কোঠিমে চক্রবর্তী সাব্ হ্যায় না?

নেহি তো, ইসমে তো ধারিওয়াল সাহাব রহতে হে, চক্রবর্তী সাব্ তো দোসরা কোঠিমে রহতে হে।

দোসরা কোঠি?

হ্যাঁ।

দারোয়ানই লেক অঞ্চলের সমরেশের নবনির্মিত গৃহের ঠিকানা বলে দিল।

রীতা সরে আসে।

লেক অঞ্চলে নতুন বাড়িটা খুঁজে নিতে বেশী কষ্ট পেতে হয় না রীতার।

রাত তখন যদিও দশটা বেজে গিয়েছে।

বিরাট নতুন বাড়ি। গেট—গেটের ওধারে ফুলের বাগান।

দোতলার ঘরে ঘরে এতক্ষণ আলো জ্বলছিল, ক্রমে রাত যত বাড়তে থাকে একটা ঘরের আলো ছাড়া অন্য ঘরের আলোগুলো নিভে গেল একে একে।

মনের মধ্যে রীতার যেন একটি মাত্রই চিন্তা রাহুল। তার রাহুল।

রাহুল কেমন আছে?

রাহুল তো তার ঐ বাড়িরই কোন একটা ঘরে আছে।

নীতা কি তাকে নিয়ে শুয়েছে না আলাদা একটা ঘরে শুতে দিয়েছে।

নীতার ছেলে মেয়েরা কিভাবে নিল রাহুলকে কে জানে। রাহুল নিশ্চয়ই সমরেশকে বাবা বলে ডাকছে। আর নীতাকে মা।

একবার—একটিবার যদি দেখে আসতে পারতো।

ঘরে আলো জেবলে না রাখলে বাপী তার ঘুমোতে পাবে না। মায়ের মুখে ঘুমপাড়ানী গান না শুনলে ঘুম আসে না কোনদিনই তার বাপীর।

ঘুমালো, না জেগেই আছে এখনো।

ঐভাবে বাড়ির গেটের এক পাশে ঊর্ধ্বদৃষ্টিতে দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতেই কখন একসময় রাত প্রায় শেষ হয়ে আসে।

রীতা তাড়াতাড়ি ফিরে চলে।

এমনি করে তার পরের রাত, তার পরের রাতও। কিন্তু বাড়ির মধ্যে ঢুকতে সাহস হয় না।

নীতা যদি জানতে পারে, সমরেশ যদি টের পেয়ে যায়, বিশ্রী একটা কেলেঙ্কারী হয়ে যাবে হয়তো। না না, তার কোন প্রয়োজন নেই।

তাছাড়া রীতা ত আজ জগতের চোখে মৃত।

কালই এ শহর ছেড়ে চলে যাবে রীতা।

রাহুলকে তার যাদের হাতে তুলে দিয়েছে তাদের কাছে সে সুখে থাকুক, তার অমঙ্গল ছায়া নিয়ে সে দূরে চলে যাবে।

কিন্তু মনে মনে ভাবা যতটা সহজ কাজে তা হয় না।

পারে না রীতা শহর ছেড়ে চলে যেতে। কি এক অন্ধ আকর্ষণে যেন রাত হলেই লেক অঞ্চলের ঐ বাড়িটা রীতাকে কেবল টানতে থাকে।

পারে না থাকতে।

রাত বাড়লেই সকলের অলক্ষ্যে চুপে চুপে বাণীতীর্থ হোটেল থেকে বের হয়ে যায় ঐ বাড়ির মেথরদের যাওয়ার পিছনের সরু গলিপথটা দিয়ে।

পথটা সে ইতিমধ্যেই আবিষ্কার করেছিল।

সেদিন রাত্রেও বাড়িটার অল্প দূরে রাস্তার এক পাশে দাঁড়িয়েছিল।

হঠাৎ দেখলো একসময় হেডলাইট জ্বালিয়ে একটা গাড়ি এসে গেট দিয়ে ঢুকলো, ও বুঝতে পারে ওটা সমরেশেরই গাড়ি।

কিন্তু কিছুক্ষণ বাদেই গাড়িটা আবার গেট দিয়ে বের হয়ে গেল। এত রাত্রে সমরেশ আবার কোথায় গেল বাড়িতে এসেই।

রীতা দাঁড়িয়েই আছে, ঘণ্টাখানেক পরে গাড়িটা আবার ফিরে এলো।

উপরের ঘরে আলো জ্বলছে।

আধঘণ্টাও গেল না গাড়িটা আবার ঝড়ের বেগে বের হয়ে গেল। রীতা ব্যাপারটা ঠিক বুঝতে পারে না।

এত রাত্রে আবার সমরেশ কোথায় বের হয়ে গেল !

কেন সে বার বার বাইরে যাচ্ছে আর ফিরে আসছে। কোন কিছু হয়নি ত। কোন দুর্ঘটনা। রাহুল ভাল আছে ত।

উপরের ঘরে আলো জ্বলছে।

মায়ের সদাশঙ্কিত প্রাণটা সঙ্গে সঙ্গে উদ্বিগ্ন হয়ে ওঠে।

রীতা আর নিজেকে রোধ করতে পারে না, সমস্ত সংযম যেন তার মুহূর্তে গুঁড়িয়ে যায়, রীতা সব কিছু ভুলে কি এক অন্ধ আকর্ষণে গেট দিয়ে ভিতরে ঢুকে দরজার সামনে এসে দাঁড়ায়।

এখন—এখন কি করে ভিতরে প্রবেশ করবে ?

দরজা তো বন্ধ ভিতর থেকে। তবু দরজার উপরে হাত রাখে আর আশ্চর্য সঙ্গে সঙ্গে দরজাটা খুলে যায়।

দরজা খোলা। ধ্বক করে ওঠে বুকটার মধ্যে রীতার।

সমরেশ নিশ্চয়ই দরজা বন্ধ করে যায়নি বা চাকররাও ভিতর থেকে দরজা বন্ধ করেনি। করতে হয়তো ভুলে গিয়েছে। কিংবা ঘুমিয়ে আছে, ঘুম ভাঙেনি।

বুকটার মধ্যে কি অসহ্য একটা কাঁপুনি। শুধু বুকের ভিতরটা নয় হাত পাও কাঁপছে বুঝি।

দরজাটা ঠেলে ভিতরে পা দিল রীতা।

সামনেই একটা হলঘরের মত। দামী দামী আসবাবপত্রে সুসজ্জিত। এক পাশ দিয়ে চওড়া সিঁড়ি উঠে গিয়েছে।

হলঘরে আলো নেই, কিন্তু সিঁড়ির আলোটা জ্বলছে।

এদিক ওদিক তাকায় ভীত শঙ্কিত দৃষ্টিতে রীতা। কেউ দেখছে না তো তাকে ! আশেপাশে কেউ নেই তো ! উঃ কি দুঃসহ স্তব্ধতা একটা।

কোন শব্দ নেই কোথাও। পা টিপে টিপে সিঁড়ির দিকে এগিয়ে যায়।

এক ধাপ ওঠে আর একবার সামনে পশ্চাতে তাকিয়ে দেখে। কেউ দেখছে না তো ! কেউ নেই তো !

না কেউ কোথায়ও নেই।

সিঁড়িগুলো অতিক্রম করে রীতা একসময় দোতলার বারান্দায় এসে পা ফেলে, টানা বারান্দা নির্জন।

মধ্যরাত্রির স্তব্ধতায় যেন খাঁ-খাঁ করছে। বারান্দার আলোটা অবিশ্যি জ্বলছিল।

পর পর চারটি ঘর। কোন ঘরে আছে রাহুল কে জানে ! প্রথমেই যে ঘরটার দরজা পড়লো সেটায় মৃদু ঠেলা দিল, ভিতর থেকে বন্ধ।

তার পরেরটাও তাই।

এগিয়ে চলে রীতা, হঠাৎ ঐ সময় একটা ঘরের দরজা খুলে গেল, আর রীতা যেন চমকে ওঠে।

তাড়াতাড়ি একপাশে সরে দাঁড়ায়। একটা থামের আড়ালে আত্মগোপন করে।

কিন্তু ও কে ? কে বের হয়ে এলো খোলা দরজা দিয়ে।

রাহুল।

রাহুল এদিক ওদিক তাকাতে তাকাতে বের হয়ে আসে ঘর থেকে। আস্তে আস্তে সিঁড়ির দিকে এগিয়ে চলেছে রাহুল। পিছনে ফিরে ফিরে তাকায়।

কোথায় চলেছ রাহুল অমন করে এত রাতে একা একা !

সিঁড়ির কাছাকাছি আসতেই হঠাৎ থামের আড়াল থেকে বের হয়ে এসে রীতা রাহুলকে আচমকা জাপটে ধরে : বাপী।

কে, মামণি।

বাপী।

মামণি।

চুপ, চুপ বাপী, চেঁচাস না বাপী, কেউ যদি শুনতে পায়।

এসো তুমি আমার ঘরে এসো, রাহুল রীতাকে টানতে টানতে তার ঘরের মধ্যে নিয়ে যায়।

রীতা তাড়াতাড়ি ভিতর থেকে দরজাটার খিল এঁটে দেয়।

এখনো ঘুমোওনি কেন বাপী, এত রাত হয়ে গিয়েছে, রীতা অনেক দিন পরে ছেলেকে পেয়ে তাকে বুকের মধ্যে চেপে ধরে আদর করতে করতে প্রশ্নটা করে।

তুমি বদলে গেছো কেন ?

বদলে গিয়েছি, সেকি বাপী ?

হ্যাঁ বদলে গিয়েছোই তো। আমাকে বাপী বলে আর ডাক না, রাত্রে শোবার পর গান গাইতে বললে আর গান গাও না।

বাপী !

এইতো তুমি আবার আগের মত হয়েছো। সেই সব কাপড়গুলো ছেড়ে ফেলেছো।

রীতা এতক্ষণে ব্যাপারটা বুঝতে পারে।

শিশুর মনে কোথায় সংশয় জেগেছে। কেন নীতা অবিকল একেবারে তার মত দেখতে হলেও তাকে মা বলে সমস্ত মন দিয়ে গ্রহণ করতে পারেনি এখনো রাহুল। এতটুকু একটা বাচ্চা তার মনের মধ্যেও দ্বন্দ্ব দেখা দিয়েছে, হয়তো সবটাই ওর সন্দেহ বা সংশয় নয়, মায়ের প্রতি একটা নিদারুণ অভিমানও ঐ সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে।

মামণি।

কি বাপী ?

তুমি আবার আগের মত বদলে যাবে না তো ?

না বাপী। তারপরই একটু থেমে আবার ডাকে, বাপী !

মামণি।

তুমি পড়াশুনা করো না ?

করি, বাবা তো এখনো আমাকে স্কুলে ভরতি করে দেয়নি, ওখানে যা পড়তাম তাই পড়ি।

ওরা সব স্কুলে যায় না ?

কারা ?

আর সব ছেলেমেয়েরা এ বাড়ির।

বাঃ, কি তুমি, তুমি যেন জান না, এখানে আমি ছাড়া আর কে আছে ?

রীতা তাড়াতাড়ি নিজেকে সামলে নেয়। ঐ সঙ্গে বুঝতে পারে রাহুল ছাড়া এ বাড়িতে আর কোন বাচ্চা নেই।

ঢং ঢং করে বাইরের ঘড়িতে রাত বারটার ঘোষণা শুরু হয়।

অনেক রাত হলো বাপী, এবারে শুয়ে পড়।

রীতা, রাহুলকে শয্যায় শুইয়ে দেয়। তার মাথার চুলগুলো পরম স্নেহে বিলি করে দিতে থাকে।

মামণি।

কি বাপী ?

সেই গানটা—

তুমি চোখ বোজ আমি গাই।

রীতা গুন গুন করে গায় ঃ

ঘুমের পাখীরা আয় আয় এই ঘরে
নিশি রাতে মেলে ডানা।
ঘুম ঘুম আয় ঘুম আয় রে।
ঘুম যাক খোকন সোনা।
ঘুম থাক রে।

ঘুমিয়ে পড়েছে, রাহুল ঘুমিয়ে পড়েছে, গায়ের চাদরটা ওর টেনে দিয়ে, ঘুমন্ত রাহুলের কপালে মৃদু আলগোছে একটি চুমো দিয়ে উঠে দাঁড়ায় রীতা।

চোখের কোলে জল রীতার।

পা টিপে টিপে ঘর থেকে বের হয়ে যায় রীতা, দরজাটা টেনে দেয় নিঃশব্দে, নির্জন স্তব্ধ সিঁড়ি বেয়ে নেমে যায় রীতা।

মাথার মধ্যে যেন আগুন জ্বলছিল সমরেশের।

শুধু তাহলে হোটেলে বা ক্লাবেই নয় নীতার শৈবালের গৃহে গিয়ে নৈশ বিহারও চলে থাকে।

শৈবাল সেনের ক্যামাক স্ট্রীটের বাড়িটা ঠিক একেবারে ক্যামাক স্ট্রীটের উপরে নয় যদিও নাম্বারটা ক্যামাক স্ট্রীটেরই।

একটা ব্লাইণ্ড রাস্তা, তার দু'পাশে খানকয়েক বাড়ি। তারই একটা বাড়ি শৈবালের বাবা স্বর্গত প্রখ্যাত ব্যারিস্টার শৈলেশ্বর সেনের।

গেট খোলাই ছিল। গাড়ি নিয়ে পোর্টিকোর নীচে এসে থামলো সমরেশ, গাড়ি থেকে নেমে কলিং বেল টিপলো।

বেয়ারা এসে দরজা খুলে দিল।

কিসকো মাংগতে ?

সাব্ হ্যায় ?

হ্যাঁ, লেকেন, বেয়ারা ইতস্ততঃ করে কারণ কিছুক্ষণ আগে তার সাহেব সেই মেয়েমানুষটিকে সঙ্গে করে এনে উপরে গিয়েছে।

কিধার হ্যায় সাব্ ?

উপরমে, লেকেন সাব্ তো আভি শো রহা হ্যায়।

ও হাম জানতা হ্যায়, বেয়ারার পাশ কাটিয়ে ভিতরে ঢুকতে ঢুকতে সমরেশ আবার বলে, এক মেম-সাব্ সাব্‌কা সাথ আয়া না ?

জী।

আর কোন প্রশ্নের দরকার নেই।

সমরেশ দ্বিতীয় আর কোন প্রশ্ন করেও না। সিঁড়ির দিকে এগিয়ে যায়।

বেয়ারা বাধা দেয়—দেবার চেষ্টা করে, শুনিয়ে—শুনিয়ে তো, কিধার যা রহে হ্যায় আপ্ !

সমরেশ তার কোন জবাবই দেয় না।

টপাটপ সিঁড়ির ধাপগুলো ডিঙিয়ে চলেছে উপরে।

শুনিয়ে।

ততক্ষণে উপরে উঠে গিয়েছে সমরেশ, সামনেই একটা ঘর, দরজাটা বন্ধ।

॥ এগারো ॥

সে রাত্রে মাত্রা ছাড়িয়ে গিয়েছিল নীতা।

তাছাড়া বেশ কিছুদিন পরে তরল অগ্নি তার জঠরে পড়েছিল, এ কয়দিন যে তীব্র তৃষ্ণাটা তাকে অনুক্ষণ পীড়ন করেছে সেই তৃষ্ণাতেই যেন সে পেগের পর পেগ গ্লাসের পর গ্লাস শেষ করতে থাকে।

আর পাশে দাঁড়িয়ে শৈবাল তাকে উৎসাহ দেয়, এগিয়ে দেয়, নীতা, won't you have another ?

শেষটায় নীতার কথা জড়িয়ে যায়, থেকে থেকে অকারণ হেসে উঠছে, এলোমেলো জড়ানো জড়ানো কথা বলছে। টলছে পা।

শৈবালও সেদিন কম পান করেনি।

তারও দু'চোখের দৃষ্টিতে নেশা ছিল কিন্তু তা ছাড়াও সে দৃষ্টিতে ছিল অন্য একটা তৃষ্ণার আগুন।

সে থেকে থেকে নীতার দিকে তাকাচ্ছিল।

নীতা তার দীর্ঘদিনের ঘনিষ্ঠ বান্ধবী।

নীতা তার ব্যবহারে সহজ চঞ্চল ও আবেগময়ী। এবং বোধহয় সেই কারণেই নীতার ঘনিষ্ঠ সাহচর্য একটু একটু করে দিনের পর দিন শৈবালের বুকের মধ্যে একটা তৃষ্ণা জাগিয়ে তুলেছিল।

হয়তো নীতার ব্যবহারের প্রশ্রয়ও শৈবালের বুকের সেই তৃষ্ণার আগুনে ইন্ধন যুগিয়েছে। আজ সেই তৃষ্ণাই শৈবালকে বুঝি মাতাল করে তোলে।

নেশায় শিথিল নীতার হাত ধরে বলে, চল নীতা এবার ফেরা যাক।

কোথায় ?

কেন, বাড়িতে।

কত রাত হলো ?

রাত এগারটা বেজে গেছে।

তাহলে চল।

দুজনে এসে শৈবালের গাড়িতে বসে। নীতা যেন চোখ মেলে তাকাতেও পারছিল না সে সময়। শরীর টলছে, মাথা ঝিম মিঝ করছে।

শৈবাল যখন তার ক্যামাক স্ট্রীটের বাড়িতে এসে গাড়ি থামালো, নীতা কোন মতে যেন চোখ মেলে তাকায়, পেঁছে গেছি ?

হ্যাঁ, চল !

নীতার হাত ধরে শৈবাল নামায়। ভিতরে ঢুকে নীতা প্রশ্ন করে, এ কোথায় এলে ?

আমার বাড়িতে।

এখানে কেন ?

চল না, তুমি একটু বেশি খেয়েছো, চোখে মুখে জল দিয়ে একটু সামলে নাও তারপর তোমাকে পেঁছে দেবো 'খন কেমন।

নীতা আর আপত্তি জানায় না।

সিঁড়ি দিয়ে উঠে দুজনে এসে শৈবালের শয়নকক্ষে প্রবেশ করে। একধারে একটা ডিভান ছিল, নীতাকে তার উপরে ধীরে ধীরে বসিয়ে দেয় শৈবাল।

কিন্তু বসে থাকতে পারছে না তখন আর যেন নীতা, সে ডাকে—

শৈবাল ?

কি ?

আমাকে বাড়ি পেঁছে দাও।

ব্যস্ত কি দেবোখন, আর এক পেগ হবে ?

নো নো।

এ ঘরটা নীতার একেবারে অপরিচিত নয়। এর আগেও সে এ ঘরে অনেকবার এসেছে, সন্ধ্যায় রাত্রে।

শৈবাল ইতিমধ্যে পাশে এসে বসেছিল নীতাব।

নীতা ?

উঁ।

নেশায় নীতা চোখ খুলতে পারছিল না।

অকস্মাৎ শৈবাল নীতাকে দু'হাতে জাপটে ধরে ডাকে, নীতা, ডার্লিং।

নীতার যেন তখন প্রতিরোধের ক্ষমতাটুকুও লোপ পেয়েছে। সে অসহায়ের মত শৈবালের আলিঙ্গনের মধ্যে নিজেকে ছেড়ে দেয় প্রথমটায় কিন্তু সেটা বুঝি মুহূর্তের জনাই—পরক্ষণেই নিজেকে মুক্ত করবার চেষ্টা করে।

নো নো, শৈবাল—

নীতা-শৈবালের আলিঙ্গন আরো নিবিড় হয়। নেশায় সারাটা দেহ শিথিল হলেও শৈবালের সেই নিবিড় আলিঙ্গন নীতাকে যেন সহসা সচকিত

করে তোলে। সে নিজেকে শৈবালের আলিঙ্গন থেকে ছাড়িয়ে নেবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করে।

কিন্তু অত সহজে সক্ষম হবে কেন নীতা, শৈবালের সমস্ত সংযমের তখন বাঁধ ভেঙে গেছে, এতদিনের তৃষ্ণা।

শৈবালের বুকের মধ্যে আগুন জ্বলে উঠেছে। শৈবাল নীতাকে আরো নিবিড় করে ধরতে চায়।

নীতা একটা প্রবল ঝটকা দিয়ে নিজেকে ছাড়িয়ে কাঁপতে কাঁপতে উঠে দাঁড়ায়, You brut—ইতর।

থর থর করে কাঁপছে নীতা।

শৈবালও উঠে দাঁড়ায়, Don't be silly নীতা।

Not a step more—I shall shout—চীৎকার করে সকলকে ডাকবো।

ডাকবে।

হ্যাঁ, হ্যাঁ ডাকবো। অসচ্চরিত্র—ইতর।

থাক—থাক সুন্দরী, আর সতীত্ব নাই বা দেখালে—everybody knows our relation—রাতদুপুরে আকণ্ঠ মদ্যপান করে যার বুকে মাথা রেখে তার bed room-য়ে এসে ঢুকেছো তার বিরুদ্ধে তোমার ঐ উক্তিগুলো লোককে হাসাবে বই আর কিছুই নয়।

তুমি এত নোংরা, এত ইতর।

তাই বুঝি! আর তুমি, শোন মাই ডিয়ার, ট্রাই টু বি র‍্যাশন্যাল—come back to your senses—হইচই করবার চেষ্টা করলে লোকে তোমার গায়েই থুতু দেবে। মিসেস নীতা চক্রবর্তীকে তো আর শহরে চিনতে কারো বাকী নেই। বরং আমি বলি সমরেশ চক্রবর্তীর সঙ্গে স্বামী স্ত্রীর অভিনয় আর নাইবা করলে—I am ready to marry you—arrange for a divorce.

কি বললে, বিয়ে, তোমাকে!

কথাটা বলে নীতা হঠাৎ পাশের ঘরে ছুটে যায়, সে ঘরে দেওয়াল আলমারিতে শৈবালের পিস্তলটা থাকে জানতো নীতা।

ঐ সংকট মুহূর্তে নীতার সেই পিস্তলটার কথাই বুঝি সর্বপ্রথম মনে পড়েছিল।

একটা রুদ্ধ আক্রোশে সে তখন দলিত নাগিনীর মত ফুঁসছে। নেশা উবে গিয়েছে।

আলমারি খুলে পিস্তলটা নিয়ে এ ঘরে আবার ফিরে আসে।

শৈবাল প্রথমটায় বুঝতে পারেনি হঠাৎ নীতা পাশের ঘরে ছুটে গেল কেন, এখন পিস্তল হাতে তাকে ঘরে ফিরে আসতে দেখে সে লাফিয়ে একপাশে সরে যায়, নীতা—don't be fool—ওটা loaded—নীতা।

কিন্তু শৈবালের কথা শেষ হয় না—তার আগেই নীতা শৈবালকে লক্ষ্য করে পরপর দুটো ফায়ার করে।

কিন্তু হাত কাঁপায় সে মিস্ করে।

নীতা আবার ফায়ার করবার চেষ্টা করে কিন্তু তার আগেই শৈবাল তার উপরে ঝাঁপিয়ে পড়ে হাত থেকে তার পিস্তলটা ছিনিয়ে নেবার চেষ্টা করে আর সেই ধস্তাধস্তির মধ্যে আবার নীতার আঙ্গুলের টানে ট্রিগারে চাপ পড়ে—তৃতীয় বার ফায়ার হয় আর গুলিটা লাগে নীতারই বুকের বাঁ পাশে।

শৈবালের নেশাও ততক্ষণে ছুটে গিয়েছে—সে নীতার হাতটা চেপে ধরে তখন পিস্তলটা ছিনিয়ে নেবার চেষ্টা করে।

দুজনায় আবার ধস্তাধস্তি শুরু হয়।

বেয়ারাটাও সে পিস্তলের আওয়াজ শুনেছিল—সে সিঁড়ি দিয়ে উঠছিল, ঠিক ঐ সময় দরজার কলিং বেলটা বেজে ওঠে।

দরজা খুলে দিতেই সমরেশ এসে ভিতরে ঢোকে।

সমবেশকে বাধা দেবার আগেই সে তরতর করে সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠে আসে, সামনে যে দরজাটা সেটা ঠেলতেই দড়াম করে খুলে যায়।

আর ঘরে পা দিয়েই সমরেশ থমকে দাঁড়ায়, নীতা আহত ক্লান্ত তবু যুঝে চলেছে।

সমরেশ ঠিক ব্যাপারটা বুঝতে পারে না, সে সম্পূর্ণ অন্য ব্যাপার ভেবে সঙ্গে সঙ্গে ঘর থেকে বের হয়ে যায়।

যেমন এসেছিল তেমনি তরতর করে সিঁড়ি বেয়ে নেমে বাড়ি থেকে বের হয়ে গাড়িতে স্টার্ট দেয়।

সমরেশ জানতো না যে তার পরদিনই প্রত্যুষে তারই বাড়ির কয়েক ফার্লং মাত্র দূরে সাদার্ন অ্যাভিনুর উপরেই নীতার মৃতদেহটা আবিষ্কৃত হয়েছিল।

পুলিশ প্রথম যে সংবাদটা পেয়েছিল সেটা হচ্ছে খুব ভোরে, অন্ধকার তখনও ভাল করে কাটেনি, একটা মালবোঝাই লরী একটি মেয়েমানুষকে চাপা দিয়ে পালাবার চেষ্টা করে, কিন্তু কয়েকজন মেথর সে সময় রাস্তা পরিষ্কার করছিল তারা লরীটাকে ধরে আটকায়।

দেহের মুখটা ও মাথাটা একেবারে থেঁতলে গিয়েছিল, মৃতদেহ আইডেণ্টিফিকেশনের আর কোন উপায়ই ছিল না।

লরীওয়ালাকে অ্যারেস্ট করে থানায় নিয়ে যাবার পর মৃতদেহটা পরীক্ষা করতে গিয়ে পুলিশ জানতে পারে মৃতের বুকের পাঁজরায় বুলেট উণ্ড আছে। তাতেই তাদের ধারণা হয়েছিল মৃত্যুর কারণ হয়তো অ্যাকসিডেণ্ট নয়—বুলেট।

লরীওয়ালাও অবিশ্যি বলে সে ইচ্ছা করে চাপা দেয়নি, সম্ভবতঃ মেয়েলোকটি রাস্তার উপরে পড়ে ছিল, সে দেখতে পায়নি চাপা দিয়েছে।

তাহলেও পুলিশ লরীওয়ালাকে মুক্তি দেয়নি, হাজতে বন্দী করে রেখেছে।

মৃতদেহের পাশে একটা সুদৃশ্য দামী লেডিজ ব্যাগ পাওয়া গিয়েছিল—তার মধ্যে কিছু নোট, একটা ইয়েল লকের চাবি, কিছু টুকিটাকি কসমেটিকস্

ও একটা খামে ভরা চিঠি পাওয়া গেছে।

খামের উপরে নীতার নাম লেখা।

চিঠিটা তার বোন রীতার লেখা আগ্রা থেকে।

সেই চিঠির সূত্র ধরেই পুলিশ অফিসার মিঃ সান্যাল এলো পরের দিন বেলা দশটা এগারটা নাগাদ সমরেশের গৃহে।

সেই গভীর রাত্রে শৈবালের বাড়ি থেকে ফিরে এসে সমরেশ যেন মাতালের মতই টলতে টলতে সোজা তার ঘরে ঢুকে খিল তুলে দিয়েছিল ভিতর থেকে আর বের হয়নি, চাকর-বাকরেরা ডাকাডাকি করেও দরজা খোলাতে পারেনি।

পুলিশ অফিসার তার পরিচয় দিয়ে দরজায় ধাক্কা দিতেই এবারে সমরেশ দরজাটা খুলে দেয়।

সারাটা রাত ঘুমায়নি সমরেশ।

মাথার চুল রুক্ষ এলোমেলো—গত দিনের সেই অফিসের পোশাকই তখনো পরিধানে।

চোখের কোল বসে গিয়েছে, সমস্ত চেহারাটার উপর যেন একটা নিদারুণ বিপর্যয়ের চিহ্ন সুস্পষ্ট। যে ডিভানটার উপর সম্ভবতঃ বাকী রাতটুকু বসে কাটিয়েছিল সমরেশ তারই সামনে টেবিলটার 'পরে রক্ষিত সুদৃশ্য কাঁচের অ্যাশট্রেটা পোড়া সিগ্রেটের টুকরো ও ছাইতে স্তূপীকৃত। আশেপাশে ঘরের মেঝেতে দামী কার্পেটের উপরেও সিগ্রেটের ছাই ও অসংখ্য পোড়া টুকরো।

মিঃ চক্রবর্তী, আপনাকে ডিসটার্ব করতে হচ্ছে বলে দুঃখিত, পুলিশ অফিসার বলে।

কি চান? ভ্রূকুটি করে তাকায় সমরেশ মিঃ সান্যালের মুখের দিকে।

মিসেস নীতা চক্রবর্তীকে আপনি চেনেন?

হ্যাঁ।

কে হন তিনি আপনার?

আমার স্ত্রী।

তাঁর সঙ্গে একটিবার দেখা হতে পারে?

এ বাড়িতে নেই।

বাড়িতে নেই?

না।

কোথায়ও গিয়েছেন বুঝি?

হ্যাঁ।

কোথায়?

জানি না, কিন্তু এসব প্রশ্ন করছেন কেন জিজ্ঞাসা করতে পারি কি?

প্রয়োজন আছে বলেই জিজ্ঞাসা করছি।

তাহলে একটা কথা শুনুন, একসময় সে আমার স্ত্রী ছিল বটে কিন্তু এখন তার সঙ্গে আর আমার কোন সম্পর্কই নেই।

কোন সম্পর্কই নেই?

না, এবং তার সম্পর্কে আমি কোন কথা আলোচনাও করতে চাই না—

তাহলে আপনি সত্যিই জানেন না তিনি এখন কোথায় ?

বলছি তো জানি না, আপনি ক্যামাক স্ট্রীটে ব্যারিস্টার শৈবাল সেনের কাছে যান, সে হয়তো বলতে পারবে সেই মহিলাটি এখন কোথায়।

ব্যারিস্টার শৈবাল সেন ?

হ্যাঁ হ্যাঁ, দেখুনগে সেখানেই তার শয্যায় সে এখনো শুয়ে আছে হয়তো !

মিঃ চক্রবর্তী, আপনাকে একটিবার আমার সঙ্গে যেতে হবে।

কোথায় ?

চলুন না।

কিন্তু—

চলুন, বিশেষ প্রয়োজন আছে।

সমরেশকে নিয়ে অতঃপর মিঃ সান্যাল মর্গে এলো।

কেমন যেন বিস্মিত হয় সমরেশ। বুঝতে পারে না পুলিস অফিসাররা তাকে মর্গে নিয়ে আসার কারণটা কি।

এখানে কেন ? সমরেশ শুধায়।

আসুন ভিতরে। মিঃ সান্যাল শান্ত গলায় বলে।

মর্গের মধ্যে ঢুকে স্ট্রেচারে রক্ষিত মৃতদেহটার উপর থেকে চাদরটা সরাতেই সমরেশ থমকে দাঁড়িয়ে যায়।

কী বীভৎস দৃশ্য ! সমস্ত মুখ ও মাথাটা যেন রক্তাক্ত একটা মাংসপিণ্ড, তাহলেও সমরেশের চিনতে কষ্ট হয় না। মৃতদেহটা নীতার।

সমরেশ বোবা। পাথর।

চিনতে পারছেন ?

No no—I can't stand it—let me go—let me go—অর্ধস্ফুট একটা আর্তনাদের মতই যেন কথাগুলো বলতে বলতে সমরেশ স্খলিতপায়ে ঘর থেকে একপ্রকার ছুটে বের হয়ে গেল।

মিঃ সান্যাল তাকে বাধাকে দেয় না। সমরেশ চক্রবর্তীকে জিজ্ঞাসা করবারও আর কিছুই ছিল না।

অতঃপর সে ক্যামাক স্ট্রীটে গিয়ে ব্যারিস্টার শৈবাল সেনের সঙ্গে দেখা করে।

সেখানে নীতা সম্পর্কে অনেক কিছুই সান্যাল জানতে পারে।

স্বামী স্ত্রী, সমরেশ ও নীতা তার দীর্ঘদিনের পরিচিত, নীতার সঙ্গে তার বিশেষ একটু হৃদ্যতাও ছিল। ওদের কোন সন্তানাদি নেই, বর্তমানে ওর কিছুদিন আগে নীতার মৃতা যমজ বোনের একমাত্র সন্তানকে নিয়ে এসেছিল পালন করবে বলে।

বেশ কিছুদিন ধরেই স্বামী স্ত্রীর মধ্যে বনিবনা ছিল না। সমরেশ স্ত্রীকে সন্দেহ করতো আর সেই কারণে ইদানীং ওদের মধ্যে ঝগড়াঝাটি নাকি লেগেই ছিল। এমনকি দুজনে পৃথক ঘরেও শয়ন করতো অনেক দিন থেকে।

হঠাৎ মিঃ সান্যাল প্রশ্ন করে, মিঃ সেন একটা কথা জিজ্ঞাসা করব।

বলুন!

স্বামী স্ত্রীর মধ্যে এই যে মনোমালিন্য চলছিল সত্যিই কি তার কোন ভিত্তি ছিল?

আমার মনে হয় না।

কেন।

নীতা was so nice—

আপনার সঙ্গে মিসেস চক্রবর্তীর বেশ ঘনিষ্ঠতা ছিল মনে হয়।

সে আমার বান্ধবী ছিল।

আচ্ছা মিঃ সেন যদি কিছু মনে না করেন আপনাকে নিয়েই কি—

বলতে পারি না তবে তার জানা উচিত ছিল আমি আর নীতা—we were just only friends।

আচ্ছা নীতা চক্রবর্তীর কোন খবর আপনি রাখেন?

কেন, কাল রাত্রেও তো রেইনবো ক্লাবে আমাদের দেখা হয়েছে, আমরা দুজনে একসঙ্গে ড্রিংক করেছি, বেচারী কাল রাত্রে মনের দুঃখে একটু বেশী খেয়েছিল, আমি তো তাকে কাল রাত্রে তার বাড়িতে নামিয়ে দিয়ে চলে আসি শেষ পর্যন্ত।

সেটা কখন?

রাত এগারটা হবে।

নীতা সম্পর্কে সব কথা তখন মিঃ সান্যাল শৈবালকে বলে।

একটা কথা আপনি বোধ হয় এখনো জানেন না মিঃ সেন।

কি কথা!

মিসেস চক্রবর্তী মারা গেছেন।

মারা গেছে, how absurd, কি বলছেন আপনি অফিসার!

হ্যাঁ, মারা ঠিক নয় তাকে হত্যা করা হয়েছে।

হত্যা!

হ্যাঁ, তার দেহে বুলেট পাওয়া গেছে।

Bullet—you mean bullet?

হ্যাঁ।

অতঃপর শৈবাল সেনকে দিয়েও মিঃ সান্যাল মৃতদেহটা আর একবার আইডেন্টিফাই করায়।

শৈবাল বলে, What a horrible sight, মুখটা মাথাটা যদিও একেবারে smashed তাহলেও ওই যে নীতা চক্রবর্তী সে সম্পর্কে আমি নিঃসন্দেহ।

পরের দিন পোস্ট মর্টেম রিপোর্ট পাওয়া গেল।

পুলিশ সার্জনের মতে মৃত্যুর কারণ অ্যাক্সিডেন্ট নয়, বুলেটই।

বুলেট উণ্ড থেকে রক্তক্ষরণ হয়েই তার মৃত্যু হয়েছে।

মৃত্যুর পর আততায়ী নিশ্চয়ই মৃতদেহটা রাস্তায় ফেলে রেখে যায় কোন এক সময় ব্যাপারটাকে এড়াবার জন্য।

পরের দিন আবার সমরেশের গৃহে গিয়ে সান্যাল সব চাকর-বাকরদের নানাভাবে জেরা করে এবং জানতে পারে দুর্ঘটনার দিন রাত্রে সমরেশ অফিস থেকে ফিরে এসে ঘণ্টাখানেক পরেই একা গাড়ি নিয়ে বের হয়ে যায়, ঘণ্টা-খানেক পরে আবার ফিরে আসে।

আবাব ঘণ্টাখানেক বাদে বের হয়ে যায়, তারপর কত রাত্রে ফিরেছে চাকরবাকরেরা জানে না, কেউ কিছু বলতে পারে না।

আরো সংবাদ পায় সমরেশের একটা পিস্তল আছে।

ইতিমধ্যে সমরেশ রাহুলকে দেখাশোনা করবার জন্য সুখদাকে চিঠি দিয়ে ফিরিয়ে এনেছিল, সে বলে তার জবানবন্দিতে, দিদিমণি ও দাদাবাবুর মধ্যে দীর্ঘদিন ধরেই মন কষাকষি চলছিল কথাটা মিথ্যা নয়।

কেন ?

কেন আর কি, নীতা দিদিমণির উচ্ছৃংখল স্বভাবের জন্যে, সন্ধ্যা হলেই ক্লাব পার্টি. মাঝরাতে মদ খেয়ে টলতে টলতে বাড়ি ফিরতো, কোন স্বোয়ামী এমন বেলেল্লাপনা সহ্য করতে পারে বলুন ? আর শনি ঐ ব্যারিস্টারটা, ওই তো যত নষ্টের গোড়া।

তুমি তো এঁদের বাড়িতে অনেক দিন ছিলে, তাই না ?

হ্যাঁ।

চলে গিয়েছিলে কেন ?

বিরক্ত হয়ে।

আচ্ছা, নীতা দেবীর একজন যমজ বোন ছিল না।

হ্যাঁ, রীতা।

তিনি কোথায় ?

আহা শুনলাম সেও নাকি বেঁচে নেই।

মারা গেছেন ?

হ্যাঁ, ঐ রাহুল তো তারই ছেলে।

সমরেশ অফিসে বেরুচ্ছিল না দু'দিন ধরে।

তার ঘরের মধ্যেই সর্বক্ষণ থাকতো।

মিঃ সান্যাল উপরে সমরেশের ঘরের সামনে গিয়ে দাঁড়ালো।

সমরেশ ডিভানটার উপরে বসে ছিল।

ভিতরে আসতে পারি ?

আসুন।

সান্যাল ভিতরে এসে ঢোকে, আবার আপনাকে বিরক্ত করতে আসতে হল বলে দুঃখিত মিঃ চক্রবর্তী, কয়েকটা প্রশ্ন আমার ছিল।

সমরেশ কোন সাড়া দেয় না।

আপনি বোধহয় এখনো শোনেননি, আপনার স্ত্রীর মৃত্যুর কারণ পোস্ট মর্টেমে প্রমাণিত হয়েছে পিস্তলের গুলিতেই।

সমরেশ যেন পুলিশ অফিসারের কথাটা ঠিক হৃদয়ঙ্গম করতে পারেনি—

কেমন যেন বোবা দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে তার মুখের দিকে।

ভাল কথা মিঃ চক্রবর্তী, আপনার তো একটা পিস্তল আছে ?

আছে।

লাইসেন্স আছে নিশ্চয়ই ?

আছে।

পিস্তলটা একবার দেখতে পারি ?

সমরেশ কোন কথা বলে না, নিঃশব্দে উঠে গিয়ে পাশের ঘর থেকে পিস্তলটা এনে মিঃ সান্যালের হাতে দেয়।

মিঃ সান্যাল পিস্তলটা পরীক্ষা করে, ম্যাগাজিন চেম্বারে পাঁচটি গুলি আছে।

আপনি কি পিস্তল সব সময় লোড করে রাখেন ?

না।

তবে এটা লোডেড কেন ?

মধ্যে মধ্যে টার্গেট প্র্যাকটিশ করি নীচের বাগানে।

কবে লাস্ট প্র্যাকটিশ করেছেন ?

দিন সাতেক আগেই বোধ হয়।

চেম্বারে দুটো গুলি নেই দেখছি।

হবে।

শেষ যেদিন টার্গেট প্র্যাকটিশ করেন কটা গুলি ছুড়েছিলেন ?

মনে নেই।

হুঁ, আচ্ছা এটা আমি আপাতত নিয়ে গেলাম।

সমরেশ হাঁ বা না কিছুই বলে না।

॥ বারো ॥

উক্ত ঘটনার দুদিন পরেই মিঃ সান্যাল সমরেশকে অ্যারেস্ট করলো তার স্ত্রীকে হত্যার সন্দেহে।

আই অ্যাম সরি মিঃ চক্রবর্তী।

সমরেশ কোন কথা বলে না কেবল মৃদু হাসে।

সুখদাকে ঘরের মধ্যে ডেকে পাঠালো সমরেশ, সুখদা।

দাদাবাবু।

রাহুল রইলো ওকে দেখো, উনি আমাকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে যাচ্ছেন।

ওমা, সেকি গো, সে আবার কি কথা !

হাউ মাউ করে চেঁচিয়ে ওঠে সুখদা।

হ্যাঁ, ওঁদের ধারণা তোমার দিদিমণিকে আমিই নাকি গুলি করে মেরেছি সুখদা।

না, না, দারোগাবাবু তোমাদের কি মাথা খারাপ হলো ? দাদাবাবু তেমন মানুষ নয়।

সমরেশ বলে, অফিসের বীরেনবাবু এসে তোমাদের দেখাশোনা করবেন—

যখন যা টাকা পয়সার দরকার তিনিই দেবেন, আর তাঁকে বলো আগ্রায় ডাক্তার সুনীল চৌধুরীকে যেন একটা চিঠি দেন আসবার জন্যে।

সমরেশ অতঃপর বললে সান্যালকে, চলুন।

ওরা নামছে, দেখলো দরজার উপরে এসে দাঁড়িয়েছে রাহুল। এই কয়দিন একমাত্র রাহুলের সঙ্গে ছাড়া সমরেশ আর কারো সঙ্গেই কথা বলেনি।

থমকে দাঁড়ালো সমরেশ।

বাপী।

রাহুল এগিয়ে আসে, তুমি অফিস যাচ্ছো বাপী?

না বাপী।

তবে কোথায় যাচ্ছো?

হঠাৎ কি জবাব দেবে পুত্রের কথার ঠিক বুঝে উঠতে পারে না সমরেশ। মুখ দিয়ে তার যেন কোন কথাই বের হয় না। ছেলেকে হঠাৎ বুকের উপর তুলে নেয়।

শোন বাপী আমি একটু বাইরে যাচ্ছি, তুমি কিন্তু খুব লক্ষ্মী হয়ে থাকবে, কেমন?

মামণি কোথায় বাপী? সেই যে পরশু রাত্রে এসে, আমাকে গান গেয়ে ঘুম পাড়ালো, কখন চলে গেল মামণি, কখন আবার আসবে বাপী?

সমরেশ তাড়াতাড়ি রাহুলকে একটা চুমো খেয়ে তাকে নামিয়ে দিয়ে তরতর করে সিঁড়ি বেয়ে নীচে নেমে যায়।

মিঃ সান্যালের দিকে ফিরেও তাকায় না।

মিঃ সান্যাল রাহুলের দিকে তাকায়, তোমার মামণি বুঝি সে রাত্রে এসেছিল?

হ্যাঁ।

মিঃ সান্যাল আর কোন প্রশ্ন করে না রাহুলকে, সিঁড়ি দিয়ে নীচে নেমে যায়।

পরের দিন গভীর রাত্রে। বাড়ির সবাই ঘুমিয়ে পড়েছে। কেবল রাহুল ঘুমায়নি বলে সুখদা তার শয্যার পাশে বসে তাকে ঘুম পাড়াবার চেষ্টা করছিল।

কলিং বেলটা বেজে উঠলো।

এত রাত্রে আবার কে এলো, সুখদা তাড়াতাড়ি নীচে নেমে যায়। দরজা খুলতেই সর্বাঙ্গ চাদরে ঢাকা এক নারীমূর্তি ভিতরে এসে পা দেয়।

সংবাদপত্রেই সমরেশের গ্রেপ্তার হওয়ার সংবাদটা প্রকাশিত হয়েছিল—রীতা সংবাদটা পড়ার পর থেকেই সারাটা দিন ছটফট করেছে।

সমরেশ তার স্ত্রী নীতার হত্যাপরাধের সন্দেহে গ্রেপ্তার হয়েছে।

নারীমূর্তি ভিতরে প্রবেশ করতেই সুখদা প্রশ্ন করে, কে গা তুমি?

সুখদা।

কে?

মুখের উপর থেকে গুণ্ঠন অপসারিত করে রীতা।

সুখদা আমি।

হঠাৎ ভয়ে চীৎকার করে ওঠে সুখদা।

নীতা—রীতা ত দুজনেই মরে গেছে। তবে এ আবার কে!

কে, কে!

সুখদা আমি—আমি—রীতা।

ছোট দিদিমণি।

হ্যাঁ, চুপ।

তুমি, তবে যে সবাই বললে তুমি—তুমি আর বেঁচে নেই।

ভুল বলেছে সুখদা, আমি মরিনি বেঁচে আছি।

তুমি মরনি! বেঁচে আছো?

হ্যাঁ।

এতদিন কোথায় ছিলে তবে?

সুখদার কথার জবাব না দিয়ে রীতা প্রশ্ন করে, রাহুল ঘুমিয়েছে?

না।

জেগে আছে?

হ্যাঁ।

রীতা আর দাঁড়ায় না সোজা সিঁড়ি বেয়ে উপরে চলে যায় বিস্মিত হতভম্ব সুখদাও রীতাকে অনুসরণ করে।

রীতা ঘরে ঢুকে রাহুলকে ডাকে, বাপী।

মামণি।

রাহুল ছুটে এসে রীতার বুকের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে, মামণি, এ দু'দিন তুমি আসনি কেন?

তুমি এখনো ঘুমাওনি, চল শোবে চল রাহুল।

ছেলেকে এনে শয্যায় শুইয়ে দেয়।

আর তুমি চলে যাবে না তো মামণি?

না, তুমি ঘুমাও।

রীতা ঘুমপাড়ানী গান গায়, রাহুল নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে পড়ে দেখতে দেখতে।

অল্প দূরে দাঁড়িয়ে দেখছিল বীতাকে সুখদা।

রাহুল ঘুমিয়ে পড়লে উঠে দাঁড়ায় রীতা।

সুখদা।

ছোট দিদিমণি।

চল পাশের ঘরে, তোর সঙ্গে কথা আছে।

পাশের ঘরে গিয়ে রীতা সুখদার সঙ্গে অনেকক্ষণ ধরে কথা বললো।

পরের দিন সকালে।

রীতা গিয়ে হাজির হলো অবিকল নীতার মত বেশভূষা করে মিঃ

সান্যালের অফিসে।

মিঃ সান্যালের বিস্ময়ের যেন অবধি থাকে না রীতাকে দেখে, কারণ নীতার যে ফটো সে সমরেশের ঘর থেকে সংগ্রহ করে এনেছিল সেই ফটোর চেহারার সঙ্গে রীতার চেহারা হুবহু একেবারে এক।

আপনি!

আমি মিসেস নীতা চক্রবর্তী।

মানে সমরেশবাবুর স্ত্রী?

হ্যাঁ, আপনাদের ধারণা আমার স্বামী আমাকে গুলি করে হত্যা করেছেন কিন্তু তা সত্যি নয়, আমার মৃত্যু হয়নি, দেখছেনই তো আপনার সামনে আমি সশরীরে দাঁড়িয়ে।

হ্যাঁ, তা তো দেখতেই পাচ্ছি কিন্তু—

স্বামীর সঙ্গে সে রাত্রে কথাকাটাকাটি হওয়ায় বাড়িতে এসে আমি তখুনি চলে যাই।

কোথায় ছিলেন এ কয়দিন আপনি?

একটা হোটেলে, সেখানেও আপনি খোঁজ নিতে পারেন আমার কথা সত্য না মিথ্যা, এবারে নিশ্চয়ই আমার স্বামীকে আপনাদের মুক্তি দিতে কোন বাধা নেই।

সান্যালের তখন যেন সব গোলমাল হয়ে যাচ্ছে।

ব্যাপারটা তার মাথার মধ্যে যেন কিছুই ঢুকছে না।

একটা কথা জিজ্ঞাসা করতে পারি? রীতা আবার প্রশ্ন করে।

বলুন।

মৃতদেহটা সনাক্ত করেছিল কে? আমার স্বামী কি সনাক্ত করেছিলেন?

করেছিলেন বৈকি।

তিনি বলেছিলেন দেহটা তাঁরই স্ত্রীর।

না, মুখে তিনি তা বলেননি বটে তবে—

তবে, আপনারাও সে দেহটা যে মিসেস নীতা চক্রবর্তীরই ছিল সে সম্পর্কেও ডেফিনিট হতে পারেননি।

কিন্তু অন্যান্য প্রমাণ।

যে প্রমাণই থাক না কেন আমি নিজে যখন আপনাদের সামনে সশরীরে উপস্থিত হয়েছি তার চাইতে আর কি বড় প্রমাণ আপনারা আশা করেন। আর আমি আপনাদের কমিশনারের সঙ্গে একবার দেখা করতে চাই।

সান্যাল আপত্তি করতে পারে না।

সত্যিই তো এত বড় অকাট্য প্রমাণের পর আর সন্দেহের অবকাশ কোথায়?

তাছাড়া মৃতের মুখটা এমনভাবে থেঁতলে গিয়েছিল যে অন্যান্য প্রমাণ থাকলেও ঐ মৃত নারীই যে নীতা চক্রবর্তী সেটা তো নির্ভুলভাবে প্রমাণ হয়নি।

পুলিশের মনের মধ্যে কিন্তু একটা থাকলেও সেই কিন্তুর উপর নির্ভর করে জোর গলায় নীতাকে অস্বীকারও করতে পারেন না।

শেষ পর্যন্ত আদালতে কেসটা উঠলো। কারণ নীতা চক্রবর্তীর এক যমজ বোন ছিল, যদিও তার মৃত্যু হয়েছে কিছুদিন আগে রেল অ্যাক্সিডেন্টে, সেক্ষেত্রেও সন্দেহ থেকে গিয়েছে কারণ নীতার মুখটাও চাকায় পিষ্ট হয়ে গিয়েছিল।

নির্ভুলভাবে যে সেই, নীতা, একমাত্র সেটা ডাঃ সুনীল চৌধুরীর সাক্ষ্যেতেই প্রমাণিত হয়েছিল। কারণ মৃতদেহ ডাঃ চৌধুরীই সনাক্ত করেছিল।

তবে কি যে মৃতদেহটা নীতা চক্রবর্তীর বলে সনাক্ত করা হয়েছে সেটা আদৌ নীতা চক্রবর্তীর মৃতদেহ নয় ?

অন্য কারোর মৃতদেহ।

আদালতে তারও ডাক পড়ে।

কিন্তু এক্ষেত্রে সবচাইতে বড় সাক্ষী নীতার সন্তান রাহুল।

শিশু রাহুলকে কাঠগড়ায় এনে দাঁড় করানো হল।

মা আর ছেলে মুখোমুখি আদালতে দাঁড়িয়ে।

বিচিত্র মামলায় বিচিত্র পরিস্থিতি।

তোমার নাম রাহুল ?—প্রসিকিউশন কাউনসেল প্রশ্ন করেন রাহুলকে।

হ্যাঁ।

ঐ তোমার মামণি, ভাল করে দেখ তো !

নীতা ছেলেকে প্রশ্ন করে, রাহুল, আমি তোমার মামণি না ?

না।

রাহুল শোন, নীতা আবার ডাকে।

না না, কিছুতেই না, কিছুতেই না, তুমি আমার মামণির মত দেখতে কিন্তু মামণি নও, আমার মামণি আমাকে কখনো রাহুল বলে ডাকতো না, বাপী বলে ডাকতো।

নীতার দু'চোখে জল। ঝরঝর করে অবারিত অশ্রু তার গণ্ড ও চিবুক প্লাবিত করে দিতে থাকে।

জজসাহেব জুরিদের সঙ্গে একমত হয়ে রায় দিলেন, সমরেশ নির্দোষ।

সমরেশ আদালত থেকে বের হয়ে এলো।

সেও স্তব্ধ, নির্বাক। সত্যিই সে যেন বোবা হয়ে গিয়েছে।

আর ডাঃ সুনীল চৌধুরী, সেও যেন নির্বাক হয়ে গিয়েছিল কারণ নীতাকে চিনতে তারও কষ্ট হয়নি।

পাঁচ ছয় বছর ধরে সে একান্ত ঘনিষ্ঠভাবে নীতাকে দেখবার সুযোগ পেয়েছিল, অত্যন্ত কাছাকাছি ছিল তারা।

আর সমরেশ। সমরেশও কি নীতাকে নীতা বলে ভুল করতে পারে ?

সেও গোড়া থেকেই বুঝতে পেরেছিল নীতার মৃত্যুর ব্যাপারটা মিথ্যা—নীতা সেদিনকার এ্যাকসিডেন্টে মারা যায়নি, এবং সেই দুর্ঘটনার রাত্রে

পুত্রের কাছে গিয়েছিল। বুঝতে পেরেছিল সমরেশ রীতা তাকে ফাঁসির দড়ি থেকে বাঁচানোর জন্যই ঐ মিথ্যার আশ্রয় নিয়েছে।

আদালত থেকে ফিরে সমরেশ গৃহে ফিরে এসে নিজের ঘরে প্রবেশ করতেই দেখে রীতা ডিভানটার উপরে চুপটি করে বসে আছে। দুজনা দুজনার মুখের দিকে কিছুক্ষণ অপলক দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে নিঃশব্দে।

তোমার কাছ থেকে বিদায় নেবো বলে তোমার অপেক্ষা করছিলাম— বলতে বলতে একসময় রীতা উঠে দাঁড়ায়।

রীতা।

না, রীতা নয়, নীতা, রীতা অনেক দিন মরে গেছে।

কিন্তু এ কাজ তুমি কেন করলে রীতা, যে তোমাকে চরম অপমান করে একদিন—

ছিঃ ও কথা বলো না। তুমি তো আমাকে অপমান করোনি। তারপর একটু থেমে রীতা বলে, মিথ্যা বলবো না আজ আর। সেদিন যে তোমার ওপরে আমার অভিমান হয়নি তা নয়, ক্ষোভও ছিল আমার কিন্তু আজ আর কোন অভিমান কোন ক্ষোভ নেই, তুমি আমার সন্তানকে গ্রহণ করেছো, আজ সেই আনন্দেই বুক আমার ভরে গিয়েছে। আমি নিশ্চিত, রাহুল তার অভিমান একদিন ভুলে যাবে, তার মামণিকেও ভুলে যাবে। তাই হোক— তাই হোক।

রীতা ধীরে ধীরে দরজার দিকে এগিয়ে যায়।

সমরেশ যেন সহসা সংবিৎ ফিরে পায়, তাড়াতাড়ি এগিয়ে এসে রীতার হাত ধরে, না।

যেতে দাও, আমাকে বাধা দিও না সমরেশ।

না, ভুলে যাচ্ছো কেন তুমি তো রীতা নও তুমি তো আজ নীতা।

সমরেশ দু'হাতে রীতাকে বুকের মধ্যে টেনে নেয়।

রাহুল যে ইতিমধ্যে কখন এসে দরজার উপর দাঁড়িয়েছে ওরা জানতেও পারেনি। হঠাৎ সমরেশের ঐদিকে নজর পড়তেই ডাকে, বাপী।

রাহুল কিন্তু নড়ে না যেমন দাঁড়িয়ে ছিল তেমনি দাঁড়িয়ে থাকে।

চেয়ে আছে সে ওদের দিকে।

এবারে রীতা ডাকে, বাপী?

মামণি বলে, রাহুল ছুটে আসে।

রীতা রাহুলকে বুকে তুলে নেয়, বাপী, আমার সোনামণি বাপী!

মামণি, আর তুমি বদলে যাবে না তো?

না বাপী।

আর তুমি চলে যাবে না?

না বাপী।

বাইরে সুনীলের গলা শোনা গেল, সমরেশ।

সুনীল, এসো এসো ভিতরে এসো।

ভেনডেটা

স্বর্ণেন্দু, এখানকার বাস আমার উঠল।

এখানে আজই আমার শেষরাত্রি, শেষরাত্রিরও সবটুকু নয় কারণ এ রাত্রি শেষ হবার আগেই আমাকে এখান থেকে রওনা হতে হবে।

মনে পড়ছে এই তো সেদিন এক রাত্রিশেষেই চিরদিনের পরিচিত গৃহকোণটি ছেড়ে এক অনির্দিষ্ট আশ্রয়ের সন্ধানে এখানে এসে পা দিয়েছিলাম। এবং আশ্চর্য ভাবেই আজকের এই আশ্রয়টি পেয়ে গিয়েছিলাম।

মনে হয়েছিল, বাঁচলাম—নিশ্চিন্ত হলাম।

কিন্তু বিধাতা পুরুষ বোধহয় সেদিন ঐ মুহূর্তটিতে অলক্ষ্যে বসে হেসেছিলেন, তাই পুরো পাঁচটা বছরও গেল না, আবার আজ রাত্রে সেদিনকার মত এক অনির্দিষ্ট পথে পা বাড়াতে চলেছি।

আর মজা কি জান, সেদিন আমার ঘর ছাড়ার পিছনে যাদের কুটিল জঘন্য চক্রান্ত ও নীচতা ছিল আজও ঠিক তারাই আমাদের ঘর ছাড়া করল।

পথে আবার বেরুতে বাধ্য করল।

কিন্তু বলতে পার স্বর্ণেন্দু, আজ মানুষের মনের একটা দিক মহাশূন্যপথে গ্রহ হতে গ্রহান্তরে যখন যাতায়াত করছে তাদেরই মনের অন্য দিকটায় তখন এত অন্ধকার কেন?

নীচতার কুশ্রীতার এমন হলাহল ফেনিয়ে ফেনিয়ে ওঠে কেন?

অবিশ্যি তোমাকে আমি সেই দলে টানছি না।

তুমি তো তাদের মধ্যে থেকেও কলুষিত নও, তাদের মধ্যে থেকেও তাদের কেউ নও, তাই তো অকুণ্ঠ ধন্যবাদ, অকুণ্ঠ শ্রদ্ধা তোমার প্রতি আমার যেমন চিরদিন আছে তেমনি থাকবেও চিরদিন।

সমস্ত মানুষের প্রতি আমার সমস্ত অবিশ্বাস-অশ্রদ্ধার মধ্যে তুমিই সে আমার একমাত্র সান্ত্বনা। সমস্ত মিথ্যার মধ্যে একমাত্র সত্য।

তাই যতদূরে যেখানেই যাই না কেন ধ্রুবতারার মত তোমারই দিকে যে একমাত্র তাকিয়ে আছি সর্বক্ষণ।

কুন্তী তার কোয়ার্টারে বসে চিঠিটা লিখছিল।

রাত অনেক হয়েছে।

অদূরে শয্যায় শুয়ে চার বছরের মেয়ে সীতা ঘুমাচ্ছে। এমন ছটফট করে সারাটা রাত মেয়েটা ঘুমের মধ্যে, কিছুতেই গায়ে লেপটা রাখে না।

কেবলই সরে সরে যায়—

আর কুন্তীর ঐ এক কাজ, সেই লেপ টেনে টেনে ঠিক করে দেওয়া মধ্যে মধ্যে সারাটা রাত ধরে সজাগ থেকে।

আশ্চর্য, মেয়েটার শীতবোধও যেন তেমন নেই।

দিব্যি উদলো গায়ে এই শীতের মধ্যেও ঘুমিয়ে থাকে।

এই কয়দিন ধরে আবার কি প্রচণ্ড হয়েই না শীতটা পড়েছে। গতকাল ও পরশু কুন্তী তো স্পষ্টই দেখেছে, বাইরে ঐ মাঠের উপর পাতলা বরফের মত শিশির জমে আছে।

এই ঘরের পশ্চিম দিককার জানালার কাচ দুটো সীতা কয়েকদিন আগে খেলতে খেলতে কেমন করে যেন ভেঙে ফেলেছে একটা বল ছুঁড়ে, সেক্রেটারি নীলমাধববাবুকে জানায়নি কথাটা কুন্তী—

জানায়নি তার কারণ প্রথমত সে তো চলেই যাচ্ছে আর দ্বিতীয়ত নীল মাধববাবু হয়তো কয়েকটা বাঁকা বাঁকা কথা শুনিয়ে দিতেন।

বাইরের ঠাণ্ডা তো আটকাতে হবে তাই ঐ জানালার ফাঁকগুলো খবরের কাগজ কেটে আঠা দিয়ে এঁটে দিয়েছিল কুন্তী, কিন্তু গতকাল কারা যেন ইট মেবে তাও আবার ফাটিয়ে দিয়েছে।

ফাটা আর ভাঙা জানালার কাচের মধ্যে দিয়ে হিমতীক্ষ্ণ হওয়ার একটা প্রবাহ ঘরের মধ্যে এসে যেন ঢুকছে।

জানালার পর্দাগুলো পর্যন্ত নেই, বিকেলেই সেগুলো খুলে বাক্সের মধ্যে ভরে দিয়েছিল কুন্তী।

সীতার গায়ের লেপটা আবার সরে গিয়েছে।

কুন্তী হাতের কলমটা টেবিলের ওপরে নামিয়ে রেখে উঠে দাঁড়াল।

লেপটা সীতার গায়ে টেনে দিয়ে আবার এসে চেয়ারটায় বসল।

আপনা থেকেই যেন ঘরের চারিদিকে আবার নজর পড়ে কুন্তীর, ফিরে ফিরে তাকায় ঘরের চারিদিকে।

প্রায় দীর্ঘ পাঁচ বছর ধরে এই ঘরটিতে সে আছে।

এক-আধ দিন তো নয়, দীর্ঘ পাঁচ পাঁচটা বছর।

কালও ছিমছাম ছিল সমস্ত ঘরটা, যেই যখন তার ঘরে এসে পা দিয়েছে, বলেছে, তোমার ঘরের মধ্যে পা দিলেই কি মনে হয় জান কুন্তীদি—

কি—

এ ঘরের প্রত্যেকটি বস্তুর মধ্যে একটা সযত্ন পরিচ্ছন্নতার সঙ্গে সঙ্গে একটা গভীর মমতা যেন সর্বত্র জড়িয়ে আছে—

আঃ, মেয়েটা আবার গায়ের লেপটা ফেলে দিয়েছে।

কুন্তীকে আবার উঠতে হল, আবার সীতার গায়ের লেপটা ঠিক করে দিতে হল।

ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া কোঁকড়ান চুলগুলো কপালের ওপরে গালের ওপরে এসে পড়েছে, সযত্ন মমতায় এলোমেলো চুলগুলো সীতার ঠিক করে দিল কুন্তী।

অদ্ভুত একটা আলগা শ্রী আছে মেয়েটার চোখে মুখে।

মায়ের রঙ পায়নি বটে তবে মার বাঁ-গালের তিলটা আছে, ঠিক বাঁ-গালেই সীতার।

কালো তিলটা।

আবার টেবিলের সামনে এসে চেয়ারটা টেনে নিয়ে বসল কুন্তী।

গোছগাছ যা করবার সবই করে রেখেছে বিকেলে।

সাঈদা এসেছিল তাকে সাহায্য করবার জন্য। তার সাহায্যেই গোছগাছ সব সেরে রেখেছে কুন্তী সন্ধ্যায়।

ঐ সাঈদা মেয়েটি বড় ভাল।

মেয়েটার মনের মধ্যে অদ্ভুত একটা যেন মর্যাদাবোধ আছে।

মুসলমানের মেয়ে, স্বামীটা একটা দুশ্চরিত্র মাতাল, কবে বছর চারেক আগে ওর বয়স যখন মাত্র নাকি আঠার কি উনিশ তখনই তালাক হয়ে গিয়েছিল।

তারপর আবার ইচ্ছা করলেই হয়তো সাঈদা বিয়ে করতে পারত, বিশেষ করে ঐ ইসমাইল ছেলেটিকে, কিন্তু করেনি।

করবেও না কোনদিন।

অথচ ইসমাইল ছেলেটি সত্যি ওকে ভালবাসে।

ইসমাইলকে অনেকবার দেখেছে কুন্তী এখানে আসে মধ্যে মধ্যে সাঈদার সঙ্গে দেখা করতে, চমৎকার ছেলেটি, ভারী নম্র, ভারী মিষ্টি—

দেখতেও কালোর উপর মোটামুটি মন্দ নয়, চাকরি-বাকরি করে না, কলকাতা শহরে নিজের কাঠের ক্যাবিনেটের ব্যবসা আছে পার্ক স্ট্রীট না কোথায়।

বেশ ফলোয়া ব্যবসা।

ওদের পরস্পরের পরিচয় প্রায় বছর দুয়েকের বেশী হবে, এবং একটা ঘনিষ্ঠতা যে গড়ে উঠেছে ওদের পরস্পরের মধ্যে তাও জানে কুন্তী—

তবু—

তবু সাঈদা যেন কেমন নিস্পৃহ ইসমাইলের ব্যাপারে।

প্রথম প্রথম কুন্তী ভেবেছে বুঝি সাঈদা ওকে যাচাই করে নিচ্ছে, পরে কিন্তু মনে হয়েছে তা নয়।

তাই ও সাঈদাকে না জিজ্ঞাসা করে পারেনি—

মানুষটা কিন্তু সত্যিই ভাল সাঈদা—

তাই কি—

ওকে বিশ্বাস বোধহয় করতে পার—

কিন্তু সাঈদা বলে, পুরুষ জাতটাকে আর আমি বিশ্বাস করি না কুন্তীদি—

শুধিয়েছিল কুন্তী, কেন রে?

না, বিশ্বাস করি না—

সবাই ত কিছু আর মনসুর সাহেব হয় না? কুন্তী বলেছিল।

সবাই তাই, সব পুরুষের মুখেই যেন থাকে একটা করে মুখোশ।

কিন্তু ও ত তোকে সত্যিই ভালবাসে সাঈদা।

সাঈদা বলেছিল, ওটা কেতাবী কথা, গল্পের কথা। শুনতেই ভাল লাগে, সত্যিকারের জীবনে ওর কোন মূল্য নেই—

ইচ্ছা হয়েছিল সে সময় কুন্তীর যে বলে, না রে, না, তুই জানিস না তাই বলছিস, আছে রে, ভালবাসা আছে, ও বস্তুটা না থাকলে পৃথিবী এতদিন অরণ্যে পরিণত হ'ত, মরুভূমি হয়ে যেত।

কুন্তী আবার কলমটা তুলে নেয়, চিঠিটা শেষ করবার জন্যই বোধ করি।

সাঈদা বিশ্বাস হারিয়েছে তাই ওর বিশ্বাস নেই কিন্তু আমি বিশ্বাস করি স্বর্ণেন্দু—

ভালবাসা আছে—

আর ভালবাসা আছে বলেই আজও আমি বেঁচে আছি—

আমার সীতা বেঁচে আছে।

আর ভালবাসা না থাকলে এত বড় জোর তোমার ওপরে খাটাতাম কি করে আমি বলত। তাই মেয়েটার জন্য সত্যি দুঃখ হয় আমার।

বড় সরল, বড় সহজ মেয়েটা, কিছুটা বোধ করি ঐ কারণে নির্বোধও।

আশ্চর্য।

দেখ আমার নিজের দুঃখের শেষ নেই। অথচ আমি সাঈদার দুঃখের কথা ফেনিয়ে ফেনিয়ে লিখে চলেছি তোমার কাছে।

অনেক দিন পরে এই চিঠি তোমাকে আমি লিখছি—

তা বোধ করি বছরখানেক ত হবেই—কি বল!

সেই যেবার তুমি বাঁকুড়ায় বদলী হয়ে যাও, আমার চিঠিটা ঘুরতে ঘুরতে তোমার বাঁকুড়ায় নতুন ঠিকানায় গিয়ে পৌঁছেছিল।

কে জানে এক বছর বাদে আবার চিঠি দিচ্ছি, তুমি আজও বাঁকুড়ায়ই আছ কি না, যদি নাই থাক, তাহলেও হয়ত আমার আগেকার চিঠিটার মত ঘুরতে ঘুরতে তোমার হাতে গিয়ে একদিন এটা ঠিকই পৌঁছবে।

আচ্ছা সেই পুরনো কথাটা আজ আবার যদি বলি রাগ করবে না তো—

রাগ করো না—লক্ষ্মীটি—

এবারে একটা বিয়ে কর।

বিশ্বাস কর, সত্যিই সংবাদটা পেলে আমি খুশি হব। এবং আমার চাইতে খুশি আর কেউ হবে না যেন।

আমার দুর্ভাগ্যের সঙ্গে কেন তুমি জড়িয়ে থাকবে সারাটা জীবন এমনি করে—যে দুর্ভাগ্যের কোন অন্ত নেই, কোনদিন শেষ হবে না, তার জন্যে তুমি কেন এমনি করে একক জীবনযাপন করবে।

এতে যে আমার কি লজ্জা করে তা কি তুমি বোঝ না?

মা—

চমকে ফিরে তাকাল কুন্তী।

কখন সীতা শয্যার উপর উঠে বসেছে, ওরই দিকে চেয়ে আছে।

একটু জল খাব মা—

কুন্তী আবার কলমটা রেখে উঠল।

পাশেই টেবিলের ওপরে কাচের গ্লাসে জল ঢাকা ছিল, জলের গ্লাসটা

হাতে নিয়ে সীতার সামনে ধরতেই সীতা নিজেই ছোট ছোট দু'হাতে গ্লাসটা ধরে এক চুমুকে অনেকটা জল খেয়ে আবার নিঃশব্দে শুয়ে পড়ল।

সঙ্গে সঙ্গে বোধ করি ঘুমিয়েও পড়ল।

টেবিলের ওপরে রক্ষিত ঘড়িটার দিকে তাকাল কুন্তী, রাত মাত্র পৌনে দুটো।

ট্রেনের এখনও প্রায় তিন ঘণ্টারও বেশী দেরি আছে।

ট্রেনটা ভোর পাঁচটা দশে।

স্টেশন অবিশ্যি এখান থেকে মাইল দেড়েক মত হবে এবং বেরুতেও হবে সাড়ে চারটে নাগাদ, নচেৎ ট্রেনটা ধরা মুস্কিল।

টিকিট কাটার ব্যাপার আছে, জিনিসপত্রও সঙ্গে একেবারে যে নেই তাও নয়।

এর আগের বার ত ছোট একটা সুটকেশ ছাড়া কিছুই ছিল না। সেই সুটকেশ ও দুই মাসের সীতাকে নিয়ে এখানে এসে অনীতার ওখানে উঠেছিল।

অনীতা ত ওকে দেখে অবাক।

সঙ্গে আবার দুই মাসের শিশু সীতা --

সীতা অবিশ্যি তখনও ওর নামকরণ হয় নি, খুকীই ছিল ওর নাম।

এখানে অনীতার স্বামী ডিস্ট্রিক্ট ইঞ্জিনীয়ার ও জানত।

অনীতার স্বামী প্রভাস সেদিন অবিশ্যি বাড়িতে ছিল না। টুরে গিয়েছিল।

॥ দুই ॥

রাত তখন প্রায় চারটে হবে।

সেও এমনি একটা কন্‌কনে শীতের শেষ রাত।

পেঁছাবার কথা রাত দেড়টায় কিন্তু ট্রেনটা লেট করে পেঁছেছিল, প্রায় রাত তিনটের সময়।

একবার মনে হয়েছিল ঐ অত রাত্রে, ঐ সময় কোন ভদ্রলোকের বাড়িতে যাওয়া ঠিক উচিত হবে না, কিন্তু দু'মাসের কচি বাচ্চাটা সঙ্গে, ওয়েটিং রুমের দরজাটাও কিছুতেই খোলান গেল না, অনন্যোপায় হয়েই তখন একটা সাইকেল রিক্সা ভাড়া করে ঘুরতে ঘুরতে গিয়ে হাজির হয়েছিল অনীতার বাসায়।

দরজা-জানালা বন্ধ, শীতের রাত, সবাই ঘুমে অচেতন তখন।

রিক্সাওয়ালাটা অনেক ডাকাডাকি করবার পর চাকরে এসে দরজা খুলে দেয়।

চাকরটাও অবাক, কে রে বাবা এই শীতের রাত্রে একটা বাচ্চাকে নিয়ে সাধারণ বেশে ইঞ্জিনীয়ার সাহেবের বাড়িতে এল।

অবিশ্যি অবাক হবারই কথা চাকরটার।

অতি সাধারণ বেশেই গৃহ ত্যাগ করে এসেছিল কুন্তী।

সাধারণ একটা মিলের কালো পাড় শাড়ি, হাতে একগাছি করে সরু সোনার বালি, গায়ে একটা শাল জড়ান। গায়ে চপ্পল।

ভ্রু কুঁচকে শুধায় চাকরটা, কি চাই—

এটা ইঞ্জিনীয়ার মিঃ মিত্রের কোয়ার্টার?

হ্যাঁ, কিন্তু সাহেব ত বাসায় নেই—

কেউ নেই আর বাসায়?

আছেন, মেমসাহেব আছেন—

রিক্সাওয়ালার ডাকাডাকিতে আগেই অনীতার ঘুমটা ভেঙ্গে গিয়েছিল, সেও বাইরের ঘরে এসে প্রবেশ করে।

কে রে বিশু?

অনীতার গলার সাড়া পেয়ে ভৃত্য বিশ্বনাথ ও সেই সঙ্গে কুন্তীও ঘরে তাকায়!

প্রথমটায় চট করে অবিশ্যি চিনতে পারে নি অনীতা কুন্তীকে দেখে।

মাথায় ঘোমটা, শাল জড়ান বুকে শিশু, তা ছাড়া দেখা প্রায় বছর চারেক বাদে।

সেই যে চার বছর আগে আই. এ পড়তে পড়তেই বিলাতফেরত ইঞ্জিনীয়ার প্রভাস মিত্রের সঙ্গে অনীতার বিয়ে হয়ে গিয়েছিল, তারপর তো আর দেখা-সাক্ষাৎ হয় নি দুজনার মধ্যে।

কে?

কুন্তীও চেয়ে ছিল অনীতার মুখের দিকে।

শাড়ির উপরে সিল্কিং গাউন জড়ান, এবং চার বছরে বেশ মুটিয়েছিল অনীতা—

অনীতা—

কে, কুন্তী চৌধুরী না।

হ্যাঁ, চিনতে পেরেছিস তাহলে, আমি ত ভেবেছিলাম—

নিশ্চয়ই, কিন্তু—

সব কথা বলব, ঠান্ডায় বাচ্চাটা একেবারে নেতিয়ে পড়েছে, যদি একটু গরম জলের ব্যবস্থা করতে পারিস—

নিশ্চয়ই, আয়—

অনীতার শোবার ঘরটা বেশ গরমই ছিল।

সেই ঘরে ঢুকে অনেকটা সুস্থ বোধ করে কুন্তী। তারপর গরম জলে বাচ্চাটাকে সেক দিয়ে একটু গরম হরলিকস খাইয়ে নিশ্চিন্ত হয়।

অনীতার নির্দেশেই কুন্তী বাচ্চাটাকে শয্যায় শুইয়ে দেয়।

অনীতা তার বান্ধবী কুন্তীকে সাদর আহ্বান জানালেও তার মনের মধ্যে কুন্তীর ক্রোড়ের ঐ শিশুটি এবং তার বেশ-ভূষা বিশেষ করে মাথায় বা কপালে সিন্দুরের কোনও চিহ্ন মাত্র বা তেমনি হাতে কিছু সধবার চিহ্ন শাঁখা বা লোহা কিছুই নেই দেখে সেই সব কিছু জড়িয়েই কেমন একটা সংশয় তাকে

যেন পীড়া দিতে থাকে।

অথচ বলতেও পারছিল না মুখ ফুটে কথাটা, কেমন যেন বাধ বাধ ঠেকছিল, একটা লজ্জাবোধ যেন ওকে বিব্রত করে তুলছিল।

অবশেষে জিজ্ঞাসাই করে ঘুরিয়ে কথাটা।

তারপর বিয়ে করলি কবে? কর্তাটি কোথায়? কি করে বে—

অনীতার প্রশ্নে মুখ তুলে তাকাল কুন্তী।

বললে, বিয়ে?

হ্যাঁ, কোথায় হলো—

কুন্তী কেমন যেন একটু ম্লান হাসি হাসে।

অনীতায় শুধায়, হাসছিস যে, বিয়ে কবে হলো—। আর একাই বা কেন ঐটুকু বাচ্চাকে নিয়ে—

কোথায় আর সে সৌভাগ্য হল ভাই—

তবে?

কি তবে? ঐ বাচ্চা—অবিশ্যি ও আমারই বাচ্চা।

কথাগুলো কুন্তীর মুখ থেকে উচ্চারিত হবার সঙ্গে সঙ্গে যে অনীতার মুখখানা গম্ভীর থমথমে হয়ে উঠেছিল কেমন, সেটা কুন্তীর দৃষ্টি এড়ায় নি।

কুন্তী পূর্ববৎ মৃদু হাসি হেসে বলে, খুব আশ্চর্য লাগছে তো—

না, মানে—

বলতে হবে না, বুঝতে কি আর পারছি না এই মুহূর্তে তোর মনের অবস্থাটা—তারপর একটু হেসে বলে, মনে হচ্ছে ঘৃণাও নিশ্চয় হচ্ছে আমার ওপরে—

ঘৃণা—

হ্যাঁ, ঘৃণা হচ্ছে না! বিয়ে হয় নি অথচ বাচ্চা, মা হয়ে গেলাম।

অনীতা একেবারে চুপচাপ, মুখে কোন কথা নেই।

দুজনাই কিছুক্ষণ যেন একেবারে বোবা। তারপর অনীতাই কথা বলবার চেষ্টা করে একসময়।

বলে, কিন্তু—

তাকে বাধা দিয়ে কুন্তী বলে, যেটুকু বলেছি তার বেশী কিছুই আর এ মুহূর্তে বলতে পারছি না ভাই, ক্ষমা কর।

অনীতার সমস্ত মুখখানা সত্যি ততক্ষণে বেশ গম্ভীর হয়ে উঠেছে।

কুন্তী মৃদু হেসে বলে, ভয় নেই ভাই, তোকে বিব্রত করবার জন্য আসি নি, একটা বা দুটো দিনের বেশী থাকব না। আর থাকা উচিতও হবে না—

অনীতার মুখে কোন কথা নেই।

কেমন করে যেন চেয়ে আছে অনীতা কুন্তীর মুখের দিকে।

কুন্তী তখন বলেছিল, মিথ্যা একটা বানিয়ে অনায়াসেই তোর কাছে বলতে পারতাম অনীতা—কিন্তু তাতে করে না আমার, না আমার মেয়ের সম্মান বাড়বে, অথচ এই মুহূর্তে পুরোপুরি সত্যটাও যখন বলতে পারছি না তখন এইটুকু অন্তত জেনে রাখ যে মিথ্যা বলছি না, খুকী আমারই মেয়ে,

কিন্তু আসল কথাটাই তোকে এখনো বলা হয় নি রে—

কি ! সতৃষ্ণ দৃষ্টিতে তাকায় অনীতা কুন্তীর মুখের দিকে।

এম. এ. পাশ করেছি, বাড়িতে জায়গা হল না, ঠিক হল না যে তাও নয় সবটা সত্যি, বিব্রত করতে চাই নি আমার জন্য কাউকে, তাই একটা চাকরির সন্ধানে বের হয়েছি—

চাকরি ?

হ্যাঁ—

বলিস কি অত বড় একজন ধনী ডাক্তারের মেয়ে তুই। তোর চাকরি করতে হবে। তোরা ত মাত্র দুই বোন। ভাইও নেই—

তা নেই বটে তবু চাকরি করতে হবে, বিশেষ করে এই মেয়েটার জন্যই—

তোর বাবা ত বেঁচে নেই—

জানি না। বাবা অনেক দিন আগে সংসার ছেড়ে চলে গিয়েছেন, তারপর আর কোন সংবাদই তার জানি না।

তবে সেদিন না বললেও পরে সবটা না হলেও কিছুটা সত্যি ঘটনা বলেছিল কুন্তী অনীতাকে।

অনীতা কেমন যেন সংশয়ভরা দৃষ্টিতে কুন্তীর মুখের দিকে চেয়ে ছিল সেদিন।

হঠাৎ মৃদু হেসে বলেছিল সে সময় কুন্তী, নিশ্চয়ই অনেক কথাই তোর মনে হচ্ছে না অনীতা, ভাবছিস ব্যক্তিটি কে, ব্যক্তিটি কিন্তু একেবারে রাস্তার ভিক্ষুক নয়, কমপিটেটিভ পরীক্ষা দিয়ে ভাল চাকরিও করছে, কিন্তু ঐ পর্যন্তই —

মানে—

মানে তার মত হচ্ছে, বিয়েতে তার আর আপত্তি নেই কিন্তু ঐ খুকীকে বাদ দিয়ে। কি আব্দার বল তো, খুকী কি দোষ করল ! তাই খুকীকে নিয়ে আমি সরে এলাম—

বলিস কি—

তাছাড়া কি আর করতে পারতাম, বল !

অত বড় একটা Scoundrel-কে অমনি অমনি ছেড়ে দিলি !

দিলাম, জোর করে কি কাউকে কেউ বেঁধে রাখতে পারে, না সে বাঁধন টেকে—

তারপর—

কি তারপর ?

তোর মেয়ের পরিচয় কি হবে ?

কেন, আমার পরিচয়ই হবে তার পরিচয়—

পাগল, মায়ের পরিচয়ে কোন সন্তান আজ পর্যন্ত আমাদের দেশে কি পরিচিত হয়েছে ?

তা এখন কি করব, পরিচয় যে দেবে না তার পায়ে গিয়ে মাথা খুঁড়তে হবে নাকি।

কিন্তু—

রক্ষে কর বাবা, কুন্তী চৌধুরী তার মধ্যে নেই—

অনীতা খুব খুশী না হতে পারলেও পরের দিন প্রভাস মিত্র এসে সব শুনে কিন্তু বললে, এই ত চাই—I appreciate your courage Miss Chaudhury—শুনুন, এখানকার মেয়ে স্কুলের সেক্রেটারির সঙ্গে আমার বিশেষ জানা-শোনা ও হৃদ্যতা আছে, তাকে বলে দেখি আপনার একটা কোন ব্যবস্থা করা যায় কি না।

ভাগ্য ভাল কুন্তীর ছিল বলতেই হবে। চাকরি একটা ছিল, এবং হয়ে গেল প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই।

শুধু একটু মিথ্যার আশ্রয় নিতে হয়েছিল কুন্তীকে সেদিন।

কুন্তী চৌধুরী নয় মিসেস কুন্তী সান্যাল নাম লেখাতে হয়েছিল তাকে।

কিন্তু সে মিথ্যা শেষ পর্যন্ত টিকল না।

কুৎসিত ভাবে একদিন সবকিছু প্রকাশ পেয়ে গেল—

পাঁচ বছর ধরে মিথ্যার আড়ালে থেকে সত্যটা প্রকাশ পেয়ে গেল হঠাৎ একদিন।

সেক্রেটারি বললেন, এরপর আর তো আপনার এখানে স্থান হতে পারে না, মিসেস সান্যাল—

কুন্তী কোন জবাব দেয় নি—

মিটিং থেকে চলে এসেছিলে এবং পরের দিন একটা রেজিগনেশন লেটার লিখে পাঠিয়ে দিল।

জান স্বর্ণেন্দু, তোমাকে সেদিন জানাইনি, এবং না জানিয়েই তোমার পদবীটা মাথায় তুলে নিয়ে সিঁথিতে দিয়েছিলাম সিন্দুর।

কিন্তু কি হল—

এরা শেষ পর্যন্ত সেটা বিশ্বাস করল না, পাঁচ বছর বাদে স্পষ্ট জানিয়ে দিল সেটা মিথ্যা, অবিশ্যি জানতাম তোমাকে ডাকলে তুমি নিশ্চয়ই আমার পাশে এসে আজ দাঁড়াতে, সীতার পিতৃত্বকে সস্নেহে স্বীকৃতি দিতে কিন্তু তুমিই বল, তাই কি আমি পারি।

ছিঃ—

রাত শেষ হয়ে এল নাকি—

টেবিল ছেড়ে উঠে গিয়ে জানালাটা খুলে দিল কুন্তী।

না, এখনো অন্ধকার আকাশের গায়ে লেপটে আছে। সপ্তর্ষি আকাশে জ্বলজ্বল করছে।

ফিরে এল আবার টেবিলের সামনে কুন্তী। ঘড়িতে সোয়া তিনটে।

ট্রাঙ্ক ও সুটকেশটা গোছানই আছে কেবল বেঁধে নিতে হবে বিছানাটা। তাও কুন্তী কারো সাহায্য না নিয়েই বেঁধে নিতে পারবে।

একা হলে কথা ছিল না কিন্তু সীতার বিছানাটা বেঁধে ফেললে ঘুমাত কি করে।

সাঈদা অবিশ্যি বলেছিল, একটা রাত কুন্তীদি, তুমি তো আমার ঘরে গিয়েও থাকতে পার, চল না—

সাঈদার কোয়ার্টারে গিয়ে যে শেষ রাতটা কাটাতে পারত না কুন্তী তা নয় কিন্তু মিথ্যে বিব্রত করতে চায় নি ও বেচারীকে।

বলেছে, কিছু দরকার নেই ভাই, কয়েকটা ঘন্টা আর মাত্র তো।

॥ তিন ॥

স্কুলের আটদশজন টীচার, তাদের মধ্যে একমাত্র ঐ সাঈদাই মুসলমান—এবং সেই কেবল তার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় নি।

একমাত্র সেই তার কলঙ্ক নিয়ে হাসাহাসি করে নি বা কোন বক্রোক্তি করে নি। বরং তার পক্ষ নিয়ে অন্য সকলকে কড়া কড়া কথা বলেছে।

এবং তার ফলে সাঈদার প্রতি কম বক্রোক্তি বর্ষিত হয় নি।

কুন্তী আবার সীতার সামনে এসে দাঁড়াল। নিশ্চিন্তে ঘুমুচ্ছে। পাঁচ বছর বয়সের আন্দাজে একটু যেন বড়-সড়ই দেখায় ওকে।

আশ্চর্য! ঐ শিশুর মধ্যেও মানুষ পাপ দেখে।

কোন ভয় নেই তোর সীতা, তোকে আমি বাঁচিয়ে তুলবই, মানুষের পরিচয় দেবই, মানুষ—পৃথিবীর সমস্ত মানুষকে একদিন স্বীকার করতে হবে তোকে।

স্বীকার করতেই হবে মানুষের জন্মের মধ্যে কোন কলঙ্ক থাকে না। কোন পাপ মানুষের জন্মকে স্পর্শ করতে পারে না।

এ কেবল তোর অগ্নিপরীক্ষা সীতা, একদিন তোর অগ্নিশুদ্ধি হবেই।

তুই নির্মল, তুই নিষ্পাপ একথা তোকে প্রমাণ করতেই হবে। এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ একদিন তোকে হতেই হবে।

আবার টেবিলের সামনে ফিরে এসে কলমটা তুলে নিল কুন্তী।

চিঠিটা শেষ করতেই হবে।

আজ আবার এখানকার আমার পাঁচ বছরের বাসা ভাঙ্গার সঙ্গে সঙ্গে নতুন করে জানতে পারলাম আমরাই আমাদের অর্থাৎ নারীই নারীর সর্বাপেক্ষা বড় শত্রু।

আমার কলঙ্কে নাকি তাদেরই সর্বাপেক্ষা বড় লজ্জা, তাদেরই সব চাইতে বেশি দুঃখ, তাই নাকি তারা আমাকে ক্ষমা করতে পারল না।

অবিশ্যি সেজন্য আমার কোন দুঃখ নেই, কিন্তু ওরা বুঝল না। আজ আমাকে সকলে মিলে ওরা হেয় প্রতিপন্ন করে, আমার গায়ে কাদা ছিটিয়ে দিয়ে, নিজেদের গায়ে তো কাদা মাখলই, সমস্ত নারী জাতটার গায়েও মেখে দিল। অথচ দেখ কি আশ্চর্য, ওদের কাছেই আমার সব চাইতে বড় দাবি ছিল,

আমাকে বিচার করতে গিয়ে ওরা একবারও ভাবল না ওদের যে কারোরই সন্তান হতে পারত সীতা, সীতার জন্মবৃত্তান্তর মধ্যে অস্বাভাবিক, অত্যাশ্চর্য কিছু নেই—

প্রতিনিয়ত পৃথিবীর ঘরে ঘরে মানুষের যে জন্ম-ইতিহাস রচিত হচ্ছে সীতা তার ব্যতিক্রম নয়।

এবং সীতা যেদিন মাথা তুলে দাঁড়াবার পর ওদের আজকের এই কথা শুনবে সেদিন কি ওদের কাউকে ও ক্ষমা করতে পারবে!

তবু, তবু, যাবার আগে সান্ত্বনা রইল আমার সাঈদা, ঐ ভিন্নজাতের, ভিন্নধর্মের মেয়েটি।

পদের সকলের নীচতা, কুশ্রীতা ও অবক্ষয়ের মধ্যে বিদুরের এক মুঠো ক্ষুদের মতই তার প্রীতি ও সমবেদনাটুকু অন্তত মুঠো ভরে নিয়ে যাচ্ছি সেও ত কম নয়।

এই চিঠির পর আবার কবে তোমাকে চিঠি দিতে পারব জানি না। কারণ সেদিন এমনি এক রাত্রে যখন দু'মাসের সীতাকে বুকে জাপটে ধরে ঘরের বাইরে যে অনিশ্চয়তার মধ্যে পা বাড়িয়েছিলাম আজও আবার সেই অনিশ্চয়তার মধ্যেই পা বাড়াচ্ছি।

কিছু দিন চিঠি না পেলে কিন্তু চিন্তিত হয়ো না।

জানি আজও তোমার মত বদলায় নি, আজও তুমি বলবে, তোমার ওখানে কেন চলে গেলাম না, কিন্তু কোন দিন ইতিপূর্বে তোমার সে প্রশ্নের জবাব দিই নি, আজ দিচ্ছি।

শুধু বলেছি এতদিন, ছিঃ—

কিন্তু সেটাই ত সব কথা নয়।

জানি স্বর্ণেন্দু, জানি সীতাকে তুমি অপমান করবে না। তোমার দিক থেকে সে সম্ভাবনা কোন দিনই নেই এবং সেটা স্বপ্নেরও অগোচর কিন্তু আমার দিক বলেও তো একটা বস্তু আছে।

তাই আর যাই করি না কেন মানুষের সমস্ত কিছু নীতি ও সৌজন্যবোধের যে একটা স্বাভাবিক সীমারেখা আছে, সেটা লঙ্ঘন করবারও যে একটা নীতি আছে, তা কেমন করে না মেনে পারি তুমিই বল।

তা ছাড়া দায়িত্ব তুমিই বা নেবে কেন যেমন কথাটা অত্যুক্তি নয়, তেমনি যে সন্তান আমার গর্ভে আসবে তাদের প্রতিও তো আমার সব কিছু বাদ দিলেও একটা কর্তব্য থাকে, তখন সেই কর্তব্যের যদি ত্রুটি ঘটে তখন নিজেকেই বা আমি নিজে ক্ষমা করব কি করে বলতে পার?

অথচ সীতা আমার যেমন প্রিয় তুমিও আমার তেমনি প্রিয়।

কিন্তু আর না, যাবার সময় হল—

আজকের মত এইখানেই ইতি করলাম। তোমার কুন্তী।

বন্ধ দরজার উপর করাঘাত শোনা গেল একটু পরেই।

কুন্তী খামের মধ্যে চিঠিটা ভরে সবে ঠিকানাটা লেখা তখন শেষ করেছে।

কে ?—কুন্তী শুধায়।

আমি, কুন্তীদি, দরজাটা খোল—

সাঈদার গলা।

ও বলেছিল, রাত চারটেয় তো বেরুবে, তার আগে আমি আসব—

কুন্তী তাড়াতাড়ি এগিয়ে গিয়ে দরজাটা খুলে দিল। সাঈদা এসে ঘরে প্রবেশ করল।

হাতে ওর একটা কেটলি, বোধহয় চা এনেছে, হাতে দুটো কাপ আর একটা কাগজের মোড়ক।

কেটলিতে আবার কি আনলি ?

একটু চা—

সত্যি, তোকে নিয়ে আর পারি না সাঈদা। এমন করে যাবার আগে বাঁধছিস কেন বল তো—

হয়েছে, হাত মুখ ধুয়ে নাও। চা-টা গরম গরম থাকতে খেয়ে নাও।

প্যাকেটে আবার কি ?—জিজ্ঞেস করে কুন্তী।

ও কিছু না, এত সকালে বেরুচ্ছ, বাচ্চাটা রয়েছে সঙ্গে, পথে ক্ষিদে পেলে কোথায় কি পাবে না পাবে, তাই একটা প্যাকেট বিস্কুট দিয়ে দিচ্ছি।

বেশ, রাখ। তোকে না বলবার ক্ষমতাই বা কোথায় আমার সাঈদা।

কি যে বল, তুচ্ছ এক প্যাকেট বিস্কুট।

শুধু ত ঐ বিস্কুটের প্যাকেটটাই নয় ভাই, তোর কাছে যে ঋণ রেখে গেলাম এ জীবনে তাই কোনদিন কি শোধ করতে পারব—

ছিঃ ছিঃ কুন্তীদি, ওকথা বলো না। আমি তোমার জন্য কি করেছি যে ও কথা তুমি বলছ ? বরং এই দুঃখটাই চিরকাল আমার থাকবে। আমরা মেয়েরাই তোমাকে এত বড় অপমান করে দল বেঁধে এখান থেকে তাড়িয়ে দিলাম। যাক ওসব কথা, চা ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে, মুখ ধুয়ে এসে চা-টা খেয়ে নাও—

পাশের বাথরুমে গিয়ে কোনমতে হাত-মুখটা ঠাণ্ডা বরফ গলানো জলেই ধুয়ে এল কুন্তী—

বাথরুমের পাশেই ছোট রান্নাঘরটা।

রান্নাঘরে সব জিনিস বয়ে গেল। এই কয় বছরে এক একটি করে সংসারের নিত্য প্রয়োজনীয় অনেক খুঁটিনাটিই ক্রয় করেছিল।

সব কিছুই সে রেখে যাচ্ছে। সাঈদা বার বার বলেছিল, সব ফেলে রেখে যাচ্ছ, আবার তো দরকার হবে—

না, দরকার যখন হবে তখন দেখা যাবে কিন্তু এখানকার কোন চিহ্নই সঙ্গে নেব না। মানুর মা দেশে গেছে, সে ফিরে এলে ওসব তাকেই দিয়ে দিস—

কিন্তু—

না রে যত বোঝা পথে কম হয় ততই ভাল।

সাঈদা কুন্তীকে খুব ভাল করেই চেনে তাই তর্ক করে নি।

ঘরে এসে ঢুকতেই চায়ের কাপটা এগিয়ে দেয় সাঈদা।

চায়ের কাপে চুমুক দিতে দিতে কুন্তী বলে, ঐখানে কাগজের ঐ খামটায় আনুর মার দু'মাসের মাইনে বেখে গেলাম, এলে তাকে দিস।

কলকাতায়ই ত যাচ্ছ কিন্তু কলকাতায় কোথায উঠবে কিছু ঠিক করেছ?

না—

তবে?

দেখি একটা আশ্রয় যতদিন না মেলে কোন একটা হোটেলে উঠব—

তোমাকে একটা কথা কাল জিজ্ঞাসা করব ভেবেছিলাম কুন্তীদি?

কি সাঈদা?

শিশিরাংশু সেন বলে কাউকে তুমি চেন?

হঠাৎ যেন ভূত দেখার মতই চমকে ওঠে নিজেব অজ্ঞাতে কুন্তী, সাঈদার মুখের দিকে তাকায়।

অর্ধোস্ফুট কণ্ঠে প্রশ্ন কবে, কি, কি নাম বললি?—

শিশিবাংশু সেন, চেন নাকি?

কুন্তী ততক্ষণে নিজের আকস্মিক চমকটা সামলে নিয়েছে। বলে, কেন, কেন বল তো?

কাল বাত্রে তোমার এখান থেকে ফিরে হেড মিস্ট্রেস চপলাদির সঙ্গে তোমার কথা নিয়ে আলোচনা হতে হতে হঠাৎ উত্তেজনার মধ্যে তিনি বলেছিলেন—

কি, কি বলছিলেন?

কমিটি শিশিরাংশু সেনের একটা চিঠি পেযেই নাকি—

শিশিবাংশুর সেনের চিঠি?

হ্যাঁ—

সে, সে কি লিখেছে চিঠিতে—

তা তো ঠিক জানি না, বলেনওনি সব খুলে তবে এইটুকু বলেছিলেন, তার চিঠি পাবার পরই স্কুল কমিটি তোমার সম্পর্কে অনুসন্ধান করে—

কিছু বলেননি চপলাদি চিঠিটা সম্পর্কে? না তুই আমার কাছে গোপন করছিস সাঈদা।

গোপন কবব কেন, বলেননি উনি আব আমারও সত্যি কথা বলতে কি ঐ নোংবা ব্যাপারে মাথা গলাতে প্রবৃত্তি হযনি। তবে একটু যা বলেছেন তা হচ্ছে, তিনিই নাকি জানিয়েছেন ঐ খুকী তোমার অবৈধ সন্তান।

বাইরে থেকে ঠিক ঐ সময় সাইকেল-রিক্সাওয়ালার গলার স্বর শোনা গেল, মাঈজী, এখন না বেরুলে ট্রেন ধরতে পারব না।

কুন্তী তাড়াতাড়ি জবাব দেয়, আমি তৈরি বে, এক্ষুনি বের হয়ে পড়ব।

কুন্তী এগিয়ে গেল শয্যার কাছে।

ঘুমন্ত মেয়ের কপালে গভীর স্নেহে হাত দিয়ে মৃদুকণ্ঠে ডাকে, সীতা, সীতা ওঠ মা—

সীতা ঘুম ভেঙে উঠে বসে।

মামণি—

ওঠ, এবারে আমাদের যেতে হবে যে—

ট্রেনে চেপে আমরা যাব, তাই না মামণি ?

হ্যাঁ, ওঠ—

কুন্তী সীতার হাত-মুখ ধুইয়ে জামাকাপড় পরিয়ে সাঈদার সাহায্যেই বিছানাটা চটপট বেঁধে নেয়।

সাঈদা রিক্সাওয়ালাকে ডাকে, সে ভিতরে আসতে বলে, এগুলো নিয়ে যা—

রিক্সাওয়ালা মালপত্র একে একে নিয়ে গিয়ে সাইকেল-রিক্সায় তুলল।

শূন্য ঘরটার দিকে একবার তাকাল কুন্তী।

পাঁচ বছর এই ঘরে তার কেটেছে। পাঁচ বছরের স্মৃতি তো কম নয়। অনেক দিন, অনেক রাত্রি, অনেক মুহূর্তের ইতিহাস।

সেই ইতিহাসের স্মৃতি।

পাঁচ বছরের প্রাত্যহিকতার মধ্যে যেন ভুলেই গিয়েছিল কুন্তী, এই কোয়ার্টার আবার কোন একদিন তাকে এমনি এক রাত্রিশেষে কলঙ্কের বোঝা মাথায় নিয়ে ছেড়ে চলে যেতে হবে।

ভাবতে পারেনি পাঁচ বছর পরে এমনি করে এক প্রত্যুষে বাইরে আবার পা বাড়াতে হবে, অনিশ্চয়তার মধ্যে।

আশ্চর্য ! সব কিছুর মূলে নাকি শিশিরাংশু।

তাহলে ব্যাপারটা শিশিরাংশুরই কীর্তি।

চল—

সাঈদার কণ্ঠস্বরে চমকে ওঠে আবার কুন্তী। বলে, হ্যাঁ, চল।

সীতার হাত ধরে কুন্তী বাইরে বের হয়ে এল।

রিক্সায় উঠে বসল, রিক্সাটা চলতে লাগল।

পিছন ফিরে তাকাল কুন্তী, সাঈদা ঠিক তেমনি করে সামনের বারান্দায় আবছা রাত্রিশেষের আলোছায়ার মধ্যে দাঁড়িয়ে আছে।

ক্রমে ক্রমে সাঈদার ঝাপসা চেহারাটা মিলিয়ে গেল, হারিয়ে গেল।

সমস্ত শহর এখনো নিশ্চিন্ত আরামে ঘুমের মধ্যে তলিয়ে আছে।

কনকনে শীতের হাওয়া চোখে-মুখে যেন ছুঁচ বেঁধায়।

॥ চার ॥

রাত্রিশেষের তরল অন্ধকারের মধ্যে ট্রেনটা হু হু করে ছুটে চলেছে।

একটা প্রায়-খালি সেকেণ্ড ক্লাস লোডিস কম্পার্টমেণ্টই পেয়ে গিয়েছিল কুন্তী, সীতাকে শুইয়ে দিয়েছে বার্থটায়, সীতা আবার ঘুমিয়ে পড়েছে।

শিশিরাংশু।

তা হলে শিশিরাংশুই শত্রুতা করেছে। কিন্তু কেন ?

পৃথিবীতে যা কেউ কোনদিন করত না, করতে পারে না, তাই তো সে করেছে শিশিরাংশুর জন্য।

কিন্তু সত্যিই কি শিশিরাংশুর জন্য—

না ত, সে যা কিছু করেছে মানসীর জন্য।

সীতা যেমন আজ তার সন্তান হয়ে তাকে আঁকড়ে ধরেছে, মানসীও যে ঠিক তেমনি করেই তাকে দু'হাতে আঁকড়ে ছিল।

মা বেঁচে থাকলেও মানসী যে তারই কোলে-পিঠে মানুষ হয়েছে।

পক্ষাঘাতে পঙ্গু মা তখন ত এক প্রকার মৃত বললেও চলে।

তার নিজের তখন মাত্র বার বছর বয়স, সে নিজেই বালিকা, তবু তাকেই নিতে হয়েছিল সেদিন মানসীর সকল ভার, সকল দায়িত্ব।

দিদি বলে ডাকলেও একদিক থেকে মানসীর মা কি সেই ছিল না।

আর তাই না, সত্যিকারের মায়ের প্রতি তার কোনদিন এতটুকু আকর্ষণ বা শ্রদ্ধা জাগে নি। অনুভবও করে নি সে।

এমন কি মা যেদিন মারা গেল মানসীও তখন নেহাৎ ছোটটি নয়, বছর ষোল বয়স। দীর্ঘকাল পক্ষাঘাত রোগে শয্যাশায়িনী থেকে মা মারা গেলেন অথচ মানসী সেদিন এক ফোঁটা চোখের জলও ফেলে নি বরং সেজেগুজে সিনেমা দেখতে চলে গিয়েছিল পালিয়ে।

রাত্রে শ্মশান থেকে ফিরে এসে মানসীকে বলেছিল ও, ছিঃ মানসী, মাকে শ্মশানে নিয়ে গেলাম আমরা আর তুই গেলি সিনেমায় পালিয়ে?

বিছানার উপর শুয়ে একটা উপন্যাস পড়ছিল মানসী।

বলে, মা তাতে হয়েছে কি, তুমিই তো ছিলে—

কিন্তু আমার একার তো মা নয়—

তোমারই মা, আমার কেউ নয়। তাছাড়া শিশিরাংশুদা বললে, ফোনে অমন করে—

কে, কে বললে—

শিশিরাংশুদা—

শিশিরাংশু ফিরেছে নাকি মুর্শিদাবাদ থেকে—

সে ত পরশুই ফিরেছে—

কিন্তু কই, আমার সঙ্গে ত দেখা করে নি।

হয়ত সময় পায় নি, মানসী বলে।

সেই দিন, সেই দিনই রাত্রে শুয়ে প্রথম মনে হয়েছিল কুন্তীর, কথাটা।

শিশিরাংশু, শিশিরাংশু কলকাতায় এসেও তার সঙ্গে দেখা করে নি।

এবং তাকে না জানিয়ে ফোনে মানসীকে ডেকে নিয়ে সিনেমায় গিয়েছে।

শিশিরাংশু আর স্বর্ণেন্দু।

তাদের সঙ্গে কি তার আজকের পরিচয়। অনেক বছরের পরিচয়।

কিন্তু তার চাইতেও বড় কথা, শিশিরাংশুর সঙ্গে তার সম্পর্কটা, সেটা আর যার কাছেই অস্পষ্ট থাক তাদের নিজেদের কাছে ত অস্পষ্ট নেই।

তবে, তবে এ ধরণের ব্যবহার করার শিশিরাংশুর মানেটা কি?

সেই দিন, সেই দিন প্রথম বিশ্লেষণ করেছিল মনে মনে একক শয্যায় শুয়ে শুয়ে অন্ধকারে শিশিরাংশুর ইদানীংকার ব্যবহারের বিশ্লেষণ করতে গিয়ে।

বছরখানেক থেকেই যেন শিশিরাংশুর মধ্যে কেমন একটা পরিবর্তন এসেছে—তার ব্যবহারে, তার কথাবার্তায় যেন আর সে উত্তাপ নেই।

এবং শুধু ঐ দিনই তো নয়, মানসীকে একা একা নিয়ে আরো কয়েকদিন শিশিরাংশু বেড়াতে গিয়েছে, সিনেমায় গিয়েছে।

অথচ কথাটা তাকে জানানোও প্রয়োজন মনে করে নি।

কেন মনে করে নি, কেন?

তবে কি মানসীকে শিশিরাংশু, আর ভাবতে পারে নি, কেমন যেন সব গোলমাল হয়ে গিয়েছে।

তবু তবু পরদিন প্রত্যুষে শয্যা থেকে উঠে মনে মনে বলেছে কি পাগলের মত আবোল-তাবোল গতরাত্রে সব সে ভেবেছে।

শিশিরাংশু মানসীকে, ছিঃ ছিঃ—

কেমন করে ভাবতে পারল সে কথাটা।

বাবা সতীনাথ দীর্ঘ দিন ধরেই সংসার থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে নিয়েছিলেন। প্রকৃতপক্ষে বলতে গেলে স্ত্রী নর্মদার পক্ষাঘাতে অসুস্থ হবার পর থেকেই।

কলকাতা সহরে একজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ চিকিৎসক হিসাবে, অমন রোরিং প্র্যাকটিস হঠাৎ বন্ধ করে দিলেন ডাঃ সতীনাথ চৌধুরী।

বললেন, মিথ্যা, ওর কোন মানে হয় না—We doctors are helpless in the hands of destiny, কিছু আমরা করতে পারি না, কিছু করতে পারি না আমরা—

চিকিৎসক বন্ধু-বান্ধবেরা বলেছিল, এ তুমি কি বলছ সতীনাথ—

ঠিকই বলছি, তোমরা তো এতগুলো বিলেত-ফেরত বড় বড় অভিজ্ঞ ডাক্তার ছিলে, নর্মদার কিছু করতে পারলে তোমরা—

কিন্তু তোমার স্ত্রীর যে রোগ হয়েছে তাতে আর কি করবার আছে তুমিই বল?

সেই কথাটাই তো আমি বোঝাতে চাইছি তোমাদের, কিছু করবার নেই যখন তখন কেন আর এ মিথ্যা প্রহসনের জের টানা—

এই কি একটা তোমার যুক্তি হল সতীনাথ?

যুক্তি কি না জানি না তবে একথাটা আজ তোমরা কেউ অস্বীকার করতে পারবে না, আজকের দিনে আমরা এতগুলো এত বড় বড় ডাক্তার ও তোমাদের এত সব আধুনিক চিকিৎসা পদ্ধতি ও ঔষধপত্র থাকা সত্ত্বেও নর্মদা আমাদের চোখের সামনে পঙ্গু হয়ে পড়ে থাকবে যতদিন না সত্যি সত্যি মৃত্যু এসে তাকে এই যন্ত্রণা আর প্রতিমুহূর্তের মৃত্যু থেকে মুক্তি দেয়।

বাইরের বারান্দায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বাপের কথাগুলো শুনছিল কুন্তী।

ডাঃ মুখার্জী সতীনাথের দীর্ঘদিনের সুহৃদ এবং ঐ বাড়িতে তাঁর খুব বেশি যাতায়াতই ছিল, তিনি বের হয়ে আসতেই ঘর থেকে কুন্তীর সঙ্গে

চোখাচোখি হয়।

কুন্তীই ডাকে, কাকাবাবু—

ডাঃ মুখার্জী কুন্তীর মুখের দিকে তাকালেন, ও বোধ হয় আর সত্যিই ফিরবে না মা—

তাহলে কি হবে কাকাবাবু, বাবা যে এক মুহূর্তও ঐ ডাক্তারী, রোগী, হাসপাতাল, চেম্বার ছাড়া থাকতে পারেন না—

সেইটাই তো সবচাইতে বড় আশ্চর্য লাগছে মা—কি জান মা, একটু থেমে ডাঃ মুখার্জী বলেন, একটা প্রচণ্ড বিশ্বাস ছিল ওর এই Medical Science-টার উপরে, শুধু বিশ্বাস নয়, আস্থাও ছিল গভীর, আর ঠিক সেইখানেই আঘাতটা লেগেছে, এটা তারই একটা প্রতিক্রিয়া।

কাকাবাবু—

হ্যাঁ মা, তোমার যেখানে ভয়, আমারও ভয়টা সেখানেই। ও নিজেকে যদি এই আশাভঙ্গের বিপর্যয় থেকে না উদ্ধার করতে পারে তাহলে ও হয়তো পাগল হয়ে যাবে।

পাগল অবিশ্যি হননি সতীনাথ কিন্তু পাগল না হলেও সংসার থেকে নিজেকে যেন একেবারে নিশ্চিহ্ন করে মুছে নিয়েছিলেন।

এবং মুছে নিলেন নিজেকে একেবারে সংসার থেকে দূরে সরিয়ে নিয়ে গিয়ে।

বাড়ি ছেড়ে বের হয়ে পড়লেন একদিন।

বের্‌বার আগের দিন রাত্রে, কুন্তীকে ডেকে পাঠালেন নিজের ঘরে।

কুন্তী এসে ঢুকল ঘরে, আমাকে ডাকছিলেন বাবা ?

হ্যাঁ মা, কাল ভোরে আমি বের হয়ে যাচ্ছি—

কোথায় বাবা ?

তা জানি না মা, তবে বের হয়ে যাচ্ছি—

কুন্তী নিঃশব্দে বাপের মুখের দিকে চেয়ে থাকে।

সতীনাথ বলেন, ব্যাঙ্কে ইনস্টাকসন দিয়ে দিয়েছি, তুমি তোমার নামেই চেকে টাকা ড্র করতে পারবে, এ বাড়িটা রইল আর ব্যাঙ্কে যা রইল, তোমাদের মা যতদিন বেঁচে থাকবেন ও তোমাদের দু'বোনের তাতে কোন কষ্ট হবে না, যদি অবিশ্যি দু'হাতে সব না উড়িয়ে দাও।

বাবা—

বল মা ?

আবার কবে আপনি আসবেন !

তুমি আমার মেয়ে হলেও তুমি আমার ছেলের অধিক মা, শুধু যে সেটা আমার ভাবা তাই নয় বিশ্বাস করি সেটা পুরোপুরি, তাই তো আজ এত বড় একটা দায়িত্ব তোমার ঘাড়ের উপর ফেলে দিয়ে বের হয়ে যাবার জন্য পা বাড়িয়েছি—

বাবা—

সে শোন মা, অনেকে হয়ত আমার সম্পর্কে অনেক কথা বলবে, ভীরু,

কাপুরুষ, অপদার্থ, কিন্তু মা, তোমার কাছে যাবার আগে আমি সত্য কথাটাই বলে যাচ্ছি, তোমার ঐ অসহায় অবস্থাটা যখনই চোখে পড়ে তখনই তোমার মার অনেকদিন আগেকার একটা কথা মনে পড়ে, তোমার মা বলতেন আমি নাকি মস্ত বড় ডাক্তার, তাই তাঁর স্থির বিশ্বাস একটা বরাবর ছিল, তার যত কঠিন অসুখই হোক না কেন আমি ঠিক তাকে ভাল করে তুলতে পারবই। আজ তোমার মার চোখের দিকে চাইলে মনে হয় যেন সেই কথাটাই তার চোখ বলছে, তুমি আমাকে ভাল করে, আবার সুস্থ করে তুলছ না কেন? কেন—কেন—

একটু থেমে আবার সতীনাথ বলেন, আজ যদি তার কথা না বন্ধ হয়ে যেত, যদি কথাটা বলতে পারতেন আমি অন্তত চিৎকার করে প্রতিবাদ জানিয়ে আজ তার সত্যিকারের কথাটা জেনে নিতে পারতাম কিন্তু তারও উপায় নেই, এ পীড়ন, এ অসহ্য, দিবারাত্র আর আমি সহ্য করতে পারছি না, আমাকে যেন নিষ্ঠুর ব্যঙ্গ করছে, আমাকে যেন পাগল করে তুলছে—

কিন্তু বাবা, মাকে ত আপনি ভাল করবার কম চেষ্টা করেন নি, চিকিৎসার দ্বারা যা সম্ভব, মা মুখে সেটা প্রকাশ না করতে পারলেও চোখে কি সেটা দেখেন নি, মনে মনে কি বোঝেন নি, কথাই বলতে পারেন না, জ্ঞান ত পুরোপুরিই আছে মার—

আমার লজ্জা, আমার দুঃখ তো মা সেইখানেই, পঙ্গু থেকেও যদি ওর মুখে অন্তত কথাটা ফোটাতে পারতাম—

সেই দিন, সেই দিন প্রথম ও শেষ কুন্তী সতীনাথের চোখে জল দেখেছিল।

দুফোঁটা চোখের জল গাল বেয়ে নিঃশব্দে গড়িয়ে পড়তে দেখেছিল ও। আর তাইতেই ও বুঝেছিল কত বড় দুঃখে অমন মানুষটার চোখ দিয়ে জল বের হয়ে এসেছে।

আর সে কোন কথা বলতে পারে নি।

সতীনাথ বলেছিলেন, তোমাদের মা যে আমার কতখানি ছিল, সন্তান তোমরা, তোমাদের কাছে প্রকাশ করতেও পারব না, আর প্রকাশ করলেও হয়ত ঠিক সেটা বুঝবে না। আজ আমার কাছে আমার এত বছরের উদ্যম, কর্মপ্রচেষ্টা, সাফল্য সব ব্যর্থ হয়ে গিয়েছে। সব মনে হচ্ছে মিথ্যা, তাই শুধু এই মিথ্যা, এই লজ্জা থেকে সরে যাচ্ছি দূরে।

কিন্তু বাবা, একটা পরামর্শ দেবার মতও তো কেউ আমাদের আশেপাশে রইল না—

কারো পরামর্শ নিও না মা, তুমি যা ভাল বুঝবে তাই করবে, ভুল হবে এবং ভুল হয়ই, তার জন্য দুঃখ করো না।

আপনি কি আজই চলে যাবেন?

হ্যাঁ, আজই—

কখন?

শেষ রাত্রের দিকে—

মানসীকে ডাকব বাবা?

না, থাক, তোমার মা এখন জেগে আছেন ?

একটু আগে দেখে এসেছিলাম জেগেই আছেন, দেখে আসব—

এস—

॥ পাঁচ ॥

নর্মদা জেগেই ছিল।

ডান হাত, ডান পাটা, পঙ্গু, অসাড়, সেই সঙ্গে বাক্-শক্তিও অন্তর্হিত।

ফ্যাল ফ্যাল করে কেবল চেয়ে থাকে আর মধ্যে মধ্যে চোখের কোল বেয়ে জল গড়িয়ে পড়ে, মাসখানেক আগে থাকতেই সতীনাথ স্ত্রীর ঘরে আসা ছেড়ে দিয়েছিলেন, মনে মনে তখন বোধ হয় তার প্রস্তুতি চলেছে।

কুন্তীর অন্তত তাই মনে হয়েছিল পরে।

আর মনে হয়েছিল ভালবাসার এমন দৃষ্টান্ত বুঝি সত্যিই বিরল।

সতীনাথ যখন ঘরে গিয়ে ঢোকেন, নর্মদা তখন চোখ বুজে ছিল, ও পাশের জানালার আধ-ভেজানো কপাটের আড়াল থেকে দেখেছিল সে দৃশ্য কুন্তী।

আশ্চর্য !

সতীনাথ ঘরে প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গেই নর্মদা চোখ মেলে তাকাল। এবং অন্য দিকে মাথাটা ছিল, এবারে মাথাটা ঘুরিয়ে তাকাল সতীনাথের দিকেই।

সতীনাথ মুহূর্তের জন্য দাঁড়িয়ে পড়েছিলেন নর্মদাকে সহসা তার দিকে ঘুরে তাকাতে দেখে।

কথা বলতে পারছে না নর্মদা, শুধু চেয়ে আছে চোখ দুটি মেলে।

সে কি দৃষ্টি।

যেন অফুরন্ত স্নেহ, মমতা, ও ভালবাসা সেই দৃষ্টির মধ্যে।

সতীনাথ ধীরে ধীরে এগিয়ে গিয়ে শয্যাপাশে দাঁড়ালেন।

ডান হাতটা তুলে নর্মদার শীর্ণ কপালের ওপরে রাখতেই নর্মদা বাঁ হাত দিয়ে স্বামীর হাতট চেপে ধরে চোখ বুজল।

বোজা চোখের কোল বেয়ে ক্ষীণ দুটি অশ্রুর ধারা নেমে এসে শীর্ণ গাল বেয়ে গড়িয়ে পড়ল।

কতক্ষণ অমনি করে রইল দুজনে।

সতীনাথ শিয়রের সামনে দাঁড়িয়ে আর নর্মদা তার বাঁ হাতটা দিয়ে সতীনাথের ডান হাতটি ধরে আছে।

দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে বোধ করি কুন্তীরই সেদিন পা ধরে গিয়েছিল।

অনেকক্ষণ পরে সতীনাথ ধীরে ধীরে স্ত্রীর মুঠি থেকে নিজের হাতটা ছাড়িয়ে ঘর থেকে বের হয়ে এলেন।

নর্মদার চোখ দুটি তখন বোজা।

ঘুমচ্ছিল কি না কে জানে।

সেই দিনই রাত্রিশেষে কখন এক সময় সতীনাথ গৃহ ছেড়ে চলে গিয়েছেন

কুন্তী জানতেও পারে নি।

কিছুতেই ঘুমাবে না, জেগে থাকবে মনে মনে স্থির করেছিল কিন্তু পারে নি, শেষ রাত্রের দিকে কখন এক সময় ঘুমিয়ে পড়েছিল।

হঠাৎ ঘুমটা ভেঙ্গে গেল কি একটা ভারী বস্তু মেঝেতে পতনের ঝন্ ঝন্ শব্দে।

পাশের ঘরে মা থাকে, পাশের ঘর থেকেই শব্দটা এসেছিল, যদিও একজন নার্স সর্বক্ষণ রাত্রে ও একজন সর্বক্ষণ দিনের বেলাতে থাকে নর্মদাকে দেখাশোনা ও পরিচর্যা করবার জন্যে, তবু শব্দটা শুনে ঘুম ভেঙ্গে ছুটে যায় কুন্তী পাশের ঘরে।

কুন্তীর পদশব্দে রাত্রের নার্স ওর দিকে ফিরে তাকাল, সে তখন মেঝে থেকে ভাঙ্গা ফিডিং কাপের টুকরোগুলো একটা একটা করে কুড়োচ্ছে।

সে বলে, দেখুন না, হাত বাড়িয়ে টেবিলের উপর থেকে ফিডিং কাপটা ফেলে দিয়ে ভাঙ্গলেন আপনার মা—

কুন্তী মার দিকে তাকাল।

তার মনে হয় ঐ মুহূর্তেই নর্মদার চোখ দুটো যেন কি বলতে চাইছে। কি হয়েছে মা?

নর্মদার ঠোঁট কাঁপতে থাকে মৃদু মৃদু। কুন্তী বুঝতে পারে মা কি যেন বলবার তাকে চেষ্টা করছে কিন্তু পারছে না।

মা—

কুন্তী মার হাতটা ধরে, হাতটা তখন নর্মদার কাঁপছে।

কুন্তী ভয় পেয়ে যায়, তাড়াতাড়ি বারান্দায় ছুটে গিয়ে ডাঃ মুখার্জীকে ফোন করে ফিরে আসবার সময় সতীনাথের ঘরের দরজাটার দিকে তার নজর পড়ে।

দরজাটা হা হা করছে খোলা—ঘরের ভিতর আলো জ্বলছে।

কি ভেবে কুন্তী ঘরের ভিতর গিয়ে পা দেয় এবং পা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই দাঁড়িয়ে যায়, সতীনাথ নেই ঘরে।

ধক করে ওঠে যেন বুকের ভিতরটা, বাবা, বাবা—

কারো কোন সাড়া নেই।

শুধু রাত্রিশেষের হাওয়ায় ঘরের জানালায় পর্দাগুলো উড়ছে। সামনেই দেওয়ালে টাঙানো মা ও বাবার পাশাপাশি এনলার্জ ফটো দুটো।

সেই ফটোর দিকে নজর পড়ল।

সতীনাথ যেন চেয়ে আছেন তার মুখের দিকে।

আধঘণ্টার মধ্যেই ডাক্তার মুখার্জী এলেন।

রোগিণীকে পরীক্ষা করে বললেন, কোন কারণে খানিকটা exeitement হয়েছিল বোধ হয়—Pulse rate ও Pressureটা একটু বেড়েছে—otherwise ভয়ের কোন কারণ নেই—

একটা ঘুমের ঔষধ দিয়ে চলে গেলেন ডাঃ মুখার্জী।

পরে কুন্তীর মনে হয়েছে, তবে কি মা সেই মুহূর্তে বাবার চলে যাওয়ার ব্যাপারটা জানতে পেরেছিল ?

কারণ ইতিপূর্বে যেমন কখনো ওরকম হয় নি তেমনি পরে যতদিন বেঁচে ছিল নর্মদা ওরকম কিছু কোনদিন হয় নি !

এদিকে, পরের দিন থেকেই সংসারের সমস্ত দায়িত্বটা এসে পড়ল কুন্তীর ঘাড়ের উপরে।

কতই বা বয়স তখন কুন্তীর। তার উনিশ আর মানসীর বার, সে তখন থার্ডইয়ারে আর মানসী পড়ে ক্লাস এইটে, স্কুলে।

সতীনাথের চলে যাওয়ার ব্যাপারটা কিন্তু বেশী দিন চাপা গেল না। ক্রমে ক্রমে বাড়ির সবাই জেনে ফেলল। কিন্তু সংসারের চাকাটা অব্যাহত চলতে লাগল।

বাড়ির একটিমাত্র মানুষ চলে যাওয়া ছাড়া আর কোন পরিবর্তনই তো হয় নি। সব ব্যবস্থা যে করে রেখে গিয়েছিলেন সতীনাথ।

বিরাট বাড়ি, গাড়ি, চাকর-চাকরাণী-আয়া—ড্রাইভার, ঠাকুর আর ছিল সরকার—বনমালী সরকার।

দীর্ঘদিনের লোক ঐ বাড়িতে ঐ বনমালী সরকার।

জ্ঞান হওয়া অবধি কুন্তী বনমালী সরকারকে দেখে আসছে, ছোটবেলায় তো কত কোলে-পিঠেও চড়েছে।

রোগা ঢ্যাঙ্গা দড়ির মত পাকানো চেহারাটা। কষ্টি পাথরের মত কালো গায়ের রঙ। মাথায় কাঁচা পাকা কদমছাঁট চুল, চোখে নিকেলের ফ্রেমে চশমা, বাঁকানো উঁচু নাক। তোবড়ানো গাল। মুখে সর্বদাই খোঁচা খোঁচা দাড়ি থাকত !

হপ্তায় একদিনের বেশী কামাত না বনমালী সরকার।

কি শীত, কি গ্রীষ্ম একটা গলাবন্ধ খদ্দরের মোটা কোট গায়ে, হাঁটুর ওপর তোলা মোটা খদ্দরের ধুতি।

বাবা ডাকত, বনমালী বলে—মা ডাকত, ঠাকুরপো—আর ওরা দুবোনে ডাকত, বনমালী কাকা। বাড়ির অন্যান্য সকলে বলত, সরকার মশাই—

বাড়ির একতলায় পশ্চিমের ছোট ঘরটিতে এক কোণে থাকত বনমালী সরকার। ঘরের মধ্যে আসবাবপত্রের কোন বাহুল্য ছিল না—

একটা চৌকি তার উপরে একটা সতরঞ্চি পাতা, একটা বালিশ। এক কোণে একটা টিনের পোর্টম্যাণ্টো আর একজোড়া ক্যামবিশের জুতো, তাও ধুলোয় ধুলোয় লালচে হয়ে গিয়েছে।

বড় হয়ে বাবার কাছে একদিন কথায় কথায় শুনেছিল কুন্তী, ব্রিটিশ আমলে লোকটা নাকি একজন দুর্ধর্ষ—terrorist, বিপ্লবী ছিল। ঘরছাড়া গৃহহারা, কোথায় কোথায় কোন পাহাড়ে, কন্দরে, ঘনবনের মধ্যে আত্মগোপন করে বেড়াত আর দেশকে সশস্ত্র বিপ্লবের দ্বারা স্বাধীন করবার স্বপ্ন দেখত।

কতবার সশস্ত্র ব্রিটিশের সঙ্গে মুখোমুখি লড়াই করেছে—

দেশ স্বাধীন হবার পর যখন ফিরে এল, দেখল তার কথা কেউ জানে না,

জানার প্রয়োজনও মনে করে না।

তারপরেই কথাগুলো অবিশ্যি একদিন কুন্তীই জিজ্ঞাসা করে জেনেছিল।

কেন কাকা, চিনতে পারল না কেন তোমায় ?

দূর পাগলী···কি এমন করেছি বল তো যে আমায় চিনে রাখতে হবে! দেশকে ভালবেসেছি সে একান্তই নিজস্ব আমার মনের তাগিদে। দেশ স্বাধীন হোক এইটাই চেয়েছিলাম, স্বাধীন দেশের একজন নাগরিক হব, হয়ে মাথা উঁচু করে বেঁচে থাকব এইটুকুই চেয়েছিলাম, তার বেশী তো কিছু চাই নি—

কি বলতে গিয়েও যেন চেপে গিয়েছিল নিজেকে বনমালী সরকার।

পরে অনেকবার প্রশ্ন করেও জবাব পায় নি বনমালীর কাছ থেকে কুন্তী।

যা হোক ঐ বনমালী সরকার মানুষটা নীচের একটি ছোট ঘরে সবার চোখের আড়ালে থাকলেও সে যে সতীনাথের সংসারের প্রাণকেন্দ্র ছিল সেটা বুঝতে কুন্তীর বেশীদিন দেরি হয় নি।

সতীনাথকে একদিন কুন্তীই প্রশ্ন করেছিল, আপনি বনমালী কাকাকে খুব বিশ্বাস করেন, না বাবা ?

একটা কথা মনে রাখিস মা, অত বড় বিশ্বাসের জায়গা যেমন পাবি না, তেমনি অমন একজন সত্যিকারের শুভানুধ্যায়ীও জীবনে পাবি না।

সতীনাথের গৃহত্যাগের পর কথাটা যে কত বড় সত্যি সেটা যেন মর্মে মর্মে উপলব্ধি করে কুন্তী।

বনমালী কাকা না থাকলে যে কি হতো কথাটা, ভাবতে গিয়েও যেন বুকের ভিতরটা তার হিম হয়ে যায়।

সংবাদটা কুন্তী বনমালী কাকার কাছেই প্রথম পায়।

তার বাপ সতীনাথের কেবল যে একজন প্রথিতযশা চিকিৎসক হিসাবে উপার্জন ছিল তাই নয়, দমদমার ওদিকে একটা ঔষধের কারখানাও ছিল।

এবং সেটা রীতিমত একটা লাভজনক ব্যবসা বছর তিনেক থেকে হয়েছিল। সতীনাথের পরিকল্পনা ছিল ঔষধের কারখানাটাকে বিরাট একটা কিছু গড়ে তোলা।

কুন্তী সব শুনে বলে, বাবার সে স্বপ্নকে কি আমরা সফল করে তুলতে পারি না বনমালী কাকা ?

কেন পারবে না মা, নিশ্চয়ই পারবে, চেষ্টা করলেই পারবে। কিন্তু তাই বলে তুমি পড়াশোনা বন্ধ করতে এখন পারবে না—

কিন্তু—

তুমি তোমার পড়াশোনা শেষ কর, যতদিন না শেষ হয় আমি আছি—

কুন্তী মনে মনে নিশ্চিন্ত হয়।···

ঐ সময়ই একদিন বাবার স্থাপিত কারখানাটা চোখে একবার দেখবার জন্য বনমালী কাকাকে অনুরোধ জানায় কুন্তী।

বনমালী বলে, বেশ তো, নিয়ে যাব—

নিয়ে যাব নয়, কবে নিয়ে যাবে বল ?

কবে যেতে চাও তুমি বল ?

কাল—

কালই ?

হ্যাঁ—

বেশ, তাই যাব—

কলেজ থেকে ফিরে পরের দিন বনমালীর সঙ্গে বাপের স্থাপিত ঔষধের কারখানা দেখতে বের হয় কুন্তী—

কারখানায় ঘুরে দেখতে দেখতে এক সময় এসে ল্যাবরেটরীতে ঢোকে।

সেইখানেই কাজ করছিল শিশিরাংশু।

এম. এস-সি পাশ করে সামান্য মাহিনায় ঐ কারখানায় মাস কয়েক হল সে তখন রিসার্চ এ্যাসিষ্টাণ্ট হয়ে এসে কাজ করছে।

॥ ছয় ॥

ট্রেনটা একটা ব্রীজের উপর দিয়ে পাশ করছিল। নীচে নদী।

শীতের নদী শীর্ণা, খালি বালি আর বালি তার মধ্যে দিয়ে কোনমতে ঝির ঝির করে বহে চলেছে ক্ষীণ একটা জলধারা।

প্রথম ভোরের আলো নদীর জলে পড়ে থির থির করে কাঁপছে।

ফিরে তাকাল কুন্তী, সীতা ঘুমাচ্ছে।

হাওয়ায় মাথার চুলগুলো কপালের ওপরে এসে পড়েছে, সস্নেহে হাত দিয়ে চুলগুলো সরিয়ে দেয় কুন্তী।

শিশিরাংশু, শিশিরাংশু নাকি চিঠি দিয়েছি স্কুল সেক্রেটারীকে।

আশ্চর্য !

পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন ডাঃ লাহিড়ী, তারই এ্যাসিষ্টাণ্ট হিসাবে কাজ করছিল শিশিরাংশু তখন।

শিশির, কুন্তী চৌধুরী—আমাদের এই কোম্পানীর ম্যানেজিং ডাইরেক্টর ডাঃ চৌধুরীর মেয়ে।

শিশির তাড়াতাড়ি হাত তুলে নমস্কার জানায়।

নমস্কার—

মৃদু কণ্ঠে প্রতি নমস্কার জানায় কুন্তী।

ছোটবেলায় গ্রীক্ ফেয়ারি টেলক-এ একটা এ্যাপোলোর ছবি দেখেছিল কুন্তী, ঠিক যেন তেমনি চেহারা—

রংটা ফর্সা নয়, মাজা মাজা, কিন্তু দেহ-সৌষ্ঠবের যেন তুলনা নেই, সুগঠিত, সুঠাম দেহ।

ফিরে এল এক সময় কিন্তু মনের মধ্যে ছাপটা থেকে গেল।

পাঁচ দিনও গেল না, আবার একদিন কুন্তী কাউকে কিছু না বলে একাই কলেজের পর বাসে চেপে দমদম চলে গেল।

সোজা গিয়ে ঢুকল ল্যাবরেটরীতে। সেদিন ল্যাবরেটরীতে ডাঃ লাহিড়ী

ছিলেন না, একাই শিশিরাংশু কাজ করছিল।

একটা টেস্ট টিউবে নীল রঙের কি একটা তরল পদার্থ নিয়ে বুনসেন বার্ণারের ফ্লেমে গরম করছিল।

ওটা কি গরম করছেন?

কুন্তীর প্রশ্নে চমকে ফিরে তাকায় শিশিরাংশু, কে, ও আপনি—

কুন্তী মৃদু হাসে।

কখন এলেন আপনি? শুধায় শিশিরাংশু।

এই তো—

কারখানায় কোন কাজ আছে বুঝি?

না তো—

তবে?

কি তবে?

এখানে—কথাটা শেষ করে না, অসম্পূর্ণ রেখেই মুখ তুলে তাকায় শিশিরাংশু কুন্তীর মুখের দিকে।

হঠাৎ যেন কেমন লজ্জাবোধ করে কুন্তী।

সত্যিই তো, কি জবাব দেবে ঐ প্রশ্নের। কেন সে এসেছে, হঠাৎ কলেজ থেকে কেন এখানে সে চলে এসেছে ছুটির পর।

এদিকে মানে—কুন্তী বলে, এদিকে আমার এক বান্ধবী থাকে, তার কাছে এসেছিলাম—

ও—

হঠাৎ মনে হল কারখানাটা ঘুরে যাই, তাই—আচ্ছা চলি, নমস্কার—

কুন্তী আর দাঁড়ায় না, ল্যাবরেটরী থেকে বের হয়ে পড়ে।

কোন এক সময় বোধ হয় একটা বাগানবাড়ি ছিল, অনেকখানি জায়গা, একটা পুকুরও আছে। মাঝখানে দোতলা একটা পাকা বাড়ি।

সতীনাথ বাড়িটা কিনে আরো কিছু কিছু ঘর তৈরী করে ঔষধের কারখানাটার পত্তন করেছিলেন।

তিন বন্ধুতে মিলে করেছিলেন পত্তন। যদিও অংশে তারই টাকা বেশী ছিল। পরে সেই দুই বন্ধু কিছু কিছু আরো দিলেও সতীনাথের অংশটাই বেশী। এবং সতীনাথই প্রথম থেকে কারখানাটার পিছনে বেশী পরিশ্রম করেছেন।

কথাটা জানতে পেরেছিল কুন্তী তাদের সলিসিটার রায় এণ্ড বোসের কাছ থেকে।

রায় এণ্ড বোসের সিনিয়ার পার্টনার মতি রায়ই বলেছিলেন, আর দুজন অংশীদার কারখানার থাকলেও তাদের মাত্র দু আনা করে চার আনা অংশ, বাকী বার আনা অংশের মালিক সতীনাথ ও তার দুই মেয়ে, কুন্তী ও মানসী।

এবং কুন্তী ও মানসী প্রাপ্তবয়স্কা হলে কোম্পানীর ডাইরেক্টর হবারকথা ছিল। সেদিক দিয়ে কুন্তী গত বছর থেকে একজন ডাইরেক্টর।

দুপাশে কিছু একতলা বাড়ি, কিছু পাকা গাঁথুনির উপর এ্যাসবেস্টাসের

শেড, মাঝখান দিয়ে লাল সুরকির রাস্তা ও ধারে ধারে ফুলের কেয়ারি।

সন্ধ্যা হওয়ায় ইতিমধ্যে চারিদিকে আলো জ্বলে উঠেছিল, কুন্তী মাঝখানের রাস্তা ধরে এগিয়ে যাচ্ছিল।

গেট রবারের আসতেই পিছনে পায়ের শব্দে ও ফিরে তাকায়।

শিশিরাংশু।

এ কি, আপনি—

হ্যাঁ, কিন্তু আপনার গাড়ি কোথায়? শিশিরাংশু প্রশ্ন করে।

গাড়ি তো আমি আনি নি—

গাড়ি আনেননি তবে, কিসে এলেন?

কেন, বাসে—

সে কি! বাসে এসেছেন?

কি হয়েছে তাতে, তাছাড়া বাসেই তো আমি যাতায়াত করি—

চলুন, দাঁড়ালেন কেন?

আবার দুজনে হাঁটতে হাঁটতে গেট পার হয়ে আসে। দরোয়ান কুন্তীকে সেলাম দেয়, ইতিমধ্যে সে জেনেছিল গতকালই কুন্তীর পরিচয়টা।

শিশিরাংশু আবার বলে, চলুন, আপনাকে পৌঁছে দিয়ে আসি—

না, না, তার কোন প্রয়োজন হবে না, আমি একাই যেতে পারব—

তা পারবেন জানি, তা হলেও এভাবে একা আপনাকে আমার ছেড়ে দেওয়া উচিত হবে না···তাছাড়া ডাঃ লাহিড়ী শুনলে আমাকে গালাগালি করবেন।

বাঃ, তা কেন করবেন, আমি তো একাই এসেছি, একা চলে যাব—

তা কি হয়, এ কোম্পানীর বলতে গেলে আপনি মালিক।

আমি একা মালিক হব কেন, আমার বোন আছে, আরো দুজন আছেন—

শিশিরাংশু হেসে বলে, আছেন, তবে আপনারা বার আনার মালিক, এবং খোদ ম্যানেজিং ডাইরেকটারের মেয়ে আপনি—

আপনি এত কথা জানলেন কি করে?

কেন, ডাঃ লাহিড়ীই বলছিলেন—

দুজন রাস্তায় বের হয়ে কথা বলতে বলতে বাস স্ট্যান্ডের দিকে যাচ্ছিল, এরোড্রোমের দিক থেকে একটা খালি ট্যাক্সি আসতে দেখে শিশিরাংশু হাত ইশারায় ট্যাক্সিটা থামাল।

ট্যাক্সিটা সামনে এসে দাঁড়াতেই শিশিরাংশু বলে, উঠুন—

কি দরকার, বাসেই তো অনায়াসে চলে যেতে পারতাম—

পারতেন ঠিকই, আর বাসে এখানকার কেউ আপনাকে দেখলেও হয়তো কিছু মনে করবে না। ভাববে, বিলাসিতা—কিন্তু তা হলেও সেটা উচিত হবে না, নিন উঠুন—

কুন্তী আর কথা বাড়ায় না। ট্যাক্সিতে উঠে বসে।

শিশিরাংশু সামনে উঠতে যাচ্ছিল, কুন্তী বাধা দেয়, বলে, ও কি, সামনে

কেন, এদিকে আসুন—

না, না, সামনেই তো আমি বসতে পারব—

পারবেন তা জানি, এদিকে আসুন।

শিশিরাংশু ট্যাক্সিতে উঠে বসতেই ড্রাইভার ট্যাক্সি ছেড়ে দেয়।

কলকাতার দিকে ট্যাক্সি চলে।

কুন্তীই আবার প্রশ্ন করে, তখন বাসে যাওয়া উচিত হবে না কেন বলছিলেন?—

একটা কোম্পানীর ডাইরেকটার কখনো বাসে যায় নাকি! তাছাড়া যাবেনই বা কেন? আপনাদের তো অভাব নেই—

অভাব নেই বলেই কি ট্যাক্সিতে যেতে হবে নাকি!

দেখুন মিস চৌধুরী, যে যাই বলুক, আপনার বাসে যাতায়াতটাকে কিন্তু আমি বলব, অহেতুক—

অহেতুক—

তা বৈ কি। কি জানেন ঐশ্বর্যের অহংকারটা নিশ্চয়ই ভাল না কিন্তু তার যোগ্য সম্মানটুকু না দিলে যে ঐশ্বর্যকেই ছোট করা হয়, হয়তো বুঝতে পারবেন না ঠিক আমার কথাটা। আমরা নিম্ন মধ্যবিত্ত যারা, আমরা যে কি ভাবে আমাদের নিজেদের সঙ্গে আপোষ করবার চেষ্টা করি সেটা আপনারা জানেন না বলেই আপনার মত একজন মানুষের পক্ষে বাস ও ট্যাক্সির পার্থক্যটা স্পষ্ট নয়।

কি জানি কেন শিশিরাংশুর শেষের কথাগুলোতে কেমন যেন লজ্জাবোধ করতে থাকে কুন্তীর, তাড়াতাড়ি প্রসঙ্গটা পাল্টাবার জন্য অন্য প্রসঙ্গে চলে যায়।

বলে, আপনি কোথায় থাকেন।

বেলেঘাটায়—

তা হলে ট্যাক্সিওয়ালাকে বলুন, সেদিক দিয়ে যেতে—

তার কোন প্রয়োজন নেই, শিয়ালদহের ধার দিয়ে যাবার সময় আমি নেমে যেতে পারব—

না, না, তা কেন, আপনাকে আপনার বাড়ির দরজায় একেবারে ড্রপ করে দিয়ে যাব।

শিশিরাংশু হেসে ওঠে।

হাসলেন যে—

এই জন্য যে, তার উপায় নেই।

উপায় নেই। কেন।

সে এক জলে-কাদায় সর্বক্ষণ—সর্ব season-এ প্যাচপ্যাচে অন্ধকার গলি, সেখানে গাড়ি ঢোকা তো দূরে থাক, রিক্সাও ঢুকতে পারে না, পারে একমাত্র আমাদের মত যারা, পায়ে হেঁটে সন্তর্পণে জামাকাপড় বাঁচিয়ে।

কুন্তীর সেদিন মনে হয়েছিল শিশিরাংশুর কথার মধ্যে কোথায় যেন একটা ব্যঙ্গের হুল রয়েছে।

সে আর কথাটা বাড়াবার চেষ্টা করেনি, চলন্ত গাড়ির মধ্যে চুপচাপ বসেছিল।

তারপর গাড়িটা যখন শিয়ালদহের কাছাকাছি এসেছে, কুন্তীর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে গাড়ি থেকে নেমে যায় শিশিরাংশু।

সেদিনের কথাটা কুন্তীর আরো বেশী করে মনে আছে। কারণ, বাড়িতে এসে পা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আর এক অভিজ্ঞতার মুখোমুখি হয়ে তাকে দাঁড়াতে হয়েছিল।

সতীনাথের সংসারে আত্মীয়-স্বজন বা আপনার জন যে ছিল না তা নয়।

কিন্তু কখনো সে সব আত্মীয়-স্বজনদের দেখা দূরে থাক কারো নামও শোনেনি বাবার মুখে কুন্তী। শুধু কথায় কথায় জেনেছিল গ্রামে একদা তার পিতামহ রমণীমোহনের আদিনিবাস ছিল এবং রমণীমোহন ছিলেন নাকি অতিরিক্ত নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ। তাঁরই জ্যেষ্ঠ পুত্র হয়ে সতীনাথ সে সময় ভালবেসে এক ব্রাহ্ম পরিবারে বিবাহ করেছিলেন, এটা তিনি কোন দিনই ক্ষমা করতে বা ক্ষমার চোখে দেখতে পারেননি।

যতকাল নাকি বেঁচে ছিলেন পুত্রের মুখদর্শনও করেননি, নাম পর্যন্ত মুখে উচ্চারণ করেননি। এবং মৃত্যুর পূর্বে উইল করে গিয়েছিলেন, তাঁর সম্পত্তির এক কপর্দক বা বাস্তুভিটার ওপরে কোন দাবিই থাকবে না সতীনাথের।

সতীনাথকে তিনি ত্যাজ্যপুত্র করে গিয়েছিলেন। এবং তার আর এক ছেলে রতিনাথকে সব কিছু দিয়ে গিয়েছিলেন। রতিনাথ গ্রামের বাড়িতেই থাকতেন এবং কোন দিন তাকে কুন্তীরা দেখেনি।

গ্রামে থেকে জেলা আদালতে ওকালতি করতেন রতিনাথ।

সেদিন গৃহে ফিরে সিঁড়ি দিয়ে দোতলায় উঠেছে কুন্তী, ভৃত্য সাধুচরণ এসে সামনে দাঁড়াল।

বড়দিমণি।

কি রে, মা কেমন আছে?

ভাল, কিন্তু ওদিকে যে তোমার দেশ থেকে কাকা-কাকীমা ও তার দুই ছেলে এক মেয়ে এসে হাজির।

সেকি।

তুমি কলেজে যাবার কিছুক্ষণ পরেই এসেছেন, এসেই সব তচনচ করে বেড়াচ্ছেন সারা বাড়ি।

কুন্তীর কিন্তু কাকা দেশের বাড়ি থেকে এসেছেন শুনে আনন্দই হয়, সে উৎফুল্ল কণ্ঠে বলে, সত্যি, কোথায়? কোথায় কাকা—

যান উপরে, দেখুন না গিয়ে, এসেই কত্তাবাবুর ঘরটা দখল করে বসেছেন—

রতিনাথ দেশ থেকে এসেছেন শুনে আনন্দ হয়েছিল কুন্তীর এই কারণে যে এত বড় বাড়িতে মাথার উপরে কেউ নেই, রুগ্না পক্ষাঘাতগ্রস্তা মা, একমাত্র ছোট বোন মানসী, একা একা যেন কুন্তী হাঁপিয়ে উঠেছিল এই কয়দিনেই—

বাবা চলে যাওয়ার বাড়িটা যেন একেবারে শূন্য হয়ে গিয়েছিল কুন্তীর কাছে।

একমাত্র বোন মানসী, সে তার চাইতে অনেক ছোট, তা ছাড়া সে তো এখনো ছেলেমানুষ বলতে গেলে, তাকে না যায় একটা কথা জিজ্ঞাসা করা বা যায় তার কাছে কোন পরামর্শ গ্রহণ করা।

নিজেও সে কয়েকদিন থেকে ভাবছিল, দেশে তো তার কাকা আছেন শুনেছে সে, তাকেই না হয় ডেকে আনবে।

মাথার উপর একজন না থাকলে কেমন যেন অসহায় লাগে বড়।

যাক, কাকা নিজে থাকতেই এসে গেছেন, খুব ভাল হয়েছে।

॥ সাত ॥

তাড়াতাড়ি সিঁড়ি বেয়ে দোতলায় উঠতেই একটা মোটাসোটা কালো সাধারণ একখানি মিলের লালপাড় শাড়ি পরনে, হাতে শাঁখা মোটা হাঙ্গরমুখী বালা, মাথায় তেল সিন্দুরের মস্ত এক টিপ, একজন মহিলার সামনে পড়ে গেল কুন্তী।

সঙ্গে সঙ্গে দাঁড়িয়ে পড়ে কুন্তী।

মহিলাটি ভ্রূ কুঁচিত করে কুন্তীর আপাদমস্তক বার দুই নিরীক্ষণ করে শ্যেন দৃষ্টিতে খনখনে গলায় প্রশ্ন করে, কে গা তুমি—

কুন্তী ততক্ষণে অনুমান করে নিয়েছে মানুষটি কে।

সেই যে তার সদ্য দেশগ্রাম থেকে আগত তার কাকীমা ছাড়া অন্য কেউ নয় মনে মনে সেটার সম্পর্কে স্থির হয়েই হাসি হাসি মুখে বলে, আপনিই বোধ হয় আমার কাকীমা, আমি কুন্তী, বলতে বলতে কুন্তী এগিয়ে যায় মহিলার পদধূলি নেবার জন্য।

মহিলা অর্থাৎ নিস্তারিণী দেবী তাড়াতাড়ি কুন্তীর স্পর্শ থেকে, নিজেকে বাঁচাবার জন্য দু পা পিছিয়ে গিয়ে বলে, থাক থাক, ছুঁয়ো না বাপু, একে সর্দির ধাত আমার, এই ভরসন্ধ্যা রাত্রে আবার নাইতে পারব না—

কুন্তী ততক্ষণে সোজা হয়ে দাঁড়িয়েছে, কিছুটা ব্যবধানে।

ইতিমধ্যে ওদিককার ঘর থেকে চটি জুতোর চটাস চটাস শব্দ করতে করতে তালগাছের মত রোগা ঢ্যাঙ্গা, চিমসে এক পুরুষ, বারান্দায় নিস্তারিণীর পাশে এসে দাঁড়ায়।

এটি কে গিন্নী, তারা, তারা—

আগন্তুকের প্রশ্নে তার দিকে এবারে ভাল করে তাকায় কুন্তী।

মাথাভরা তেল চকচকে বড় বড় বাবরী চুল, কপালে সিন্দুরের ফোঁটা, পরিধানে একটি ধুতি ও বেনিয়ান। গায়ের বর্ণ রীতিমত যাকে বলে গৌর।

তারা, তারা—

চিনতে পারছ না? নিস্তারিণী বলে স্বামীকে।

না তো—

তোমার দাদার কন্যেরত্ন যে এটি—

বল কি !

হ্যাঁ, মাগো মা, এ যে বিয়ে দিলে চার ছেলের মা হয়ে যেত—

আঃ, হঠাৎ ধমকে ওঠে রতিনাথ স্ত্রীকে, থাম তো, কি আবোল-তাবোল সব বকতে শুরু করলে।

তা সত্যি কথা বললে যদি আবোল-তাবোল বকা হয় তো আমি বাপু নাচার, ঢং মিনষের, বলে মুখটা ঘুরিয়ে নিস্তারিণী স্থান ত্যাগ করে।

কুন্তী তখনো পাথরের মত দাঁড়িয়ে।

রতিনাথই কথা বলে, তোমারই নাম মা কুন্তী।

হ্যাঁ—

কুন্তী এবারে কিছুটা সাহস পায়, এগিয়ে গিয়ে রতিনাথের পায়ের ধুলো নেয়।

থাক মা, থাক, বেঁচে থাকো, দেখ মা, তোমাকে না জানিয়ে দাদার ঘরটা আমি ব্যবহার করবার জন্য নিয়েছি—

তাতে কি হয়েছে, বেশ করেছেন, আপনি বাবার ঘরে থাকবেন সে তো ভালই—

আমি জানতাম, আমার মামণি আমার অসম্মান করবে না। কিন্তু এখানে দাঁড়িয়ে তো সব কথা হবে না, চল, ঘরে চল—

কুন্তী রতিনাথের সঙ্গে সঙ্গে অনেকদিন পরে আবার তার বাবার ঘরে এসে ঢুকল। সতীনাথের গৃহত্যাগের পর আর সে ঘরে পা দেয় নি।

ঘরে তালা দেওয়াই থাকত, কেবল সকালে বিকালে ভৃত্য একবার ঘরটা পরিষ্কার করে রাখত। কুন্তীরই নির্দেশ ছিল সেটা।

ঘরের মধ্যে প্রবেশ করে রতিনাথ বলে, হয়ত একটা কথা তোমার মনে হবে মামণি, আর মনে হওয়াটাও স্বাভাবিক। এতদিন কখনো আসি নি, একটা চিঠি লিখে তোমাদের কোন খোঁজ-খবর পর্যন্ত নিই নি, আজ হঠাৎ কেন এসে হাজির হলাম—

কুন্তী কি আর বলবে, চেয়ে থাকে কেবল রতিনাথের মুখের দিকে।

তার বাবার মতই কাকার রংটা ফর্সা বটে, কিন্তু আশ্চর্য, মুখটার মধ্যে যেন কোথাও কোন আদল খুঁজে পাচ্ছে না। বাবার মুখের মধ্যে যে একটা শান্ত সৌম্য গাম্ভীর্য ছিল, কাকার মুখের মধ্যে কোথাও যেন সেটা নেই। কোথায় যেন সূক্ষ্ম কি একটা পার্থক্য আছে।

অথচ বাবারই সহোদর ভাই।

আর কখনো তো বাবা কাকার নামও মুখে আনেন নি। কেন, তার ঠাকুর্দা তার বাবার সঙ্গে তার মার বিবাহের জন্য সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করে দিয়েছিলেন বলেই কি? মনের মধ্যে ঐ মুহূর্তে কুন্তীর সেই কথাগুলোই যেন বার বার উদয় হতে থাকে।

কি জান মা—

রতিনাথের গলার স্বরে চমকে আবার কুন্তী তার মুখের দিকে তাকায়।

রতিনাথ বলে, লজ্জায় বুঝলে মা, লজ্জায়, বাবা দাদার উপর যে

অন্যায় বিচার করেছিলেন তার লজ্জাটাই আমাকে সর্বদা দগ্ধ করেছে। মরবার সময় দাদাকে তার এক কপর্দকও দিলেন না, সব দিয়ে গেলেন আমাকে—তারা—তারা।

ও সব কথা থাক কাকা, বাধা দেয় কুন্তী।

কেমন যেন লজ্জা করে তার।

না মা, থাক বললেই আজ আর সেটা চাপা দেওয়া যায় না। তা ছাড়া দাদাকে সম্পত্তিচ্যুত করা মানে তো তোমাদেরও করা, তোমাকে, মানসীকে—দাদা যদি বাবার বিচারে অপরাধী হনও তোমরা তো কোন অপরাধে অপরাধী নও মামণি, তবে তোমরা কেন তা সহ্য করবে। জান মা, একটু থেমে বলে রতিনাথ, সব কিছু যদি আমার জ্ঞাতসারে হত, অর্থাৎ বাবা কিছু করবার সময় যদি আমি তা জানতে পারতাম নিশ্চয়ই বাধা দিতাম, বলতাম, এত বড় অন্যায় করবেন না বাবা। কিন্তু তা তো নয়, কিছুই আমি জানতে পারি নি, জানলাম তার মৃত্যুর পর প্রথম। তারা—তারা—

আপনি জানতেন না?

না, ঘুণাক্ষরেও জানতে পারিনি, তারপর তার মৃত্যুর পর যখন জানতে পারলাম, লজ্জায় দাদাকে কিছু জানাতে পারি নি—

কেন?

দাদা যদি অন্য রকমটা মনে করেন যে আমিই বাবাকে দিয়ে কৌশলে সব লিখিয়ে নিয়েছি, তারা—তারা—

কুন্তী আবার বাধা দেয়, ওসব কথা থাক কাকা—

তুমি ঠিকই বলেছ মা, সেই দাদারই তো মেয়ে তুমি, হবে না কেন, বলবে না কেন—তারা, তারা—মনে আমার সেদিন কোন পাপ ছিল না বলেই না—তোমরা কিছু না বলা সত্ত্বেও লোকমুখে দাদার গৃহত্যাগের সংবাদ পেয়েই ছুটে আসছি। তোমাদের এতবড় বিপদ, বৌঠান পঙ্গু, মৃত্যুপথ যাত্রী—তোমরা দুটি শিশু, মাথার উপর একজন অভিভাবক নেই তাইত ছুটে এলাম—

বাইরে থেকে ঐ সময় বনমালী সরকারের কণ্ঠস্বর শোনা গেল, মামণি—

আসুন বনমালী কাকা, আমি এই ঘরে—

কুন্তী তাড়াতাড়ি বলে।

একটা খাতা ও চেক বই নিয়ে বনমালী এসে ঘরে ঢোকে।

ভ্রূকুঞ্চিত করে তাকায় রতিনাথ বনমালীর দিকে, বার কয়েক তার আপাদমস্তক দেখে নিয়ে কুন্তীর দিকে তাকিয়ে বলে, এ কে মা?

বনমালী কাকা, বলেই কুন্তী বনমালীর দিকে তাকিয়ে বলে, বনমালী কাকা, ইনি আমার কাকা, দেশ থেকে এসেছেন—

বনমালী গম্ভীর শান্ত কণ্ঠে কেবল বলে, জানি—

আমার নিজের কাকা, বাবার সহোদর ভাই—

কুন্তীর শেষের কথাগুলোর কোন আর জবাব দেয় না বনমালী, রতিনাথের দিকে ফিরেও তাকায় না, তার দিকে তাকিয়েই বলে, তুমি বোধহয় এখন ব্যস্ত-

আছ মা, থাক, না হয় কাল সকালেই হিসাবটা দেখ, আর চেক ক'টা সই করে দিও—

না, না, ওকে ছেলেমানুষকে আর বিরক্ত করা কেন বনমালীবাবু, আমি যখন এসেই পড়েছি, রতিনাথ বলে ওঠে, ছেলেমানুষ ও, এখন ওর হেসে খেলে বেড়াবার সময়, আমিই ওসব দেখতে পারব। চলুন বরং আপনার ঘরে গিয়ে দুজনে বসা যাক—

বনমালী কিন্তু রতিনাথের কথায় কোনও সাড়াও দেয় না, উৎসাহও দেখায় না।

এমন কি রতিনাথের দিকে ফিরেও তাকায় না, ঘর থেকে বেরুবার জন্য পা বাড়ায় এবং যেতে যেতে বলে, সকালেই তবে হবেখন মামণি—

বনমালী ধীরে ধীরে বের হয়ে গেল।

আর প্রচণ্ড ক্রোধে, অপমানে পাথরের মত দাঁড়িয়ে রইল রতিনাথ ঘরের মধ্যে।

কুন্তী যেন নিজেকে হঠাৎ কেমন বিব্রত বোধ করে। অতঃপর তার কি যে করা কর্তব্য, কি করলে শোভন হবে কিছুই যেন বুঝে উঠতে পারে না।

ঐ সময় প্রশ্ন করে রতিনাথ আবার, লোকটা কে মামণি? এর কথা তো কখনো শুনি নি?

বাবার বন্ধু—

দাদার বন্ধু, তা—

অনেকদিন এখানে আছেন, বাবা ওরই হাতে আমাদের সবকিছু দিয়ে গিয়েছেন—

সে কি! না, না, এ তো ভাল নয়, কোথাকার কে, এতবড় বিরাট সম্পত্তি—

উনি সন্ন্যাসী ব্রহ্মচারী মানুষ, প্রথম জীবনে বিপ্লবী ছিলেন তারপর দেশ স্বাধীন হলে—

কি বললে, বিপ্লবী, terrorist—তারা—তারা—

হ্যাঁ—

বুঝলে মা, ওরা হচ্ছে দেশের শত্রু—

এ কি বলছেন আপনি—

হ্যাঁ, তুমি জান না, গান্ধীজী কোন দিন ওদের ভাল চোখে দেখেন নি—

না, না, তা কেন হবে, ক্ষুদিরাম, বাঘাযতীন, কানাইলাল, রাসবিহারী, সূর্যসেন, মহাত্মাজী তাঁদের প্রত্যেককে অত্যন্ত স্নেহ করতেন, ভালবাসতেন।

রতিনাথ অত্যন্ত চতুর মানুষ সঙ্গে সঙ্গে কথার সুরটা পালটে দেয়। বলে, না, না মামণি, আমি ঠিক তা বলি নি, terrorist মাত্রেই যে সব দেশপ্রেমিক ছিল তা নয়, তার মধ্যে ছদ্মবেশী অনেক কুখ্যাত ডাকাতও ছিল। যাক গে সে কথা, বনমালীর কথা এখন আমার মনে পড়ছে বটে দাদার মুখে দু একবার যেন শুনেছি, তাহলে ঐ সব দেখাশোনা করছে।

হ্যাঁ, আমরা তো সব বুঝি না, ব্যবসা, বিষয় সম্পত্তির ব্যাপার—

তা অবিশ্যি ভালই হয়েছে, মেয়েছেলেরা কি এসব পারে তাও তোমাদের মত বালিকা মাত্র যারা বয়সে, তবে আর ভয় নেই মামণি আমি যখন এসে গেছি, তুমি নিশ্চিন্ত থাক, সব আমি দেখে দেব।

কিন্তু দেখা গেল গন্ডগোল সেইখানেই বেধে গেল সর্বপ্রথমে।

কুন্তী চিনতে পাবে নি সেদিন তার কাকাকে কিন্তু বনমালী ঠিকই চিনতে পেরেছিলেন মানুষটাকে। তাই যখনই বিষয়-সম্পত্তি ও ব্যবসার ব্যাপারটা রতিনাথ নিজে হাতে নেবার চেষ্টা করেছে, বনমালী নানা অজুহাত দেখিয়ে পাশ কাটিয়ে যান।

তবে বুদ্ধিমান রতিনাথ, খুব একটা বেশী তাড়াহুড়া করে নি। ধীরে ধীরে সে কঠিন মুঠি বিস্তার করে অগ্রসর হচ্ছিল।

রতিনাথ গৃহিণী নিস্তারিণী দেবী কিন্তু অত-শতর ধার ধারে নি, সে সোজাসুজিই এগিয়ে গিয়েছিল এবং হালহীন অন্দরের সমস্ত কর্তৃত্বটা নিজের হাতের মুঠোর মধ্যে নিয়ে নিয়েছিল প্রথম দিনই।

নিস্তারণীর বেশী বেগ পেতে হয় নি ব্যাপারটায়, কারণ কুন্তীর মা নর্মদা দেবী অসুস্থ হবার পর অন্দরের ব্যাপারটা তো চাকর-বাকর ও ঠাকুররাই যে যাব নিজের ইচ্ছা ও খুশি মত অসংলগ্ন ভাবে চালাচ্ছিল।

কুন্তী তো ওসবে কখনো মাথা গলাতই না, আব মানসী তো বালিকা বললেও অত্যুক্তি হয না।

নিস্তারিণী সংসারের হালটা শক্ত হাতে ধবায় কুন্তী ববং স্বস্তি পেয়েছিল—নিঃশ্বাস নিয়ে বেঁচেছিল।

তাছাড়া কুন্তীব জীবনে তখন এসেছে শিশিবাংশু।

॥ আট ॥

শিশিরাংশু তখন কুন্তীর সমস্ত জীবনকে যেন আচ্ছন্ন কবে রেখেছে।

কেমন করে কি ভাবে যে সে তখন দিনের পর দিন শিশিরাংশুর প্রতি একটা অন্ধ আকর্ষণ অনুভব করেছে, কথাটা ভাবতে গেলে আজও যেন তার বিস্ময়ের অবধি থাকে না।

কারণ স্বর্ণেন্দুও প্রায় ঠিক সেই সময়ই বলতে গেলে তার জীবনে এসেছে।

শিশিরাংশু আর স্বর্ণেন্দু।

সদ্য ঘুমভাঙা আলোর ভিতর দিযে মেল ট্রেনটা তখন কলকাতা অভিমুখে ছুটে চলেছে। বার্থের উপর শুয়ে সীতা এখনো ঘুমাচ্ছে।

বরাবরই সীতার বেলায় ঘুম ভাঙে। কাজেই এখনো তার ঘুম ভাঙার সময় হয়নি। হাওয়ায় সীতার পশমের মত পাতলা চুলগুলো উড়ে উড়ে কেবলই কপালের ওপরে এসে পড়ছে। চেয়ে-চেয়ে দেখে কুন্তী সীতার ঘুমন্ত মুখখানার দিকে।

আশ্চর্য মিল। ঠিক যেন মানসীর ছোটবেলার মুখখানা।

ঠিক তেমনি, বাঁ চোখের কোলের কাছে ছোট তিলটা পর্যন্ত।

কিন্তু মানসীর মত গায়ের রং নয়, মানসী তো কালো, যাকে বলে বেশ কালো।

সতীনাথ ও নর্মদার মধ্যে একজন ছিল কালো একজন গৌর। মা ছিল কালো। মায়ের রং পেয়েছে মানসী। আর সে পেয়েছে বাবার রং।

বাবা। আচ্ছা, বাবা কি আজো বেঁচে আছেন?

সেই যে একদিন রাত্রিশেষে চলে গেলেন আর তার কোন সংবাদ পাওয়া গেল না—

বনমালী কাকা অনেক খোঁজ করেছিলেন কিন্তু কোন সংবাদই পাননি।

কত বছর হল!

হিসেব করে মনে মনে, তা প্রায় দীর্ঘ নয় বছর হয়ে গেল।

পুজোর পর একবার করে বনমালী কাকা বের হতেন বাবার সন্ধানে, শেষবার ফিরে এসে বলেছিলেন, যোশীমঠের কাছে এক সন্ধ্যায় বাবার মত দেখতে নাকি দেখেছিলেন এক সন্ন্যাসীকে।

আলাপ করবার চেষ্টা করেছিলেন বনমালী কাকা সন্ন্যাসীর সঙ্গে কিন্তু সন্ন্যাসী আলাপ করেননি, তিনি মৌনব্রত নিয়েছেন।

মুখভর্তি দাড়ি-গোঁফ ও মাথাভরা ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া রুক্ষ চুল, পরনে গেরুয়া, তবু বনমালী নাকি তাঁকে চিনতে পেরেছিলেন।

এবং তিনি যে বনমালীকে চিনেছিলেন সে বিষয়েও তিনি নিঃসন্দেহ!

কুন্তীর ইচ্ছা হয়েছিল বনমালী কাকাকে নিয়ে সে যোশীমঠে যাবে কিন্তু যাওয়া আর হল না তার।

একটার পর একটা বিপর্যয় তার জীবনে ঘটে গেল মাত্র মাস পাঁচেকের মধ্যে পর পর। এবং বিপর্যয় প্রথমই হচ্ছে, দীর্ঘ সাত বছর বাদে বনমালী এক সন্ধ্যা রাত্রে তাদের বাড়ি ছেড়ে চলে গেলেন।

কিন্তু তখন কি স্বপ্নেও ভাবতে পেরেছিল কুন্তী তার চাইতেও বড় বিপর্যয় তার জীবনে ঘনিয়ে এসেছে।

তার জীবনটাই একেবারে ওলোট-পালোট হতে চলেছে।

শিশিরাংশু—

আচ্ছা, কোথায় যেন পড়েছিল কুন্তী Face is the index of man, গোটা মানুষটাই তার মুখের দর্পণে প্রতিফলিত হয়। বাজে কথা, মিথ্যা কথা, কবি-কল্পনা কিংবা সাহিত্যের সুন্দর একটি কথা।

নচেৎ শিশিরাংশু, যার অমন দেবোপম চেহারা, অমন সুন্দর স্বর্গীয় মুখ, অমন শান্ত স্বপ্নালু স্নিগ্ধ দুটি চোখ, তার ভিতরটা অমন কুৎসিৎ জঘন্য নীচ হল কি করে। হতে পারেই বা কি করে।

নিজের অজ্ঞাতে বুঝি আবার ফিরে তাকাল কুন্তী সামনেই বার্থের ওপরে নিদ্রিতা সীতার মুখখানার প্রতি।

সীতা, সীতা, তুইও কি অমন হবি মা।

হোস না রে, হোস না, ঘৃণায় মানুষ থুতু দেবে তোর গায়ে।

আচ্ছা, শিশিরাংশুর চেহারাটা দেখেই ভাল লেগেছিল বলেই কি কুন্তী

সেদিন ভুলেছিল।

কিন্তু ভাল লাগা আর ভালবাসা তো এক বস্তু নয়।

সে যে সত্যি সত্যিই শিশিরাংশুকে ভালবেসেছিল।

ভাল লাগা, চোখের নেশা নয়, সত্যিকারের ভালবাসা। যে ভালবাসার জন্য একদিন সে সর্বস্ব ত্যাগ করতেও প্রস্তুত ছিল। আর করেওনি কি তাই।

বনমালী কাকা চলে যাবার পর সে কি নিজেই ব্যাঙ্কে গিয়ে কাকার নামে চেক সই করবার অধিকার তাকে দেয়নি।

ঔষধের কোম্পানীর ডিরেকটার তাকে করে দেয়নি।

কিন্তু বনমালী কাকা কি যাবার সময় বলে যাননি, স্পষ্ট করেই তো সব বলে গিয়েছিলেন।

অনেকদিন ধরেই বিষের ধোঁয়ার মত ধোঁয়াচ্ছিল ব্যাপারটা।

কিন্তু বনমালী কাকা যেন স্থির প্রতিজ্ঞ, কিছুতেই রতিনাথকে মেনে নেবেন না।

হাজারো অপমান, বক্রোক্তি, বিরুদ্ধাচারণ তবু, তিনি যেন অচল অটল।

রতিনাথ তখন রীতিমত ক্ষেপে উঠেছেন। যে কোন প্রকারে তখন তিনি সব কিছু থেকে বনমালীকে সরাবার জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ।

কুন্তী যে ব্যাপারটা একেবারে বুঝতে সেদিন পারেনি তা নয়।

বুঝতে সে পেরেছিল বৈকি, কারণ রতিনাথের আক্রমণটা ছিল স্পষ্ট এবং খোলাখুলি। সে যেন স্পষ্টই যুদ্ধ ঘোষণা করেছিল।

সত্যি কথা বলতে কি, ব্যাপারটা বুঝতে পেরে কুন্তী বেশ একটু যেন ভীতই হয়েই পড়েছিল। কিন্তু বনমালী কাকার মুখের দিকে তাকালেই সাহসটা যেন সে আবার ফিবে পেত।

তাছাড়া বুঝলেও সব কিন্তু তার মনটা ছিল সে সময় অন্যত্র।

শিশিরাংশু ইতিমধ্যে কুন্তীর কাছে প্রতিশ্রুতি পেয়ে জার্মাণীতে যাবার ব্যবস্থা প্রায় শেষ করে এনেছে।

ঔষধের কারখানায় তার রিসার্চের চাকরিটাতে ইস্তফাও দিয়ে দিয়েছে শিশিবাংশু। অবিশ্যি কুন্তীই তাকে প্ররোচিত কবেছিল সে ব্যাপারে।

চাকরিটা কারখানার তুমি ছেড়ে দাও শিশির, কুন্তী বলে।

বল কি, তারপর।

তারপর আবার কি, দুদিন বাদে যে সমস্ত কারখানার মালিক হবে তার পক্ষে সামান্য ঐ চাকরি! তুমিই বল, ভাল দেখায় কি।

কিন্তু তুমি তো জান কুন্তী, আমাব সংসারে বুড়ো মা আছেন, দুটি অবিবাহিতা বোন, তারা কলেজে পড়ে, একটি ছোট ভাই স্কুলে পড়ে। সবই তো আমার ওপরে নির্ভর।

তা জানব না কেন?

তবে?

আমি তো আছি—

প্রথমটায় কুন্তীর ইঙ্গিতটা বুঝতে পারে নি শিশিরাংশু, তাই ওর মুখের দিকে তাকায়।

কুন্তী আরো স্পষ্ট করে তখন বলে, তোমাকে আর আমাকে পৃথক করে দেখছ কেন—

কুন্তী—

কুন্তীর ইঙ্গিতটা তখন স্পষ্ট হয়ে উঠেছে শিশিরের কাছে।

হ্যাঁ,তোমার যা দরকার, আমার কাছ থেকেই নিও—

বিয়ের আগেই ?

বিয়ে তো একদিন হবেই, আজ না হয় কাল—

কিন্তু না, না, ছিঃ, সে আমার বড় লজ্জা করবে—

লজ্জার কি আছে এতে, আর দুমাস বাদে তুমি জার্মাণী যাচ্ছ, যাবার আগে আমাদের বিয়ে হয়ে যাবে যখন—

কুন্তী—

হ্যাঁ, বিয়ের পরে তুমি জার্মাণী চলে যাচ্ছ, যতদিন না ফিরে আস আমাকেই তো দেখতে হবে সব—

শিশিরাংশু কুন্তীর হাতটা চেপে ধরে বলে, সত্যি, তুমি আমাকে বাঁচালে কুন্তী, কি দুর্ভাবনা যে ইদানিং আমাকে ধরেছিল—

কুন্তী হাসে, তারপর শান্ত কণ্ঠে বলে, শোন যে জন্য আজ বিশেষ করে তোমাকে আমার প্রয়োজন ছিল—

আজ্ঞা কর দেবী, দাস হুজুরের হাজির, হাসতে হাসতে শিশিরাংশু অভিনয়ের ভঙ্গিতে কথাগুলো বলে।

তোমার যাবার দিনও এগিয়ে এল, এবারে বনমালী কাকাকে আমাদের বিয়ের কথা বলি—

বেশ তো, কিন্তু আমি একটা কথা বলছিলাম—

কি ?

জার্মাণী থেকে ফিরে এসে আমাদের বিয়েটা হলে হত না—

কেন ?

তোমাকে একটা বাঁধনে এভাবে বেঁধে যাব—

সে কি কথা, বাঁধন কেন বলছ, তাইত আমরা দুজনে চাইছি আজ—

চাইছি নিশ্চয়ই কিন্তু, কত রকম আপদ-বিপদ বিদেশে ঘটতে পারে—

ভয় নেই গো, ভয় নেই, আমার শুভেচ্ছা আর ভালবাসা তোমাকে জেনো নির্বিঘ্নে আবার আমার কাছে ঠিক একদিন পৌঁছে দেবে—

এত বিশ্বাস তোমার কুন্তী—

নয় কেন ?

সেই দিন, সেই দিন রাত্রেই গৃহে ফিরে কুন্তী দেখে বাইরের ঘরে স্বর্ণেন্দু বসে আছে একাকী—

স্বর্ণেন্দু ওকে ঘরে প্রবেশ করতে দেখে তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়ায়।

এতদিন আলাপ হয়েছে তবু স্বর্ণেন্দুর কি লজ্জা, কুন্তীর সামনে দাঁড়িয়ে চোখে চোখ রেখে আজও কথা বলতে পারে না।

ঔষধের কারখানার নতুন জেঃ ম্যানেজার হয়ে এসেছে স্বর্ণেন্দু, মাস দশেক আগে।

অনেক অ্যাপ্লিকেশন পড়েছিল পোস্টটার জন্য, ডাইরেক্টররা ইন্টারভিউ নিয়ে ঐ স্বর্ণেন্দুকেই পঞ্চাশ জনের মধ্যে পছন্দ করেন।

কুন্তী নিজেও ছিল সিলেকশন বোর্ডে—

বছর খানেক হয় কুন্তী ম্যানেজিং ডাইরেক্টর হয়েছে কারখানার, সেই সুবাদেই স্বর্ণেন্দুকে ঘন ঘন আসতে হয় কুন্তীর কাছে।

কি ব্যাপার স্বর্ণেন্দুবাবু, কতক্ষণ—

এই কিছুক্ষণ!

কিন্তু আপনার ফাইল কই?

সেজন্যে আসি নি—

তবে?

আমি আপনাদের কাজে রেজিগনেশন দিয়েছি আজ—

সে কি, হঠাৎ কি হল?

ব্যাপারটা আপনাকে বলা দরকার, আমার রেজিগনেশন লেটারে অবিশ্যি আমি কোন কারণ দর্শাই নি কিন্তু আপনাকে বলব বলেই এসেছি—

বসুন, বসুন, কি ব্যাপার আমায় বলুন।

আমি অবিশ্যি জানতাম না যে, স্বর্ণেন্দু ইতঃস্তত করতে থাকে।

থামলেন কেন বলুন—

শিশিরাংশুবাবু এ বাড়িতে বিশেষ একজন হয়ে শীঘ্রই আসছেন—

হঠাৎ কুন্তীর কপোল ও কপাল রাঙা হয়ে ওঠে লজ্জায়।

অবিশ্যি, স্বর্ণেন্দু আবার বলে, very very happy news—কিন্তু—

বলুন, থামলেন কেন—

সব হয়ত পাকাপাকি হয়ে গিয়েছে, তাই না?

হুঁ—

তাহলে আমি উঠি, স্বর্ণেন্দু উঠে পড়ে।

না না, বসুন, কি বলতে এসেছিলেন বলুন! মিনতি জানায় কুন্তী।

কিন্তু ভাবছি—

কি।

এ সময় বোধ হয় আমার কথাটা বলা উচিত হবে না—

খুব উচিত হবে। বলুন, কি কথা—

শিশিরাংশুকে কতদিন আপনারা জানেন তা জানি না, আমি কিন্তু তাকে দীর্ঘদিন, মানে, কলেজ-জীবন থেকেই জানি। He was all along a brillant student সে সবাই জানে, আমরাও জানি, কিন্তু—

কি, থামলেন কেন!

॥ নয় ॥

দেখুন মিস চৌধুরী, স্বর্ণেন্দু একটু থেমে বলে, ক'টা মাস আপনার নুন খেয়েছি, তা ছাড়া আপনাদের কোম্পানী, বিশেষ করে আপনার কাছ থেকে যে ব্যবহার পেয়েছি কোন দিন তা ভুলতে পারব না, তাই বলছিলাম ব্যাপারটা পাকাপাকি করার আগে শিশিরাংশুবাবু সম্পর্কে একটু ভাল করে খোঁজ নিয়ে দেখলে বোধ হয় ভালই হয়।

কি বলতে চান আপনি স্বর্ণেন্দুবাবু, স্পষ্ট করে বলুন—

আমি যতদূর জানি—

কি ?

স্বর্ণেন্দু, একটু থেমে যেন একটু ইতঃস্তত করে বলে, শিশিরাংশুবাবু বিবাহিত—

সে কি !

হ্যাঁ, একই গ্রামে আমাদের বাড়ি, সেখানে এক বিধবা ভদ্রমহিলার মেয়ের সঙ্গে ওর আলাপ হয়, তাকে বিয়ে করেছিল—

তারপর ?

তারপর আমি ঠিক জানি না, তবে যে মেয়েটিকে কিছুদিন আগে দেখলাম এক অফিসে কাজ করতে।

সত্যি, সত্যি বলছেন আপনি স্বর্ণেন্দুবাবু—

আপনি খোঁজ নিয়ে দেখুন না, সেই মেয়েটির মানে শর্মিলার ঠিকানা আমি দিয়ে যাচ্ছি।

কুন্তী যেন হঠাৎ পাথর হয়ে যায়।

অকস্মাৎ যেন সমস্ত পৃথিবীটা শূন্য হয়ে গিয়েছে। কোথায়ও যেন এতটুকু হাওয়াও অবশিষ্ট নেই।

আমি হয়ত আপনাকে অত্যন্ত রূঢ় আঘাত দিলাম মিস চৌধুরী, কিন্তু আরো বেশী আঘাতের থেকে আপনাকে বাঁচাবার জন্যই, আর বিশ্বাস করুন আপনাদের মঙ্গল চিন্তা ছাড়া আমার আর কিছুই ছিল না বলেই, আচ্ছা আসি, নমস্কার—

স্বর্ণেন্দু যাবার জন্য উঠে দাঁড়ায় এবং ধীরে ধীরে এগিয়ে যায়।

স্বর্ণেন্দুবাবু—

কুন্তীর ডাকে স্বর্ণেন্দু ফিরে দাঁড়ায়।

কিন্তু আপনি তো বললেন না রেজিগনেশন কেন দিলেন ?

শিশিরাংশুবাবু গতকাল হঠাৎ অফিসে গিয়েছিলেন—

কেন ?

তার নাকি এক মাসের মাহিনা প্রাপ্য—

সেই টাকা নিতে গিয়েছিলেন শিশিরাংশুবাবু ?

হ্যাঁ, ম্যানেজার ডাঃ ভাদুড়ী ছিলেন না তাই আমার সঙ্গে দেখা করে কথাটা বলেন। তাতে আমি বলি, ম্যানেজার বা আমি কেউই, কমিটির বিনা অনুমতিতে এখন আর তার সম্পর্কে কিছুই করতে পারি না, তাই

হঠাৎ তিনি চটে উঠলেন—

তারপর।

যাচ্ছে তাই করে আমাকে বললেন, এবং তখুনি বললেন, শীঘ্রই তিনি কোম্পানীর হর্তাকর্তা হয়ে আসছেন, তখন নাকি তিনি আমার মত দুর্বিনীতকে প্রথমেই যোগ্য শিক্ষা দেবেন।

আপনাকে একথা বললেন!

হ্যাঁ, আর পাশে সে সময় আপনার বোন—

আমার বোন, চমকে ওঠে আবার কুন্তী।

হ্যাঁ, মানসী দেবী তার সঙ্গেই ছিলেন, বুঝতে তখন আমি পারলাম সমস্ত ব্যাপারটাই, টাকা অবিশ্যি তাকে আমি দিই নি, কিন্তু এর পর আর চাকরি করা কি আমার ঠিক হবে, আপনিই বলুন? একটু থেমে আবার বলে স্বর্ণেন্দু, তাই আজ রেজিগনেশন দিয়েছি—

আমি ঠিক বুঝতে পারছি না ব্যাপারটা স্বর্ণেন্দুবাবু, মানসী, মানসী কারখানায় শিশিরাংশুর সঙ্গে গিয়েছিল কাল কিন্তু আমার যেন কেমন সব গোলমাল হয়ে যাচ্ছে।

তিনি মানে আপনার বোন মানসী দেবী ছিলেন, আপনি বরং তাকেই জিজ্ঞাসা করে দেখুন না।

না, না, আপনি যখন বলছেন।

আমি তাহলে আসি। নমস্কার—

নমস্কার—

স্বর্ণেন্দু চলে গেল।

স্বর্ণেন্দু চলে যাবার পরও কুন্তী অনেকক্ষণ সোফাটার উপর ঝিম মেরে বসে থাকে।

মানসী শিশিরাংশুর সঙ্গে কারখানায় গিয়েছিল কিন্তু, কেমন করে তা সম্ভবপর হবে? তার কোন এক বান্ধবীর বিয়েতে কাল সেই দুপুরে মানসী চলে গিয়েছে, বলে গিয়েছিল ফিরতে রাত হবে।

গাড়ি নিয়ে যাবার কথায় মানসী বলেছিল, তার কোন প্রয়োজন নেই, তার বান্ধবীই তাকে পৌঁছে দেবে।

আর শিশিরাংশু, তার তো জাহাজের কি সব প্যাসেজ বুকিংয়ের ব্যাপারে সারাটা দিন ব্যস্ত থাকবার কথা গতকাল।

কতক্ষণ যে কুন্তী বসেছিল সোফাটার উপর নিজেরও খেয়াল নেই, হঠাৎ এক সময় ভৃত্যের ডাকে তার খেয়াল হয়।

বড়দিমণি, আপনি এখানে বসে—

কে, গণেশ?

হ্যাঁ, বড়দিমণি।

হ্যাঁরে, বনমালী কাকা তার ঘরে আছেন?

না তো, তিনি তো এখনো ফেরেন নি—

ছোড়দিমণি?

এই তো ফিরলেন—

কুন্তী ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়াল।

দোতলায় মানসী থাকে। একেবারে বারান্দার শেষ প্রান্তের ঘরটায়।

সিঁড়ি দিয়ে দোতলায় উঠতে উঠতেই কানে বাজে দোতলার ক্যাদেল ক্লকটায় ঢং ঢং করে রাত্রি এগারটা ঘোষণা।

অনেক রাত হয়েছে। এত রাত হয়ে গিয়েছে ও টেরই পায় নি।

বারান্দা দিয়ে যেতে যেতে কাকার ঘর পড়ে, রতিনাথ বোধহয় তার রাত্রের আহারপর্ব শেষ করলেন, উদ্গার তুলতে তুলতে তারা নাম স্মরণ করছেন—তারা—তারা—

পা যেন আর চলতে চাইছে না।

কোনমতে টেনে টেনে চলে কুন্তী, মানসীর ঘরের দরজায় এসে দাঁড়াল—ঘরের দরজা ভেজান, ভেজান দরজার ফাঁক দিয়ে ঘরের আলো দেখা যায় আর গুন গুন গান শোনা যায়।

মুহূর্তকাল ইতঃস্তত করে কুন্তী—

তারপর হাত দিয়ে দরজা ঠেলে ভিতরে প্রবেশ করে, নাইট গাউনটা গায়ে চড়িয়ে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে সাদা হাতীর দাঁতের চিরুণী দিয়ে চুল আঁচড়াচ্ছিল মানসী, আয়নার উপর কুন্তীর ছায়া প্রতিফলিত হতেই সে ঘুরে দাঁড়ায়, দিদিভাই—

কুন্তী ততক্ষণে দরজাটা ভিতর থেকে নিঃশব্দে বন্ধ করে দরজার ওপরে পিঠ দিয়ে ঘুরে দাঁড়িয়েছে মানসীর মুখোমুখি।

মানু—

কুন্তীর কঠিন মুখের দিকে চেয়ে মানসী বুঝতে পেরেছিল, বা আঁচ করতে পেরেছিল হয়ত কিছুটা ব্যাপারটা।

কিছু বলবে ?

তুমি কাল আমার সঙ্গে মিথ্যে কথা বলেছিলে কেন ?

মিথ্যা কথা বলেছি !

হ্যাঁ, তোমার বান্ধবীর বিয়েতে যাবার নাম করে তুমি কোথায় গিয়েছিলে ?

আমি, আমি মানে, কেন আমি তো, সেখানেই গিয়েছিলাম—

না, যাও নি।

তবে, কোথায় আমি গিয়েছিলাম !

সেইটাই জানতে চাইছি, কোথায় গিয়েছিলে ?

বাঃ রে, তুমি ফোন করে দেখ না—

মানু, চাপা কণ্ঠে যেন গর্জন করে ওঠে কুন্তী, শোন, আমি জানি তুমি কোথায় গিয়েছিলে, তুমি আর শিশিরাংশু—

মানসী এবারে মাথা নীচু করে, আর কোন জবাব নেই তার মুখে।

শিশিরাংশুর সঙ্গে তুমি কারখানায় গিয়েছিলে কেন ? জবাব দাও।

সিনেমায় গিয়েছিলাম, ফেরার পথে শিশিরাংশুদা বললে, কারখানায়

ঘুরে যাবে এববার, তাই—

আবার মিথ্যা বলছ, সিনেমায় কোন শোতে গিয়েছিলে ?

ম্যাটিনী শোতে—

শোন, যেন আর কখনো তোমাকে আমি শিশিরাংশুর সঙ্গে যেতে না দেখি কোথায়ও বা শুনি, মনে থাকে যেন কথাটা।

বলে আর দাঁড়াল না কুন্তী, নিজের ঘরে চলে গেল।

আশ্চর্য, সেদিন কেন চোখ খোলে নি কুন্তীর—

স্বর্ণেন্দুর কথাটা কেন স্পষ্ট বুঝতে পারে নি।

হয়ত বুঝতে পারে নি শিশিরাংশুর চিন্তায় সমস্ত মনটা তার আচ্ছন্ন হয়েছিল বলেই।

স্বর্ণেন্দু তার সম্পর্কে যা বলে গিয়েছে সেই কথাগুলোই মনের মধ্যে তার তোলপাড় করে ফিরছিল বলেই বোধ হয়।

একচক্ষু হরিণের মত একদিক থেকেই সে বিপদের সম্ভাবনা ভেবে সেই দিকে চোখ মেলে রেখেছিল, অন্যদিক থেকে যে বিপদ আসতে পারে ভাবতেও পারে নি।

পরের দিন বিকেলের দিকে শিশিরাংশুর ফোন এল হঠাৎ—

ওদের সিনেমায় যাওয়ার কথা ছিল।

গতরাত থেকে কেবলই ভেবেছে কুন্তী, শিশিরাংশুকে কি করে বলা যায় কথাটা যে, সে সিনেমায় যেতে পারছে না—

কিন্তু তাকে আর বলতে হল না কথাটা, শিশিরাংশুই বললে।

কুন্তী—

বল—

I am very sorry, হঠাৎ একটা বিশেষ কাজে আটকা পড়ে গেছি, আজ আমাদের সিনেমায় যাবার কথা ছিল, আজ পারছি না, please don't mind, লক্ষ্মীটি—

বেশ—

মনে করলে না তো কিছু, রাগ করলে না—

ফোনটা নামিয়ে রেখে দেয় কুন্তী, কিছুই যেন আর ভাল লাগছে না।

হঠাৎ যেন সমস্ত দুনিয়াটা একেবারে ফাঁকা হয়ে গিয়েছে।

কিন্তু না, এমন করে তো চলতে পারে না। এর একটা মীমাংসার দরকার।

মুখোমুখি স্পষ্ট করে সব বলা দরকার, শোনা দরকার—

কতবার সে বারণ করে দিয়েছে শিশিরাংশুকে এখন যেন কারখানার কেউ না জানতে পারে যে তার সঙ্গে শিশিরাংশুর বিয়ে হচ্ছে।

সেই কারণেই সে শিশিরাংশুকে তার কারখানার চাকরি ছাড়তে পর্যন্ত বাধ্য করেছে। তাছাড়া তার মা পঙ্গু, শয্যাশায়িণী, তাই সে নিজের বিয়ের ব্যাপারটায় এখনো যেন মন স্থির করতে পারছিল না।

সবাই কি দৃষ্টিতে দেখবে ব্যাপারটা, একটা লজ্জাবোধও যেন তাকে

পীড়ন করছিল, তাছাড়া তার ও শিশিরাংশুর ভালবাসার ব্যাপারটা সে সযতনে নিজেদের মধ্যেই কেবল রেখেছিল, পাছে কেউ জানতে পারে বলে খুব সাবধানে মেলামেশা করেছে—কিন্তু শিশিরাংশু এটা কি করল।

তখন যদি জানত কুন্তী, শিশিরাংশু আরো অনেক বেশী এগিয়ে গিয়েছে—

ঐ দিনই সন্ধ্যায় —

ডাঃ ভাদুড়ীর কাছ থেকে ফোন এল—

বিশেষ প্রয়োজন আছে কুন্তী যেন অবিলম্বে তার বাড়িতে গিয়ে একটিবার দেখা করে এখুনি।

কুন্তী চিন্তিত মনে তখনি গাড়ি নিয়ে বের হয়ে পড়ে—

বেশী দূর নয় ডাঃ ভাদুড়ীর বাড়ি।

ডাঃ ভাদুড়ীর তাঁর বসবার ঘরে একাই ছিলেন। কুন্তীকে ঘরে ঢুকতে দেখে বললেন, বস মা।

কুন্তী বসল—

আজ অত্যন্ত অপমানিত বোধ করেছি মা, শিশিরাংশু—

কি করেছে সে ?

তার সঙ্গে যে তোমাদের এতটা ঘনিষ্ঠতা গড়ে উঠেছে ইতিমধ্যে, তা অবশ্যই আমি জানতাম না—

কি হয়েছে আমাকে খুলে বলুন।

সে আজ আমার অফিসে এসেছিল—

কখন ?

দুপুরে, এসে তার মাহিনা চায়, তাতে আমি তোমার কথা বলি, সে তখন বলে—

কি বলেছে ?

সে কথাটা আর নাই বা শুনলে মা—

কুন্তী অতঃপর কিছুক্ষণ চুপ করে থাকে। তারপর বলে, স্বর্ণেন্দুবাবু কি আর অফিসে আসছেন না।

না।

তার রেজিগনেশন আপনারা অ্যাকসেপ্ট করেছেন ?

এখনো কিছু করিনি—

ঠিক আছে, আপনি একটা মিটিংয়ে ওকেও ডাকুন, আর একটা কথা, শিশিরাংশুবাবু এবারে এলে আমার সঙ্গে দেখা করতে বলবেন—

কিন্তু মা, আমি আর কাজ করতে পারব না।

কেন ভাদুড়ী কাকা ?

কাল যখন সত্যিই তোমাদের সঙ্গে তার একটা সম্পর্ক গড়ে উঠবে—

গড়ে যে উঠবেই সে সম্পর্কে আপনি স্থির নিশ্চিত এখন থেকেই বা কেন হচ্ছেন ?

কুন্তী—

আজ আমি চলি—

কুন্তী ঘর থেকে বের হয়ে এল।

গাড়িতে বসে তার মনে হয় একবার শিশিরাংশুর সঙ্গে দেখা হওয়া একান্ত দরকার, জার্মাণীতে যাবে বলে কিছুদিন হল শিশিরাংশু তার মা ও ভাই-বোনদের দেশের বাড়িতে পাঠিয়ে দিয়ে কুন্তীরই টাকায় একটা হোটেলে বর্তমানে ঘর নিয়ে আছে।

কুন্তী ড্রাইভারকে বললে, সেই হোটেলে যেতে।

হোটেলে যখন এসে পৌঁছল রাত তখন প্রায় সোয়া নয়টা।

হোটেলের চাকর বললে, বাবু নেই, কে এক দিদিমণি এসেছিল তার সঙ্গে বের হয়েছে—

কুন্তী বলে, দরজাটা খুলে দাও—

ভৃত্য জানত কুন্তীর পরিচয়, ম্যানেজারের কাছ থেকে চাবি এনে দরজা খুলে দিল।

কুন্তী ঘরে ঢুকে একটা চেয়ারে বসল অন্ধকারেই। আলোটা আর জ্বালায় না।

॥ দশ ॥

প্রায় এক ঘণ্টা পরে শিশিরাংশু এল।

অন্ধকার ঘরে ঢুকে আলোটা জ্বালতেই সামনে চেয়ারে উপবিষ্ট কুন্তীকে দেখে থমকে দাঁড়াল শিশিরাংশু।

তুমি—

হ্যাঁ আমি, শান্ত কণ্ঠে কুন্তী বলে ওর মুখের দিকে দু'চোখের দৃষ্টি ন্যস্ত করে।

কি সৌভাগ্য, এতদিন পরে তা হলে এলে, কিন্তু অন্ধকারে অমন করে ভূতের মত বসেছিলে কেন?

শিশিরাংশু—

শিশিরাংশু একটা সিগ্রেট অগ্নি সংযোগ করছিল ফিরে তাকাল কুন্তীর কণ্ঠস্বরে, কুন্তীর শেষের দিকের কণ্ঠস্বরটার মধ্যে কোথায় যেন একটা চমক আছে তার মনে হলো হঠাৎ।

শিশিরাংশু নিজের অজ্ঞাতেই যেন থমকে যায়, সিগ্রেটে অগ্নি সংযোগ করা আর হয় না, হাতের সিগ্রেট ও লাইটার হাতেই ধরা থাকে।

কিছু যেন তুমি বলবে, বলতে চাও মনে হচ্ছে কুন্তী?

আশ্চর্য শান্ত শিশিরাংশুর কণ্ঠস্বর।

মুহূর্ত পূর্বে সে যে চমকে উঠেছিল সেটা যেন সে ততক্ষণে সামলে নিয়েছে।

বলব বলেই আমি এসেছিলাম শিশিরাংশু, কিন্তু—

কিন্তু কি, থামলে কেন?

না থাক—

থাক কেন বল না কি বলতে ৬সেছিলে।

না।

বেশ তবে বলো না—

কাদা ঘাঁটলেই তার কিছুটা গায়ে ছিটকে আসবেই, কিন্তু আমি, আমি তো তোমার সঙ্গে কোন প্রতারণা করি নি শিশিরাংশু তবে তুমি—

কি আমি, কুন্তী—

তুমি এমন হীন জঘন্য ব্যবহার, এমন কুৎসিত প্রতারণা আমার সঙ্গে করলে কেন ?

প্রতারণা, এসব কি বলছ কুন্তী, আমি তোমার সঙ্গে প্রতারণা করেছি—

শর্মিলা কে—

কুন্তীর মনে হল হঠাৎ যেন নামটা উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গেই শিশিরাংশুর সমস্ত মুখটা ফ্যাকাসে হয়ে গেল কিন্তু তা সামলে নিতেও তার দেরী হয় না সঙ্গে সঙ্গে।

কেন বলত।

মনে হচ্ছে নামটার সঙ্গে তোমার পরিচয় আছে—

তা আছে বৈকি—

আছে ?

অতঃপর একটু থেমে সিগ্রেটটা অগ্নি সংযোগ করে, সিগ্রেটে একটা মৃদু টান দিয়ে বলে, হুঁ, অবিশ্যি আমিই তোমাকে বলতাম—

বলতে ? বিস্ময়ের যেন অবধি নেই কুন্তীর।

বলতাম বৈ কি—

কি বলতে, যে শর্মিলার সঙ্গে একদিন তোমার বিয়ে হয়েছে, এবং—

থাম, থাম, don't be so melodramatic—কুন্তী—

Melodramatic ?

তা বৈ কি! প্রথম যৌবনে একটি অপরিণতবুদ্ধি পুরুষের যেমন কোন তরুণী মেয়েকে দেখলেই চোখে নেশা ধরে, ঠিক তাই it was nothing more than that—

শিশিরাংশু, একটা অস্ফুট চিৎকার যেন বার হয়ে আসে কুন্তীর কণ্ঠ থেকে।

পূর্ববৎ শান্ত কণ্ঠে বলে চলে শিশিরাংশু, and we also lived together a few days—say a few months—

তুমি তাকে বিয়ে কর নি ?

হ্যাঁ, কে জানে, হয়ত এলে-বেলে কয়েকটা অর্থহীন মন্ত্র পড়েছিলামও, কিন্তু সত্যিকারের আসল বিয়ে তো কয়েকটা ঐ মন্ত্র পড়া ও সামান্য একটু চোখের নেশা মাত্র নয় কুন্তী—

তার মানে সেটাকে তুমি বিয়ে বল না ?

না, আর সেই কারণেই শর্মিলার পরবর্তীকালের ব্যাপার নিয়ে আমি এতটুকুও মাথা ঘামাই নি, She is as free as I am—

কুন্তী যেন বোবা হয়ে গিয়েছে। গলা দিয়ে আর কোন শব্দ বের হয় না।

কথা বলার শেষ শক্তিটুকুও যেন কুন্তীর ঐ মুহূর্তে লোপ পেয়েছে। ঘটনার আকস্মিকতায়, বিস্ময়ে অভিভূত কুন্তী কেবল নিঃশব্দে শিশিরাংশুর মুখের দিকে ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে থাকে।

শিশিরাংশু কিন্তু নির্বিকার, একান্ত নির্বিকার।

এতটুকু বিস্মিত বা এতটুকু অপ্রস্তুতও যেন হয় নি লোকটা!

মনে হয় কুন্তীর ঐ শিশিরাংশুকে সে তো চেনে না।

অথচ, এই দুটো বছর কি এক অন্ধ আবেগেই না ওকে সে আঁকড়ে ধরে ছিল। ঐ মানুষটা শুধু তাকে মুগ্ধই করে নি, ওকে সে সমস্ত প্রাণ দিয়ে ভালও বেসেছে। আর সেই ভালবাসার উপরেই নাকি এক মধুর ভবিষ্যৎ সে গড়ে তুলছিল তিল তিল করে।

এবং আজ অকস্মাৎ ব্যাপারটা ঐভাবে তার গোচরীভূত না হলে, কয়েকদিনের মধ্যেই তো তাদের রেজেস্ট্রী ম্যারেজ হয়ে যাবার কথা।

উঃ, যদি না জানতে পারত, বিয়েটা তো হয়ে যেত।

হাসতে হাসতেই ঐ লোকটা হয়ত তাকে চরম সর্বনাশ ও দুঃসহ অবর্ণনীয় একটা লজ্জার মধ্যে টেনে নিয়ে যেত। এতটুকু বিবেকে হয়ত বাধত না না লোকটার।

সিগ্রেটে একটা দীর্ঘ টান দিয়ে এক গাল ধোঁয়া ছেড়ে শান্ত কণ্ঠে শিশিরাংশু বলে, তুমি যেন হঠাৎ অত্যন্ত চিন্তিত হয়ে পড়লে বলে মনে হচ্ছে কুন্তী।

কুন্তী চেয়ে আছে তখনো ওর মুখের দিকে নিঃশব্দে, কোন জবাব দেয় না।

হাতের জ্বলন্ত সিগ্রেটের অগ্রভাগের ছাইটা ঝাড়তে ঝাড়তে বলে আবার শিশিরাংশু তেমনি ঠাণ্ডা গলায়, তুমি জেনে ফেলেছ দুদিন আগে—well and good অবশ্যি—otherwise আমিই বলতাম। কয়েকদিন ভাবি নি যে বলব তাও নয়, বলব, বলব করেও বলা হয়ে ওঠে নি, আবার কখনও এও ভেবেছি, কি এমন একটা ব্যাপার যা তোমার কর্ণগোচর করতেই হবে।

কথাগুলো শেষ হল না শিশিরাংশুর হঠাৎ যেন সে বলতে বলতে থেমে গেল।

সামনে উপবিষ্ট কুন্তীর মুখের দিকে হঠাৎ বুঝি চোখ পড়াতেই থেমে গেল শিশিরাংশু।

কুন্তী তখনো পর্যন্ত চুপ করেই আছে, একটি কথাও বলে নি—

তার দু'চোখের কোল বেয়ে দুটি অশ্রুর ধারা নেমেছে।

What's up, ব্যাপার কি, are you really serious, কাঁদছ নাকি?

শিশিরাংশুর কণ্ঠস্বরে যেন একটা প্রচণ্ড বিস্ময়।

কথা বলল। এতক্ষণ পরে প্রথম কথা বলল কুন্তী।

বললে, এ তুমি কি করলে শিশিরাংশু—

কুন্তী—

তুমি যে আমার সমস্ত কল্পনা, সমস্ত সম্ভাবনার সঙ্গে জড়িয়ে ছিলে।

ঐ দেখ, কি সব শুরু করে দিলে।

শিশিরাংশু যেন ব্যাপারটা হালকা করে দেবার চেষ্টা করে।

কুন্তী বললে, সব তুমি এমনি করে নষ্ট করে দিলে।

এঃ সত্যি, তুমি দেখছি অত্যন্ত sentimental, বলতে বলতে শিশিরাংশু কুন্তীর হাতটা ধরবার জন্য দু পা এগিয়ে আসতেই, কুন্তী ছোঁয়া বাঁচিয়ে যেন সরে যায়।

কুন্তী।

না, না, তুমি আমাকে আর ছুঁয়ো না—

কি পাগলামি করছ, শিশিরাংশু আবার এগিয়ে আসবার চেষ্টা করে। আবার ঘন হবার চেষ্টা করে।

কুন্তী আরো দূরে সরে যায়। বলে, না।

কুন্তী—

না, শিশিরাংশু, না—

কুন্তী যেন ক্ষীণ কণ্ঠে এবারে একটা আর্তনাদ করে ওঠে।

তুমি—

শেষ করতে দেয় না শিশিরাংশুকে কথাটা তার কুন্তী, বলে, ছিঃ তুমি অন্যের স্বামী।

কুন্তী।

তুমি শর্মিলার স্বামী, তুমি আর একজনের।

শোন, শোন, একটা তুচ্ছ ব্যাপারকে তুমি এমন জটিল করে তুলছ।

এর চাইতেও জটিল মানুষের জীবনে আর কি থাকতে পারে শিশিরাংশু, মনে হয়েছিল কথাটা বলে কিন্তু ঘৃণায় লজ্জায় যেন কণ্ঠ তখন রুদ্ধ হয়ে গিয়েছে, আর তখন সেখানে দাঁড়িয়ে থাকবার মত শক্তিও বুঝি নেই, তাই যাবার জন্য দরজার দিকে পা বাড়ায় কুন্তী নিঃশব্দে শেষবারের মত যেন একবার ওর দিকে তাকিয়ে।

শিশিরাংশু তাড়াতাড়ি দরজার দিকে একটু এগিয়ে এসে প্রশ্ন করে, শোন কুন্তী, শোন ?

এবারেও কোন জবাব দেয় না, আরো দুপা এগিয়ে যায় কেবল দরজার কাছে।

শিশিরাংশু বোধ হয় এতক্ষণে নিঃসন্দেহ হয়েছিল, কুন্তী সত্যিই চলে যাচ্ছে।

সে এবারে দরজাটা আগলে দাঁড়ায়, কুন্তী I must tell you frankly— আমি কিন্তু ভাবতে পারি নি—

কি ভাবতে পার নি ?

তুমি—

পথ ছাড় শিশিরাংশু—

কুন্তী। তা হলে আমাদের—

হ্যাঁ, এইখানেই শেষ।

আমি কিন্তু বলব, একটু বাড়াবাড়িই হয়ে যাচ্ছে, আজকালকার যুগে এ ধরনের ঘটনা—

চুপ কর শিশিরাংশু, তোমার লজ্জা ঘৃণা বলে কোন বস্তুর বালাই থাকতে পারে কিন্তু আমার সর্বাঙ্গ ঘৃণায় লজ্জায় যেন ঘিন ঘিন করছে।

ওঃ—

হ্যাঁ, আর একটা কথা শোন, যা আমি বলে গেলাম এই আমার শেষ কথা। এরপর কোন কারণেই যেন ব্যাপারটা আরো তিক্ত করবার চেষ্টা তুমি করো না—

তোমার বুঝি ধারণা তাই আমার সম্পর্কে ?

তাই, আর একটা কথা, স্বর্ণেন্দুবাবুর কাছে শুনলাম তুমি নাকি আমাদের কারখানার অফিসে তোমার কি সব প্রাপ্য টাকার জন্য গিয়েছিলে, সেখানে আর তুমি যাবার চেষ্টা করো না! তোমার প্রাপ্য যদি কিছু থাকে তো তোমাকে ডাকে পাঠিয়ে দেওয়া হবে—

আর কিছু বল, মনে হচ্ছে কুন্তী তুমি আরো কিছু যেন বলবে—

শিশিরাংশুর কণ্ঠস্বরটা তখন বেশ পরিবর্তিত মনে হয়।

ক্ষণপূর্বের কণ্ঠের সেই সহজ সুরটা আর নেই। একটা চাপা ব্যঙ্গের বিদ্যুৎ যেন কণ্ঠস্বরে ঝিলিক দিয়ে গেল।

কুন্তী কিন্তু শান্ত কণ্ঠে বলে, হ্যাঁ, তোমাকে জার্মাণী যাবার জন্য যে অর্থসাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম, সেটাও তুমি পাবে—

ধন্যবাদ, আর কিছু ?

আর যতদিন জার্মাণী না যাও এই হোটেলের থাকবার খরচাটাও আমি দেব কারণ তোমাকে আমিই এখানে এনে তুলেছিলাম—

আবারো ধন্যবাদ, তোমাকে অসংখ্য ধন্যবাদ কুন্তী দেবী, তোমার বদান্যতা, দাক্ষিণ্য, সত্যিই প্রশংসনীয়। এখন অবিশ্যি আমি বুঝতে পারছি, হঠাৎ তোমার এই পরিবর্তনের কারণ কি, তা হলে স্বর্ণেন্দুই আজ তোমার আপনার জন হয়েছে, সেই লোফার, দুঃশ্চরিত্রটা—

থাম, হঠাৎ যেন গর্জন করে ওঠে কুন্তী, নিজের চরিত্র দিয়ে সকলকে বিচার করো না—

ওঃ এত দূর, তা হলে অনেকটা এগিয়েছো বল—

ইচ্ছা হয়েছিল কুন্তীর ঐ মুহূর্তে পায়ের জুতোটা খুলে শিশিরাংশুর গালে-মুখে বসিয়ে দেয় কয়েক ঘা কিন্তু ওকে স্পর্শ করতেও যেন তখন তার ঘৃণা হচ্ছিল।

শুধু বললে, হ্যাঁ, তোমার প্রাপ্যের জন্য তার কাছেই তোমাকে জানাতে হবে, সেটা মনে রেখ—

তা রাখতে হবে বৈকি মনে, যেন একটা বিষধর সর্পের মত হিস্ হিস্ করে ঘুরে দাঁড়িয়েছে তখন শিশিরাংশু।

তারপর টলতে টলতে সামনের হলঘরে গিয়ে প্রবেশ করল।

রতিনাথ কয়েকজন ভদ্রলোকের সঙ্গে হলঘরে আসর জমিয়ে বসেছিলেন, কুন্তীকে ঘরে প্রবেশ করতে দেখে বলেন, এই যে কুন্তী এঁরা সব তোমার কাছে এসেছেন, অনেকক্ষণ ধরে তোমার সঙ্গে দেখা করবেন বলে বসে আছেন—

কেমন যেন শূন্য বোবা দৃষ্টিতে একবার মাত্র রতিনাথ ও অন্যান্যদের মুখের দিকে তাকাল কুন্তী তারপর ঘর থেকে বের হয়ে গেল একটি কথাও না বলে।

ঘরের মধ্যে ঐ মুহূর্তে উপস্থিত সকলে ফ্যালফ্যাল করে কুন্তীর গমন পথের দিকে চেয়ে রইল।

সিঁড়ি দিয়ে উঠে, বারান্দা অতিক্রম করে নিজের ঘরে পা দিয়েই থমকে দাঁড়াল কুন্তী।

মনে হলে অন্ধকার ঘরের মধ্যে কে যেন চেয়ারটার উপর বসে আছে।

ওদিককার দোতলা বাড়ির একটা ঘরের খানিকটা আলো জানালা পথে তার ঘরে এসে ঢুকেছে সেই আলোতেই ঝাপসা ঝাপসা দেখতে পায় কুন্তী।

বলে, কে, কে ওখানে ?

আমি, মৃদু কণ্ঠে জবাব এল।

কে, মানু—

বলতে বলতে কুন্তী একটু যেন বিস্মিত হয়েই হাত বাড়িয়ে ঘরের আলোটা জ্বালিয়ে দেয় সুইচটা টিপে। উজ্জ্বল আলোয় ঘর ভরে যায়।

কুন্তী দেখে চেয়ারের উপরে মানসী বসে চুপটি করে।

কেমন যেন ধ্বক করে উঠেছিল ঐ মুহূর্তে বুকের মধ্যে কুন্তীর, মানসীর মুখের দিকে তাকাতেই।

মানসীই প্রথমে কথা বলে, দিদিভাই—

কুন্তী তখনো চেয়ে আছে বোনের মুখের দিকে।

কি হয়েছে দিদিভাই, মানসী প্রশ্ন করে, তোমার মুখটা অমন শুকনো কেন ?

ও কিছু না, তুই এখানে বসে যে—

আমি—

কিছু বলবি ?

হ্যাঁ, মানে ! তোমার কাছে আমি অনুমতি চাইব বলে বসে আছি।

অনুমতি ? কিসের অনুমতি মানু।

আমি, মানসী মাথাটা নীচু করে।

কুন্তীর সঙ্গে বয়েসের তার অনেক পার্থক্য। বয়েসের সেই ব্যবধানটা চিরদিন দু'জনার মধ্যে একটা সম্ভ্রমের প্রাচীর তুলে রেখেছিল।

তাছাড়া চিরদিন একটু রাশভারী, গম্ভীর প্রকৃতির কুন্তী, সকলে সব সময় তার সামনে এগুতে ঠিক যেন সাহস পেত না।

দুই বোনের পরস্পরের মধ্যে অবশ্য একটা ভালবাসার সম্পর্ক ছিল

সে বলে তীক্ষ্ণ শ্লেষ ভরা কণ্ঠে, তবে কুন্তী দেবী, তোমারও একটা কথা জানা দরকার, এর পরও যদি তুমি মনে করে থাক, শিশিরাংশু তোমার দাক্ষিণ্যের জন্যই তার হাত দুটো পেতে রাখবে তো ভুল করেছ—

কুন্তী তাকিয়ে ছিল শিশিরাংশুর মুখের দিকে।

শিশিরাংশুর কণ্ঠস্বরে যেন তখন বিষ ঝরে পড়ছিল।

সে বলে, হ্যাঁ, জেনে যাও, তোমার জন্য আমি কোন দিনই বসেছিলাম না, আর আজও নেই, নিজেব চেহারাটা বোধ হয় অনেকদিন আয়নায় দেখ না, বাড়ি ফিরে গিয়ে দেখ—

তীক্ষ্ণ আর্তকণ্ঠে চিৎকার করে ওঠে কুন্তী, শিশিরাংশু—

শিশিরাংশু আরো বিষ কণ্ঠে ঢেলে বলে, ভেবেছ স্বর্ণেন্দুকে ঐ চেহারা দিয়ে ভোলাবে কিন্তু জেনো—he is not an idiot—

আর সহ্য করতে পারে না কুন্তী, মুহূর্তে যেন একটা তীব্র অপমানের জ্বালা তার সর্বাঙ্গে বিদ্যুৎ-প্রবাহেব মত ছড়িয়ে যায়, সে যেন মুহূর্তের জন্য অন্ধ হয়ে যায়, ঠাস্ করে শিশিরাংশুর গালে একটা চড় বসিয়ে হাঁপাতে হাঁপাতে বলে, ইতর—

আর দাঁড়ায় না কুন্তী, দাঁড়াবার আর তার শক্তি নেই তখন।

সমস্ত শরীরটা তার তখন থর থর করে কাঁপছে।

ঝিম ঝিম করছে সমস্ত চেতনা।

টলতে টলতে কোন মতে ঘর থেকে বের হয়ে যায়!

কিন্তু সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতেও শিশরাংশুর বিষাক্ত কণ্ঠস্বরের শেষ কথাগুলো যেন তার কানে বাজতে থাকে, ভেবেছ স্বর্ণেন্দুকে তোমার ঐ চেহারা দিয়ে ভোলাবে কিন্তু he is not an idiot—

কি করে যে হোটেলের সিঁড়িগুলো অতিক্রম করে এক সময় কুন্তী গাড়ির মধ্যে এসে উঠে বসেছিল কিছুই তার মনে নেই।

॥ এগারো ॥

ড্রাইভার যখন জিজ্ঞাসা করেছিল, কোথায় যাবে, তখনো কোন জবাব দেয় নি কুন্তী। গাড়ির ব্যাক সীটে হেলান দিয়ে পড়ে ছিল।

অনেক দিনের পুরনো ড্রাইভার কি সে বুঝেছিল কে জানে, সোজা বাড়ির দিকেই গাড়ি চালিয়েছিল। গাড়ি ছুটে চলেছে, চারিদিকে কর্মব্যস্ত প্রবাহমান জনস্রোত কিন্তু কোন দিকেই কোন দৃষ্টি ছিল না তখন কুন্তীর।

সেই যে গাড়িতে ঢুকে মাথাটা নীচু করে হেলান দিয়ে বসেছিল সারাটা পথ আর মাথা তোলে নি, এক সময় গাড়িটা এসে বাড়ির সদর দরজা দিয়ে প্রবেশ করে পোর্টিকোর নীচে এসে দাঁড়াল।

ড্রাইভার গাড়ির দরজা খুলে দিল, দিদিমণি—

সেই ডাকে কুন্তী মুখ তুলে তাকায়।

ড্রাইভার আবার বলে, দিদিমণি, কোঠি আ-গিয়া—

কুন্তী গাড়ি থেকে নেমে এল।

তথাপি বয়সের ঐ ব্যবধানটা ও কুন্তীর চরিত্রের গাম্ভীর্য ঠিক সহজ একটা ঘনিষ্ঠতায় কোনদিন বোধহয় দুজনকে আসতে দেয় নি, সংযম গাম্ভীর্য ও চারিত্রিক বলিষ্ঠতায় কুন্তীর মধ্যে একটা বৈশিষ্ট্য এনে দিয়েছিল।

একটা আভিজাত্য দিয়েছিল এবং যেখানে সে সংসারের মধ্যে থেকেও এক স্বাতন্ত্র্যের সৃষ্টি করেছিল। বাড়ির মধ্যে সকলেই কুন্তীকে সেই কারণে সমীহ করে চলত।

রতিনাথও সেই কারণেই ইচ্ছা থাকলেও তার লোভের হাতটা বোধকরি গুটিয়ে রেখেছিল। এবং স্ত্রীর দিক থেকে অবিরত তাগিদ আসলেও বিশেষ অগ্রসর হতে সাহস পাচ্ছিল না মনের মধ্যে।

কুন্তী কথা বলত কম এবং নিজের ঘরের মধ্যেই সর্বদা প্রায় লেখাপড়া নিয়ে বা অন্য কাজকর্ম নিয়ে ব্যস্ত থাকত। এবং যতক্ষণ সে বাড়িতে থাকত প্রত্যেকেই বুঝতে পারত যেন সে বাড়ির মধ্যে কোথায়ও না কোথায়ও আছে।

মানসী যদিও কুন্তীর কাছ থেকে বরাবর যথেষ্ট ভালবাসা, স্নেহ ও প্রশ্রয় পেয়েছে তবু সে দিদিভাইকে মনে মনে ভয় করত।

তাই বুঝি কথাটা বলতে গিয়েও মানসী থিতিয়ে যায়।

কুণ্ঠায় কেমন যেন স্তব্ধ হয়ে আসে।

কিন্তু কথাটা যে না বললেও নয়। মানসীকে কথাটা যে বলতেই হবে।

যা হোক মানসীর মুখের দিকে তাকিয়ে কুন্তীই আবার প্রশ্ন করে, কিছু বলবি?—

না থাক, অন্য এক সময় না হয় বলব—

না, কি বলতে চাস বল? কিসের অনুমতি চাইছিলি?

বলছিলাম আমি—আমি বিয়ে করব—

বিয়ে করবি?

হ্যাঁ—

কয়েকটা মুহূর্ত যেন কুন্তীর বাঙ্‌নিষ্পত্তি হয় না।

চেয়ে থাকে ছোট বোনের মুখের দিকে—

তারপর ধীরে ধীরে এক সময় বলে, বিয়ে, তুই বিয়ে করবি?

হ্যাঁ—

মাথাটা নীচু করে মানসী।

তুই বিয়ে করতে চাস?

হ্যাঁ দিদিভাই, তাই তোমার অনুমতি—

কে সে? কাকে বিয়ে করতে চাস।

তুমি তাকে অবিশ্যি চেন—

আবার বিস্ময়ের একটা ধাক্কা খায় যেন কুন্তী।

বলে, আমি তাকে চিনি? কিন্তু কে সে? কি নাম তার?

শিশিরাংশু।

নামটা উচ্চারণ করবার সঙ্গে সঙ্গে আবার মাথাটা নীচু করে মানসী।

কি, কি বললি, কাকে বিয়ে করতে চাস তুই—

একটা প্রচণ্ড ইলেকট্রিক শক্ খেয়েছে যেন কুন্তী।

গলা দিয়ে অর্ধস্ফুট একটা শব্দের মতই যেন কথাগুলো বের হয়ে আসে কুন্তীর।

কি শুনছে সে, মানসী শিশিরাংশুকে বিয়ে করতে চায়।

ঠিক শুনেছে তো, না ভুল শুনলো সে—

তুই, তুই শিশিরাংশুকে বিয়ে করতে চাস?

হ্যাঁ—

না, না, না—

তীক্ষ্ণ কণ্ঠে যেন প্রতিবাদ জানায় এতক্ষণে কুন্তী।

দিদিভাই—

না, না, এ বিয়ে হতে পারে না—

হতে পারে না?

না, না—

কিন্তু আমি যে—

মানসীকে বলতে দেয় না কুন্তী, তীক্ষ্ণ প্রতিবাদে যেন ঝলসে ওঠে, বলছি এ বিয়ে হতে পারে না, এর মধ্যে আর কোন কথা, কোন কিন্তু নেই মানু, এ হতে পারে না।

কিন্তু কেন, কেন হতে পারে না?

আমি বলছি এ বিয়ে হতে পারে না, আর কোন প্রশ্ন করিস না আমাকে—যা এঘর থেকে—

কিন্তু দিদিভাই—

যা, যা বলছি এঘর থেকে—

না, আমি যাব না, কেন হতে পারে না তোমাকে বলতেই হবে—

কি বললি, বলতে হবে—

মুহূর্তে আক্রোশে যেন ফেটে পড়ল কুন্তী, এলোপাথাড়ি বোনের দুগালে গোটাকতক চড় বসিয়ে দেয়, যে বোনের গায়ে কখনো হাত আজ পর্যন্ত তোলে নি।

ঐ ভাবে কুন্তীর হাতে চড় খেয়ে মানসীও যেন হঠাৎ থমকে যায়, বোবা হয়ে যায়।

কুন্তী তখনও হাঁপাচ্ছে।

মানসী ধীরে ধীরে ঘর থেকে চলে যাবার জন্য পা বাড়ায়।

কুন্তী আর নিজেকে রোধ করতে পারে না।

ছুটে গিয়ে দু'হাতে মানসীকে জড়িয়ে ধরে, মানু—

ছেড়ে দাও, ছেড়ে দাও তুমি আমায়—

মানসী জোর করে নিজেকে ছাড়িয়ে নেবার চেষ্টা করে।

কিন্তু কুন্তী ছাড়ে না বোনকে। বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরে থাকে।

শোন, শোন, তুই জানিস না—

মানসী বলে, জানি, আমি সব জানি—

কি জানিস তুই, কিছুই জানিস না ঐ মানুষটা সম্পর্কে তুই, he is a liar, নীচ ভালগার—

ছেড়ে দাও তুমি আমায়—

শোন মানু, শোন, আমি বলছি, তুই ভুলে যা তাকে ভাই—

ও ঠিকই বলেছিল, তুমি শুনলে হয়ত বাধা দেবে, আমিই তখন বিশ্বাস করি নি, বলেছিলাম আমার দিদিভাইকে আমি জানি সে আমার জন্যে পারে না এমন কিছু দুনিয়ায় নেই। কিন্তু এখন বুঝতে পারছি আমি ভুল করেছিলাম—

মানু শোন, তুই, তুই জানিস না, ও তোকে প্রতারণা করেছে, ও ভালবাসতে জানে না, কোনদিন কাউকে ভালবাসতে পারে না—

সর তুমি আমার পথ থেকে, মানসী বলে, আমি জানি ও প্রতারণা করে নি, ও আমাকে ভালবাসে—

প্রতারণা করে নি ?

না—

কিন্তু জানিস তুই ও বিবাহিত—

বিবাহিত !

হঠাৎ যেন কথাটা শুনে থমকে দাঁড়ায় এতক্ষণে মানসী প্রথম।

হ্যাঁ। বিবাহিত।

না, এ আমি বিশ্বাস করি না।

বিশ্বাস কর সত্যি বলছি, he is married—

না, তা হলে তার মা ভাইবোনেরা জানত—

তারা জানে না, তাদেরও জানতে দেয় নি কোনদিন, সত্যিই শিশিরাংশু বিবাহিত, আর তার সেই স্ত্রী এখনো বেঁচে—

সেই স্ত্রী—

হ্যাঁ, নাম তার শর্মিলা আর এই শহরেই সে আছে, আমি তোকে ঠিকানা দেব তুই খোঁজ করে দেখ নিজে বিশ্বাস না করিস আমার কথায়—

সত্যি, সত্যি বলছ দিদিভাই—

মানসীর কণ্ঠে এতক্ষণে বুঝি সংশয়ের সুর।

হ্যাঁ, সত্যিই বলছি, ও বিবাহিত, তোকে মিথ্যা বলেছে, প্রতারণা করেছে—

মানসী ততক্ষণে বসে পড়েছে।

আর সে দাঁড়িয়ে থাকতে পারে না। দুহাতে মুখ ঢাকে।

কুন্তী এগিয়ে আসে মানসীর পাশে—

গভীর স্নেহে ওর মাথায় একখানি হাত রেখে বলে, মানু, আমি জানি, It is really shocking, প্রচণ্ড ব্যথা পেয়েছিস তুই, ভুলে যা তাকে, তাছাড়া তুই জানিস না, এ বিয়ে যদি হতও কোনদিন তুই সুখী হতে পারতিস না। একটা নীচ, স্বার্থপর জঘন্য চরিত্রের মানুষ ও—

কান্নায় ভেঙে পড়ে মানসী হঠাৎ ঐ সময় কুন্তীকে দু'হাতে জড়িয়ে ধরে, কিন্তু আমার যে আর অন্য কোন উপায় নেই দিদিভাই—

মানু, অস্পষ্ট কণ্ঠে চীৎকার করে ওঠে কুন্তী।

হ্যাঁ, দিদিভাই, অন্য কোন পথ নেই—

কুন্তী যেন পাথর হয়ে গিয়েছে হঠাৎ।

তার সমস্ত বোধশক্তি, সমস্ত চেতনা যেন হিম হয়ে গিয়েছে।

নির্বাক নিস্পন্দ কুন্তী কেবল বোনকে বুকের মধ্যে নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে।

দু'চোখের অশ্রুর ধারা তার গণ্ড ও চিবুক প্লাবিত করে দিচ্ছে।

॥ বারো ॥

কতক্ষণ, কতক্ষণ যে তারপরও অমনি করে কুন্তী পাথর হয়ে মানসীকে বুকের মধ্যে নিয়ে দাঁড়িয়েছিল নিজেও বুঝি জানে না।

হঠাৎ একসময় তারপর মানসীই ডাকে, দিদিভাই—

কি রে ?

আমার যে আর কোন পথ নেই—

তুই ঘরে যা, ভাবিস না কিছু, যা—

দিদিভাই—

যা, ঘরে যা, অনেক রাত হয়েছে।

মানসী ঘর থেকে বের হয়ে গেল ক্লান্ত শিথিল পায়ে।

আর হঠাৎই ঐ মুহূর্তে প্রস্থানরত ছোট বোনটির দেহের দিকে তাকিয়ে কুন্তীর মনে হল, অন্ধ সে, এত দিন কেন তার চোখে পড়েনি, ওর চোখের কোল, ওর চলার ভঙ্গি।

কিন্তু এখন ও কি করবে—

সেই শিশিরাংশুর সামনে গিয়ে হাত পেতে তাকে দাঁড়াতে হবে।

তাই, তাই শিশিরাংশু অমনি করে কথাগুলো তাকে বলতে পেরেছিল।

কিন্তু কবে, কবে ঘটলো ব্যাপারটা—

ইতিমধ্যে শয়তানটা মানসীর মনকে জয় করে নিয়েছে—

উঃ কি নির্বোধ মানসীটা, একটা হীন চরিত্র শয়তানের হাতে এমনি করে সে নিজেকে কেমন করে সমর্পণ করল।

কিন্তু সে তো পরের কথা, মানসীকে আজ তাকে যে বাঁচাতে হবে।

তার মুখের আশ্বাস পেয়েই মানসী নিশ্চিন্ত হয়ে ঘরে গিয়েছে। কিন্তু কেমন করে, কেমন করে সে বাঁচাবে মানসীকে এ অপমানের হাত থেকে—.

বাবা, কোথায় তুমি বাবা। কোথায় গিয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে বসে আছ। তোমার দেওয়া দায়িত্ব বইবার আর যে আমি শক্তি পাচ্ছি না বাবা।

এই কথা যদি ঘুণাক্ষরেও এখন প্রকাশ হয়ে যায়, সারা বাড়ি মুখর হয়ে উঠবে। ঐ রীতিনাথই সর্বাগ্রে চীৎকার করতে সুরু করে দেবেন।

তারপর তার স্ত্রী—

উঃ মাথাটা যেন ছিঁড়ে পড়ছে কুন্তীর।

কি অসহ্য যন্ত্রণা—

সারাটা রাত ঘরের মধ্যে পায়চারি করেছিল কুন্তী।
এবং শুধু সেই রাতই নয় তার পরের আরো দুটো রাত।
কি করবে সে এখন, কি করবে। মানসী, মানসীর কি ব্যবস্থা করবে।
একমাত্র উপায় বিবাহ। মানসী ও শিশিরাংশুর বিবাহ।
কুন্তীর মুখের দিকে চেয়ে মানসীও যেন ভয় পেয়ে যায়।
ভয়ে ভয়ে সে আবার দুদিন পরে কুন্তীর সামনে এসে দাঁড়ায়।

পরবর্তীকালে ব্যাপারটা অনেক ভেবেছে কুন্তী—
সেদিন কি সে ভুল করেছিল ?
কিন্তু আবার এও মনে হয়েছে আর বিইবা সেদিন সে করতে পারত, আর কিইবা তার করার ছিল।
মানসীকে সেদিন সেই অপমানের হাত থেকে বাঁচাবার তো আর কোন পথই তার সামনে সেদিন খোলা ছিল না।
সামনে তার আর কোন রাস্তাই ছিল না।
হ্যাঁ ঠিক, মাথা পেতে সে সেদিন চরম অপমানকেই মেনে নিয়েছিল।
শুধু মানসীর মুখের দিকে চেয়েই সেদিন কুন্তীকে ঐ অপমান মাথা পেতে নিতে হয়েছিল।
মানসী অতঃপর শুধিয়েছিল, তাহলে কি হবে দিদিভাই।
ভাবিস না, একটা কিছু উপায় হবেই।
আমি ঘুণাক্ষরে জানতে পারিনি যে ও বিবাহিত ও তার স্ত্রী বর্তমান।
মানসী—
দিদিভাই ?
তুই এক কাজ কর, শিশিরাংশুকে একবার আমার সঙ্গে দেখা করতে বল !
আমি যাব দিদি, গিয়ে তাকে হোটেল থেকে ডেকে নিয়ে আসব !
না, ফোন করে দে আসবার জন্য।

কিন্তু মানসী সেদিন কুন্তীর কথা শোনেনি।
দুপুরের দিকে কুন্তীকে কিছু না জানিয়ে চলে গিয়েছিল মানসী। এবং বিকেলের দিকে যখন সে তার ঘরের মধ্যে বসে আছে গণেশ এসে জানাল, শিশিরাংশুবাবু এসেছেন।
লাইব্রেরী ঘরে নীচেয় বসতে দে গিয়ে, আমি আসছি, কুন্তী বলে।
গণেশ চলে গেল এবং একটু পরে গায়ের কাপড়টা ঠিক করে কুন্তী ঘর থেকে বেরুল।
লাইব্রেরী ঘরের মধ্যে একটা বড় সোফার ওপরে গা এলিয়ে দিয়ে সামনের একটা নিচু গোলাকার টেবিলের ওপর জুতো সমেত পা দুটো তুলে সিগ্রেট টানছিল শিশিরাংশু।

কুন্তীকে ঘরে ঢুকতে দেখে একটু নড়ে-চড়ে বসল বটে শিশিরাংশু কিন্তু টেবিলের উপর থেকে পা দুটো নামাল না।

এই যে কুন্তী দেবী, হঠাৎ এত জরুরী তলব যে একেবারে বোনটিকে আমার হোটেলে পাঠিয়ে দিয়েছেন। কঠিন ব্যঙ্গ যেন শিশিরাংশুর কণ্ঠস্বরে ঝরে পড়ে।

কুন্তী চমকে ওঠে শিশিরাংশুর কথাটা শুনে। বলে, মানসী—

হ্যাঁ, ফেরে নি, আপনার decision-টা শোনবার অপেক্ষায় এখনো আমার হোটেলের ঘরেই বসে আছে—

Decision ?

তা বৈ কি! এখন বলুন এ অধীনকে স্মরণ করেছেন কেন ?

মানসী আমার বোন শিশিরাংশুবাবু, তাই সমস্ত অপমানই আমাকে মুখ বুজে সহ্য করতে হবে। যাক সে কথা, মানসীকে বিয়ে করবার আগে আমি আপনার কাছ থেকে শুনতে চাই শর্মিলার কি ব্যবস্থা আপনি করছেন ?

শর্মিলা সম্পর্কে আপনার কোন দুশ্চিন্তার কারণ নেই কুন্তী দেবী।

আপনার হয়ত নেই কিন্তু আমার আছে—সে যাতে হঠাৎ কোনদিন আবার এসে আমার বোনের জীবনের শান্তি না নষ্ট করে, সে দিকটা।

ভয় নেই, সে আসবে না, আমার মনে হয় কিছু টাকা তাকে দিয়ে দিলে, এই ধরুন হাজার দশেক।

কে দেবে ?

কেন, আপনিই দেবেন।

আমি!

হ্যাঁ, মানসীর জীবনের সুখ-দুঃখটা আপনি না দেখলে কে দেখবে বলুন ?

কয়েকটা মুহূর্ত যেন বোবা দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে কুন্তী ঐ মানুষটার দিকে। লোকটা কি শয়তান! না, শয়তানেরও হৃদয় বলে একটা বস্তু আছে। কিন্তু ঐ মানুষটার তাও বুঝি নেই।

অপরিসীম ঘৃণায় সর্বাঙ্গ ঘিন ঘিন করতে থাকে কুন্তীর। আশ্চর্য, এই জঘন্য, নীচ প্রকৃতির মানষটাকে এতদিন মনে মনে ভালবেসেছিল কি করে ?

অমন চমৎকার একটা মুখোস মানুষটা মুখে এঁটে রেখেছিল একটিবারও বুঝতে পারে নি কুন্তী।

বেশ, তাই হবে, কুন্তী ধীরে ধীরে এক সময় বলে, কিন্তু তাতেই যে ব্যাপারটা চিরদিনের মত মিটে যাবে, তাতে আপনি নিশ্চিত হলেন কি করে ?

নিশ্চিত, মৃদু হাসে শিশিরাংশু, দশ হাজার দূরে থাক, জীবনে কখনো একত্রে একশ টাকাও চোখে দেখে নি। তাছাড়া ও সব মেয়েদের চরিত্র তো আমার জানা আছে, যারা দেহ আর যৌবনের ফাঁদ পেতে পুরুষকে ঘায়েল করে।

কিন্তু শিশিরাংশু কথাটা শেষ করতে পারে না, আগেই তাকে তীক্ষ্ণ একটা চীৎকার করে থামিয়ে দেয় কুন্তী, থামুন—থামুন—

॥ তের ॥

কুন্তীর আকস্মিক চীৎকারে শিশিরাংশু থেমে গিয়েছিল।

থেমে গিয়ে কুন্তীর মুখের দিকে তাকিয়েছিল।

থামুন, আপনি আর ঐ কথাগুলো নাই বা উচ্চারণ করলেন মুখে, বিশেষ করে আমার সামনে, তারপর একটু থেমে নিজেকে যেন অনেকটা সংযত করে প্রশ্ন করে, আপনি তার সম্পর্কে তা হলে কি ব্যবস্থা করবেন সেটাই বলুন।

শুনুন কুন্তী দেবী, আমার বক্তব্য হচ্ছে শর্মিলা সম্পর্কে কি করব না করব সেটা যখন একান্ত ভাবে আমারই ব্যাপার, আমিই না হয় ভাবলাম—আপনি সে ব্যাপারে অতটা মাথা নাই বা ঘামালেন।

প্রয়োজন বলেই আমাকে মাথা ঘামাতে হচ্ছে, মানসী আমার একমাত্র বোন!

আমি বিয়ে করলে সে আমার স্ত্রী হবে।

তা হবে, কিন্তু বিয়ে করবার পর।

বেশ, তার আগে আপনি আমার একটা প্রশ্নের জবাব দিন।

প্রশ্ন—কিসের প্রশ্ন?

মানে আপনাদের সম্পত্তির ব্যাপারটা।

সম্পত্তির।

হ্যাঁ, ডাঃ চৌধুরীর সম্পত্তির কি ব্যবস্থা হবে, যদিও আপনার গুণধর শকুনি কাকাটি এসে দরজা আগলে বসেছেন তা হলেও আমি জানি, তার কিছু করবার শক্তি নেই। সমস্ত সম্পত্তির একমাত্র মালিক তো বটেই আবার আপনিই একমাত্র ব্যক্তি যিনি ব্যাঙ্ক ট্র্যাংকজ্যাকশনের অধিকারী আপনার বাবার উইল অনুযায়ী।

কুন্তী চেয়েছিল শিশিরাংশুর মুখের দিকে অবাক বিস্ময়ে!

আশ্চর্য! মানুষটা সে খবরও রেখেছে।

শিশিরাংশু বলে, চেয়ে আছেন কি আমার মুখের দিকে, সব আমি জানি, খবর রাখি, তাই বলছিলাম, মানসী সম্পর্কে কি ব্যবস্থা করবেন? সে যখন আপনারই মুখাপেক্ষী।

কুন্তীর একবার ইচ্ছা হয়েছিল চীৎকার করে লোকটার মুখের ওপরে বলে দেয়, এক কপর্দকও দেব না তাকে।

চুপ করে থাকে কুন্তী।

চুপ করে থাকলেও চলবে না কুন্তী দেবী।

উঃ, শয়তানটা জানে যে সে আজ ভাল করে কুন্তীকে মুঠোর মধ্যে পুরেছে, ইচ্ছা মত তাকে সে যে পথে চলতে বলবে কুন্তীর সেই পথেই যাওয়া ছাড়া আর দ্বিতীয় কোন পথ নেই। রাগ করেও কোন লাভ নেই।

সে আজ মানসীর জন্য সব কিছু মেনে নিতে বাধ্য।

ধীরে ধীরে তাই বলে, সেজন্য আপনাকে ভাবতে হবে না।

হেসে ওঠে শিশিরাংশু, তাই কি একটা কথার কথা হল কুন্তী দেবী, কথায় বলে পর হস্তগতধন, তার একটা মীমাংসা না হওয়া পর্যন্ত কি—

অর্ধেক সে পাবে বৈ কি।

আর ব্যাঙ্কের টাকা।

তাও পাবে।

কত আছে ব্যাঙ্কে।

যা আছে তার অর্ধেক পাবে সে, এখন বিয়েটা কবে হবে বলুন।

বিয়ে!

হ্যাঁ, কবে হবে তাই বলুন!

ব্যস্ত কি, সম্পত্তির সব ফয়শালা হয়ে যাক, তারপর—

আমি তো বললাম সব করে দেব।

অবিশ্যি আপনাব কথাকে আমি honour করি, কারণ আপনি কথার খেলাপ করবেন না অন্তত কুন্তী দেবী আমি তা জানি, কিন্তু—

কি—

আরো একটা কথা আছে এর মধ্যে।

কি কথা?

মানসীর, মানে, মানসীর শবীবেব বর্তমান অবস্থাটা নিশ্চয়ই আপনার অজ্ঞাত নয় কুন্তী দেবী।

লজ্জায় ঘৃণায় কুন্তী যেন আর তাকাতে পারে না, মাথাটা নীচু করে।

বলছিলাম কি এই অবস্থায় বিয়েটা কবা কি ভাল দেখাবে?

লোকটা বলে কি? চকিতে মুখ তুলে তাকায় কুন্তী।

এ, এ আপনি কি বলছেন শিশিরাংশুবাবু।

ঠিক বলেছি, এ অবস্থায় বোধ হয় বিয়ে করাটা উচিত হবে না। মানে নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন কুন্তী দেবী, বিয়েব মাস ছিয়-সাত-এর মধ্যেই বাচ্চা যখন হবে তখন আমার চাইতে কেলেঙ্কারীটা তারই কি বেশী হবে না, তাই বলছিলাম।

কুন্তী অবাক বিস্ময়ে যেন পাথর হযে মানুষটার মুখের দিকে চেয়ে থাকে।

শিশিরাংশু বলে, তাই বলছিলাম, সবটাই সুষ্ঠু, সুন্দর ও স্বাভাবিক হওয়াই ভাল নয় কি। বিশেষ করে ডাঃ সতীনাথ চৌধুরীর মেয়ে, একটা আভিজাত্যের কৌলিন্য আছে, যদি কোন একটা ব্যবস্থা করতে পারেন, আপনার পক্ষেও তো সেটা তেমন অসুবিধাও কিছু হবে না, বাবা ডাক্তার ছিলেন, অনেক ডাক্তারদের সঙ্গেই তো আপনাদের জানাশোনা আছে।

শিশিরাংশুর জঘন্য কুৎসিত স্পষ্ট ইঙ্গিতটা যেন কুন্তীকে একেবারে বোবা করে দেয়।

মানুষটা এত কুৎসিত, এত নীচ, এত নোংরা!

মুখোসটা খুলে গিয়েছে শিশিরাংশুর ভয়াবহ কুৎসিত ক্লেদাক্ত একটা সরীসৃপ যেন, মানুষ নয়।

শিশিরাংশু আবার বলে, আপনি বুদ্ধিমতী অধিক বলা বাহুল্য।

অকস্মাৎ যেন অগ্নুৎপাত ঘটলো।

ফেটে পড়ল যেন কুন্তী, যান, যান এখান থেকে বলছি, মনে করব এর চাইতে আমার বোন মরে গেছে, কিংবা আমিই ওর গলা টিপে মেরে ফেলবো।

কুন্তী ঘৃণায় আক্রোশে-অপমান-জ্বালায় যেন থর থর করে কাঁপতে থাকে।

কথাগুলো শেষ করতে পারে না, কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে যায় অবরুদ্ধ অশ্রুতে বুঝি।

শিশিরাংশু শান্ত কণ্ঠে বলে, মিথ্যে আপনি উত্তেজিত হচ্ছেন কুন্তী দেবী, কলঙ্কর কথাটা আপনি আদৌ ভাবছেন না, পয়সা আপনাদের অনেক আছে মানি কিন্তু ভাববেন না সেই পয়সা দিয়ে সারাটা দুনিয়ার মুখই বন্ধ করতে পারবেন। আর কলঙ্ক, বিশেষ করে মেয়েদের এমনি জিনিস যে বিষাক্ত ঘায়ের মত শুকিয়ে গেলেও কুৎসিত দাগগুলো বাকী জীবনটায় থেকেই যায়, কোনদিন মোছে না।

আপনি যাবেন কি না, যান।

বেশ, যাচ্ছি, তবে ভেবে দেখলেই বুঝতে পারবেন, কথাটা আমার কত সত্য, আর এও জানি, ফিরে আবার আমার কাছেই আসতে হবে, আজই হোক বা কালই হোক, of course I will wait for you, অপেক্ষা করে থাকব হোটেলেই আমি, আচ্ছা চলি, Bye, Bye—

শিশিরাংশু অতঃপর ঘর থেকে বের হয়ে গেল।

কুন্তী কিন্তু বসেই রইল।

পায়ের তলা থেকে সমস্ত মাটিটা তখন তার সরে যাচ্ছে।

এ মানসী কি করল!

কোন ভয়াবহ সর্বনাশের মধ্যে এমনি করে ঝাঁপিয়ে পড়তে চলেছে—

কিন্তু পরক্ষণেই আবার মনে পড়ে মানসীর অসহায় অবস্থার কথাটা।

কি করবে, সে এখন কি করবে।

কি সে করতে পারে।

একদিকে মানসীর সব কিছু মান অপমান লজ্জা, পরিচয়, অন্য দিকে ঘৃণ্যতম পরাজয়। পাগলের মতই দুটো দিন ছটফট করে বেড়াল কুন্তী।

কারো কাছে যদি একটু পরামর্শ পেত কিন্তু এক কান থেকে দশ কান হয়ে যাবে হয়ত তখন ব্যাপারটা। আর তখন সমস্ত আড়াল ভেঙ্গে গিয়ে চরম অপমান আর লজ্জা তাদের গ্রাস করবে।

না, না, তা তো সম্ভব নয়।

তা ছাড়া মানসীকে সে কথা দিয়েছে—

একদিন দুদিন করে আরো কটা দিন গেল, মানসী আজকাল এক মুহূর্তও বলতে গেলে বাড়ি থাকে না, যখন-তখন শিশিরাংশুর হোটেলে চলে যায়।

সত্যি, আর বুঝি ভাবতে পারে না কুন্তী। আর ভেবেই বাকি করবে, মনে মনে স্থির করে কালই সে শিশিরাংশুর কাছে যাবে। বলবে, একটা উপায় সে ভেবেছে—

কিন্তু তার আগে সম্পত্তির একটা বিলি-ব্যবস্থা করা দরকার।

শিশিরাংশু নচেৎ হয়ত বেঁকে বসবে।

পরের দিন সকালেই তাই সে সলিসিটারের কাছে গেল, তাকে সব বললে, সম্পত্তির একটা পাকা ব্যবস্থা করতে চায় সে।

বলুন, কি ব্যবস্থা করতে চান। সলিসিটার শুধায়।

ব্যাঙ্কের টাকা সামান্য কিছু রেখে সব মানসীর নামে ট্রান্সফার করে দেবার ব্যবস্থা করুন, আর সব অস্থাবর সম্পত্তি ও কারখানা, তার অর্ধেক অংশের শেয়ার মানসী পাবে এবং সেই শেয়ার থেকে মাসে মাসে একটা পাঁচশো টাকার মত মাসোহারা দেওয়া হবে।

কখন থেকে ঐ ব্যবস্থা চালু করতে চান আপনি?

ওর বিয়ের পর থেকে—

বিয়ে কি ওর স্থির হয়েছে নাকি।

না এখনো হয় নি, তবে—

তবে—

আমি সব ব্যবস্থা আগেই করে দিতে চাই।

বেশ, তাই হবে।

তা হলে আপনি একটা ড্রাফট করে যত শীঘ্র পারেন আমার কাছে নিয়ে আসবেন।

আরো দিন তিনেক বাদে একটা ড্রাফটের টাইপ কপি নিয়ে কুন্তী শিশিরাংশুর হোটেলে গিয়ে হাজির হল।

কি সৌভাগ্য, আসুন, কুন্তী দেবী।

শিশিরাংশু স্বাগত সম্ভাষণ জানায়।

আমি জানতাম অবিশ্যি আপনি আসবেন, যাক, এখন বলুন কি বলবেন? মানসীর যা ব্যবস্থা করতে বলেছিলাম—

না, যে শিশু এসেছে তাকে আমি এভাবে হত্যা করতে দেব না, বিয়ের পর আপনারা দূরে কোথাও চলে যান।

তারপর।

সন্তান হবার পর আমাকে খবর দিলে, আমি সে সন্তানের ব্যবস্থা করব।

কি ব্যবস্থাটা করবেন জানতে পারি কি?

আমার কাছে সে সন্তানকে আমি নিয়ে আসব।

An absurd proposal—

শিশিরাংশুবাবু, আপনাকে আমি নগদ দশ হাজার টাকা আলাদা দেব, মানসীর প্রাপ্য সম্পত্তি বাদেও এবং সে সন্তানকে আমি নিয়ে আসব, সে কথাও দিচ্ছি।

But if you don't keep your promise—আপনার কথা যদি না রাখেন।

আমাকে আপনি বিশ্বাস করেন না ?

করি।

তবে।

বেশ, তবে তাই হবে।

এখন বলুন, কবে বিয়েটা হবে ?

যেদিন খুশি হতে পারে।

আপনি তাড়াতাড়ি দিন ঠিক করুন একটা, আর এই নিন সম্পত্তির ড্রাফট্, পড়ে দেখবেন, কাল আমি আবার আসব।

কথাটা বলে কুন্তী আর দাঁড়ায় না, উঠে দাঁড়ায় যাবার জন্য এবং দরজার দিকে দু পা এগুতেই মানসীর সঙ্গে চোখাচোখি হয়ে যায়।

মানসী ঘরে ঢুকছিল।

মানসীও কুন্তীকে ঘরে দেখে থতমত খেয়ে দাঁড়িয়ে যায়।

কিন্তু কুন্তী দাঁড়ায় না, এমন কি ফিরে মানসীর দিকে তাকায় না পর্যন্ত। ঘর থেকে বের হয়ে যায়।

এস, মানসী, বস।

দিদিভাই এসেছিল।

হ্যাঁ, আমি তোমাকে বলিনি, she must come, আসবে সে, তাকে আসতে হবেই।

মানসী শিশিরাংশুর কথার কোন জবাব দেয় না।

ধীরে ধীরে সোফাটার ওপর এসে বসে !

হাতে কিসের কাগজ ওটা, মানসী শুধায় !

ও কিছু না। এমনি একটা কাগজ, কাগজটা আড়াল করে ফেলে শিশিরাংশু।

শিশির।

বল।

আমাকে তুমি ক্ষমা কর শিশির, ও আমি পারব না, মা হয়ে নিজের সন্তানকে, তাছাড়া সে তো কোন পাপ করে নি, আর আমরা যখন বিয়েই করছি।

আচ্ছা. আচ্ছা হবে, তোমার যখন এতই অনিচ্ছা, সেজন্য তোমাকে অত ভাবতে হবে না।

সত্যি, সত্যি বলছ শিশির।

হ্যাঁ, তবে।

কি তবে ?

বিয়ের পরই এখান থেকে আমরা দূরে কোথায়ও চলে যাব।

সে খুব ভাল হবে, মানসী বলে।

তারপর তোমার বাচ্চা হয়ে গেলে ফিরে আসা যাবে আরো কিছুদিন

পরে, তখন আর কারো কিছু মনেও হবে না।

উঃ, ইউ আর সো নাইস শিশির, আনন্দে আত্মহারা হয়ে মানসী শিশিরাংশুকে জাপটে ধরে।

আরো দিন সাতেক পরে রেজেষ্ট্রি করে বিয়ে হয়ে গেল।

এবং বিয়ে যেদিন হল, কুন্তী সকলকে নিমন্ত্রণ করে হোটেলে একটা ডিনার দিল।

বললে যে, মার অসুখ তাই বাড়িতে কোন কিছু করা হল না।

রতিনাথ কেবল বলতে লাগলেন, একটা কায়স্থর সঙ্গে মেয়েটার বিয়ে দিলি শেষ পর্যন্ত তুই মা।

কুন্তী বলে, ওসব আজকাল আর কেউ মানে না কাকা।

ডিনার তখনো শেষ হয় নি, কুন্তী একপাশে শিশিরাংশুকে ডেকে এনে তার হাতে একটা ভারী খাম তুলে দিল।

শিশিরাংশু শুধায়, কি এটা।

এতে নগদ দশ হাজার টাকা, তোমাদের কাল সকালের প্লেনের দুটো টিকিট আর সম্পত্তির দলিল, কাল সকালেই তোমরা দিল্লী চলে যাবে।

দিল্লী।

হ্যাঁ, তারপর সেখান থেকে যেখানে যেতে চাও যেও, আমাকে একটা চিঠিতে জানিও শুধু সন্তান হবার পর, আমি গিয়ে তাকে নিয়ে আসব।

কুন্তী কথাগুলো বলে আর দাঁড়াল না, বাড়ি থেকে ফোন এসেছিল, মার অবস্থা হঠাৎ খারাপ হয়েছে, সে সোজা বাড়ি চলে গেল।

বাড়িতে পৌঁছে দুটো দুঃসংবাদ পর পর গেল।

মার মৃত্যু হয়েছে কয়েক মিনিট আগে এবং বনমালী কাকার খোঁজ করতে গিয়ে জানতে পারল আগের দিনই নাকি বনমালী সরকার কোথায় যে চলে গেছেন কেউ জানে না।

।। চৌদ্দ ।।

কুন্তী যেন অকূল সাগরে পড়ে।

মায়ের মৃত্যু, বনমালী কাকা নেই, মানসী ঐ ভাবে তাকে চরম আঘাত দিয়েছে, দিশেহারা সে, কি করবে ভেবে পায় না।

অনন্যোপায় হয়েই যেন কুন্তী রতিনাথের হাতে সব কিছু দেখাশোনার ভার তুলে দিল। আর সংসারের সঙ্গে যুদ্ধ করতে সে পারছে না। সে দিশেহারা, ক্লান্ত, অবসন্ন।

মানুষ এক এক সময় এমন একটা পরিস্থিতির মধ্যে পড়ে যে তখন নিজেকে প্রবহমান ঘটনাবর্তের মধ্যে ছেড়ে দেওয়া ছাড়া আর অন্য কোন পথই বুঝি সে খুঁজে পায় না।

ভাল-মন্দ লাভ খতিয়ান টা পর্যন্ত তখন আর তার মনে স্থান পায় না।

কুন্তীর সেদিন ঠিক তেমনি অবস্থা।

যে মাটিতে পা রেখে সে দাঁড়াবার স্বপ্ন দেখেছিল সেই মাটিটাই শুধু

পায়ের নীচ থেকে সরে গিয়েছে তাই নয়, মনের সব চাইতে বড় বিশ্বাসের জায়গাটা হঠাৎ যেন শূন্য, ফাঁকা হয়ে গিয়েছে।

আশা নেই, ভবিষ্যৎ নেই, কেবল ব্যর্থতা-রিক্ততার একটা বুকভাঙ্গা দীর্ঘশ্বাস যেন সমস্ত মনটাকে বিকল বিষণ্ণ করে তুলেছে।

মনের ঠিক ঐ অবস্থায় আর কিইবা সে করতে পারত।

তখন সমস্ত কিছুই তো তার কাছে দুঃসহ।

লেখাপড়া করে শিশির ও মানসীর একটা মাসোহারার ব্যবস্থা করে তো দিয়েছিলই, ব্যাঙ্কে যা নগদ ছিল তার সবটাই ওদের নামে ব্যাঙ্কে ট্রান্সফার করে দিয়েছিল। সে তার প্রতিশ্রুতি অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছিল।

কুন্তী স্বর্ণেন্দুকে বলেছিল, এ ছাড়া আর কি উপায় ছিল বলুন?

কিন্তু আপনি যা ভাবছেন, সর্বনাশকে ঠেকিয়ে রাখবেন।

না স্বর্ণেন্দুবাবু, সর্বনাশকে কি ঠেকান যায়, না আজ পর্যন্ত কেউ তা পেরেছে, আপনি কি বলবেন আমি জানি, মানসী সুখী হবে না কোন দিন, হতে পারে না। মিথ্যার উপরে কোন দিন কোন সত্য দাঁড়িয়ে থাকতে পারে না তা আমিও যে জানিনা তা নয়, তবু আমার দায়িত্বটুকু তো আমি পালন করলাম, এটুকু সান্ত্বনাও তো অন্ততঃ আমার থাকল, ভাল কথা, শর্মিলার কোন খোঁজ আর আপনি করতে পেরেছিলেন?

হ্যাঁ।

দেখা হয়েছিল আপনার সঙ্গে।

হয়েছিল, দেখলাম সব সে জানে।

জানে!

হ্যাঁ, আপনার সঙ্গে দেখা করার কথা বলতে সে বললে, কুন্তী দেবীকে বলবেন, পুরাতন একটা ভুলকে আমি ঘেঁটে নিজের গায়ে কাদা ছিটাব না। শিশিরাংশু আমার মন থেকে মুছে গিয়েছে, সে আজ আমার কাছে মৃত।

কয়েকটা মুহূর্ত চুপ করে থেকে কুন্তী বলে, কি যেন চাকরি করে সে বলেছিলেন?

হ্যাঁ, সামান্য চাকরি, একটা মার্চেন্ট অফিসে টাইপিস্টের চাকরি, মাহিনা একশত কুড়ি টাকা মত পায়, বিধবা মা এখনো বেঁচে আছে। দুজনে সমদমার ওদিকে একটা ছোট বাসা ভাড়া করে থাকে।

আমি যে ভেবেছিলাম, কিছু—

না কুন্তী দেবী, ও চেষ্টা বোধ হয় না করাই ভাল।

কেন?

ও নেবে না।

স্বর্ণেন্দুকে শেষ পর্যন্ত চাকরিটা ছাড়তে দেয় নি কুন্তী।

মানসী ও শিশিরাংশুর বিয়ের পর দিন যখন সব কিছুর ব্যবস্থা সে করে ফেলেছে, তখন সে এক সময় স্বর্ণেন্দুর বাসায় গিয়ে হাজির হয়েছিল।

ভবানীপুরে হরিশ মুখার্জী রোডের একটা সরু গলির মধ্যে স্বর্ণেন্দুর বাসা। দোতলায় খান তিনেক ঘর নিয়ে দুটি প্রাণীর নির্ঝঞ্ঝাট সংসার।

মা ও ছেলে। স্বর্ণেন্দু ও তার মা।

ভোরবেলাই গিয়ে হাজির হয়েছিল কুন্তী স্বর্ণেন্দুর ওখানে।

স্বর্ণেন্দুর মা-ই বাসায় ছিলেন, স্বর্ণেন্দু বাসায় ছিল না।

পরবর্তীকালে প্রায়ই ভেবেছে কুন্তী, ভাগ্যে সেদিন স্বর্ণেন্দুর ওখানে গিয়েছিল সে নচেৎ অতবড় সত্যটা কোনদিনই সে জানতে পারত না।

জীবনটা যে শুধু অন্ধকারই নয় আলোও আছে, এ কথাটা তো কোন দিনই তার আর জানা হত না, তার জীবনের কোন সান্ত্বনাই তো আর থাকত না।

স্বর্ণেন্দুর মা তো কোনদিন ইতিপূর্বে দেখেন নি কুন্তীকে, জিজ্ঞাসা করেন, তুমি।

আপনি বোধ হয় স্বর্ণেন্দুবাবুর মা!

হ্যাঁ।

আপনি আমায় চিনবেন না, আমি কুন্তী, স্বর্ণেন্দুবাবু নেই?

একটু বাইরে গিয়েছে, এখুনি ফিরবে, এস মা, ঘরে এসে বস।

ভদ্রমহিলা কুন্তীকে ঘরে এনে বসান এবং বার বারই যেন কুন্তীর মুখের দিকে তাকান।

কুন্তী বিব্রত বোধ করে।

তোমার মুখটা এত চেনা চেনা যেন মনে হচ্ছে বল তো মা, কোথায় যেন তোমায় দেখেছি মনে হচ্ছে।

হয়ত রাস্তা-ঘাটে কখনো দেখে থাকবেন, কুন্তী ইতঃস্তত করে বলে।

না মা, রাস্তায় তো আমি বড় একটা বের হই না, তুমি বোস ও আবার তাড়াতাড়ি কোথায় যেন বেরুবে, রান্নাটা চাপিয়েছি।

স্বর্ণেন্দুর মা চলে গেলেন।

কুন্তী ঘরের চারিদিকে চেয়ে দেখে, মাঝারি আকারের ঘরখানি কিন্তু ঘরের প্রতিটি বস্তুতে এমন পরিচ্ছন্ন আর্টিস্টিক একটা রুচিবোধের পরিচয় ছড়ানো আছে যে কুন্তী মুগ্ধ হয়ে যায়।

একটি সিঙ্গল বেডে পরিচ্ছন্ন বিছানা—মোরাদাবাদী একটা বেড কভারে ঢাকা। একটি বুক-সেলফে নানা বই।

পাশের ঘরে নজর পড়ে কুন্তীর মধ্যবর্তী দরজা পথে।

ঘরের দেওয়ালে সর্বত্র, হাতে আঁকা নানা ধরণের ছবি, কৌতূহলী কুন্তী পায়ে পায়ে এক সময় পাশের ছোট ঘরটায় গিয়ে প্রবেশ করে।

স্টুডিও—

স্বর্ণেন্দুর তা হলে ছবি আঁকার সখ আছে, শুধু সখ নয়, ছবিগুলো দেখতে দেখতে কুন্তীর মনে হয় ঐ ব্যাপারে স্বর্ণেন্দু রীতিমত পারদর্শী।

হঠাৎ ঈজেলের ওপরে অর্ধসমাপ্ত একখানা ছবির প্রতি নজর পড়তেই চমকে ওঠে কুন্তী, কার, কার ছবি, মনে হচ্ছে যেন সেই।

ছবিটির নীচে ছোট করে লেখা, গোপন স্বপ্ন।

অকস্মাৎ, অকস্মাৎই যেন মনের পাতায় কুন্তীর একটা আলোর ঝাপটা এসে লাগে। কিন্তু সেখানে ঐ ছবির সামনে ঐ ঘরের মধ্যে যেন আর দাঁড়িয়ে থাকতে একাকী সাহস হয় না, তাড়াতাড়ি এ ঘরে চলে আসে কুন্তী।

আজ মনে পড়ে নতুন করে স্বর্ণেন্দুর দুটি চোখের দৃষ্টি। সত্যিই তো, সে দৃষ্টিই তো তাকে বলেছে, সব কথা, কতদিন, অন্ধ সে তাই দেখতে পায় নি।

কাজের জন্য দিনের পর দিন এসেছে তাদের বাড়িতে, কারখানা সম্পর্কে কথাবার্তা হয়েছে, সহজে তাকায়নি স্বর্ণেন্দু তার মুখের দিকে।

মুখ নীচু করেই কথাবার্তা বলেছে কিন্তু যখন চোখ তুলে তার দিকে তাকিয়েছে—দৃষ্টি পড়ে নি, কোনদিন দৃষ্টি পড়ে নি তার, কেন পড়ে নি—

বাইরে পদশব্দ পাওয়া গেল।

পরমুহূর্তেই স্বর্ণেন্দু এসে ঘরে ঢুকল।

আপনি—

কেন আসতে পারি না! বলে কুন্তী।

না, না, তা কেন, কিন্তু—

স্বর্ণেন্দুবাবু—

বলুন!

আজ কিন্তু একটা অনুরোধ নিয়ে এসেছি।

অনুরোধ।

হ্যাঁ, খালি হাতে ফিরিয়ে দেবেন না তো?

স্বর্ণেন্দু মৃদু হাসে, তারপর বলে, বলুন।

আপনার কাজ ছাড়া চলবে না।

কিন্তু—

বললাম তো, আমার অনুরোধ, রাখবেন না আমার অনুরোধটুকু?

স্বর্ণেন্দু চুপ করে মাথা নীচু করে দাঁড়িয়ে থাকে।

ডাঃ ভাদুড়ীকেও আমি অনুরোধ করেছি, তিনিও ছাড়বেন না চাকরি বলেছেন, তাছাড়া যে কারণে আপনাদের অসম্মান হয়েছিল সে কারণ তো আর থাকল না।

কিন্তু।

না স্বর্ণেন্দুবাবু, আপনি না করতে পারবেন না। তাছাড়া আমার সব চাইতে বড় আশ্রয়টাই যে আমি হারিয়েছি আজ।

কুন্তী দেবী।

হ্যাঁ, বনমালী কাকা চলে গেছেন।

সে কি!

হ্যাঁ স্বর্ণেন্দুবাবু, কেউ আজ আর আমার পাশে নেই, আরো একটা কথা। আপনাকে তো বলিনি।

কি?

বাড়ি ঘর দোর ও অন্যান্য ব্যাপার তো সবই এতদিন বনমালী কাকা দেখছিলেন, এখন থেকে আমার কাকা দেখবেন।

কিন্তু।

জানি কি বলবেন আপনি, কিন্তু তাবেই বা আর কতদিন ঠেকিয়ে রাখি বলুন। যে সর্বক্ষণ দু'হাত বাড়িয়ে রয়েছে, তাছাড়া একটা সামান্য মানুষ আমি, কত যুদ্ধ করব একা একা বলুন তো।

বেশ, আজই আমি অফিসে যাব।

ঠিক তো।

হ্যাঁ।

আঃ, আপনি আমায় বাঁচালেন স্বর্ণেন্দুবাবু, আমি, আমি যে কি বলে আপনাকে ধন্যবাদ জানাব।

ঐ সময় স্বর্ণেন্দুর মা মমতাময়ী একটি কাঁচের ডিসে কিছু হালুয়া ও এক কাপ চা নিয়ে ঘরের মধ্যে এসে প্রবেশ করলেন।

এ কি, আপনি আবার কষ্ট করতে গেলেন কেন মা? তাড়াতাড়ি বলে ওঠে কুন্তী।

কষ্ট আবার কি মা, সামান্য এক কাপ চা।

স্বর্ণেন্দু বলে, কিন্তু মা, আমাদের বাড়ির ঐ চা কি উনি খেতে পারবেন?

কেন? মমতাময়ী ছেলের মুখের দিকে তাকান।

মমতাময়ী সত্যি কথা বলতে কি ছেলের কথাটা ঠিক বুঝতে পারেন নি, কারণ অতি সাধারণ বেশে কুন্তী এসেছিল।

সাধারণ সরু কালো পাড় একটি তাঁতের শাড়ি ও সাদামোটা একটি আদ্দির ব্লাউজ পরনে, হাতে এক গাছি করে সরু সোনার চুড়ি।

দোষ নেই মমতাময়ীর, ঐ সামান্য বেশে কুন্তীকে তিনি বুঝবেন কি করে।

সামান্য বেশে দেখে তুমি চিনতে পার নি মা, কিন্তু উনি কার মেয়ে জান? সহরের একজন বিশিষ্ট চিকিৎসক ডাঃ সতীনাথ চৌধুরীর মেয়ে।

কুন্তী অত্যন্ত বিব্রত বোধ করছিল। তাড়াতাড়ি এগিয়ে এসে মমতাময়ীর হাত থেকে প্লেটটা নিয়ে বলে, কি যে বলেন স্বর্ণেন্দুবাবু আপনি, দিন মা তাছাড়া সত্যিই আমার চায়ের পিপাসা পেয়েছে।

মমতাময়ী ততক্ষণে নামটা শুনে চিনতে পেরেছেন কুন্তীকে। বলেন, মানে যে ঔষধের কোম্পানীতে তুই চাকরি করতিস।

হ্যাঁ মা, সেই কোম্পানীরই ম্যানেজিং ডাইরেক্টার, খোদ মালিক।

স্বর্ণেন্দুবাবু, আপনি যদি এমনি করে আমাকে লজ্জা দেন—তারপরই মমতাময়ীর দিকে তাকিয়ে বলে কুন্তী, আচ্ছা মা, আপনিই বলুন তো, সেই কোম্পানীর উনিও তো এ্যাসিসটেন্ট ম্যানেজার, উনিই বা কিসে কম, কিন্তু মা, ওঁকে চা দিলেন না?

এই যে আনছি।

মমতাময়ী ঘর থেকে বের হয়ে গেলেন।

নির্মল কৌতুকে ও আনন্দে সকালটা যেন প্রসন্ন হয়ে উঠল।

এবং কুন্তী স্বর্ণেন্দুর কাছ থেকে যখন বিদায় নিয়ে বের হয়ে এল তখন মনটা তার কানায় কানায় ভরে উঠেছে যেন।

দুঃখের ও জ্বালার অনেক বাষ্প কয়েকদিন ধরে মনটা ভারাক্রান্ত করে তুলেছিল, মনটা যেন অনেকটা হালকা হয়ে যায়।

কুন্তীর বেশ মনে আছে।

শিশিরাংশু ও মানসীর একদিন বিয়ে গেল। এবং ওদের বিয়ের পর দিনই, নর্মদার মৃত্যু হল।

নর্মদার মৃত্যু সংবাদ পেয়ে সর্বাগ্রে স্বর্ণেন্দুই ছুটে এসেছিল, এসে কুন্তীর পাশে দাঁড়িয়েছিল।

এবং স্বর্ণেন্দু যদি কুন্তীর সেই চরম দুঃখের মুহূর্তে অমন করে সেদিন তার পাশটিতে এসে না দাঁড়াত কুন্তী আজও ভেবে পায় না সে কি করত।

বনমালী কাকা নেই, রতিনাথ কেবল নিরর্থক চেঁচামেচি করছে রতিনাথের স্ত্রী অনাবশ্যক গলায় জোর দিয়ে চীৎকার করে কাঁদছে, মানসীও বাড়িতে নেই।

কুন্তী যে কি করবে ভেবে পায় না।

কেমন যেন বিহ্বল বিভ্রান্ত হয়ে মার মৃত্যুশয্যার পাশটিতে বসে ছিল। কাঁদতেও বুঝি সে ভুলে গিয়েছিল।

স্বর্ণেন্দু সোজা ঘরের মধ্যে এসে প্রবেশ করে।

কুন্তী দেবী—

কুন্তী মুখ তুলে তাকাল।

চলুন, উঠুন, পাশের ঘরে চলুন।

স্বর্ণেন্দুই হাত ধরে সেদিন কুন্তীকে তুলেছিল।

॥ পনেরো ॥

পরবর্তীকালে একটা পত্রে কুন্তী লিখেছিল স্বর্ণেন্দুকে :

জান স্বর্ণেন্দু, তুমি সেদিন এসে আমার মায়ের মৃত্যুশয্যার পাশ থেকে হাত ধরে তুললে, আমার মনে হল, ভয় কি আমার, আর কাউকেই তো প্রয়োজন নেই আজ, তুমিই তো আছো। তুমি আমার আছো।

কানে কানে কে যেন আমায় বললে, কুন্তী, তোর ভয় নেই, স্বর্ণেন্দু তোর আছে।

তারপর কতদিন ভেবেছি, আমার জীবনের এত বড় একটা ব্যাপার কখনো আগে আমি উপলব্ধি করতে পারিনি কেন?

আমি এমনই অন্ধ যে এত বড় ভালবাসার সন্ধান পেলাম না। আচ্ছা, সত্যি করে বল তো, কবে থাকতে তুমি আমায় ভালবেসেছিলে আর আমার এমন কি সুকৃতি ছিল যে এত বড় ভালবাসা তুমি আমায় দিয়েছিলে?

এত বড় পুরস্কারের যোগ্য তো আমি নই।

ট্রেনটা একটু আগে একটা স্টেশনে থেমেছিল, আবার এখন চলেছে।

সীতা ঘুম ভেঙে উঠেছে।

কুন্তীর কোল ঘেঁষে বসে জানালা-পথে বাইরে তাকিয়ে আছে।

হঠাৎ কুন্তীর হাতটা ধরে টেনে সীতা বলে, দেখ, দেখ মা, তারের উপর বসে আছে লাল পাখীটা কি সুন্দর, যাঃ, উড়ে গেল, ঐ যে, কোথায় গেল মা পাখীটা।

হাওয়ায় এলোমেলো সীতার মাথার চুলগুলো ঠিক করে দিতে দিতে সস্নেহে বলে, বোধ হয় ওর বাসায়।

বাসায় ওর কে আছে মা? ওর মা আছে?

নিশ্চয়ই আছে।

আচ্ছা মা?

কি?

আমরা কোথায় যাচ্ছি?

কলকাতায়।

কলকাতায় বুঝি আমাদের বাসা?

হ্যাঁ।

তবে এতদিন বাসায় যাওনি কেন?

সত্যিই তো, যায়নি কেন?

সে তো তার নিজের বাড়ি, যাওয়ার তো কোন বাধাই ছিল না, আর আজও তো নেই। তার সেখানে আজও যাবার ও থাকবার সম্পূর্ণ অধিকার আছে। কেউ তাকে সেখানে যেতে বাধা দিতে পারে না, সাধ্য নেই কারো বাধা দেবার।

তাছাড়া সামান্য চাকরিই বা সে করছে কেন, আর আজ কলকাতায় কোথায় গিয়ে সীতাকে নিয়ে উঠবে ভেবে আকুল হচ্ছেই বা কেন?

আকুল তো সে নিজের জন্য নয়। সীতার জন্য।

সীতাকে কেন্দ্র করে যে প্রশ্নের কুৎসিত ঝড় উঠবে সেখানে সীতাকে নিয়ে গিয়ে পা ফেলার সঙ্গে সঙ্গেই, যে অপমানের কাদা সকলে মিলে তার ও সীতার গায়ে ছিটাবে, তা থেকে নিজেকে এবং সীতাকে বাঁচাবার জন্যই যে সে আর সেখানে ফিরে যেতে পারে না।

সীতার দায়িত্ব যে তার দায়িত্ব। সীতাকে যে সে গ্রহণ করেছে।

মানসীকে যে সে কথা দিয়েছে, সীতার গায়ে সে কোন কলঙ্কের দাগ লাগতে দেবে না।

হ্যাঁ, মানসীকে সেদিন সে কথা দিয়েছিল যে।

তা কি সে ভুলতে পারে। মনে পড়ছে। সবই মনে পড়ছে।

সাত মাস পরে হঠাৎ একদিন জরুরী তার এল লক্ষ্ণৌ থেকে।

শিগগিরী এস, মানসী।

তার পেয়েই ছুটে গিয়েছিল কুন্তী, এক মুহূর্তও আর দেরি করেনি। সে ভেবেছিল মানসী বুঝি অসুস্থ।

একটা টাঙ্গা নিয়ে অনেক ঘুরে ঘুরে তবে বাসাটা খুঁজে পেয়েছিল কুন্তী।

অনেকক্ষণ কড়া নাড়ার পর ঐ-দেশী একটা দাই এসে দরজাটা খুলে দিয়েছিল।

কাকে চাই মাঈজী, দাই জিজ্ঞাসা করে।

এখানে কি শিশিরাংশুবাবু থাকে?

দাই সে কথার জবাব না দিয়ে প্রশ্ন করে, মাঈজী কলকাতা থেকে আসছে কি না?

কুন্তী হাঁ বলায় দাই তখন তাকে দোতলায় নিয়ে যায়।

দোতলায় ছোট দুটো ঘর পাশাপাশি, সামান্যই আসবাবপত্র ঘরে। দাইয়ের নির্দেশে একটা ঘরের মধ্যে ঢুকে থমকে দাঁড়াল কুন্তী।

জানালাটার সামনে পিছন ফিরে দাঁড়িয়েছিল মানসী। দাই ঘরে ঢুকে ডাকে, মাঈজী।

কিরে দাই।

কথাটা বলে ফিরে তাকাতেই মানসীর সঙ্গে কুন্তীর চোখাচোখি হয় এবং মানসী মুহূর্তকাল কুন্তীর মুখের দিকে তাকিয়ে থেকেই ছুটে এসে দুহাতে উচ্ছল আনন্দে কুন্তীকে জড়িয়ে ধরে বলে, দিদিভাই!

কুন্তী দুহাতে ছোট বোনটিকে জড়িয়ে ধরে।

আমি জানতাম দিদিভাই তুমি আসবে, ও বলেছিল, আসবে না।

কে, শিশিরাংশু?

হ্যাঁ।

কি বলেছিল?

তুমি নাকি আসবে না, সেদিন কথা দিলেও তুমি কথা রাখবে না, আর আমি বলেছিলাম, নিশ্চয়ই তুমি আসবে, আসবে তুমি।

শিশিরাংশু কোথায়? তাকে দেখছি না।

সে তো এ সময় বাড়িতে থাকে না।

থাকে না?

না, সারাটা দিন কোথায় থাকে, অনেক রাত্রে আসে, মাঝে মাঝে তাও আসে না, রাতটুকু থাকে, তারপর ভোর হলেই চলে যায়।

কোথায়?

জানি না।

সে কি, তুই জানিস না সারাদিন সে কোথায় থাকে?

না।

কোথায় ও চাকরি করে হয়ত।

না—

তবে কি রিসার্চ করে?

না।

তার মানে কিছুই করে না নাকি।

মানসী মাথা নীচু করে থাকে।

কুন্তী বুঝতে পারে শিশিরাংশু সম্পর্কে মানসী আর বেশী কিছু বলতে চায় না। কি ভেবে কুন্তীও আর পীড়াপীড়ি করে না।

তা, হ্যাঁরে, কুন্তী অতঃপর বলে, তোর ছেলে না মেয়ে হল কিছুই তো আমায় জানালি না। কথা ছিল জানাবি, আমি তাকে এসে নিয়ে যাবো। তা না হয় নাই জানালি, নাই দিলি। কিন্তু দিদিভাই বুঝি এতই পর হয়ে গিয়েছে, এতই দূরে চলে গিয়েছে তোর সন্তানের জন্য আশীর্বাদটুকুও তার আর প্রয়োজন নেই?

সেই জন্যই তো তোমায় ডেকে পাঠিয়েছি দিদিভাই, মানসী বলে আশীর্বাদের কথা বলছ, আজ পৃথিবীতে খুকীর তোমার আশীর্বাদটুকুই যে একমাত্র সম্বল, সেই তো তার একমাত্র পরিচয়।

কথাগুলো বলতে বলতে মানসীর চোখের কোল দুটো জলে ভিজে ওঠে।

মানু।

চল পাশের ঘরে।

পাশের ঘরে দোলনায় শুয়ে ঘুমিয়ে ছিল খুকী।

এক গুচ্ছো যুঁই ফুল যেন।

বাঃ বাঃ, ভারী সুন্দর হয়েছে তো, প্রশংসমান দৃষ্টিতে খুকীর দিকে চেয়ে চেয়ে কুন্তী বলে, দেখেছিস, তোর মত ওর গালে একটা তিলও আছে, বাবার গালে ঠিক অমনি একটা তিল ছিল, মনে আছে তোর?

হ্যাঁ।

তুই সেই তিলটি পেয়েছিস, আর তোর মেয়েও পেয়েছে, বাবার মত দেখতে তুই হয়েছিলি ঠিক, মা তাই বলত, তুই খুব সৌভাগ্যবতী হবি, বলতে বলতে লাল লাল ফোলা ফোলা গাল দুটো খুকীর টিপে দেয় কুন্তী আদর জানিয়ে।

ঘুমের মধ্যেই মুখ ফোলায় খুকী।

দেখছিস, কেমন আবার গাল ফোলাচ্ছে, বলতে বলতে আবার খুকীর গাল টিপে দেয় কুন্তী।

খুকী এবারে ঠোঁট ফুলিয়ে কেঁদে ওঠে।

ওরে আমার সোনা, ওরে আমার মণি, ওরে সাতরাজার ধন, বুকে তুলে নিয়ে আদর করে কান্না থামায় কুন্তী।

কিন্তু তুই কি বল তো, আবার বলে কুন্তী, সংবাদটা দিবি তো, এখন কি দিয়ে ওর মুখ দেখি বল তো?

কুন্তীর কথায় কোন সাড়া দেয় না মানসী।

ওর চোখ দুটো কেবল ছল ছল করতে থাকে।

খুকীকে শান্ত করে দোলায় ঘুম পাড়িয়ে রেখে ওরা আবার পাশের ঘরে

ফরে আসে এবং তখনই কথাটা বলে মানসী।

দিদিভাই।

কিরে ?

খুকীকে তোমার হাতে তুলে দেবার জন্যই কিন্তু আমি তোমায় ডেকে এনেছি জরুরী তার করে।

মানসীর কথায় চকিতে ফিরে তাকায় কুন্তী বোনের মুখের দিকে।

হ্যাঁ, দিদিভাই, মনে আছে আমায় তুমি কথা দিয়েছিলে ওর সব ভার তুমি নেবে।

মানসী।

হ্যাঁ দিদিভাই, ওকে তুমি নাও, আমি, আমি হয়ত ওকে বাঁচাতে পারব না।

সত্যিই তুই সেইজন্য আমায় ডেকে পাঠিয়েছিস ? বিস্ময়ের যেন অবধি নেই কুন্তীর।

বিয়ের আগে ওদের অমনি একটা কথা হয়েছিল বটে, ও কথাও দিয়েছিল কিন্তু সেটাকেই ওরা আজ সত্যি করে তুলতে চায় নাকি ! নিজের সন্তানকে মা অন্যের হাতে তুলে দিতে চায়, তাই কি সম্ভব, না কেউ তা পারে !

মানসী আবার বলে, ও চায় না খুকী এখানে থাকুক, ও জন্মান অবধি একবারের জন্যও ওর মুখের দিকে তাকায় নি, আর বার বার বলেছে তোমাকে ডেকে এনে ওকে তোমার হাতে তুলে দেবার জন্য।

শিশিরের কথা ছেড়ে দে, কিন্তু তুই, তুই পারবি ওকে ছেড়ে থাকতে ?

পারব, পারব দিদিভাই, আমি সব পারব ! আমি সব পারি, সব পারি— আমি তো ওর মা নই, আমি ওর কেউ নই।

মানু।

ওকে তুমি নিয়ে যাও, না হলে হয়ত আক্রোশের বশে কোনদিন আমার অলক্ষ্যে ওর গলা টিপে মেরে রাখবে, জানতেও পারব না আমি।

মানু।

তোমার কাছে থাকলে ও বেঁচে থাকবে, নাই বা দেখলাম ওকে, তবুও জানব ও আমার বেঁচে আছে।

আসুক সে, আমি তার সঙ্গে কথা বলব।

না, না দিদিভাই, তার সঙ্গে তুমি কথা বলো না, অপমান করবে সে।

কিন্তু কেন, রাখবেই বা না কেন ওকে নিজের কাছে, ওর জন্মের জন্য কে দায়ী, সেই তো সব চাইতে বেশী দায়ী। তার সন্তানের প্রতি তার চাইতে আর কার বেশী কর্তব্য, সে বাপ।

বাপ ! বাপই বটে।

তাছাড়া, কুন্তী আবার বলে, এ কেনই বা হবে, মা বাপ বেঁচে থাকা সত্ত্বেও কোন অপরাধ নয় অথচ অনাথের মত অন্যর কাছে সে পালিত হবেই বা কেন ?

আমার গর্ভে জন্মেছে, সেই দুর্ভাগ্যে।

দুর্ভাগ্য, কিসের দুর্ভাগ্য, কুন্তী সরোষ কণ্ঠে বলে, এ অন্যায়,

জবরদস্তি, জুলুম, অবিচার।

জান দিদিভাই, ও কি বলে।

কি।

ও নাকি তার সন্তান নয়।

বলেছে ঐ কথা!

হ্যাঁ, যে মেয়ে বিয়ের আগে নিজেকে এক পুরুষের কাছে সমর্পণ করতে পারে, সে নাকি—

ছিঃ ছিঃ, বলিস না, আর বলিস না।

হয়ত কে জানে, আমাদের দুজনার মাঝখান থেকে ও চলে গেলে আবার ও আগের মত হবে. আমাদের দুজনার মধ্যে প্রতি মুহূর্তের এ অসহনীয় দূরত্বের অবসান ঘটবে, তুমি আর অমত কর না দিদিভাই, ওকে তুমি নিয়ে যাও।

কিন্তু ঐ দুধের শিশু, ওকে আমি কি করে মানুষ করি বল তো?

যদি বাঁচে ও তো তোমার কাছেই বাঁচবে।

শুধু তো তাই নয়, কি বলব আমি লোককে, কাকা কাকীমা, বাড়িসুদ্ধ সবাই যখন প্রশ্ন করবে, ও কে, কি জবাব দেব আমি বলতে পারিস?

বল, কুড়িয়ে পেয়েছে, রাস্তায় ওকে কুড়িয়ে পেয়েছে, এমন তো হয়, আর একান্তই যদি তোমার পক্ষে ওকে পালন করা বা ওকে তোমার কাছে রাখা না সম্ভব হয়, তবে ওকে কোন অনাথ আশ্রমে দিয়ে দিও।

মানু, আর্তকণ্ঠে চীৎকার করে ওঠে কুন্তী।

হ্যাঁ, যার বাপ মা থেকেও নেই, যে সন্তানের বাপ মার কাছে স্থান হল না—সে অনাথ আশ্রমে ছাড়া আর কোথায় যাবে, তাকে সেখানেই যে যেতে হবে।

ঠিক আছে, থাম তুই, আর বলতে হবে না, তোরা যখন ওকে রাখবিই না, আমিই ওকে নিয়ে যাব।

॥ ষোল ॥

সেদিন ব্যাপারটা ঠিক বুঝতে পারেনি কুন্তী।

মুখে বললেও সত্যি সত্যিই যে নিজের সন্তানকে কেন এবং কত বড় দুঃখে এবং নিজে কতখানি অসহায় বলে কুন্তীর হাতে তুলে দিতে বাধ্য হয়েছিল মানসী বুঝতে পারে নি।

বুঝতে পেরেছিল অনেক পরে।

শিশিরাংশুর কাছে মানসীর সমস্ত প্রয়োজন সেইদিনই ফুরিয়ে গিয়েছিল যেদিন যে মুহূর্তে তার দেহটাকে করায়ত্ত করতে পেরেছিল। এবং সেটা একেবারে নিঃশেষ হয়ে গিয়েছিল মানসীর দেহে মাতৃত্বের সম্ভাবনাটা স্পষ্ট হয়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে। আকর্ষণ পরিবর্তিত হয়েছিল বিতৃষ্ণায়।

এমনিই হয়, আকর্ষণ ও লোভের বস্তুটি করায়ত্ত হবার সঙ্গে সঙ্গেই আকর্ষণ ও লোভের মৃত্যু ঘটে ঐ সব ক্ষেত্রে স্বাভাবিক ভাবেই।

মানসী সেটা বুঝতে পারে নি, সরল নির্বোধ মানসীর পক্ষে সেটা বোঝা

সম্ভবও ছিল না তাছাড়া এক জাতীয় পুরুষ আছে সংসারে যাদের কোন কিছুকে পাওয়া বা করায়ত্ত করবার আগে যেমন আকাঙ্ক্ষা থাকে দুর্বার, তেমনি সেটা পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সব কিছুর হয় সমাপ্তি। শুধু সমাপ্তি নয় সেই সঙ্গে বিকর্ষণের বিতৃষ্ণা।

শিশিরাংশু ছিল সেই প্রকৃতির পুরুষ। একান্ত স্বার্থপর।

শিশিরাংশু মানসীকে বিয়েই হয়ত কোনদিন করত না যদি সেই সঙ্গে সম্পত্তি ও অর্থের স্থূল স্বার্থের ব্যাপারটা অমন স্পষ্ট ভাবে না জড়িয়ে থাকত। অতটা না হলেও কিছুটা আঁচ করতে পূর্বাহ্নে পেরেছিল বলেই কুন্তী ব্যাঙ্কের টাকাটার মোটা অংশ মানসীর নামে ফিক্সড ডিপোজিটে রেখে দিয়েছিল এবং মাসোহারার ব্যবস্থাটাও ছিল মানসীর নামেই।

ঐ দিন দ্বিপ্রহরেই খুকীকে নিয়ে লক্ষ্ণৌ থেকে ট্রেনে চেপে বসল কুন্তী, সঙ্গে এলো দাই, সরাবতিয়া।

কুন্তী বুঝতে পেরেছিল খুকীকে রাখা নিজের কাছে মানসীর পক্ষে সত্যিই সম্ভব নয়, অন্য ভয় যত না থাক প্রাণের ভয় ছিল মেয়েটার।

শিশিরাংশুকে সন্তানের ব্যাপারে সত্যিই আর যেন মানসী বিশ্বাস করতে পারছিল না। রীতিমত সে ভীত-শঙ্কিত হয়েছিল কি এক অমঙ্গল আশঙ্কায়।

সত্যিই যদি তেমন কিছু ঘটে তখন আপশোষের যে আর সীমা-পরিসীমা থাকবে না।

মা হয়েও তাই মানসী দুধের শিশুকে নিজের বুক থেকে ছিনিয়ে কাঁদতে কাঁদতে কুন্তীর হাতে তুলে দিয়েছিল। বলেছিল, ও যেন আজ থেকে তোমাকেই ওর মা বলে জানে দিদিভাই, কোনদিন, কোনদিন ওকে বল না তুমি ছাড়া ওর মা আর কেউ ছিল, তাহলে হয়ত ও কোনদিনই ওর মাকে ক্ষমা করতে পারবে না, মায়ের নামে ঘৃণায় মুখ ফিরিয়ে নেবে।

কুন্তী জবাবে বলেছিল, তবু বলা রইল মানু, মেয়েকে তোর যেদিন তুই চাইবি, নিয়ে আসবি, কোন সংকোচ করিস না, কোন কিন্তু করিস না।

না দিদিভাই, আর না। পারলাম না যাকে মা হয়েও নিজের বুকে ধরে রাখতে, আর এ জীবনে তার দিকে হাত বাড়াব না। আজ থেকে ওর মার মৃত্যু হল—কথাটা শেষ করতে পারে নি মানসী, ছুটে গিয়ে ঘরে খিল তুলে দিয়েছিল।

অনেক ডেকেছিল কুন্তী বন্ধ দরজার সামনে দাঁড়িয়ে, মানু, মানু, দরজাটা খোল ভাই, একবার।

দরজা তো খোলেই নি। সাড়াও দেয়নি আর মানসী।

তবে আমি চললাম।

তবু সাড়া নেই।

অতঃপর সিঁড়ি দিয়ে নেমে এসেছিল খুকীকে বুকে নিয়ে কুন্তী।

চলন্ত ট্রেনের ফার্স্টক্লাস কামরায় বসে আরো ভাল করে স্থির মস্তিষ্কে আগাগোড়া সমস্ত ব্যাপারটা নতুন করে ভাববার চেষ্টা করে কুন্তী।

ভেবে যেন সত্যিই কূল পায় না, নিয়ে তো এল খুকীকে মানসীর কাছ থেকে—অতঃপর কি ?

মেয়েটাকে যে নিয়ে এল, এখন সে কোথায় গিয়ে উঠবে, কলকাতার বাড়িতে, কিন্তু সেখানে যখন প্রশ্নের ঝড় উঠবে, তীক্ষ্ণ কটু সমালোচনা ও ব্যঙ্গোক্তিতে বিষ ঝরতে থাকবে তখন !

তখন কি করবে এই মেয়েটাকে নিয়ে।

তাছাড়া একটা দুধের শিশুকে মার বুক থেকে নিয়ে এসে তাকে বাঁচিয়ে রাখা কি এতই সোজা ?—প্রতিদিন, প্রতি মুহূর্তে হয়তো নতুন নতুন সমস্যা দেখা দেখে। সে সব সমস্যার সমাধান সে কেমন করে করবে !

ইতিমধ্যে মেয়েটা বোধহয় ক্ষিধের জন্য কাঁদতে শুরু করেছিল সরাবতিয়া তাকে বুকে নিয়ে বোতলে করে দুধ দিয়ে শান্ত করে।

চেয়ে চেয়ে দেখে কুন্তী।

ও তো বুঝতেও পারবে না কখন ওর ক্ষিধে পায, কিসে ওর ব্যথা কিসে ওর কষ্ট, কেন কাঁদছে, কিছুই তো বুঝতে পারবে না।

তাই তো, এ কি করল সে, মানসী না হয বলেইছিল—ও কেন তাকে নিয়ে আসতে গেল।

ট্রেন থামিয়ে চেন টেনে নেমে পড়বে কি। গিয়ে ফিরিয়ে দিয়ে বলবে, না ভাই, এ আমি পারব না, এ দায়িত্ব আমি নিতে পারব না।

বাঃ, কুন্তী চেয়ে দেখে আবার ঘুমিয়ে পড়েছে, খুকী। সত্যি কি সুন্দর, যেন একগুচ্ছ ফুল।

মানসী বলেছিল, ওর চোখে আমি হত্যার সংকল্প দেখেছি দিদিভাই—

না, না, কি বলছিস তুই, প্রতিবাদ জানিয়েছে কুন্তী।

হ্যাঁ, দিদি আমার থেকে তোমরা ওকে চেন না বেশী। শুধু খুকীকে কেন হয়ত আমাদের দুজনকেই ও এক সঙ্গে গলা টিপে মেরে রাখতে পারে। যেদিন থেকে ও আমার পেটে এসেছে কথাটা জানবার পর থেকেই ওর যে সে কি আক্রোশ—

ঐ সব কথা শুনেও শেষ পর্যন্ত সাহস হয নি আর কুন্তীর খুকীকে রেখে আসতে।

তাছাড়া কুন্তী, সেদিন মানসীর ওখানে গিয়ে তাকে অমনি অসুখী দেখে ভেবেছিল এবং মানসীর কথা শুনেও মনে হয়েছিল হয়ত ঐ খুকীর জন্যই মানসীর প্রতি শিশিরাংশুর অত আক্রোশ। ঐ খুকীকে দূরে নিয়ে গেলেই হয়ত সব আবার ঠিক হয়ে যাবে। ওদের পরস্পরের সম্পর্কটা সহজ হয়ে আসবে, সমস্ত সমস্যা মিটে যাবে তাই যদি হয় তো হোক, তাই খুকীকে শেষ পর্যন্ত সে সঙ্গে করেই নিয়ে এসেছিল।

কিন্তু খুকীকে সঙ্গে করে নিয়ে সে আর যাই করুক সে যে তাদের কলকাতার বাড়িতে গিয়ে উঠতে পারবে না তা সে জানত।

কলকাতার সেই বাড়িতে ফিরে যেতেও যেন আর মন চায় না কুন্তীর। বাড়িটা যেন ইদানীং একটা দুঃসহ যন্ত্রণার আবাস হয়ে উঠেছে।

অশান্তিকে এড়াবার জন্য একটু একটু করে সে বাড়ির সমস্ত অধিকার কাকা-কাকীমা ও তাদের সন্তানদের হাতে তুলে দিয়েছিল ইদানীং মায়ের মৃত্যুর পর এই কয় মাসে।

শুধু একটা ঘরে থাকা, ও দুবেলা দুটি খাওয়া!

গণেশ দুঃখ করেছে, বলেছে, ওদের তাড়িয়ে দাও দিদিমণি—কোথা থেকে এসে সব জুড়ে বসেছে, সব গ্রাস করে নিয়েছে!

কুন্তী বলেছে, ছিঃ, ওকথা বলিস না গণেশ, ওরা আমার কাকা-কাকীমা।

কিন্তু আমিও বলে রাখছি, এখনো ভাল চাও তো তাড়াও ও-গোষ্ঠী নচেৎ একদিন তোমাকেই এখান থেকে সরে যেতে হবে।

মনে মনে ভেবেছে কুন্তী ইদানীং কত সময়, সেই বোধহয় ভাল, নিত্য পীড়ন আর যন্ত্রণা থেকে দূরে সরে যাওয়াই বোধ করি ভাল, তবু তো শান্তি পাওয়া যাবে।

তাছাড়া ঘরের আশা আর নেই মনের কোথায়ও। শিশিরাংশু তার ঘরে আগুন জেবলে দিয়ে গিয়েছে, কামনার পুষ্পকলি আগুনে ঝলসে পুড়ে ছাই হয়ে গিয়েছে।

নাই বা ফেরা গেল আর কলকাতার বাড়িতে।

ওখানে অভিশাপ আছে, মায়ের এত সাধের তৈরী বাড়ি, কটা বছরই বা মা ভোগ করতে পারল, বাপ কোথায় চলে গেল, না, ওখানে আর সে যাবে না।

।। সতের ।।

কলকাতার বাড়িতে আর ফিরে গেল না কুন্তী।

জানালও না একমাত্র স্বর্ণেন্দুকে ছাড়া অন্য কাউকে কথাটা। কলকাতার হোটেলে দুদিন থেকে সরাবতিয়া ও খুকীকে নিয়ে বের হয়ে পড়ল কুন্তী, সোজা গিয়ে উঠল যশিডিতে।

যশিডিতে সতীনাথের অনেকদিন আগে একটা বাড়ি কেনা ছিল।

একটা আদিবাসী দরোয়ানের জিম্মায় বাড়িটা তালা দেওয়াই থাকত, তবে বাড়িতে থাকবার এক প্রস্থ বিছানা ও বাসনপত্র থেকে সুরু করে সব ব্যবস্থা ছিল।

সেখানে গিয়ে উঠে স্বর্ণেন্দুকে একটা চিঠি দিল।

স্বর্ণেন্দু,

যশিডিতে এসে উঠেছি, সঙ্গে আছে মানসীর নবজাত শিশুকন্যা, হতভাগিনী মেয়েটিকে ওর মা-বাপ রাখল না তাই নিয়ে এলাম সঙ্গে করে।

বাড়িতে উঠলাম না কলকাতায় নানা কুৎসিত প্রশ্নের জবাব দিতে হবে

বলে। তোমাকে তবু জানালাম, কারণ আমার টাকার প্রয়োজন, মাঝে মাঝে যদি তুমি এখানে কিছু কিছু টাকা পাঠিয়ে দাও বড় ভাল হয়।

আর একটা কথা, কেউ কোন কারণে যেন আমার এখানকার ঠিকানাটা না জানতে পারে।

ইতি কুন্তী।

তারপর দীর্ঘ দুমাস বাদে আবার চিঠি দিয়েছিল কুন্তী স্বর্ণেন্দুকে।

স্বর্ণেন্দু,

তোমার চিঠির জবাব দিইনি বলে রাগ করনি তো। রাগ করো না লক্ষ্মীটি। তুমি রাগ করলে আমি দাঁড়াই কোথা বল তো।

আমার আর দ্বিতীয় আশ্রয় কোথায় আর তুমি ছাড়া আমায় আর বুঝবেই বা কে? তুমি লিখেছ এ নাকি আমার ইচ্ছাকৃত পলায়ন, আমার ইচ্ছাকৃত অজ্ঞাতবাস। যার নাকি কোন প্রয়োজনই ছিল না। আমার নাকি কাউকে ভয় করবার কিছুই নেই।

না স্বর্ণেন্দু, পলায়ন নয়, তবে অজ্ঞাতবাস বলতে পার।

সত্যিই এ আমার মাতৃত্বের তপস্যার অজ্ঞাতবাস।

সীতা, জান ওর নাম রেখেছি আমি সীতা, হ্যাঁ, এ আমার সীতার মা হওয়ার সাধনার জন্য অজ্ঞাতবাস বলতে পার, কি আশ্চর্য দেখ।

প্রথম যখন ওকে নিয়ে আসি, আমার সে দ্বিধা আর দোটানার কথা তো তুমি সবই জান, কিন্তু আজ এই দুমাসেই যেন মনে হচ্ছে মানসী ওকে গর্ভে ধারণ করলেও মা ওর বুঝি সত্যিকারের আমিই। আমারই সন্তান হয়ে বুঝি ও পৃথিবীতে এসেছে। আমার ঘরে এসেছে।

শুধু খোলা সদর দুয়ার দিয়ে সকলের চোখের সামনে দিয়ে না এসে, গোপন খিড়কির ভেজানো দরজাটা ঠেলে এসে ঘরে প্রবেশ করেছে আমার।

ওর আর আমার মধ্যে পূর্ব জন্মের মা ও সন্তানের প্রতিশ্রুতি ছিল নিশ্চয়ই। এ আমাদের উভয়ের প্রতিশ্রুতি পালন।

ও আমারই সন্তান, আমি ওরই মা। তাইতেই বুঝি আমরা পরস্পর পরস্পরকে খুঁজে পেয়েছি।

শুধু একটা ব্যাপার, এই ভাবে আমি আর বসে থাকতে পারছি না, তাই চাকরির সন্ধান করছি—

ইতি কুন্তী।

তৃতীয় চিঠি কুন্তীর—আবার দশমাস পরে।

স্বর্ণেন্দু,

এত দিনের চেষ্টা আমার সফল হয়েছে, চাকরি পেয়েছি। তুমি লিখেছিলে এ চাকরির আমার কি দরকার ছিল, ছিল বৈকি, সীতা যদি তার দাদুর স্বীকৃতি পেত তার মা ও বাবার হাত থেকে তবে সে গ্রহণ

করতে পারত তার দাদু ডাঃ সতীনাথ চৌধুরীর অর্থ সাহায্য। কিন্তু তা তো সে পায়নি।

তাছাড়া সে একান্ত আমারই সন্তান যখন। আমারই দায়িত্ব যে তাকে মানুষ করে তোলা আমার নিজস্ব অর্থে, যে অর্থের ওপরে তার সম্পূর্ণ অধিকার আছে। তাই এ চাকরি নিলাম।

ওর জীবনের পশ্চাতের জন্ম-পরিচয়টুকু একেবারে মুছে যাক, নিশ্চিহ্ন হয়ে মুছে যাক। জীবনের খাতায় কোন ঋণ যেন সেখানে না থাকে ওর, আমি এই চাই। ও যেন আমার সন্তান, ওর মায়ের সন্তান বলে পরিচয় দিতে পারে এই আশীর্বাদই ওকে তুমি কর। কিন্তু সে তো হল ওর পরিচয়, ওর মায়েরও নিজস্ব যে একটা পরিচয়ের দরকার, তাই তোমার কাছে এবারে আমার ভিক্ষা।

আমার কপালে ও সিঁথিতে তোমার দেওয়া, আমার স্বামীর দেওয়া একটু সিঁদুর চাই। অনুমতি চেয়ে রাখলাম যাবার দিন কপালে এঁকে নেব।

খুব জুলুম করছি, না ?

আচ্ছা, তুমিই বল না, কুন্তী জুলুম তোমার ওপরে করবে না তো কার ওপরে করবে ?

তাছাড়া স্ত্রীর যত জুলুম তো স্বামীর কাছেই। একথাটা নিশ্চয়ই তুমি স্বীকার করবে।

ইতি কুন্তী

এক বছরের শিশুকে নিয়ে একা একাই এবারে সুদূর ইউ-পি-র এক অখ্যাত ছোট জায়গায় একটা স্কুলে গিয়ে চাকরি নিল কুন্তী।

সরাবতিয়াকে ইচ্ছা করেই সঙ্গে নিল না তাকে ছুটি দিয়ে দিল।

পিছনের কোন চিহ্নই সে রাখতে চায় না।

তারপরের পাঁচটা বছর।

ট্রেনটার গতি কমে আসছে। রেলওয়ে ইয়ার্ড ও অনেক লাইন পাশাপাশি, নিশ্চয়ই কোন বড় জংশন স্টেশনে গাড়িটা এল।

হ্যাঁ, কোন বড় জংশনই হবে, দূরে কেবিনটা দেখা যাচ্ছে। গাড়িটা কাল ভোর নাগাদ কলকাতায় পৌঁছাবে। সেবারের মত এবারেও কোন হোটেলেই গিয়ে উঠতে হবে।

ইতিমধ্যে সে মনে মনে ঠিক করে, এবারে সীতাকে কোন কনভেন্টে রেখে দেবে সে। হয়ত প্রথম কয়টা দিন কান্নাকাটি করবে, তারপর ধীরে ধীরে সবই ঠিক হয়ে যাবে।

কিন্তু তখনো কুন্তী জানত না কলকাতায় তার জন্য কি সংবাদ অপেক্ষা করছে, এবং জীবন তার কোথায় এসে দাঁড়িয়েছে আকস্মিক অচিন্তনীয় একটা মোড় নেওয়ার জন্য।

ঠিক ছয়টা বছর আগে যেমন আকস্মিক তার জীবনের সব কিছু ওলোট

পালোট হয়ে গিয়েছিল, তেমনি ঠিক আবার ঘটতে চলেছে একটা ঘটনা।

প্রথমে ভেবেছিল কুন্তী, কলকাতায় তার হোটেলের ঠিকানাটা স্বর্ণেন্দুকে জানাবে না পরে কি ভেবে যেন দিন চারেক বাদে কারখানায় ফোন করল।

কে ?

স্বর্ণেন্দু, আমি কুন্তী।

কুন্তী, কোথা থেকে।

কলকাতার হোটেল থেকে, তারপরই হোটেলের ঠিকানাটা ও ঘরের নম্বর জানায় কুন্তী। অন্য পক্ষ শুধু শুনে যায়, কোন সাড়া দেয় না।

আসবে নাকি ? কুন্তী শুধায়।

তুমি তো যেতে বললে না।

বড় লোভ হচ্ছে একটিবার তোমাকে আসতে বলি, কিন্তু—

কি।

সময় এখনো আসে নি, তাছাড়া আজকাল আমি সত্যিই বড় দুর্বল হয়ে গিয়েছি জান ?

দুর্বল !

হ্যাঁ, নিজের ওপরে আর বিশ্বাস নেই।

সে তোমার অহেতুক ভয়।

না, না, সত্যি, বিশ্বাস কর।

যাক শোন, একটা সংবাদ বোধহয় তোমাকে আমার দেওয়া কর্তব্য।

সংবাদ !

হ্যাঁ, মানসীর সংবাদ।

কি, কি হয়েছে মানসীর ? বেঁচে আছে তো।

তা এখনো আছে, তবে।

তবে বল, থামলে কেন ?

ফোনে কুন্তীর গলার স্বরটা উৎকণ্ঠায় যেন বুজে আসে।

চিঠি একটা লিখেছিল মানসী তোমাকে কারখানার ঠিকানায়, বাড়ির ঠিকানায় লিখতে বোধহয় সাহস হয় নি, তারপর জানি না কি বিচিত্র কারণে পোস্টাল ডিপার্টমেণ্টের অদৃশ্য এক চক্রজালে ফেঁসে দীর্ঘ দিন বাদে চিঠিটি আমার হাতে এসে মাত্র পরশুর আগের দিন পৌঁছায়।

কি চিঠি, পড়েছ সে চিঠিটা।

পড়েছি।

কি লিখেছে ?

বিশেষ কিছু না, কলকাতায় একটা ঠিকানা দিয়েছে, তোমাকে একটিবার গিয়ে তার সঙ্গে বিশেষ করে দেখা করতে জানিয়েছে।

আর কিছু লেখে নি ?

না, তবে গতকাল অনেক কষ্টে খুঁজে খুঁজে রাত্রে সেই ঠিকানা গিয়েছিলাম।

দেখা হয়েছে ?

হয়েছে, কুন্তী তোমাকে কথাটা আমার জানান উচিত তাই জানাচ্ছি—মানসী আজ মৃত্যুশয্যায়।

না, না, স্বর্ণেন্দু, কুন্তী কেঁদে ওঠে।

আমি তোমাকে ঠিকানা দিচ্ছি, পার তো অবিলম্বে তার সঙ্গে দেখা কর—অতঃপর স্বর্ণেন্দু ঠিকানাটা বলে দিল, বেলগাছিয়ার একটা অখ্যাত রাস্তা।

আমি যাব, আজই, এখুনি যাব।

আজই ?

হ্যাঁ, আজই।

কিন্তু এই রাত্রে।

তা হোক, এই রাত্রেই যাব, উঃ তোমায় যদি না ফোন করতাম, একটা কথা, শিশিরাংশুর সঙ্গে তোমার দেখা হয়েছিল ?

না।

সে ওখানেই আছে তো, না।

তাও জানি না।

॥ আঠার ॥

সেই রাত্রেই একটা ট্যাক্সি নিয়ে ঘুরতে ঘুরতে একসময় অনেক কষ্টে খুঁজে বের করে বাসাটা কুন্তী।

মিথ্যে বলে নি স্বর্ণেন্দু।

একটা অন্ধকার অপরিসর গলি।

ছোট একটা দোতলা বাড়ির উপরের দুখানা ঘর নিয়ে ছিল মানসীরা।

মানসীরা, মানে মানসী আর একটা বুড়ী ঝি, মনোর মা। অনেকক্ষণ দরজার কড়া নাড়াবার পর এক সময় মনোর মা এসে বকর বকর করতে করতে দরজাটা খুলে দিল।

চোখে অল্প দেখে মনোর মা, তার উপরে সিঁড়ির আলোটা এত অল্প যে ভাল করে সে দেখতেই পায় নি। ভেবেছিল বোধ হয় শিশিরাংশু।

বলে ওঠে, কেমন ধারা ব্যাপার বল তো তোমার বাপু, দুদিন পরে সময় হল, এদিকে মেয়েটা যে মরে।

আমি তোমার বাবু নই, কুন্তী বলে।

ও মা, আমি ভাবনু বুঝি বাবু, তা কে গা বাছা তুমি ?

আমাকে তো তুমি চিনবে না, তা এটাই কি শিশিরবাবুর বাসা ?

হ্যাঁ, বাবুর নাম তো তাই শুনেছি।

তোমার বাবু বুঝি দুদিন আসে না ?

সে গেরোর ফেরের কথা বল কেন বাছা, কেমন ধারা লোক বুঝি না, বৌটা মরছে আর তেনার দুদিন ধরে দেখা নেই। সেই যে দুদিন আগে এখুনি আসছি মনোর মা বলে বেইরে গেল, আর দেখা নেই তারপর।

বাড়িতে আর কে আছে।

মরবার জন্য ধুঁকছে বৌটা আর আমি—আর কে থাকবে ?

তোমার মা কোন ঘরে ?

উপরে—তা তুমি বাছা কে বললে না তো—

আমি তোমার মায়ের বোন।

বোন !

হ্যাঁ, মায়ের পেটের বোন।

ও, তা হলে তুমিই, তোমার জন্যই বোধ হয় এখনো প্রাণটা বের হয় নি, এলেই যদি বাছা তা এত দেরি করে এলে।

ছোট একটি ঘর।

অল্প শক্তির টিমটিমে একটা ইলেকট্রিক বাতি জ্বলছে ঘরে, তারই আলোয় স্বল্পালোকিত ঘরটা।

একটা পালঙ্কের উপর মলিন শয্যায় শুয়ে ছিল পাশ ফিরে মানসী।

থমকে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল ঘরে পা দিয়েই কুন্তী। মুখ থেকে তার কোন শব্দ বের হয় না।

মনোর মাই ডাকে, মা।

কেন মনোর মা, ক্লান্ত ক্ষীণ কণ্ঠে সাড়া দেয় মানসী।

দেখ গো চেয়ে কে এসেছে।

কে রে ?

ফিরে তাকাল মানসী।

এ কি, কে শুয়ে ঐ শয্যায়, মানসী—না তার কংকাল। শুধুমাত্র হাত কখানির উপর চামড়ার আবরণটা।

কালি-ঢালা কোটরাগত চোখ।

কে ?

মানু।

কে, দিদিভাই, এসেছ দিদিভাই, সত্যিই তুমি এসেছ !

চোখের জল রোধ করতে পারে না কুন্তী। সযত্নে মাথাটা কোলের উপর তুলে নিয়ে বলে, আমাকে আগে জানাস নি কেন মানু ?

আগে জানালেই কি তুমি আমাকে আমার দুর্ভাগ্য থেকে রক্ষা করতে পারতে দিদিভাই ?

মানু।

কাঁদছ কেন দিদিভাই—এ যে আমার পাপের ফল।

পাপের ফল।

তা বৈ কি, কিন্তু সেদিন কেন তুমি আমায় বল নি যে ওকে তুমি ভালবাসতে।

মানু—চাপা কণ্ঠে যেন চীৎকার করে ওঠে কুন্তী।

হ্যাঁ দিদিভাই, কেন ঐ কথাটা আমায় জানতে দাও নি, তবে তো এমনি

করে তিনটে জীবন নষ্ট হয়ে যেত না।

কে—কে তোকে ঐ কথা বলেছে, ঐ শিশিরাংশু নিশ্চয়ই।

আর কে বলবে বল ?

কিন্তু তুই বিশ্বাস কর বোন, ও একেবারে মিথ্যা, অতবড় মিথ্যা আর হতে পারে না, ওর সমস্ত মিথ্যার মত ওটাও একটা মিথ্যা।

দিদিভাই।

হ্যাঁ, তোর কাছে আজ আর কিছু গোপন করব না, তুই যেমন একদিন ওকে দেখে ভুলেছিলি, আমিও ঠিক তেমনি ভুলেছিলাম। কিন্তু বিশ্বাস কর সে ভুল ভাঙতে আমার বেশী দেরি হয় নি আর তাইতেই সেদিন তোকে আমি বারবার ফেরাবার চেষ্টা করেছিলাম, কিন্তু তুই বুঝলি না।

কিন্তু—

আজ বুঝতে পারছি তোকে সেদিন সব কথা আমার স্পষ্ট করে বলাই উচিত ছিল, তবে হয়ত আজকের এই সর্বনাশটাকে তুই-আমি দুজনেই এড়াতে পারতাম, কিন্তু এভাবে তোকে আমি মরতে দেব না, কিছুতেই না, আমি এখুনি ডাক্তার ডেকে নিয়ে আসছি। যাবার জন্য বোধহয় উঠে দাঁড়ায় কুন্তী।

কিন্তু তার যাওয়া হল না, হঠাৎ ঐ সময় একটা কাশি উঠল মানসীর।

কাশতে কাশতে গলা দিয়ে থকথকে রক্ত খানিকটা বের হয়ে এল।

দিদিভাই, সময় আমার ফুরিয়েছে, মিথ্যে আর তুমি ছুটোছুটি কেন করবে, ক্লান্ত কণ্ঠে হাঁপাতে হাঁপাতে বলে মানসী, তার চাইতে আমার পাশে তুমি বস, কতদিন তোমায় দেখি না।

আসছি, আমি এখুনি আসছি ভাই, ঝড়ের মতই যেন ছুটে বের হয়ে গেল কুন্তী।

ট্যাক্সিটা ছাড়ে নি কুন্তী, দাঁড়িয়েই ছিল, সেই ট্যাক্সিতে চেপে গিয়েই একটা ডাক্তারখানা থেকে ডাঃ মুখার্জীকে ফোন করল।

কে ?

ডাঃ মুখার্জী, আমি কুন্তী, ডাঃ চৌধুরীর মেয়ে।

কুন্তী, কোথা থেকে বলছ ?

বেলগাছিয়ার এক ডাক্তারখানা থেকে, আপনাকে কাকা একবার এখুনি আসতে হবে।

কোথায় ?

ঠিকানাটা বলে দিল কুন্তী।

ঠিক আছে, ডাঃ মুখার্জী বললেন, আমি ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই আসছি।

ডাঃ মুখার্জী এসে পরীক্ষা করে মানসীকে, কুন্তীকে ঘরের বাইরে ডেকে নিয়ে গেলেন।

আমি সত্যিই দুঃখিত মা।

মুখার্জী কাকা—

দুটো লাংসয়ের কিছুই আর অবশিষ্ট নেই মা, একেবারে ঝাঁঝরা,

ক্যাভিটিতে একেবারে ভর্তি—it is too late মা—too late—

কোন আশাই কি নেই।

না মা, কোন আশাই নেই, অথচ এ রোগে আজ কি কেউ আর মরে, স্পষ্ট বুঝতে পারছি তেমন কোন চিকিৎসাই ওর হয় নি—most neglected case। কিন্তু এমনটা কি করে হল সেটাই বুঝে উঠতে পারছি না।

ডাঃ মুখার্জী অতঃপর সামান্য কিছু রোগ উপশমের মত চিকিৎসার ব্যবস্থা করে বার বার দুঃখ প্রকাশ করতে করতে বিদায় নিয়ে চলে গেলেন।

কুন্তী চুপ করে তারপরও কিছুক্ষণ বাইরের বারান্দায় অন্ধকারে দাঁড়িয়ে থাকে। অন্ধকার আকাশের একটা ভগ্নাংশ বারান্দা থেকে চোখে পড়ে।

কিছু তারাও দেখা যায়।

সামনের খোলা ছাদটার ওদিকে একটা নারকেল গাছ, তার সরু সরু দীর্ঘ পাতাগুলো যেন দুলে দুলে সিপ্ সিপ্ শব্দ করে দীর্ঘশ্বাস মোচন করছে।

বাবা মানুর ভার তুমি একদিন আমার হাতে তুলে দিয়ে গিয়েছিলে কিন্তু পারি নি আমি আমার কর্তব্য পালন করতে।

মানসী চলে যাবার জন্য পা বাড়িয়েছে, ওকে ধরে রাখতে পারলাম না।

দিদিভাই।—

ক্ষীণ কণ্ঠে ডাক শোনা গেল। মানসী ডাকছে ওকে।

কুন্তী গিয়ে ঘরে ঢুকল।

ডাঃ মুখার্জী বলে গেলেন তো কোন আশাই নেই, ম্লান বিষণ্ণ কণ্ঠে বলে মানসী, আমি তো জানতামই, মিথ্যে তুমি দৌড়াদৌড়ি কবলে। এস, ওই চেয়ারটায় এসে বস—

কুন্তী শয্যার উপর এসে বসতে উদ্যত হতেই বাধা দিয়ে তাড়াতাড়ি মানসী বলে, না, বিছানায় বস না তুমি, শুনেছি আমি একটু আগে, ডাঃ মুখার্জী কি বলছিলেন, তুমি ঐ চেয়ারটায় বসো—

কুন্তী কিন্তু নিষেধ মানে না, ওরই পাশে শয্যায় বসে। ওর মাথায় হাতটা রাখে।

আমাকে সত্যি কথাটা বল মানু, ও কি তোর আজ পর্যন্ত কোন চিকিৎসাই করেনি?

করবে না কেন, করেছে তো, মধ্যে মধ্যে হোমিওপ্যাথিক ওষুধ এনে দিয়েছে, কিন্তু যার সারবার নয়, তার কি কোন ওষুধে কোন কাজ হয়, তুমিই বল, না হলে হোমিওপ্যাথিতে তো কত জনার সারে—

কোন বড় ডাক্তারকে ডাকেনি?

কি করবে বড় ডাক্তার।

তোর নামে মাসোহারা আসে না?

হ্যাঁ আসে তো।

আর তোর ব্যাঙ্কের টাকা?

সে তো কবে শেষ হয়ে গিয়েছে, কি একটা বড় রিসার্চ করছে তাতেই সব

গেছে, ও কি বলে জান দিদিভাই, রিসার্চটা সাকসেসফুল হলে সেটা হবে যুগান্তকারী, সারা পৃথিবীর লোক বিস্ময়ে চেয়ে থাকবে—

তাহলে সেই রিসার্চ নিয়েই সে ব্যস্ত ?

হ্যাঁ, মনোর মা তো বোঝে না, দিন রাত খিট খিট করে।

কোথায় সে রিসার্চ করে, জানিস কিছু ?

শুনেছি টালিগঞ্জে কোথায়।

ঠিকানাটা জানিস না ?

ফোন নাম্বারটা জানি, বলে রেখেছিল খুব প্রয়োজন হলে ডাকতে।

ফোন নাম্বারটা বলে দেয় মানসী।

কুন্তী আবার শুধায়, লক্ষ্ণৌ থেকে কবে চলে এলি ?

তা বছর দুয়েক হবে, ও থাকত কলকাতায় রিসার্চ নিয়ে ব্যস্ত আর আমি একা একা লক্ষ্ণৌতে নিত্য রোগে ভুগি, তাই তো নিয়ে এল আমায়।

কত দিন তোর এমনি অসুখ !

তা বছর তিনেক তো হবেই, তারপরই একটু কেমন ক্লান্ত কণ্ঠে টেনে টেনে ডাকে, দিদিভাই।

কি রে—

এখন, মানে বলেছিলাম ছয় বছরের তো হল, না ?

সীতা তো, হ্যাঁ।

সীতা বুঝি নাম রেখেছ ?

হ্যাঁ—

বেশ নাম, আমার জনমদুঃখিনী সীতা।

নিয়ে আসব, তাকে দেখবি ?

ইচ্ছা করে, খুব ইচ্ছা করে কিন্তু, না থাক, এ যা ছোঁয়াচে রোগ, তা ছাড়া আমার নিঃশ্বাসে বিষ আছে, যেখানে আছে সেখানে সে আমি জানি সুখেই আছে।

মানু।

দিদিভাই।

আমি এখুনি যাব আর আসব, ট্যাক্সি আমার দাঁড় করানই আছে।

কিন্তু দিদিভাই।

কিছু হবে না, আমি নিয়ে আসছি তাকে, তাছাড়া কটা ওষুধও আনতে হবে।

কুন্তী তাড়াতাড়ি বের হয়ে গেল, এবং মনোর মাকে বলে গেল সামনে থাকতে।

॥ উনিশ ॥

হোটেলের ঘরে ঘুমিয়ে পড়েছিল সীতা।

সীতা, সীতা, মেয়েকে গায়ে হাত দিয়ে ডাকে কুন্তী।

কুন্তীর ডাকে ঘুম ঘুম চোখে তাকায় সীতা, মামণি।

চল, এখুনি এক জায়গায় আমরা যাব ?

কোথায় মামণি ?

সে একজনের কাছে, সে জান তোমাকে খুব ভালবাসে, মেয়েকে জামা পরাতে পরাতে কুন্তী বলে।

কে, মামণি সে ?

সে—সে—আমি যেমন, ঠিক তেমনি একজন, শোন, তাকে তুমি মা বলে ডাকবে, বুঝেছ ?

মা বলে ?

হ্যাঁ—

কেন মামণি ?

বাঃ, তার তো কেউ নেই।

কেউ নেই বুঝি ?

না, তাই তুমি তাকে মা বলে ডাকলে তার কত আনন্দ হবে বল তো ! ডাকবে তো ?

ডাকব—

লক্ষ্মী মেয়ে তুমি আমার।

কুন্তী যখন সীতাকে নিয়ে মানসীর বাসায় পেঁছাল মানসীর অবস্থা তখন হঠাৎ আরো খারাপ হয়ে পড়েছে, আরো বার দুই ইতিমধ্যে রক্ত বমন করেছে কাশতে কাশতে। জ্বরে গা পুড়ে যাচ্ছে, চোখ মেলতে পারছে না পর্যন্ত।

ডাঃ মুখার্জীর প্রেসক্রিপশন মত ওষুধগুলো কিনেই এনেছিল সঙ্গে করে পথের মাঝে গাড়ি থামিয়ে কুন্তী।

ঘরে ঢুকে কুন্তী ডাকে, মানু—

কে, দিদিভাই, চোখ মেলে তাকায় মানসী।

তাড়াতাড়ি এক দাগ ওষুধ খাইয়ে দেয় কুন্তী মানসীকে।

কেন মিথ্যে আর ওষুধ খাওয়াচ্ছ দিদিভাই, বলতে বলতে এতক্ষণে কুন্তীর পাশে দাঁড়ান সীতার দিকে বুঝি মানসীর নজর পড়ে।

কে, কে, দিদিভাই।

ওই তো সীতা ?

সীতা, কিন্তু চোখের দৃষ্টি আমার ঝাপসা হয়ে আসছে যে।

কুন্তী বলে সীতাকে, সীতা যাও সামনে।

সীতা আরো সামনে যায় মানসীর।

না, না, মানসী বলে, আর কাছে এস না, সীতা।

বলুন মা ?

মা, মা, সীতা।

মা—

না মা, আমি তো তোমার মা নই, আ—আমি তো, তো—মার কেউ নই—কে-উ-ন-ই-সু-সু-খে থা—শেষ হয় না কথাটা, জড়িয়ে যায়, আবার একটা কাশি তারপরই খানিকটা রক্ত।

মাথাটা টলে পড়ে বালিশের উপর।

চীৎকার করে উঠে কুন্তী, মানু।

সীতা ডাকে, মা—

সীতাকে বুকের ওপরে টেনে নিয়ে কেঁদে ওঠে কুন্তী, ও আর সাড়া দেবে না সীতা, ও আর সাড়া দেবে না।

পাড়ার লোকদের সাহায্যেই কুন্তী শেষ ব্যবস্থা করে মানসীর এবং বেলা নয়টা নাগাদ ক্রিমেটোরিয়াম থেকে ফিরে আসে সব শেষ করে হোটেলে।

শিশিরাংশুকে খবর দেয় নি কুন্তী।

খবর তো আর নয়, শেষবারের মত দেখা করে একটা শেষ বোঝাপড়া শুধু।

শেষ বোঝাপড়া।

বুকের মধ্যে আক্রোশের একটা অগ্নি-দহন চলেছে যেন।

শিশিরাংশু, আমি তোমায় নিষ্কৃতি দেব না। আমি এত সহজে তোমায় ছেড়ে দেব না, তুমি শুধু মানসীকেই হত্যা করনি, আমাদের সুখের সংসারে তুমি আগুন ধরিয়ে দিয়েছ।

মানসীকে তুমি হত্যা করেছ, সেজন্য আদালতে যাব না আমি. আমিই করব তোমার, বিচার।

ফোন গাইড দেখে ফোন নাম্বারটা মিলিয়ে শিশিরাংশুর টালিগঞ্জের ঠিকানাটা খুঁজে বের করতে খুব একটা কষ্ট হয় নি কুন্তীর।

সে ঠিক খুঁজে বের করে, মুর এ্যাভিনু।

তারপর রাত আটটা নাগাদ হোটেল থেকে বের হয়ে মুর এ্যাভিনুর নির্দিষ্ট ঠিকানায় এসে পৌঁছাল।

জায়গাটা নতুন ডেভালপ হয়েছে, রাস্তাটা এখনও পাকা হয় নি।

নতুন নতুন সব বাড়ি, বেশ ফাঁকায় ফাঁকায় বাড়িগুলো পরস্পর থেকে।

একটা দোতলা বাড়ির সামনে নম্বর মিলিয়ে ট্যাক্সি থেকে নামল কুন্তী।

উপর থেকে সেতারের আওয়াজ আসছে না।

কড়া নাড়তে হল না বা বেল টিপতে হল না, দরজার সামনেই একজন হিন্দুস্থানী দরোয়ান বসেছিল। মেয়ে মানুষ দেখে এবং বাবুর আত্মীয় শুনে পথ ছেড়ে দেয়।

সেতারের আওয়াজ শোনা যায়।

সিঁড়ি দিয়ে উপরে ওঠে কুন্তী। সামনেই একটা বড় ঘর দোতলায়, খোলা দরজা-পথে আলোর আভাস ও সেতারের আলাপ শোনা যায়।

সোজা গিয়ে কুন্তী ঘরে ঢুকল।

একটা সোফায় বসে শিশিরাংশু, পরনে পায়জামা ও পাঞ্জাবী, হাতে সুরার পাত্র আর সামনে এক সুন্দরী তরুণী বসে সেতার বাজাচ্ছে।

শিশিরাংশু।

কুন্তীর ডাকে চমকে মুখ তুলে তাকাল শিশিরাংশু, কে।

চিনতে পারছ না বোধ হয় ?

তরুণীর হাতের সেতার তখন থেমে গিয়েছে, সে সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়িয়েছে সেতারটা রেখে।

আরে what a surprise কুন্তী চৌধুরী না ?

হ্যাঁ, কুন্তী চৌধুরী।

শান্ত গলায় জবাব দেয় কুন্তী।

সুস্বাগতম, সুস্বাগতম welcome দেবী welcome দাঁড়িয়ে কেন, এস—বস, স্বপ্না if you don't mind একটু পাশের ঘরে যাও।

পাশের তরুণীকে লক্ষ্য করে বলে শিশিরাংশু। স্বপ্না ঘর থেকে বের হয়ে যায়।

শিশিরাংশু, আমি তোমার কাছ থেকে তোমার জবাবটা জানতে এসেছি—এবারে বলে কুন্তী।

জবাব ! প্রশ্ন করে নেশারক্তিম চোখে তাকাল শিশিরাংশু কুন্তীর দিকে।

হ্যাঁ।

কিসের জবাব বল তো কুন্তী দেবী, গলার স্বরটা যেন একটু জড়ানো শিশিরাংশুর।

মানসীকে তুমি।

আজ আবার মানসীকে কেন সখী। She is dead. dead to me, সঙ্গে সঙ্গে বলে ওঠে শিশিরাংশু।

তা কি আর জানি না, তাকে মেরে তারই পয়সায়, কোথায় মানসী বল ?

মানসী !

হ্যাঁ, হ্যাঁ মানসী, কোথায় সে বল ?

কেন তুমি জান না ? তুমিই তো তার বাচ্চাটাকে নিয়ে এলে আর সে দিবারাত্র মেয়েটার কথা ভেবে ভেবে শয্যাশায়ী হয়ে পড়ল।

তাই বুঝি !

হ্যাঁ, তারপর একদিন মরে গেল। কেন আমি তো তোমায় চিঠি দিয়েছিলাম, পাও নি ?

পেয়েছি বৈ কি !

পেয়েছ ?

হ্যাঁ. সেই চিঠি পেয়েই তো এসেছি।

চিঠি পেয়ে এসেছ, কেমন যেন হঠাৎ থমকে যায় শিশিরাংশু। চেয়ে থাকে কুন্তীর মুখের দিকে।

হ্যাঁ. তবে তোমার নয় মানসীর, কুন্তী কথাটা শেষ করে।

মানসীর চিঠি, সে তোমায় চিঠি লিখেছিল বুঝি ?

হ্যাঁ, আর তার মৃত্যুর কারণ যে তুমি, শেষ মুহূর্তে সেই জবানবন্দী সে দিয়ে গিয়েছে, লিখিত জবানবন্দী।

আর কিছু সে দিয়ে যায় নি ?

দিয়ে গিয়েছে বৈ কি, এবং এখান থেকে সোজা থানায় গিয়ে যখন সে

জবানবন্দী পেশ করে বলব you তুমি আমার বোন মানসীকে হত্যা করেছ you killed her।

হঠাৎ উঠে দাঁড়ায় শিশিরাংশু, এবং কুন্তীর দিকে এগুতে এগুতে বলে, মানসীর কথা আজ যেতে দাও কুন্তী, if she is really dead, let her die বিশ্বাস কর, তাকে আমি কোনদিন ভালবাসি নি।

থাম—

হ্যাঁ, বিশ্বাস কর, আমার মন জুড়ে তুমিই ছিলে, আজও আছ, I just played, played with her a nice little game কি বলব একটি আস্ত sentimental fool তোমার ঐ মানসী, তাই যখন হাতের মুঠোর মধ্যে পেলাম, দুদিন একটু শুধু ভোগ করেছিলাম মাত্র তার বেশী কিছু না।

তার বেশী কিছু নয়, না, তাই একটা নিরপরাধ মেয়ের জীবনকে নিয়ে ছিনিমিনি খেলে।

চিরকাল সব দেশে, সর্বত্র, তারাই তো victim হয়, তোমার মত একজন বুদ্ধিমতী মেয়ে এতে অমন করে আশ্চর্য হচ্ছ কেন বল তো? ওসব কথা যেতে দাও, আজ তুমি এতদিন পরে এসেছ আমার ঘরে সেইটাই একমাত্র কথা হোক Let us celebrate that অত দূরে দূরে দাঁড়িয়ে কেন, এস, পাশে এসে বস, কথাগুলো বলতে বলতে এগিয়ে যায় শিশিরাংশু কুন্তীর দিকে।

আর ঠিক সেই মুহূর্তে নিজের হঠকারিতার কথাটা মনে পড়ে এবং ঘরের চারিদিকে তাকিয়ে বুকের ভেতরটা যেন কেঁপে ওঠে কুন্তীর।

এ সে কি করেছে? হঠাৎ এভাবে এখানে সে আসতে গেল কেন?

শিশিরাংশু সোজা এসে ততক্ষণে বেরুবার দরজাটার দিকে পিছন ফিরে ওর মুখোমুখি হয়ে দাঁড়ায়, বলে, চল, যা হয়ে গিয়েছে সে তো আর ফিরবে না। তুমিও কিছুটা ভুল করেছ, ঝোঁকের মাথায় আমি তো করেছিই, কিন্তু সে তো আমরা অনায়াসেই ভুলে যেতে পারি, এস।

কুন্তীর বুকের ভিতরটা তখন কাঁপতে সুরু করেছে, সে বেরুবার জন্য পা বাড়ায় দরজার দিকে কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে দরজাটা আড়াল করে শিশিরাংশু বলে ওঠে. সে কি এসেছ যখন, নিশ্চয়ই যাবার জন্য আসনি।

পথ ছাড় শিশিরাংশু।

তা কি হয় কুন্তী, আমার দীর্ঘ দিনের প্রতীক্ষার পর তুমি এলে।

শিশিরাংশু—

আর আমিই কি এ সুযোগ এমন করে হারাতে পারি, বলতে বলতে হাত বাড়ায় শিশিরাংশু ভীতত্রস্ত কুন্তীর দিকে।

কুন্তী পিছিয়ে যায়, আর সেই মুহূর্তে শিশিরাংশু ভিতর থেকে দরজাটা বন্ধ করে দেয়।

না, না—

ভয় কি, হাসে শিশিরাংশু, এস, অনেক তৃষ্ণা এই বুকের মধ্যে জমা হয়ে আছে।

কুন্তী যত পিছোয়, শিশিরাংশু ততো এগিয়ে যায়।

শিশিরাংশু লাফিয়ে কুন্তীর হাতটা ধরে ফেলে, আর ঠিক সেই মুহূর্তে কুন্তী ঝুঁকে পড়ে টেবিলের উপর থেকে Vat 69-এর বোতলটা তুলে নিয়ে শিশিরাংশুর মাথার উপরে সজোরে বসিয়ে দেয়।

অর্ধস্ফুট চিৎকার করে টলে পড়ে শিশিরাংশু।

মাথা কেটে একটা রক্তের ধারা সমস্ত মুখটাকে বীভৎস করে তোলে শিশিরাংশুর। সেই সঙ্গে একটা উন্মাদ আক্রোশে যেন মানুষটা হিংস্র একটা জন্তুতে পরিণত হয়।

বীভৎস সেই রক্তমাখা মুখে কয়েকটা মুহূর্ত চেয়ে থাকে শিশিরাংশু, তারপরই এগিয়ে গিয়ে ঘরের ড্রয়ার থেকে পিস্তলটা টেনে বের করে।

এগিয়ে আসছে শিশিরাংশু, পায়ে পায়ে এগিয়ে আসছে, ক্রমশঃ দুজনার মধ্যে ব্যবধানটা কমছে।

কন্তীর ঠিক মনে নেই, কুন্তী ঝাঁপিয়ে পড়েছিল উন্মাদিনীর মতই শেষ প্রতিরোধে শিশিরাংশুর উপরে এবং জাপটে ধরেছিল দু'হাতে তাকে।

তারপর একটা ধস্তাধস্তি, পিস্তল-সমেত শিশিরাংশুর হাতটা কামড়ে ধরেছিল কুন্তী, পিস্তলটা হাত থেকে মেঝেতে পড়ে যেতেই পাগলের মত ঝুঁকে পিস্তলটা তুলে নিয়ে সোজা গুলি চালিয়েছিল পরপর দুবার।

ধোঁয়া বারুদের গন্ধ, একটা আর্ত চিৎকার, আর রক্ত, উঃ, সে কি রক্ত।

মাথাটার মধ্যে কেমন যেন ঘুরে উঠেছিল কুন্তীর। সে টলে পড়ে যায়।

আর কিছু মনে নেই।

॥ কুড়ি ॥

বিচার হল কুন্তীর।

স্বপ্না সাক্ষী দিল, সে প্রত্যক্ষদর্শিনী, নিজের চোখে জানালা-পথে আনুপূর্বিক ঘটনাটা ঘটতে দেখেছে : পিস্তল দিয়ে হত্যা করেছে সে শিশিরাংশুকে সে রাত্রে।

কুন্তীও অস্বীকার করেনি।

হ্যাঁ, সে হত্যা করেছে শিশিরাংশুকে, তার একমাত্র বোন মানসীর অপমৃত্যুর প্রতিশোধ সে নাকি নিয়েছে, রক্তের বদলে সে রক্ত নিয়েছে—

সে বলেছে : হ্যাঁ, আমি হত্যা করেছি শিশিরাংশুকে, I killed him, দীর্ঘদিন ধরে তাকে আমি হত্যার স্বপ্ন দেখেছি, আমার প্রতিহিংসাকে আমি তৃপ্ত করেছি, now I am satisfied, আপনাদের বিচারে যা দণ্ড আমায় দিতে চান দিন।

স্বর্গেন্দুকে সে ডেকে পাঠিয়েছিল মাত্র একদিন।

পুলিশের হাতে ধরা দেবার পর তাকে হাজতে নিয়ে যাওয়া হল।

এত বড় যে একটা ব্যাপার ঘটে গিয়েছে সে রাত্রে স্বর্গেন্দু তার বিন্দুবিসর্গও জানতে পারেনি।

সকালে একবার স্বর্গেন্দু হোটেলে কুন্তীকে ফোন করেছিল।

কুন্তী যেন বলেছিল, বিশেষ একটা কাজ আছে ঐ দিন. স্বর্ণেন্দু যেন পরের দিন আসে হোটেলে। পরের দিন দুপুরে একা একা তার নিজস্ব স্টুডিওতে বসে একটা ছবি আঁকছিল এমন সময় থানা থেকে টেলিফোন এলো।

হ্যালো—

স্বর্ণেন্দুবাবু কথা বলছেন ?

হ্যাঁ—

একবার টালীগঞ্জ থানায় আসবেন, থানার O. C. কথা বলছি।

বলুন।

এখানে কুন্তীদেবী বসে আছেন, আপনাকে একবার এখুনি এখানে আসতে বলছেন।

কি ব্যাপার বলুন তো।

আসুন না একবার।

স্বর্ণেন্দু তখুনি বের হয়ে পড়ে থানার উদ্দেশ্যে, কিন্তু মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝতে পারে না।

হাজত থেকে কুন্তী তাকে ডেকে পাঠিয়েছে। কিন্তু কেন!

যে পুলিশ অফিসারটি স্বর্ণেন্দুকে সঙ্গে করে নিয়ে এসেছিল প্রহরীকে দরজা খুলে দিতে বলে তিনি স্বর্ণেন্দুকে ভিতরে যাবার জন্য ইঙ্গিত করলেন।

দিনের বেলাতেও টিমটিমে একটা ইলেকট্রিক আলোয় স্বল্পালোকিত ঘরটি। একটা চৌকির উপর স্তব্ধ হয়ে হাজত ঘরের মধ্যে বসে ছিল কুন্তী।

স্বর্ণেন্দুর পদশব্দে মুখ তুলে তাকাল।

স্বর্ণেন্দু থমকে দাঁড়ায় কুন্তীর প্রতি দৃষ্টি পড়তেই—

মাথার চুল বিস্রস্ত, সমস্ত মুখে একটা অসহ্য ক্লান্তির ছাপ। এক রাত্রেই যেন অনেক বছর বয়স পার হয়ে এসেছে কুন্তী।

এস স্বর্ণেন্দু, মৃদু কণ্ঠে কুন্তীই আহ্বান জানায়।

স্বর্ণেন্দু বোবা হয়ে দাঁড়িয়ে আছে, কোন কথা নেই তার মুখে। কুন্তী আবার বলে, তেমোকে ডেকে পাঠিয়েছি একটা গুরুদায়িত্ব তোমার কাঁধে তুলে দেব বলে, সীতা হোটেলে কাল রাত থেকে একা আছে, কান্নাকাটি সে করবে, তাকে তুমি তোমার কাছে আপাতত নিয়ে যেও, তারপর যেমন ভাল বোঝ তার একটা ব্যবস্থা করে দিও।

কুন্তী, অনেকক্ষণ পর মৃদু কণ্ঠে ডাকে স্বর্ণেন্দু।

বল।

আমি যে কিছুই বুঝতে পারছি না কুন্তী।

জান স্বর্ণেন্দু, মানসী মারা গিয়েছে।

মারা গিয়েছে ?

হ্যাঁ, পরশু গিয়েছিলাম রাত্রে তোমার কাছ থেকে ঠিকানা পেয়েই তাকে দেখতে। পরশু রাত্রেই কয়েকবার পরপর blood vomit করে সে মারা গেল।

ওঃ, কিন্তু কালও তুমি ফোনে কিছু বললে না।

না বলিনি। তবে, মানসীর সেই মৃত্যুর—কুন্তী আবার বলে সেই হত্যার প্রতিশোধ আমি নিয়েছি, ভগবান, ভগবানই আমায় সাহায্য করেছেন মানুর হত্যার প্রতিশোধ নিতে নচেৎ হয়ত—

কি, কী করেছ তুমি।

শিশিরাংশুকে আমি হত্যা করেছি।

কুন্তী, অর্ধস্ফুট আর্তনাদ যেন মনে হয় স্বর্ণেন্দুর কণ্ঠে ঐ ডাকটা।

হ্যাঁ স্বর্ণেন্দু, তোমাদের বিচার তো আমি জানি তাই নিজের হাতেই বিচারের ভার নিয়েছিলাম, আব আমার বোন দুঃখ নেই, ভাবনা নেই, লজ্জাও নেই।

সত্যি, সত্যিই তুমি—কথাটা শেষ করতে পারে না স্বর্ণেন্দু।

সত্যিই, তারপরই আবার বলে, মানসীর আত্মা নিশ্চয়ই তৃপ্ত হবে আমি জানি। তুমি আমার সীতাকে কিন্তু দেখ, আর একটা কথা।

বল।

আজ নয়, সীতা যেদিন বুঝতে শিখবে, বড় হবে, সেদিন—

কি!

সেদিন তাকে বলো তার মায়ের হত্যার প্রতিশোধ একজন নিয়েছে।

কিন্তু এ তুমি কেন করলে কুন্তী—

কেন করলাম, তুমি তা বুঝতে পারবে না স্বর্ণেন্দু, মেয়েমানুষের দুঃখটা মেয়েমানুষ ছাড়া তো কেউ বুঝতে পারে না। কত বড় আঘাতে মায়ের জাত হিংস্র হয়ে ওঠে, মানুষের বুকে গুলি চালায়, সে তুমি বুঝবে না।

বুঝি বা না বুঝি তোমাকে এমনিভাবে আমি শেষ হয়ে যেতে দেব না!

কি করবে, বড় বড় উকিল ব্যারিষ্টার দিয়ে আমাকে বাঁচাবার চেষ্টা করবে, কিন্তু তাতে করে সংসারের চোখে কি আমাকে তোমরা কেউ কলংকমুক্ত করতে পারবে? সংসাবের ঘৃণা থেকে কি আমাকে তোমরা কেউ রক্ষা করতে পারবে?

কুন্তী।

আর তাছাড়া, মনে মনে আমিও তাকে চরম দণ্ড দেবার জন্য, চরম প্রতিশোধ নেবার জন্যই প্রস্তুত হয়ে গিয়েছিলাম। আঃ আজ সত্যিই আমি তৃপ্ত, এমনি করে সত্যি সত্যি যে ব্যাপারটা শেষ পর্যন্ত মিটে যাবে বিশ্বাস করো স্বপ্নেও আমি সেদিন তা ভাবিনি।

ওসব আমি কিছু জানি না, কিন্তু এ হতে পারে না, হতে আমি দেব না।

কি হতে দেবে না স্বর্ণেন্দু।

এভাবে তোমাকে মিথ্যা কলংক মিথ্যা দণ্ড নিয়ে—

কে বললে মিথ্যা। এতটুকু মিথ্যাও এর মধ্যে কোথায়ও নেই।

না, এ হতে পারে না, এ হতে আমি কিছুতেই দেব না। আবার বলে স্বর্ণেন্দু।

ছিঃ। তুমি না দিলেও আমি কি পারি এতবড় লজ্জা এতবড় কলঙ্ক নিয়ে তুচ্ছ একটা আইনের জোরে মুক্তি পেয়ে তোমার পাশে গিয়ে ইহজীবনে আর দাঁড়াতে।

কুন্তী।

না স্বর্ণেন্দু, সেই ব্যাপারটা ঘটে যাবার পর থেকে আমার কি মনে হত জান, এর চাইতে ভাল বুঝি আর কিছু হতে পারত না। হওয়া সম্ভব ছিল না। যাও আর দেরি করো না। কাল রাত থেকে হোটেলে সীতা একা আছে।

স্বর্ণেন্দু তবু চেষ্টার ত্রুটি করে না।

কিন্তু স্বর্ণেন্দুর সকল চেষ্টাই ব্যর্থ হয়ে যায়।

কুন্তী যেমন হাজার অনুরোধেও তার সঙ্গে আর দেখা করে না তেমনি ধরা পড়ার পর প্রথম সে হত্যাপরাধকে স্বীকৃতি দিয়ে যে জবানবন্দী পুলিশের কাছে দিয়েছিল সে জবানবন্দীও আর প্রত্যাহার করে না সে।

সেই একই কথাঃ সে হত্যা করেছে, সম্পূর্ণ জ্ঞানে এবং ইচ্ছা করে শিশিরাংশুকে।

সে হত্যাকারিণী।

শেষ পর্যন্ত দীর্ঘ পনের বৎসরের জন্য কারাদণ্ড হল।

জজ জুরীদের সঙ্গে একমত হয়ে ঐ দন্ড দিলেন কুন্তী চৌধুরীকে।

সেদিনও স্বর্ণেন্দু চেষ্টা করেছিল শেষবারের মত একবার কুন্তীর সঙ্গে দেখা করতে কিন্তু কুন্তী দেখা করে নি।

প্রথমে কিছুদিন কুন্তী সেন্ট্রাল জেলে ছিল, সেখান থেকে তাকে পাঠান হল বহরমপুর জেলে।

॥ একুশ ॥

তারপর দেখতে দেখতে দিনের পর দিন, সপ্তাহ, মাস, বছর কেটে গিয়েছে। কুন্তী কারো কোন সংবাদ নেয় নি, কাউকে কোন সংবাদ দেয় নি, সে যেন নিজেকে একেবারে মুছে দিয়েছিল পৃথিবী থেকে।

একটার পর একটা চিঠি এসেছে স্বর্ণেন্দুর। কোন দিন সে চিঠিগুলোর একটিও খুলে পড়ে নি সে।

একটার পর একটা চিঠি জমা হয়েছে কেবল।

দেহ ভেঙ্গেছে, কপালে গালে বয়সের চিহ্ন, বলি-রেখা স্পষ্ট হতে স্পষ্টতর হয়েছে, মাথার চুল সব পেকে গিয়েছে।

সে যেন আর একটি মেয়ের ইতিহাস, আর একটি মেয়ের জীবন-কাহিনী।

কুন্তী নামটা পর্যন্ত তখন কারো আর বুঝি মনে নেই।

জেলের খাতায় নতুন নাম, নতুন পরিচয়। ১৯ নং কয়েদী।

জানানা ফাটকের ১৯ নং কয়েদী।

জেল কর্তৃপক্ষের কোন দুশ্চিন্তাই ছিল না কুন্তী সম্পর্কে।

কথা বলে না কারো সঙ্গে, কোন নালিশ নেই, অভিযোগ নেই, কোন

নিয়মভঙ্গ নেই, বিদ্রোহ নেই। তাই তাদের নিয়মকানুনও ১৯ নং কয়েদীর প্রতি কিছুটা শিথিল হয়ে গিয়েছিল বুঝি আপনা হতেই।

বছর সাতেক পরে, কুন্তী আবার কথা বলল।

মিঠুয়া এল কুন্তীর জীবনে। বছর পনেরর একটি মেয়ে।

ঐ বয়েসে সে নাকি তার স্বামীকে বিষ দিয়ে হত্যা করেছে।

কুন্তী তো অবাক হয়ে গিয়েছিল কথাটা শুনে।

অমন সুন্দর ফুলের মত একটি মেয়ে, অমন সুন্দর হাসিটি যার মুখে সর্বক্ষণ লেগে রয়েছে, সে কাউকে বিষ দিতে পারে নাকি।

মিথ্যা—হতে পারে না তা।

আর আশ্চর্য মেয়েটি, হয় হাসে না হয় গান গায়।

গান গায় সে, পরিচিত সব গান।

সেই প্রথমে শুধায় কুন্তীকে, তুমি কথা বল না কেন?

কুন্তী চেয়ে থাকে মিঠুয়ার মুখের দিকে।

গলায় বুঝি তোমার ব্যথা? মিঠুয়া আবার হাসতে হাসতে শুধায়।

কুন্তী মাথা নেড়ে জানায়, হ্যাঁ।

আহা, আমার মার মত বুঝি গলায় তোমার ক্যান্সার হয়েছে? খুব ব্যথা করে?

কুন্তী আবার মাথা নাড়ে।

মিঠুয়া আর কিছু বলে না, গেয়ে ওঠে ঃ

ধীরে বন্ধু, ধীরে ধীরে
চল তোমার বিজন মন্দিরে ॥
জান নে পথ, নাই যে আলো, ভিতর বাহির কালোয় কালো,
তোমার চরণশব্দ বরণ করেছি
আজ এই অরণ্য গভীরে ॥

কুন্তী অবাক হয়ে চেয়ে থাকে ওর দিকে।

মিঠুয়া গান গাইতে গাইতে কাজ করে, জেলের কাজ।

সেদিন গভীর রাত্রে বাইরে টিপ টিপ করে বৃষ্টি নেমেছে— চুপচাপ নিজের সেলের মধ্যে কুন্তী বসেছিল।

পাশের সেলেই মিঠুয়া থাকে, হঠাৎ তার গান শোনা যায় ঃ

অন্ধকারের মাঝে আমায় ধরেছ দুই হাতে।
কখন তুমি এলে হে নাথ, মৃদু চরণপাতে।
ভেবেছিলাম জীবন স্বামী, তোমায় বুঝি হারাই আমি—
আমায় তুমি হারাবে না বুঝেছি আজ রাতে ॥

গুনগুন করে গাইছে মিঠুয়া পাশের সেলে কিন্তু রাত্রির অন্ধকারে টিপ টিপ বৃষ্টির শব্দকে ছাপিয়ে প্রতিটি গানের কথা স্পষ্ট শোনা যায়।

মিঠুয়া গাইছে ঃ যে নিশীথে আপন হাতে নিবিয়ে দিলাম আলো
তারি মাঝে তুমি তোমার ধ্রুব তারা জ্বালো।

সারাটা রাত ধরে সেদিন গান গেয়েছিল মিঠুয়া। একটার পর একটা গান।

খালি গান আর গান।

তার পরদিনই শুধায় কুন্তী, এখানে এলে কেন?

বাঃ আসব না, হাসতে হাসতে মিঠুয়া বলে, আমি যে আমার স্বামীকে বিষ দিয়ে মেরেছি।

না, না।

সত্যি, ওরা সবাই বললে

কে, কে বললে?

কেন আমার শাশুড়ী, আমার দেওর, ননদ, সবাই—সবাই বললে দুধের সঙ্গে নাকি বিষ দিয়ে তাকে আমি মেরেছি।

সত্যি, সত্যি তুমি মেরেছ?

মিঠুয়া হঠাৎ যেন কেমন অন্যমনস্ক হয়ে যায়, বলে, কে জানে, হয়ত মেরেছি, না হলে আমার হাতের দুধ খেয়েই সেই যে সে শুলো আর উঠল না, আর ঘুম ভাঙল না। কিছুতেই যখন ডেকে ডেকে উঠল না, ডাক্তার এল, পরীক্ষা করে বললে মারা গেছে, আর—

আর—

বিষের ক্রিয়ায় নাকি তার মৃত্যু ঘটেছে, তার পরই পুলিশে ওরা খবর দিল জান।

তারপর?

পুলিশ এল, ওকে নিয়ে গেল, তারপর পরীক্ষা করে নাকি সত্যি সত্যি বিষ পেল, কিন্তু এটা ওরা বিশ্বাস করল না, বিকাশ আমাকে ভালবেসে বিয়ে করেছিল, আর আমিও যে তাকে ভালবাসতাম।

বিকাশ বুঝি তোমার স্বামীর নাম?

হ্যাঁ, বাবার ছাত্র ছিল সে, বাবাও আমার স্কুল মাস্টার, মা কবে ছোটবেলা আমার মারা গেছিল বাবার কাছেই মানুষ আমি। ঐ বিকাশ আসত বাবার কাছে পড়তে, মস্ত বড়লোকের ছেলে, ও আমায় বিয়ে করতে চাইল, তারপর একদিন আমাদের বিয়ে হয়ে গেল। আচ্ছা কুন্তীদি।

কি।

বড়লোকের ছেলের সঙ্গে গরীবের মেয়ের বিয়ে হয় না তাই না।

কে বললে, কেন হবে না।

না, হওয়া কিন্তু উচিত নয়।

কেন!

ও যে অসবর্ণ বিয়ে, ওতে কখনো মঙ্গল হয় না, সুখ হয় না।—নচেৎ আমার এমন হলো কেন। বাবা কিন্তু বুঝেছিলেন তাই বোধহয় বারবার এ বিয়েতে অমত করেছিলেন। কিন্তু—

কি—

বিকাশ কিছুতেই শুনলো না।

আচ্ছা মিঠু। তোমার বাবা চেষ্টা করেন নি তোমাকে বাঁচাতে ?

বাবা, হ্যাঁ চেষ্টা করেছিলেন কিন্তু তার টাকা কোথায় অত, হেরে গেলেন, আমার যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হল, সেই খবর পেয়ে বাবা যে বিছানায় শুলেন আর উঠলেন না।

সেই থেকেই মেয়েটা যেন কাছে এসে দাঁড়াল কুন্তীর।

ভেবেছিল আর নতুন করে নিজেকে জড়াবে না। কিন্তু মিঠুয়া তাকে জড়াল। কঠিন বাঁধনে বেঁধে ফেলল যেন।

তারপর হঠাৎ একদিন ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগষ্ট এল।

দেশ স্বাধীন হল। অনেক কয়েদী ছাড়া পেল।

মুক্তির পরোয়ানা এল কুন্তীরও অনেকের সঙ্গে। কিন্তু মিঠুয়ার এল না, তার মাত্র তিন বৎসর হয়েছিল।

কাল চলে যাবে কুন্তী ভোরে।

মিঠুয়াটা আজ আর একবারও আসে নি ওর কাছে।

ডাকলেও সাড়া দেয় নি, কথা বলে নি।

অথচ আশ্চর্য! সারাটা দিন কাজ করে আর গুনগুন করে গান গায়।

আজ কিন্তু মেয়েটার গলার শব্দ পর্যন্ত শোনা যায় নি একটি বারও।

দিনেরবেলা ওকে ধরবার অনেকবার চেষ্টা করেছে কুন্তী কিন্তু ও ধরা দেয় নি, কুন্তীর কাছ থেকে পালিয়ে পালিয়ে গিয়েছে।

মনে মনে তাই ভেবেছে কুন্তী, ধরা দিল না, নাই দিক।

আবার মায়ার বাঁধন কেন, কেন মিথ্যা জড়ানো নিজেকে আবার।

একবার জড়িয়ে পড়েছিল, সেই বাঁধনের দাগই আজ পর্যন্ত মিলাল না।

বুকের নিভৃতে এখনো রক্তক্ষরণ করছে!

বাইরে যতই সে ভুলে থাকবার চেষ্টা করুক না কেন, একটি মুহূর্তের জন্যও কি এই কয় বছরে ভুলতে পেরেছে তাকে।

॥ বাইশ ॥

সীতা। চোখ বুজলেই যে মনের পাতায় মুখটা ভেসে ওঠে।

সীতা, তার সীতা—আচ্ছা কত বড়টি আজ হয়েছে সীতা।

কত বয়স হল আজ সীতার, মনে মনে হিসাব করে কুন্তী, এক, দুই তিন বছর কবে হিসাব করে।

ঠিক ষোল বছরের হয়েছে সীতা এখন। কেমন দেখতে হয়েছে।

তার মার মত কি ? মানসীর মতই তো দেখতে ছিল সীতা, কেবল গায়ের রঙটা পেয়েছিল ফর্সা।

সীতার কি আজও তার কথা মনে আছে।

পাগল, মানে থাকে না কি কারো না থাকতে পারে।

কতটুকুই বা বয়স তখন তার, নেহাৎ বাচ্চা। হয়তো সব মন থেকে ধুয়ে-মুছে গিয়েছে কবে।

সামান্য ঝাপসা স্মৃতিও হয়তো মনের কোথায়ও আজ আর অবশিষ্ট নেই তার।

আর থাকবেই বা কেন?

কে সে সীতার। কেউ তো নয়। পর, নেহাৎই পর।

তাছাড়া সে কি স্বর্ণেন্দুকে বার বার করে অনুরোধ করেনি—ও যেন ভুলে যায় আমাকে।

সীতা তার কে, বরং বলতে পারে তার, মানসীর জীবনের পরম শত্রু। শত্রু বইকি সেই তো মানসী ও তার জীবনটাকে মরুভূমি করে দিয়েছে।

না, না, এ কি ভাবছে সে—হঠাৎ চমকে ওঠে কুন্তী।

পাশের সেলে তখন মিঠুয়া গান গাইছে—

দিনগুলি মোর সোনার খাঁচায় রইল না—
সেই-যে আমার নানা রঙের দিনগুলি।

কান্নাহাসির দিনগুলি।

সত্যিই তো, রইল তো না। মনের সোনার খাঁচা তো শূন্য, কোন কিছুই তো নেই সেখানে।

কান্নাহাসির বাঁধন তারা সইল না—
সেই-যে আমার নানা রঙের দিনগুলি॥

না, সত্যিই সে বেঁধে রাখতে পারেনি কাউকে।

সবাই চলে গিয়েছে জীবনের খোলা দ্বারপথ দিয়ে একে একে।

মা, বাবা, মানসী, সর্বশেষে সীতা—

সবাই চলে গিয়েছে একে একে।

এমন কি স্বর্ণেন্দু, তাকেও সে ধরে রাখতে পারেনি।

শিথিল মুঠি ছাড়িয়ে স্বর্ণেন্দুও চলে গেল একদিন।

অন্ধকার এক যবনিকা তার সমস্ত অতীতকে এক ভয়াবহ শূন্যতায় যেন গ্রাস করে রেখেছে।

মিঠুয়া তখন গাইছে:

আমার প্রাণের গানের ভাষা
শিখবে তারা ছিল আশা—
উড়ে গেল, সকল কথা কইল না—
সেই-যে আমার নানা রঙের দিনগুলি।

কিন্তু তাই কি সে চেয়েছিল। তা তো সে চায়নি—

সে তো ভালবাসতে চেয়েছিল, ভালবাসা পেতে চেয়েছিল, শূন্য হাত ভরে নিতে চেয়েছিল, কিন্তু কোথা থেকে কি হয়ে গেল।

তার কথা কেউ বুঝল না। কেন বুঝল না। কার দোষ, কার?

তার—মানসীর, না শিশিরাংশুর।

শিশিরাংশু।

না, তার প্রতিও আজ আর তার কোন অভিমান নেই।

কারাবাসের এই কয় বৎসরে তিলে তিলে পৃথিবীর সকলের প্রতি কখন

না, তবে। একটা চিঠি রেখে গিয়েছে স্বর্ণেন্দুবাবুর নামে।
আমারই নাম স্বর্ণেন্দু, কোথায়, কোথায় সে চিঠি, দিন।
জেলার ভদ্রলোক স্বর্ণেন্দুকে চিঠিটা বের করে দেন।
কুন্তীর চিঠি। নীচে নাম সই করা কুন্তীর!

॥ তেইশ ॥

স্বর্ণেন্দু—

অনেক, অনেক অপরাধ তোমার কাছে আমার এবং সব অপরাধই আমার ক্ষমা করেছ, আজকের শেষ অপরাধটাও ক্ষমা করবে আমি জানি—

ক্ষমা কর।

পারলাম না, তোমার সামনে দাঁড়াতে পারলাম, তাই চলে গেলাম।

তোমার প্রতিটি চিঠি পেয়েছি কিন্তু জবাব দিই নি।

তুমি তো জান, জবাব দেবার কিছু থাকলে নিশ্চয়ই আমি জবাব দিতাম জবাব দেবার কিছু ছিল না বলেই দিই নি।

জান স্বর্ণেন্দু, আজ আমার কি মনে হচ্ছে জান?—কার উপরে প্রতিহিংসা আমি নিলাম, কেনই বা নিলাম।

যাক, আজ আর সে কথা ভেবে লাভ কি।

এই চিঠির মধ্যে একটা চিঠি দিলাম, সীতা আমার সমস্ত সম্পত্তির এক্সিকিউটরিশন হবে, সব সে পাবে। তুমি ব্যবস্থা করে দিও।

সীতাকে বড্ড দেখতে ইচ্ছে করছে একবার শেষবারের মত তাকে কিন্তু উপায় নেই।

আর একটা কথা। আমার খোঁজ কিন্তু আর কর না লক্ষ্মীটি। পারো আশীর্বাদ করো তোমার কুন্তীকে। পরজন্ম বলে যদি কিছু সেদিন যেন আজকের মত এমনি করে তোমাকে পেয়েও হারাতে না হয়।

এমনি করে ঘর-বাড়ি-ভালবাসা, স্নেহ সব কিছু দু'হাত ভরে পেয়ে শূন্য বুকে হাহাকার নিয়ে জীবনটা যেন আমার নিঃশেষ হয়ে না যায়।

তোমার, চিরদিনের কুন্তী।

ক্লান্ত অবসন্ন ধুলোয় ভরা কাঁচা সড়ক ধরে কুন্তী তখনও হেঁটে চলেছে।

একা একা হেঁটে চলেছে।

পাছে স্বর্ণেন্দুর সঙ্গে দেখা হয় এবং দেখা হলে যদি না এড়ান যায় তাকে তাই আগের রাত্রেই জেল থেকে বের হয়ে এসেছে কুন্তী অনেক অনুনয় বিনয় করে জেলার ভদ্রলোককে।

মিঠুয়ার গানটা কানে ভাসছে যেন এখনও:

এত বেদন হয় কি ফাঁকি
ওরা কি সব ছায়ার পাখি।
আকাশ-পরের কিছুই কি গো রইল না—
সেই-যে আমার নানা রঙের দিনগুলি॥

ধ.ড়ি র্ত এসে সংবাদটা পেল স্বর্ণেন্দু।

টে আসে সীতা, বাবা, বাবা, জান—

আমার মা এসেছিলেন।

থায় ?

পে :নে! এখানে এসেছিলেন।

খন, কবে ?

্যাকুল উৎকণ্ঠায় যেন স্বর্ণেন্দু ভেঙে পড়ে।

াল রাত্রে, আমি তখন ঘুমাচ্ছি।

ত্য।

্যাঁ বাবা, সত্যি।

সত্যিই এসেছিল কুন্তী।

ঘুমাচ্ছিল সীতা তার ঘরে, মনোমা এসে তাকে ডেকে তোলে।

সীতা, ওঠ, ওঠ, শিগগির ওঠ

ঘুম ঘুম চোখে বিস্ময়ে মনোমার মুখের দিকে তাকিয়ে প্রশ্নটা করে।

কি হয়েছে মনোর মা—

দেখবি আয় হতভাগী কে এসেছে।

কে, কে মনোর মা।

দেখবি আয় না, শিগ্‌গীর আয়।

নীচের ঘরে দাঁড়িয়ে ছিল কুন্তী।

সর্বাঙ্গ ধূলি-ধূসরিত চোখে মুখে চুলেও ধুলো। মাথায় খদ্দরের ড়ির ঘোমটা।

সীতা কিন্তু ঠিক চিনেছিল, দেখেই চিনেছিল, হুবহু বাবার ঘরের ছবির ঙ্গ যেন এক।

মা।

সীতা।

ছুটে গিয়েছিল সীতা, ঝাঁপিয়ে পড়েছিল কুন্তীর বুকে।

মা, মাগো, এতদিন কোথায় ছিলে মা ? কেন আস নি এতদিন। আমি, াবা, তোমাকে কত জায়গায় খুঁজেছি, কত ডেকেছি।

সীতা।

কেন মা।

আমাকে তুমি ডেকেছ, খুঁজেছ ?

হ্যাঁ কত! তুমি কেন হারিয়ে গিয়েছিলে মা। চল মা, উপরে চল।

এখন নয় মা।

কেন ?

আমার ছোট্ট কাজ আছে, সেটা সেরে ভোরবেলা আসব।

না, না, তুমি আর যাবে না, তুমি গেলে আসবে না।

আসব রে আসব।

ঠিক তো।

হ্যাঁ।

ফাঁকি দিচ্ছ না?

না রে, না।

স্বর্ণেন্দুর মুখের দিকে তাকিয়ে তা বলে!

কিন্তু বাবা এত বেলা হয়ে গেল, তা এখনো এল না।

স্বর্ণেন্দু কুন্তীর ফটোর দিকে চেয়ে থাকে, মনে হয় কুন্তী যেন হাসছে।

কুন্তী হাসছে।

সীতাকে বলে গিয়েছে কুন্তী, সে যাবে। সে নাকি আবার ফিরে আসবে।

কুন্তী, সত্যিই তুমি আসবে তো? এসে ফিরে এসো কুন্তী।

স্বর্ণেন্দুর দুচোখের কোল বেয়ে দুফোঁটা অশ্রু গড়িয়ে পড়ে।

বাবা, মা আসবেন নিশ্চয়ই তাই না।

হ্যাঁ, আসবেন বৈকি। নিশ্চয়ই আসবেন।

স্বর্ণেন্দু তখনও নিঃশব্দে ফটোটার দিকে চেয়ে থাকে।